বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ · ১৮৯৪ শক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

রেজেস্ট্রি ডাক-ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বভারতী পত্রিকার রেজেস্ট্রি ডাকে বার্ষিক-চাঁদা ৯·৫০ টাকার পরিবর্তে ১১·৫০ টাকা করতে হল। ইতিমধ্যে যাঁরা ৯·৫০ টাকা পাঠিয়েছেন তাঁরা অনুগ্রহ করে আরো ২·০০ টাকা পাঠালে কৃতজ্ঞ হব।

সম্পাদক

বিশ্বভারতী পত্রিকা

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

অজানায় যে চলে নাহি ভয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্যের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।

নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সার রয়েছে সদায়
তারি পরে রাখি নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষ বিরাম নাই অকালের তলে।

— রবীন্দ্রনাথ

কর্মে ব্যস্ত পুরুষদের
অতি উপযুক্ত
বাটা স্টেপমাস্টার
একেবারে নতুন স্টাইলে, বাটা স্টেপমাস্টার।
জুতোর সম্মুখভাগ প্রসারিত।
আঙুলের আড়ষ্টতা কাটবে এই প্রসারে।
প্রথম দিন থেকেই প'রে পায়ের স্বস্তি
আর স্বাচ্ছন্দ্য।
কালো আর গাঢ় বাদামি,
দু রঙেই আছে।
আপনি যখন কাজে ব্যস্ত
আপনার পায়ের পরিচর্যায় থাকে
বাটা স্টেপমাস্টার।
স্টেপমাস্টার ১৪
সাইজ ৬-১০
৩০.৯৫
Ba_a
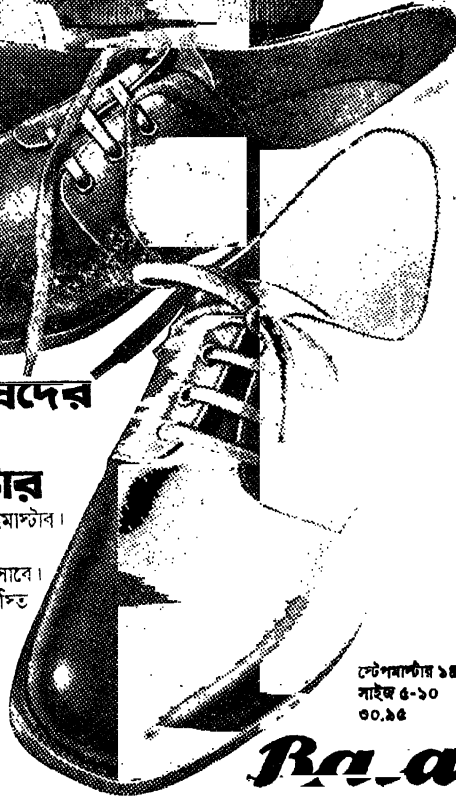
দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ইলেকট্রনিক, রেকর্ড ও জনরঞ্জনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম)

GC 7022A-1 BEN

It's not
that we are snobbish—
but breeding
looking for pedigree?
does tell and if
eugenics counts for anything
in industry, this pup
is all set to win the next
industrial dog show.
You need only glance at
the old Family Tree to
see why—Tata plus Stewarts
and Lloyds equals
something special.
The
Indian Tube Company
Limited
A
TATA-STEWARTS
AND
LLOYDS
ENTERPRISE
ITC 29A

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ · ১৮৯৪ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

একাকিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ · ১৮৯৪ শক

চিঠিপত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রথী, আজ সন্ধে বেলায় জাহাজ সাংহাই পৌঁছবে। হংকঙের কাছ থেকে ক্রমে শীত বেড়ে চলেচে। এখন রীতিমত ঠাণ্ডা। সাংহাইতে বরফ জমেচে খবর পাওয়া গেল। এই ঠাণ্ডা ভালই লাগচে। স্বাস্থ্যের হিসেবে এটা উপকারী। সাংহাই থেকে জাপানের দিকে এর চেয়ে আর একটু কম শীত হবে। কানাডার জাহাজ সম্বন্ধে আমরা অনিশ্চয়ের মধ্যে আছি। হংকঙে খবর নিতে গিয়ে শোনা গেল Empress of Asiaতে আমাদের নামে ক্যাবিন রিজার্ভ করা হয় নি। শুনে অবধি আমরা নানা জায়গায় তার করেছি— সাংহাইয়ে গিয়ে বোধ হয় পাকা খবর পাওয়া যাবে। যদি ক্যাবিন না পাই তবে প্রেসিডেণ্ট লাইনে স্থান পাওয়া সম্ভব হবে— কাঁচাভাবে সেই লাইনে ব্যবস্থা করতে বলে এসেছি। এই জাহাজে যথাস্থানে পৌঁছতে আরো দুদিন দেরি হবে। অর্থাৎ ৮ই ভ্যাঙ্‌কুভরে পৌঁছব। তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না, তা ছাড়া আমাদের এতে কোনো অপরাধ নেই। সাংহাইয়ে "সু"র সঙ্গে দেখা হবে— খুব সম্ভব সে ডাঙায় কোথাও আমাদের জন্যে থাকবার বন্দোবস্ত করবে— ওখানে জাহাজ দুদিন থাকবে বলে কথা আছে। এখান থেকে য়ুকোহামা পর্য্যন্ত এ জাহাজে যাত্রী খুব কম বাকি থাকবে— কিন্তু যাত্রীদের নিয়ে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় নি। সাংহাই কিম্বা য়ুকোহামায় আমার সিল্কের কাপড়গুলোয় নতুন আবরণ লাগিয়ে নেব— কেননা অনেকগুলোই পোকায় কেটেচে। হংকঙে আমরা ভারতীয়দের কাছ থেকে ৮০০ টাকা পেয়েছি— সাংহাইতেও পাব— তাছাড়া কোবে ও য়ুকোহামায়। এই টাকাগুলো প্রেসিডেণ্ট ফণ্ডে জমা করে দেব। চেক তোর নামে দেব, যাতে দরকার হলে বিদ্যালয়ের জন্যে তুই ব্যবহার করতে পারবি। যদি পাঠভবনে এক আধজন শিক্ষকের জন্যে টানাটানি ঘটে তবে এই টাকা থেকে লোক রাখতে পারবি। পাঠভবনে হাতের কাজ, কলের কাজ, ইন্দ্রিয়বোধ চর্চ্চা, সামাজিকতা চর্চ্চা, গৃহসামগ্রীর পারিপাট্য, পরিবেশের সৌষ্ঠবসাধন প্রভৃতি ব্যাপারে যে সব খরচ অত্যাবশ্যক সেইগুলো জোগাবার জন্যেই আমি বিশেষ ভাবে প্রেসিডেণ্ট্ ফণ্ড্ খুলেছিলুম। ঐ কাজগুলো যেন মনোযোগ বা উপকরণ অভাবে বন্ধ না থাকে— এবং যেন ঐচ্ছিকভাবে না হয়ে আবশ্যিকভাবে করানো হয়। মাঝে মাঝে ইংরেজি নাটক অভিনয় ভাষাশিক্ষার পক্ষে উপযোগী এ কথা যেন মনে থাকে— অবশ্য এই সুযোগে উচ্চারণ এবং একসেণ্টের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। অভিনয় উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষ্যে শ্রীনিকেতনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের ঘনিষ্ঠযোগ থাকা অবশ্যকর্ত্তব্য—

এমন কি, সাঁওতাল পাড়া ও ভুবনডাঙার ছেলেদেরও কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া উচিত। গ্রামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষায় কালীমোহন যদি ছেলেদের সাহায্য করে তাহলে ভালো হয়— আমি বারবার বলেচি এই শিক্ষা খুবই দরকারী। ১৭ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রথী, আজ কোবে থেকে গাড়ি করে য়ুকোহামায় যাচ্চি— সেখানে অন্য স্টীমারে উঠ্‌তে হবে। কিন্তু ক্যাবিন সম্বন্ধে কিছু গোলমাল আছে। মেজর নে এই কয়দিন হল স্টীমারওয়ালাদের তার করেচেন— দেরি হয়েচে বলে তারা সুবিধেমত ক্যাবিন দিতে পারচে না। বলেচে চেষ্টা চল্‌চে হয় তো য়োকোহামায় গিয়ে পাওয়া যেতে পারে। ভালো লাগ্‌চে না। বেশিদিন নয় এই যা। একটা লেকচার লেখা বাকি আছে বলেই ভাবনা আছে। যদি তেমন ক্যাবিন না পাই তাহলে লেখা শক্ত হবে। দেখা যাক্। এখানে ব্যবসার অবস্থা ভালো নয়— নইলে কোবে থেকে কিছু বেশি পরিমাণে টাকা পাওয়া যেত। এরা পরে সংগ্রহ করে তোর ঠিকানায় প্রেসিডেন্ট ফণ্ডের জন্য কিছু টাকা পাঠাবে বলে কথা দিয়েচে। য়োকোহামা থেকেও আশা করি কিছু পাওয়া যাবে। অনেক বাক্সে জিনিষ এখান থেকে ফেরৎ পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছি। কয়েক সেট গালার থালা বাটি তোদের জন্যে পাঠাচ্ছি। কাজে লাগবে। ওগুলো পৌঁছলে পর এক সেট থালা বাটি মীরাকে দিস্। এখানে আমরা ফতে আলি বলে একজন ধনীর বাড়িতে আছি। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাদের খুব যত্ন করেচেন। টাকার ও অপূর্ব্বও এই বাড়িতে আছে। আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গাড়ি ছাড়বে— কাল সকালে প্রায় নটার সময় য়োকোহামায় পৌঁছবে।

সতী এইখানেই আছে, তার স্বামী সহায় এখানে কাজ করে। সহায় আমাদের জন্যে প্রাণপণে খাটচে। অনেক খরচও করেচে। এই ছেলেটিকে আমার খুব ভালো লাগল।

সুধীন্দ্র জাহাজ থেকে নেমে একজন গাইডকে সহায় করে জাপান পরিদর্শনে বেরিয়েচে। য়ুকোহামায় গিয়ে আমাদের ধরবে। ওসাকা আসাহী কাগজওয়ালারা টোকিয়োতে আমাকে অভ্যর্থনার আয়োজন করেচে, সেখানে একত্রে টোকিয়োর কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হবে।

নল্‌ডেরা জাহাজে আমাদের বেশ আরামে কেটেচে। ক্যাবিনে খুবই ভালো বন্দোবস্ত ছিল। ক্যাপ্টেন প্রভৃতি সকলেই বিশেষ যত্ন করেচে— কোনো অসুবিধা হয়নি। এখানকার স্টুয়ার্ড তোর কথা বল্‌লে। মোরিয়া জাহাজে সে আমাদের স্টুয়ার্ড ছিল। ইতি ২৫ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ দোল পূর্ণিমা। মেঘ করে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। খুব ঠাণ্ডা।

৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রথী, কাল সমস্ত দিন টোকিয়োতে কেটেচে। একদিনে অনেকগুলো বক্তৃতা ইত্যাদি সারতে হয়েছে। টোকিয়ো আসাহি খবরের কাগজওয়ালারা আমাকে লাঞ্চ্ দিয়েছিল। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের সমাগম হয়েছিল। কিছু বল্‌তে হল। তার পরে বিকেলে ওসাকা মাইনিচি কাগজওয়ালাদের ঘরে চা— সেখানেও বক্তৃতা। তার পরে মেয়েদের য়ুনিভর্সিটি সেখানেও বক্তৃতা এবং ডিনার। তার পরে ওসাকা আসাহিদের মীটিংহলে কিছু বক্তৃতা এবং কবিতা পাঠ। না করে থাকা যায় না। কেননা জাপানের জনসাধারণ বিশেষত নব্যদল আমাকে আশ্চর্য্যরকম ভক্তি করে— আমাকে নিয়ে এখানে সর্ব্বত্র এমন উৎসাহ যে সে দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। এরা আমাকে বারবার বলেচে আমি যদি অন্তত এদের মধ্যে একমাস থাকতে পারি তাহলে একটা নতুন যুগ গড়ে উঠ্‌বে— কথাটা অত্যুক্তি বলে মনে হয় না। মেয়েদের য়ুনিভর্সিটিতে ছাত্রীসভা এমন শান্ত সুন্দর সুসংযত যে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মোটের উপর কাল যদিও আমাকে অত্যন্ত বেশি কাজ করতে হয়েছিল তবু এদের খুসি করে আমার মন খুসি হয়েছে। যেখানে কাজ করলে সত্যিকার কাজ হয় সেখানে ক্লান্তি হয়না— যেখানে লোকে আমাকে কেবল নামের জন্যে ব্যবহার করতে চায়, যেখানে ফাঁকা হাততালি, যেখানে কথার বদলে কথা কিন্তু কোনো ফল নেই সেখানেই দুঃখ। এই জাপানেই তার পরিচয় পেয়েছি। কোবেতে ভারতীয় সভায় আমাকে অভ্যর্থনা করে আমাকে বক্তৃতা করালে— কিন্তু বেশ জানা গেল সে কেবল নামের খাতিরে। আমার যথাসাধ্য বলেছিলুম, ওরাও বল্লে খুব মনে লাগ্‌ল— কিন্তু নিতান্ত অগভীর— মিথ্যে কথা বল্‌লেই হয়। নিজের শক্তি কতই নষ্ট করেচি, তার বদলে কেবল ক্লান্তি জমেচে। কিন্তু জাপানীদের মধ্যে কিম্বা য়ুরোপীয়দের কাছে আইডিয়া জীবনের জিনিষ, কেবলমাত্র সাহিত্যিক রচনা নয়। এখানে এরা প্রস্তাব করচে আমাকে কিছুদিন এখানে রাখবার জন্যে এরা টাকা তুলবে। লস্ এঞ্জেলিসের কাজ সেরে জুলাই অগস্ট এখানে কাটিয়ে তারপরে সেপ্টেম্বরে নিয়ুইয়র্কে যদি ফিরে যাই তার বন্দোবস্ত করে দিতে এরা রাজি আছে। দেখি কি হয়। টাইকানের সঙ্গে দেখা হল। ব্যারন্ ওকুরো আধুনিক জাপানি আর্টিস্টদের ছবি নিয়ে য়ুরোপের নানা সহরে একজিবিশন করার ব্যবস্থা করচেন। সেই উপলক্ষ্যে টাইক্কান এবং আর কয়েকজন জাপানী আর্টিস্ট য়ুরোপে শীঘ্রই যাবেন। এই বছরেই তোরা আমার ছবি এক্‌জিবিট করতে চেয়েছিলি— ভাগ্যে সেটা সম্ভব হয়নি। এখানে ছবি নকল করবার যে প্রণালী আছে সেইটে আমাদের ছাত্রদের শেখবার কোনো উপায় আছে কিনা টাইকানকে জিজ্ঞাসা করলুম— তিনি বল্লেন কোনো ব্যাঘাত হবে না, খুবই সহজ— কেবল এমন ছাত্র আসা চাই যে ছবি দেখে হাতে নকল করতে পারে। এখানে একজন মিঠাই ফ্যাক্‌টরিওয়ালা জাপানী বলেচেন তিনি একজন ছাত্রকে তাঁর ঘরে রাখ্‌তে রাজি আছেন, অর্থাৎ খাওয়া এবং বাসাভাড়া লাগ্‌বেনা। জিজ্ঞাসা করলুম্ শিখ্‌তে কতদিন লাগবে, বললেন তিন চার মাস। ধরে নেওয়া যাক এক বছর। যদি কাউকে এক বছর এখানে রেখে পাকাকরে শিখিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে বিশেষ কাজে লাগবে— হাজার তিন চার যদি খরচ করা যায় তবে সেটা ব্যর্থ হয় না। জুজুৎসু শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা। এই বিদ্যাটা আমাদের মেয়েদের পর্য্যন্ত শেখা উচিত। যদি ভালো শিক্ষক পাওয়া যায় ত চেষ্টা করা উচিত। আমাদের

দেশে আজকালকার দিনে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এর খুব দরকার হয়েচে।— আজ তিনটের সময় জাহাজ। জাহাজে মনের মত জায়গা পাইনি— কিন্তু সেজন্যে যদি যাওয়া ফাঁসিয়ে দিই তাহলে দেখতে খারাপ হবে। ন দিন মাত্র লাগবে। ক্যাবিনটা বড়ো, লেখবার টেবিল আছে, ঠিক সামনেই নাবার ঘর— সুতরাং বিশেষ অসুবিধে হবে না।

টোকিয়োতে যে রাত্রে পৌঁছলুম সেই রাত্রেই একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে এক থান সাদা সিল্ক উপহার দিলে। তার ইতিহাস হচ্চে এই যে, সে তার ছেলেকে দেখ্‌তে য়ুরোপে গিয়েছিল। মার্সেল্‌সে পৌঁছে দেখ্‌লে তার ছেলে তাকে নিতে আসে নি। য়ুরোপের ভাষা জানে না। একে একে সব লোক নেবে গেল— কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না— ওর দুরবস্থা দেখে একজন ভারতীয় যুবক ওকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হল। ওকে নিয়ে রেলগাড়িতে করে প্যারিসে গিয়ে ওর ছেলের হোটেল খুঁজে বের করে পৌঁছিয়ে দিলে। ছেলে তখন রোগশয্যাশায়ী, ভেবে অস্থির হয়েছিল ওর মা কি করে ওর কাছে আস্‌বে। দশ দিন বাদে ছেলেটি মারা গেল। এই ভারতীয় যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে সে বল্‌লে সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি— বার্লিনে তার বাসা। বুঝতে পারা গেল, সৌম্য। বিবরণটা শুনে ভারি খুসি হয়েচি। এই সিল্কের থানটা পাঠিয়ে দিচ্চি, মীরাকে দিয়ে দিস্।

য়ুকোহামায় সিদ্ধিদের বাড়িতে আছি খুব যত্ন করচে। ভূমিকম্পে হারার সর্ব্বনাশ হয়েচে— যে বাড়িতে ছিলুম সেই বাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই সকল কারণে সে লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারচেনা আজ সকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

মেয়েদের য়ুনিভর্সিটি থেকে মেয়েদের নিজের হাতের তৈরি একটি কুষন্ দিয়েছে সেটাও তোদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্চি। বসবার আসন। কতকগুলো বাজে বই জমে উঠেচে, বয়ে বেড়াবার দরকার নেই— সেও তোদের পাঠিয়ে দিতে বলেচি।

এখানে এসে অবধি মেঘ বৃষ্টি চলছিল— আজ একটু পরিষ্কার হবার মতো চেহারা দেখতে পাচ্চি। সমুদ্রে যদি মেঘলা করে থাকে ভালো লাগে না। শীত যথেষ্ট আছে। ইতি ২৮ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল যখন টোকিয়োতে ছিলুম হারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি দূরে কোথায় বাস করচেন। তাঁর অনেক লোকসান হয়েছিল বটে তবু এখনো যথেষ্ট আছে। যে বাড়িতে ছিলুম সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

টাকার। শান্তিনিকেতনে তৎকালীন অধ্যাপক Boyd G. Tucker

সতী। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, তৎকালে জাপান প্রবাসী

অপূর্ব। অপূর্বকুমার চন্দ

সুধীন্দ্র। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সৌম্য। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালীমোহন। কালীমোহন ঘোষ

মীরা। কন্যা মীরা দেবী

টাইকান। প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী

সু। রবীন্দ্রনাথের চৈনিক সুহৃৎ সু-ৎসী-মো

হারা। জাপানী বণিক হারাসান। ১৯১৬ অব্দে কবি জাপানে এঁর আতিথ্য স্বীকার করেন।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার আদিকথা

প্রবোধচন্দ্র সেন

গীতিকবিতা দিয়েই মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের আরম্ভ। শর্মিষ্ঠা নাটকের 'প্রস্তাবনা'-নামক কবিতাটি তাঁর প্রথম গীতিকবিতা বলে স্মরণীয় হবার যোগ্য। কবিতাটি অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়; এটিতে স্বদেশপ্রীতির আবেগসঞ্জাত যে বেদনাময় লিরিক সুর বেজে উঠেছে তাও স্মরণীয়। শর্মিষ্ঠা নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে জানুআরি মাসের মাঝামাঝি সময়ে (৬ তারিখের পরে ও ১৯ তারিখের পূর্বে) অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর (২৩ জানুআরি ১৮৫৯) কয়েক দিন মাত্র পূর্বে। ঈশ্বর গুপ্ত বোধ করি শর্মিষ্ঠা নাটক দেখে যাবার সুযোগ পান নি। যদি দেখে যেতেন তা হলে তিনি সহজেই মধুসূদনের ওই প্রস্তাবনাটির ছন্দে নিজের অন্তরেরই প্রতিস্পন্দন অনুভব করতেন।

> ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়,
> জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়।
>
> —ভারতভূমির দুর্দশা

> জননী ভারতভূমি,
> আর কেন থাক তুমি
> ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
> তোমার কুমার যত
> সকলেই জ্ঞান হত,
> মিছে কেন মর ভার বয়ে?
> ...
> দেশের দারুণ দুখ
> দেখিয়া বিদরে বুক,
> চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
> লিখিতে লেখনী কাঁদে,
> ম্লানমুখ মসি ছাঁদে
> শোক-অশ্রু করে বরিষণ॥
>
> —ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

ঈশ্বর গুপ্তের এসব উক্তির সঙ্গে মধুসূদনের উক্ত 'প্রস্তাবনা'র এই অংশটা মিলিয়ে দেখুন—

> শুন গো ভারতভূমি,
> কত নিদ্রা যাবে তুমি,
> আর নিদ্রা উচিত না হয়।
> উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর,

হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয় ॥

—'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), প্রস্তাবনা

দুই জনের কণ্ঠে একই সুর। অথচ একটু পার্থক্যও আছে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় বেদনার ছায়া গাঢ়তর এবং তাঁর 'জননী' সম্ভাষণের আন্তরিকতাও গভীরতর। তা ছাড়া, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় শুধু বেদনা নয়, নৈরাশ্যের সুরও সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে মধুসূদনের রচনায় বেদনার মধ্যেও বলিষ্ঠ আশাপরায়ণতার সুরই ধ্বনিত হয়েছে। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ ঈশ্বর গুপ্তের মনের সম্মুখে ছিল দেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণ, আর মধুসূদনের উদ্দিষ্ট শ্রোতা ছিল তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত অভিজাতসম্প্রদায়। শুধু ভারতভূমি নয়, বাংলাদেশ সম্বন্ধেও তাঁদের মনোভাবের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি—

যতেক বাঙালীগণ
কাঙাল সকল জন,
বাঙালীরে বিধাতা বিমুখ।

আর মধুসূদনের উক্তি—

জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

এই দুএর তুলনা করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। শুধু যে স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে তাঁদের মনোভঙ্গিতে এই পার্থক্য দেখা যায় তা নয়, তাঁদের সমগ্র সাহিত্যসাধনাতেই এই পার্থক্য সুপরিস্ফুট— এক জনের উদ্দিষ্ট দেশের সর্বসাধারণ, আর-এক জনের উদ্দিষ্ট শুধু শিক্ষিতসম্প্রদায়। মধুসূদন তাঁর মহাকাব্য লিখেছিলেন প্যারাডাইস লস্ট-পড়া নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদের জন্য, আর ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবিতাবলী লিখেছিলেন প্রধানতঃ শুধু বাংলা-জানা পাঠকসাধারণের জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র ও মধুসূদনের শিক্ষা ও মনোভঙ্গিগত এই পার্থক্য তাঁদের রচিত সাহিত্যের রস ও রূপকে প্রভূতপরিমাণেই প্রভাবিত করেছিল। এই রস ও রূপের পার্থক্যের বিষয় বাদ দিয়ে যদি তাঁদের হৃদয়জাত অনুভূতিগুলির কথা বিচার করা যায় তা হলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অন্তরের আনন্দবেদনার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, একই কালধর্ম উভয়ের চিত্তে প্রতিফলিত হয়ে তাঁদের আনন্দবেদনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সে বিশ্লেষণ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

ঈশ্বরচন্দ্র যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না তাতে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ব্যাহত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তাতে দুটি সুফলও ফলেছিল। প্রথমতঃ, ইংরেজি শিক্ষার আভিজাত্য ছিল না বলেই তিনি সর্বসাধারণের কবি হতে পেরেছিলেন, সর্বস্তরের পাঠকই তাঁকে আপনজন বলে, নিজেদের কবি বলে গ্রহণ করতে পেরেছিল। সাধারণ পাঠক তাঁর রচনায় যে সুহৃৎসুলভ সহৃদয়তার স্বাদ পেত তাতে সকলেই তাঁর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছিল। সর্বসাধারণের কবি হবার এই যে দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল, পরবর্তী কালে মধুসূদনপ্রমুখ 'শিক্ষিত' কবিসাহিত্যিকরা কেউ সে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারেন নি। তাঁরা ছিলেন শিক্ষাভিজাত ও শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের কবি, তাঁরা সর্বসাধারণের কবি হতে পারেন নি। তাঁদের উচ্চাঙ্গ সাহিত্য ছিল শিক্ষিত সমাজেরই সম্পদ, সকলের নয়। উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের প্রভাবে সমগ্র জাতিটা যে উঁচুনিচু দুই স্তরে বিভক্ত হয়ে গেল, এটা দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের সহায়ক হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, দেশের লোক তাঁকে আপনার কবি বলে গ্রহণ করার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র

সকলের চিন্তা ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করবার এবং প্রয়োজনমত সকলকে একভাবে উদ্‌বুদ্ধ করবার ও এক আদর্শের অভিমুখে প্রেরণা দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন ; কেননা, সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা তাঁকে সকলের গুরুর আসনেই বসিয়েছিল। তিনি যে সব সময় সে সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতেন কিংবা গুরুর আসনের মর্যাদা রক্ষা করতেন তা বলা যায় না। কিন্তু অনেক সময়ই করতেন এবং তার ফলে তাঁর কণ্ঠে যে সহৃদয় গুরুর স্বর ফুটে উঠেছে তার মূল্যও কম নয়। যেমন—

১ জান না কি জীব তুমি
জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে
সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?

কিংবা

২ ইন্দ্রের অমরাবতী
ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ-সার।
শিবের কৈলাসধাম—
শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥

—স্বদেশ

এর স্বর আত্মগত নয়, এ স্বর গুরুর স্বর। কিন্তু তা হলেও তার মধ্যে যে একটি সুকোমল প্রীতি ও সুগভীর বেদনার রসধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার মূল্য কম নয়, তার লিরিকমাধুর্যও অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় অংশটিতে ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’-এর যে ক্ষীণ পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে, সহৃদয় পাঠকের কানে তাও সহজেই ধরা পড়ে।

মোট কথা, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় লিরিক গীতিকার স্বর কখনও বাজে নি এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সে সুর পূর্ণবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। লিরিক কবিতার উপযোগী বিষয়বস্তু—ঈশ্বরভক্তি, মানবিকতাবোধ, স্বদেশপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, এসবও ছিল তাঁর আয়ত্তে, সেসব বিষয়ের প্রতি আন্তরিক অনুরাগও তাঁর ছিল, তবু তাঁর রচনায় লিরিকের স্রোত অব্যাহত গতিতে বয়ে যেতে পারে নি, সে স্রোত প্রায়শঃই অনুপ্রাস-যমকের উপলখণ্ডে ব্যাহত হয়ে বেগহীন, এমন-কি লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়ে গিয়েছে। তার কারণ কি ? কারণ সুশিক্ষাজাত সুরুচি ও শিল্পবোধের অভাব এবং সহজ উপায়ে লোকরঞ্জনের আগ্রহ। তা ছাড়া গুরুগিরির আগ্রহটাও অনেক সময় তার অন্তরায় ঘটিয়েছে। এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, তাঁর ‘প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই, প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন’। কিন্তু পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ না পেলেও তাঁর মধ্যে যে লিরিক অনুভূতি ও শক্তি ছিল তার বহু নিদর্শন বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনাবলীতে। সেসব

খণ্ড খণ্ড নিদর্শন সংকলিত হলে তাঁর প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু সে প্রতিভা ও শক্তির পূর্ণ পরিণত ফল পাওয়া গেল না বলে আক্ষেপও করতে হবে।

দেখা গেল, মধুসূদনের লিরিকপ্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে নি এক ধরণের শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাবে, আর ঈশ্বর গুপ্তের লিরিকপ্রতিভাও মেঘাচ্ছন্ন রয়ে গেল অন্যবিধ শিক্ষা (বা অশিক্ষা) ও সংস্কারের ফলে। সেজন্যই বিহারীলাল বাংলা গীতিকবিতার ধারায় পূর্ণবেগ সঞ্চারের গৌরবলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তা বলে এ কথা সত্য নয় যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লিরিক সুর তাঁর কণ্ঠেই প্রথম শোনা গেল।

মধুসূদন ও ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বতন যুগের দিকে আর-একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, তখনও বাংলা সাহিত্যকুঞ্জে লিরিক কবিতার পিকধ্বনি একেবারে অশ্রুত ছিল না। যথাস্থানে তারও একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাবে।

ঈশ্বর গুপ্ত সুশিক্ষা ও মার্জিত শিল্পরুচি থেকে বঞ্চিত ছিলেন বটে, কিন্তু সহজাত প্রতিভাবলে তিনি যুগধর্মকে অনায়াসেই অধিগত করতে পেরেছিলেন। তাই আধুনিক সাহিত্যের অনেকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণই তাঁর রচনায় এত সহজে ফুটে উঠতে পেরেছিল। তাঁর কালটা যে খণ্ডকবিতারই কাল, আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যের কাল নয়, তা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি কখনও অন্নদামঙ্গল বা বাসবদত্তা, পদ্মিনী-উপাখ্যান বা তিলোত্তমাসম্ভবের মতো কাহিনীকাব্য রচনার কল্পনাও করেন নি। এই সহজবোধ না থাকলে তিনি হয়তো সে পথে অগ্রসর হয়ে ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হতেন। শ্রমসাধ্য বৃহৎ কর্মে ব্রতী হবার ক্ষমতা যে তাঁর ছিল না তা নয়। তার প্রমাণ তাঁর কবিজীবনী-সংগ্রহ ও বোধেন্দুবিকাস নাটক। কিন্তু তাঁর পদ্যরচনাশক্তিকে সে দিকে চালনা করেন নি। এটা তাঁর সহজাত যুগধর্মানুভূতিরই পরিচায়ক। কবিতার বিষয় নির্বাচনেও তাঁর এই যুগানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মবোধের কথা ছেড়ে দিই, কেননা, এ বিষয়টা চিরকালের, কোনো বিশেষ কালের নয়। প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রকৃতিবর্ণনা সর্বকালের হলেও একালে তা একটি বিশেষ রসে ও রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। পূর্বতন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিপ্রীতি বিরল, প্রকৃতিবর্ণনাও এত দুর্বল ও একঘেয়ে যে তাকে আমাদের সাহিত্যের একটা বড় দৈন্য বলেই স্বীকার করতে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই এ দৈন্য মোচনের প্রথম প্রয়াস দেখা গেল। তাঁর অন্তরে যে প্রকৃতির প্রতি একটা গভীর অনুরাগ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে অনুরাগ কখনও গীতিকবিতার আবেগে পরিণত হতে পারে নি। ফলে তাঁর অনুরাগ বিশুদ্ধ বর্ণনাতেই পর্যবসিত হয়েছে এবং সে বর্ণনা কবির হৃদয়রসে অভিষিক্ত নয়। কিন্তু যথাযথ বর্ণনারও একটা কাব্যমূল্য আছে। এই কাব্যমূল্যই ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃতিবর্ণনার মূলধন। দুঃখের বিষয় মার্জিত শিল্পরুচির অভাবে তাতেও অনেক সময় স্থূলতা দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় আধুনিক যুগের যেসব বিশিষ্টতা দেখা দিয়েছে তাতে বাংলা সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধিই হয়েছে সন্দেহ নেই।

তার পরে নারীপ্রেম। নারীপ্রেম সাহিত্যের একটি চিরন্তন উপজীব্য। মানুষের জীবনে এই প্রেমের গুরুত্ব কতখানি ঈশ্বর গুপ্ত যে তা জানতেন না তা নয়। তাঁর রচনাতেই তার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁর জীবনে যথার্থ অনুভূতিতে পরিণত হবার সুযোগ পায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র তার কারণ নির্দেশ করেছেন। ফলে এ ক্ষেত্রে ছন্দস্পন্দনের সঙ্গে হৃদয়স্পন্দনের সাযুজ্যসাধনের সৌভাগ্য ঈশ্বরচন্দ্রের কখনও হয় নি। এই রিক্ততাই তাঁর রচিত সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দীনতা। তা ছাড়া প্রকৃতিপ্রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও

যে তাঁর হৃদয়াবেগের অভাব দেখা যায়, তাঁর জীবন ও সাহিত্যের এই রিক্ততাই বোধ করি তারও একটি প্রধান হেতু।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব স্বদেশপ্রেম, সমাজচিত্রণ ও হাস্যরসের কবিতা রচনায়। এই তিনটি বিষয়েই তাঁর কালোপযোগী দৃষ্টি ও মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। এখানেই তিনি আধুনিক কালের কবি।

তাঁর স্বদেশপ্রীতি আন্তরিক ও সুগভীর। এ ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের মর্যাদা ও গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলা কাব্যে স্বদেশপ্রীতির যে বান ডেকে এসেছিল তার আদি উৎস পাই তাঁরই কবিতাবলীতে। দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। নূতন উদ্‌ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের স্বদেশ-কল্পনা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তার একটু পরিচয় না দিলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে। ভাবী ভারতের সমুজ্জ্বল গৌরবের কথা কল্পনা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখা দিয়েছিল, এ কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। স্বাধীনতার কথা তাঁর রচনায় বারবারই দেখা দিয়েছে। অতীত কালের স্বাধীন ভারতের চিত্রকল্পনায় যেমন তাঁর বুক থেকে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস নিঃসৃত হয়েছে, তেমনি ভাবী স্বাধীন ভারতের গৌরবের চিত্রকল্পনাও তাঁর অন্তরে সুখময় স্বপ্নের মোহ জাগিয়েছে। যেমন—

স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে ভারতের জরা-দেহে
করিবেন শোভার সঞ্চার ॥
দূর হবে সব ক্লান্তি, পলাবে প্রবলা ভ্রান্তি,
শান্তিজল হবে বরষণ।
পুণ্যভূমি পুনর্বার পূর্বসুখ সহকার
প্রাপ্ত হবে জীবন-যৌবন ॥

এরূপ স্বপন যত কত হয় মনোগত,
মনোমত ভাবের সঞ্চার।
ফলে তাহা কবে হবে, প্রসূতির হাহারবে
সুত সবে করে হাহাকার ॥

—ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

ঈশ্বরচন্দ্র বর্তমান পরাধীনতার দুঃখে মর্মবেদনা অনুভব করেছেন, ভাবী স্বাধীনতার স্বপ্নে মুগ্ধ হয়েছেন এবং সে স্বপ্নকে সফল করে তোলবার জন্য স্বদেশবাসীকে কর্মের প্রেরণাও দিয়েছেন। শুধু কবিতায় নয়, গদ্যরচনাতেও ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় উৎসাহ সঞ্চারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর এই প্রেরণাবাক্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।—

"যে মনুষ্য স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহিত না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে।... অপিচ মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি জাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের জন্য প্রযত্ন করেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪ বৈশাখ ১৩৭৮, 'দিনের বাণী'

কিন্তু 'স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের' জন্য স্বজাতির প্রতি এই যে প্রেরণা, তাতে তিনি দুর্বার বন্যাবেগের শক্তি

সঞ্চার করতে পারেন নি। পরাধীনতার মর্মজ্বালা ও স্বাধীনতার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা মধুসূদনের অন্তরকেও আকুল করে তুলেছিল (স্মরণীয় 'ভারতভূমি' ও 'আমরা'-নামক চতুর্দশপদী কবিতা-দুটি), কিন্তু তাঁর রচনাতেও কর্মপ্রেরণার প্রবল শক্তি দেখা দেয় নি। সে সময় তখনও আসে নি। এসেছিল আরও কিছুকাল পরে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার (১৮৬৭) সময় থেকে।

নিখুঁত সমাজচিত্র রচনার মূলেও ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের এই স্বদেশানুভূতির প্রেরণা। স্বদেশকে ভালোবাসতেন বলেই সমাজের সবরকম রীতিনীতি এবং আচারব্যবহারের খুঁটিনাটিগুলিও এমন মমতামাখা দৃষ্টিতে দেখতে ও এমন সুনিপুণভাবে চিত্রিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই নৈপুণ্যের বিশদ পরিচয় দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরসের মূলেও আছে এই মমতাভরা সমাজদৃষ্টি। সমাজের প্রতি মমতা ছিল বলেই সমাজের দোষত্রুটিগুলি তাঁর হৃদয়ে জাগাত সুতীব্র বেদনা। তাঁর হাস্যবিদ্রূপের মূল উৎস এই মমতাজাত বেদনা। ঈশ্বর গুপ্তের হাসি নির্মম ছিল না, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। মমতাহীন নিষ্ঠুর হাসি জীবনে যেমন স্পৃহনীয় নয়, সাহিত্যেও তেমনি অকাম্য। আর অহেতুক লঘু হাস্য যদি উচ্চাঙ্গের শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত না হয় তবে তা কখনও ক্ষণিকতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। বিশুদ্ধ মিষ্টতার চেয়ে অম্লতা-মিশ্রিত মিষ্টতারই স্বাদমূল্য বেশি। তেমনি করুণরসমিশ্রিত হলেই হাস্যরসের স্বাদমূল্য বাড়ে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় এইজাতীয় হাস্যরসের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

দূর হউক এ বিড়ম্বনা
বিদ্রূপের ভাণ।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনাভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
শরমতাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।

—'মানসী', দেশের উন্নতি

ঈশ্বর গুপ্তও অনুরূপ মনোভাবই পোষণ করতেন। এটাই তাঁর হাসির মূলরহস্য। এ কথা মনে না রাখলে তাঁর হাস্যরচনাগুলির যথার্থ মূল্যনিরূপণ সম্ভব হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'পৌষড়ার গীত' রচনাটির কথা উল্লেখ করা যায়। এটিতে হাসির স্পর্শে দুঃখের চিত্র যেন এক অপূর্ব আভায় উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এরকম অশ্রুসিক্ত হাসির দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র শুধু হাসির কবিতা নয়, হাসির গানও রচনা করেছেন। তাতেও হাসিকান্নার যে সমাবেশ ঘটেছে তা তৎকালের পক্ষে অভাবনীয় বললে অত্যুক্তি হবে না। হাসির কবিতা ও হাসির গান-রচয়িতা হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক যুগের অগ্রদূত বলেই স্বীকার করতে হবে। পরবর্তী কালে এজাতীয় রসমিশ্রণের চরম পরিণতি দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের অনুবর্তীদের মধ্যে হেমচন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য।

আরও একটি ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে আধুনিকতার যুগলক্ষণ সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি হল সমকালীন ঘটনাকে কবিতার উপজীব্যরূপে ব্যবহার করা। তাঁর রচিত এজাতীয় কবিতা এতই সুপরিচিত যে, তার বিশদ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পরবর্তী কালে হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল -প্রমুখ অনেকেই এজাতীয় কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যসাধন করেছেন। কিন্তু এ পথের প্রথম পথিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র, বর্তমান প্রসঙ্গে এটাও আমাদের স্মরণীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বকালচেতনার সঙ্গে অতীতচেতনাও যুক্ত ছিল। তাঁর এই অতীতচেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গদ্যরচনায়, বিশেষ করে তাঁর কবিজীবনীগুলিতে। কিন্তু তাঁর পদ্যরচনাতেও নানা স্থানে তাঁর ইতিহাসচেতনার আভা পড়েছে, তাতে স্থলবিশেষে তাঁর রচনার ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, তাঁর এই অতীতচেতনা ছিল আন্তরিক অনুভূতিময়, নিছক জ্ঞানের প্রকাশমাত্র নয়। এ ক্ষেত্রেও তাঁকেই অগ্রবর্তিতার মর্যাদা দিতে হবে। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কারও রচনায় ইতিহাসচেতনা এরকম বাণীরূপ পেয়েছে বলে জানি না। পূর্বযুগে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে (বিশেষতঃ তার মানসিংহ খণ্ডে) এবং গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে ইতিহাসজ্ঞানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে জ্ঞান কবিহৃদয়ের অনুভূতিতে পরিণত হয় নি। সে অনুভূতির বাণী প্রথম ধ্বনিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের কণ্ঠেই। সে বাণী ক্ষীণ এবং অর্ধস্ফুট, কিন্তু তা হলেও তার আধুনিক সুরটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

শুধু স্বকাল ও অতীত কাল নয়, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় ভাবী কালেরও কিছু ছায়াপাত ঘটেছিল। এখন তারই একটু পরিচয় দিতে চেষ্টিত হব।

১২৮৩ (ইং ১৮৭৬) সালে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৯-৬০ সালকে বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসে 'নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল' বলে বর্ণনা করেন। কেননা, এই সময়েই "পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।" ঈশ্বরচন্দ্র পুরাতন দলের 'শেষ কবি', এটাই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কথা নয়। কারণ ১২৯২ (ইং ১৮৮৫) সালে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আবার বলেন, "যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।" তার মানে ঈশ্বর গুপ্ত পুরাতনের কালসীমা পেরিয়ে নূতনের এলাকাতেও প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। এই অগ্রবর্তিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের 'তীব্র ও বিশুদ্ধ' দেশ-বাৎসল্যের বিষয় উল্লেখ করে বলেন—

"নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার [১৮৮৫] কয়জন লোক ইহা বুঝে?"

দেখা যাচ্ছে পুরাতনের 'শেষ কবি' ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক ভাবধারার বিচারে আপন যুগকে বহু বৎসর পেছনে ফেলে বঙ্কিমচন্দ্রেরও শেষজীবনের সমকালবর্তী বলে গণ্য হতে পেরেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে স্বতঃই মধুসূদনের এই উক্তি মনে আসে—

পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।…
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'।

মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে আছে—

শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পর সদা।

('স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' ইত্যাদি গীতাবচনও স্মরণীয়।) উদ্ধৃত অংশটি অবশ্য মেঘনাদের মুখে বসানো। কিন্তু তাতে যে মধুসূদনের আন্তরিক অনুমোদন ছিল তাও সুবিদিত। মেঘনাদের মুখে বসানো এই উক্তিটি যে ঐকান্তিক দেশপ্রেমিক মনস্বী রাজনারায়ণেরও অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল, এ প্রসঙ্গে সে কথাও মনে রাখা উচিত।

ঈশ্বর গুপ্তের 'দেশের কুকুর ধরি' এবং মধুসূদনের 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ' ইত্যাদি উক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে 'খাঁটি বাঙ্গালী' এবং 'ডাহা ইংরেজ' একই মনোভাব পোষণ করতেন।

ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের এই দুটি কবিতাংশে যে মনোভাবের পরিচয় পাই, অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই জানেন সে মনোভাবের মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ও বিংশ শতকের প্রথম দশকে। নিদর্শনস্বরূপ—

ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।

—'চৈতালি', পরবেশ

তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর,
কেন তাহা ভুলি।
পরধনে ধিক্ গর্ব, করি করজোড়
ভরি ভিক্ষাঝুলি!

—'কল্পনা', ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।…
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো।

—'উৎসর্গ', সংযোজন ১২

তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।

তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা।

—'উৎসর্গ', সংযোজন ১৩

ইত্যাদি তাঁর বহু রচনাংশই উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে। সুতরাং অন্ততঃ এই একটি বিষয়ের বিচারে ঈশ্বরচন্দ্র যে আপন সময়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী অগ্রবর্তী ছিলেন, তাতে সন্দেহ করা চলে না।

শুধু তীব্র দেশবাৎসল্য নয়, বিশুদ্ধ রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে ভাবী কালের অভিসঞ্চরণধ্বনি ঈশ্বর গুপ্তের অনুভূতিতন্ত্রীতে প্রতিরণিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এই—

"ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। সুতরাং নিরস্ত হইলাম।"

এখানে 'উদার' শব্দটি বিচক্ষণ বা দূরদর্শী অর্থে গ্রহণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতির বিশদ পরিচয় দিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে নিরস্ত হলেন, সে কি শুধু বেশি কথা বলার ভয়ে? না তার অন্য কারণও ছিল? এ বিষয়ে কল্পনা করে লাভ নেই। সুখের বিষয়, এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও অন্য প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাবের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গপ্রিয়তার প্রসঙ্গে তিনি এক স্থলে বলেছেন—

"মহারানীর স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কান ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গরু,
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা, গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব, ঘুসি খেলে বাঁচব না।"[১]

ঈশ্বর গুপ্তের অন্য একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তাতে 'আমাদের ঢেরা সই রহিল'। তার পরেই উদ্‌ধৃত হয়েছে উল্লিখিত অংশটি। তাতেও যে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ অনুমোদন ও 'ঢেরা সই' ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। 'পলিটিক্‌স'-নামক কমলাকান্তের দ্বিতীয় পত্রে তিনি দেশী Agitatorদের প্রথমে চিত্রিত করেছেন 'শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর' রূপে। বলা বাহুল্য, 'শ্বেতকৃষ্ণ' বিশেষণটির দ্বারা তৎকালীন কালো সাহেবদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। আর কুক্কুর শব্দের ব্যঞ্জনাও সুস্পষ্ট। যা হক, ওই পত্রের শেষাংশে রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুরপ্রমুখ দেশী রাজনীতিকরা বর্ণিত হয়েছেন কলুর বলদ রূপে; আর বঙ্কিমনির্দিষ্ট আদর্শ রাজনীতিক বর্ণিত হয়েছে উন্নতশৃঙ্গ বলিষ্ঠ বৃষ রূপে। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার একটি বাক্য এই—

"ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল।" তার পরে আছে, বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ দেখে দূরে সরে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে কলুপত্নী যখন এই দস্যুতার প্রতিবিধান করার অভিপ্রায়ে একটি বংশদণ্ড নিয়ে এগিয়ে এল তখন বৃষ তার ভীষণ শিং

১ ঈশ্বর গুপ্তের মূলরচনা ও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্‌ধৃতিতে বানানগত কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এখানে মূলের বানানই অনুসৃত হল। দ্রষ্টব্য বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ' (১২৯২), পৃ ১০১ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা, পৃ ৫৫।

বাঁকিয়ে তাকেই তাড়া করল। তাড়া খেয়ে কলুপত্নী রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হল। আর বৃষ তখন পরম নিশ্চিন্ত মনে অভীষ্ট সিদ্ধ করল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস এই বৃষনীতিই ছিল ঈশ্বর গুপ্তের অভিপ্রেত রাজনীতি। আর এটাই যে ছিল বঙ্কিম-স্বীকৃত রাজনীতি তাতেও সন্দেহ নেই। যা হক, বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৃষবলদ-কাহিনীতে যে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বোদ্ধৃত কবিতাংশের ছায়াপাত ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। খোলবিচালিপূর্ণ গামলা ও শিং বাঁকানোর বর্ণনাই তার নিঃসংশয় প্রমাণ।

এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে স্বীকার করতে হবে, ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি তাঁর স্বকালকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমরচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' এবং কমলাকান্তের উক্ত দ্বিতীয় পত্রখানি গ্রন্থভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় একই বৎসরে (১২৯২। ইং ১৮৮৫-৮৬)। সুতরাং তৎকালেও যে ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণিত 'শিং বাঁকানো' রাজনীতি অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে স্বীকৃত এবং 'পোষা গরু'র রাজনীতি ধিক্কৃত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ঈশ্বর গুপ্তের ওই একটিমাত্র উক্তিকে আশ্রয় করে এমন ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। বস্তুতঃ ওজাতীয় আরও অনেক উক্তিই বিকীর্ণ হয়ে আছে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়। তাঁর রচনার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরাই এ কথা জানেন। বঙ্কিমচন্দ্রও জানতেন। তাই তিনি ওরকম একটি সাধারণ মন্তব্য করতে প্রণোদিত হয়েছিলেন এবং তার সমর্থনে অনেক কথা বলার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছিলেন।

যা হক, 'পোষা গরু'র রাজনীতি অর্থাৎ আবেদন আর নিবেদনের থালা-বওয়া নতশির রাজনীতি যে আরও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ বহু মনীষীর ধিক্কার লাভ করেছিল, তা এত সুবিদিত যে তার উল্লেখ-মাত্রই যথেষ্ট। এই দুর্বলের রাজনীতির নামান্তর ভিক্ষাবৃত্তি। তার বদলে সবলের রাজনীতি অর্থাৎ আত্ম-শক্তির চর্চা তথা শিং বাঁকানোই যে এক সময়ে জাতীয় কাম্যবস্তু হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে ১৯০৫ সালের বঙ্গবিপ্লবের ইতিহাসে ও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে। এই আত্মশক্তিবাণীর অন্যতম ক্ষীণ উৎসধারা দুর্লক্ষ্য হয়ে বিরাজ করছে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলীর অনতিস্ফুট উষাকালের প্রায়ান্ধকার গহনভূমিতে।

ঈশ্বর গুপ্তকে ঠিকমতো জানা চাই। নতুবা বাঙালিকে বা বাংলা সাহিত্যকে ঠিকমতো জানা যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই আমরা তাঁকে প্রাচীন যুগের শেষ কবি বলে ভাবতে শিখেছি। ইংরেজি-জানা ও ইংরেজি-না-জানা কবিদের আমরা মনে মনে দুটি স্বতন্ত্র জাতে বিভক্ত করে থাকি এবং তদনুসারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকেও দুটি স্বতন্ত্র যুগে খণ্ডিত করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই বাংলা সাহিত্যের অচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আমাদের চোখে পড়ে না। কারণ ইংরেজি-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনের মোহদৃষ্টি আছে। কারণ, "বাল্যকাল থেকেই আমরা ইংরেজের ছাত্র। অভিভূত মন নিয়ে বিশুদ্ধ সত্যের বিচার চলে না।" এই মোহদৃষ্টি ঘুচলে দেখতে পাব আধুনিকতার অনেকগুলি উৎসধারাই নিঃসৃত হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী থেকে। সে ধারাগুলি ক্ষীণ ছিল সন্দেহ নেই এবং ইংরেজি-জানা কবিরা সে ধারাগুলিকে প্রবল প্রবাহে পরিণত করেন এ কথাও সত্য। কিন্তু এই দুএর মধ্যে বিচ্ছেদ কল্পনা করলে সত্যকেও খণ্ডিত করা হয় এবং নিজের যথার্থ ঐতিহ্যকেও খর্ব করা হয়।

আজকাল কেউ কেউ ঈশ্বর গুপ্তকে পূর্বযুগের শেষ কবি ও আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ তাঁরা বর্তমান যুগটাকে দ্বিখণ্ডিত না করে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনসাধনাকেই দ্বিখণ্ডিত করেন। কিন্তু এরকম দু-মুখো সাধনা মোটেই সম্ভব কি না সে কথা তাঁরা ভেবে দেখেন না। আসল সত্য এই যে, ঈশ্বর গুপ্ত সেই যুগসন্ধির কবি যখন প্রাচীনের শেষ প্রভাবটুকু ক্রমে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল এবং আধুনিকতার প্রভাতরশ্মি ক্রমবর্ধমান তেজে বাংলার আকাশকে উদ্‌ভাসিত করে তুলছিল। তাঁর প্রায় ত্রিশবৎসরব্যাপী সাহিত্য-জীবনের (১৮৩০-৫৯) বিবর্তন-ধারা অনুসরণ করা যদি সম্ভব হয় তবে দেখা যাবে, তিনি স্বকালের সঙ্গে তাল রক্ষা করেই চলেছিলেন এবং আধুনিক বাংলার নিষ্প্রভ প্রত্যুষকালে যাত্রারম্ভ করে প্রখর মধ্যাহ্নের কাছে এসে পৌঁচেছিলেন। এ ভাবে দেখলে শুধু ঈশ্বর গুপ্তকে নয়, বাংলার সাহিত্যসাধনাকেই সত্যরূপে দেখা হবে। কেননা, তৎকালে তিনিই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রতিভূ। তাঁর কাব্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শৈশবসংগীত ধ্বনিত হয়েছিল।

২

এবার ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বতন যুগের গীতিকবিতার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রয়াস করি।

পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগে রচিত গীতিরচনাকে 'লিরিক' বলা উচিত কি না, এই কূটতর্ক নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

> "ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক।"
>
> —'বিবিধ প্রবন্ধ' : প্রথম খণ্ড. গীতিকাব্য

তাই তিনি বৈষ্ণব পদাবলী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী ও নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীকে একই লিরিক বা গীতিকাব্য পর্যায়ে ফেলেছেন। গীতিকবিতার প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেছেন—

> "রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতিকবি। তৎপরে কতকগুলি 'কবিওয়ালা'র প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক-একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।"
>
> —'বিবিধ প্রবন্ধ' : প্রথম খণ্ড, বিদ্যাপতি ও জয়দেব

জয়দেবপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের গীতিরচনাগুলি সবই ভক্তির বেনামীতে প্রেমসংগীত এবং তাতে নিজেদের বিরহমিলনের আনন্দবেদনার কথা বলা হয়েছে রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে। কিন্তু রামপ্রসাদাদি কবি ও কবিওয়ালাদের রচনায় প্রেম দেখা দিয়েছে প্রেমরূপেই, তাকে ভক্তির ছদ্মবেশ পরানো হয় নি, ভক্তিও প্রকাশ পেয়েছে আপন মহিমায়। তা ছাড়া হৃদয়ানুভূতির আরও নানা সুর বেজে উঠেছে তখনকার দিনের গীতিরচনায়। তখন যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাথা রচিত হত না তা নয়, কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে কবির নিজের এবং সমস্ত মানুষের আনন্দবেদনার সুরও ধ্বনিত হয়েছে নানা রচনায়। এই হৃদয়গত আনন্দবেদনার উচ্ছ্বাসের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক লিরিকজাতীয় গীতিকবিতার বিশিষ্টতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁদের কয়েকজনের রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করি—

মনে রইল, সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি-বলি বলা হল না—
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
...
যখন হাসি হাসি, সে, আসি বলে,
সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে, ছি ছি ধোরো না॥

—রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে।
আমার স্বভাব এই— তোমা বই আর জানি নে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
সেজন্য দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসি নে॥

—শ্রীধর কথক (১৮১৬ - ?)

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছ কখনো জ্বলন্ত আগুনো
বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে॥

—হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪)

দাসী ব'লে অভাগীরে
আজও কি তার মনে আছে?...
বাসে না বাসে না ভালো,
সে ভালো থাকিলে ভালো,
দেখা হলে সুধাস লো,
সে তো আমার ভালো আছে?

—রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)

সবগুলি দৃষ্টান্তই প্রেমসংগীত। বলা যেতে পারে রামনিধি গুপ্তই বাংলায় প্রেমসংগীত রচনার প্রবর্তক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনিই রাধাকৃষ্ণলীলার ছদ্মবেশ না পরিয়ে সাধারণ নরনারীর মিলনবিরহের বিচিত্র হৃদয়ভাব অবলম্বনে যথার্থ গীতিকবিতা রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর রচনায় যে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ

পেয়েছে ও মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি যেভাবে ধরা পড়েছে তাতে আধুনিক পাঠকের চিত্তও মুগ্ধ হয়। তাঁর কণ্ঠ থেকে প্রণয়সংগীতের যে ধারা নিঃসৃত হল, তাই দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। কোথাও ছেদ পড়ে নি। তাঁর পরবর্তী হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রেমবিষয়ক রচনা এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা যে একই পর্যায়ভুক্ত, এ দুএর মধ্যে যে প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই, তা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।

রামনিধি প্রেম ছাড়া অন্য বিষয়েও গান রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর—

নানান দেশের নানান ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর ?
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?

এই বিখ্যাত গানটির কথা বলা যেতে পারে। রামনিধির এই উক্তি এবং ঈশ্বর গুপ্তের 'মাতৃসম মাতৃভাষা', রবীন্দ্রনাথের 'মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত', দ্বিজেন্দ্রলালের 'জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান' এবং অতুলপ্রসাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা' ইত্যাদি রচনা যে একই ভাবধারার অন্তর্গত তাও বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এবার ধর্মবিষয়ক গীতিরচনার কথা উল্লেখ করি। এ ক্ষেত্রে রামপ্রসাদের (১৭২০-৮১) নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর ধর্মসংগীতগুলি একান্তভাবেই আত্মগত। তাঁর সুগভীর ভক্তি ও আন্তরিক আত্মনিবেদনের সুর এই গীতিরচনাগুলিকে উচ্চাঙ্গের লিরিকের স্তরে উন্নীত করেছে। এই ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সঙ্গে নিজের দুঃখবেদনা ও অভিমানের রঙ মিশ্রিত হয়ে এই গীতিরচনাগুলিকে অপূর্ব আভায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। তার বিস্তৃত পরিচয় দেবার অবকাশ আমাদের নেই। তাই নমুনা হিসাবে কয়েকটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

১ মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ, এলোকেশী ?
না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষে মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না॥

২ আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
তবে দেও দুঃখ মা, আর কত তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোনো খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা, বাজার মিলাই॥

...

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী,

বোঝা নামাও, ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই॥

৩ করুণাময়ি, কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, গো তারা,
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কই?
কারে দিলে ধন-জন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওমা, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই?
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি
শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥

৪ মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই জান না?
কোন্ প্রাণে তার মাটির মূর্তি
গড়িয়ে করিস উপাসনা॥

এগুলির সুর কবির নিজের সুর। এর মধ্যে যে আত্মনিবেদনের আন্তরিকতা ও গভীর ধর্মানুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে তাতেই নিহিত রয়েছে যথার্থ গীতিকবিতা অর্থাৎ লিরিকের মর্মবাণী।

৩

এ প্রসঙ্গে বাউল-পদাবলীর কথাও কিছু বলা দরকার। এজাতীয় গীতিকবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> "এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।"

—মহম্মদ মনসুর-উদ্দীন, 'হারামণি' : প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ ২

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বাউলগানকে অতি উচ্চস্তরের গীতিকবিতা বলে মনে করতেন। তাঁর নিজের রচনাতেও তার প্রভাব আছে বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।" বস্তুতঃ রবীন্দ্ররচনাতে বাউলবাণীর ছাপ আবিষ্কার করা খুব দুঃসাধ্য কাজ নয়। বাউলগীতির প্রতি তাঁর এই অনুরাগের নিদর্শন তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-নামক সংকলন-গ্রন্থখানিতেও (১৯৩৯) পাওয়া যায়। যা হক, বাউল-গীতিকবিতার কয়েকটি অংশ তুলে দিলেই তার কাব্যগত উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

শেখ মদন বাউলের একটি গান এই—

যদি করিস মানা, ওগো বন্ধু,
মানি এমন সাধ্য নাই।
কোনো ফুলের নামাজ রং বাহারে,
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে,
বীণার নামাজ তারে তারে,
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই॥

এই ভাবটিই রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নাটিকার (১৯২৬) মর্মকথা। নটী তার নৃত্যকেই পূজারূপে নিবেদন করেছিল তার অন্তরের ইষ্টদেবতার কাছে। এটির মর্মবাণী তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'আমার ধর্ম'-নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ রূপে।

মদন বাউলের আর-একটি গান—

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই, চলতে না পাই,
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥
...
ওরে প্রেম-দুয়ারে নানান তালা—
পুরাণ-কোরান তবসী-মালা;
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা—
কাঁইন্দ্যা মদন মরে খেদে॥

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি॥
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার;
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥

তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে' ইত্যাদি রচনাটিও স্বভাবতঃই মনে আসে। আর, 'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো-সংখ্যক ('ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' ইত্যাদি) কবিতাটিতে রবীন্দ্রজীবনে এই বাউলবাণীর প্রভাবের কথা বিধৃত হয়ে আছে অবিস্মরণীয় ভাষায়।

গঙ্গারাম বাউলের একটি গানের প্রথমাংশ এই—

পরান আমার সোঁতের দীয়া।
আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে?
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা,
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা গা!

তারার তলে কেবল চলে নিশুইত রাতের ধারা ;
সাথের সাথী চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা ॥
অচিন ফুলে নদীর কূলে ডাকে গো কারা—
'কূলে ভিড়া, ক্ষণেক জিরা'।
অকূল পাড়ি, থামতে নারি, চলে যে ধারা ॥

অজ্ঞানের অভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অনন্ত কালস্রোতে ভাসমান ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলমান জীবন-প্রদীপের এমন বর্ণনা যে-কোনো সাহিত্যেই দুর্লভ।

ঈশান যুগীর কণ্ঠে বেজেছে জীবনসংগীতের আর-এক সুর—

ধন্য আমি, বাঁশিতে তোর আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি নাই রে কোনো দুখ ॥
ত্রিলোকধাম তোমার বাঁশি, আমি তোমার ফুঁক।
ভালোমন্দ রন্ধ্রে বাজি, বাজি সুখ আর দুখ ॥
সকাল বাজি, সন্ধ্যা বাজি, বাজি নিশুইত্ রাত।
ফাগুন বাজি, শাঙন বাজি, তোমার মনের সাথ ॥
একবারেতে ফুরাই যদি কোনো দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজা, আর কি আমি চাই ॥

বিশ্ববীণায় ঝংকৃত জীবনসংগীতের এমন বর্ণনাও দুর্লভ। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এই ভাবের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে নানা স্থানে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর—

বাজাও, আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও ॥

ইত্যাদি গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এবার বিশা ভুঁইমালী—

হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ ;
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর, পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই—
হে বন্ধু, মুক্তি কোথাও নাই।
তুমি পার যদি যাও না ছেড়ে, ছাড়বে কি করি ॥

এর প্রথম অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের—

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে।

—'বলাকা', ৩৩

এই উক্তির ভাবগত মিল দেখা যায়। আর উক্ত বাউলগীতটির শেষাংশ তো অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় গীতাঞ্জলির এই উক্তিটি—

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।

দেখা গেল বাউলগীতি ও রবীন্দ্রগীতি এক সূত্রেই বাঁধা। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো ভেদ নেই। বাউলবাণীতে যে জীবনসত্য ও জীবনানুভূতি অপূর্ব কবিত্বসুষমায় মণ্ডিত হয়ে সুরমূর্ছনায় বিকশিত হয়েছে তার অসামান্যতা না মেনে উপায় নেই।

আশা করি এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যই আধুনিক বাংলা কবিতার আসল প্রেরণাস্থল এবং বিহারীলালের পূর্বে বাংলা গীতিকবিতায় কবির নিজের সুর শোনা যায় নি কিংবা লিরিকধর্মী আত্ম-নিবেদনের সর্বজনীন বাণী উচ্চারিত হয় নি, এ কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। মেনে নিলে সত্য ও বাংলা সাহিত্যের সুচিরাগত ঐতিহ্য, উভয়কেই খর্ব করা হয়। আসল সত্য এই যে, গীতি-কবিতার ধারা চিরকাল ধরেই বাঙালির জাতীয় মর্মকেন্দ্র থেকে নিঃসৃত হয়ে শোণিতপ্রবাহের মতো তার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে আসছে। আশ্চর্যের বিষয়, এ ক্ষেত্রে তার সমাজজীবনে উঁচুনিচু স্তর বা জাতিভেদ স্বীকৃত হয় নি। প্রাচীন কালের লুইপাদ ও জয়দেব থেকে আধুনিক কালের ঈশান যুগী, বিশা ভুঁইমালী, মদন শেখ ও রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই এক পঙ্‌ক্তিতে সমাসীন।

গীতাঞ্জলির প্রসঙ্গে কবি য়েট্‌স্ এক সময় রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—

"আপনার এই যে কাব্য আজ আমাদের গোচর হল, একে বাংলা সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছি, কিন্তু বস্তুত এ তো বিচ্ছিন্ন নয়; যে একটি বৃহৎ ভূমিকার উপর এই কাব্যের বিশেষ স্থান আছে সেটি না জানতে পারলে এর রস উপলব্ধি হয় তো সম্পূর্ণ হবে না।"

—ললিতমোহন ও চারুচন্দ্র -সম্পাদিত 'বঙ্গবীণা' (১৯৩৪), পরিচয়

য়েট্‌সের এ কথা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর সাড়া জাগিয়েছিল এবং তাতে তাঁর অন্তরের সায়ও ছিল। ছিল বলেই দীর্ঘকাল পরে বাংলা কাব্যধারার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি প্রথমেই আন্তরিক অনুমোদনসহ য়েট্‌সের এই উক্তিটি স্মরণ করেন।

শুধু গীতাঞ্জলি নয়, কোনো আধুনিক বাংলা গীতিকবিতাই প্রাচীন গীতিকবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সত্য করে দেখা হবে না। আসলে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ধারা বাঙালির মর্মজাত ভাবধারার সঙ্গে অভিন্ন, তার উৎস নিহিত রয়েছে সুদূর অতীতে তার ঐতিহ্যের নিভৃত কন্দরে। পশ্চিম থেকে নূতন স্রোত এসে তার ধারায় প্রবলতা ও নবীনতা সঞ্চার করেছে, কিন্তু তার উৎসই পশ্চিমদেশে এ কথা বললে শুধু স্বদেশকে নয়, ইতিহাসকেও অবজ্ঞা করা হবে।

আধুনিক ও প্রাচীন গীতিকবিতার প্রাণবস্তু এক। কিন্তু একটু পার্থক্যও আছে; সে পার্থক্য বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গে নয়। প্রাচীন গীতিকবিতার ভাষা অপ্রসাধিত, মণ্ডনকলার আভিজাত্যও তার নেই। আধুনিক গীতিকবিতার মার্জিত ভাষার ঔজ্জ্বল্য ও সযত্ননিবদ্ধ ভূষণবাহুল্যের আভিজাত্য স্বভাবতঃই চিত্তবিভ্রম ঘটায়। বিশেষতঃ কোনো কোনো ভূষণ যখন বহুমূল্য দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করা হল তখন ভূষণপরিহিতাকে বিদেশিনী বলে ভ্রম জন্মাতে না পারলে তো তার আভিজাত্যই ক্ষুণ্ণ হয়। রিক্ত-ভূষণা বল্কলবসনা আশ্রমবাসিনী শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের প্রাসাদবাসিনী সুকৃতবেশা রত্নভূষণা শকুন্তলাকে অভিন্ন বলে চিনতে পারলে তো রাজরানীর গৌরবহানিই ঘটে, আর অভিন্ন বলে চিনতে না পারলে সাধারণ দর্শককেও দোষ দেওয়া যায় না। আধুনিক কালে আভিজাত্যগর্বিতা বাংলা গীতিকবিতারও সেই দশাই হয়েছে।

৪

লিরিক কবিতার রস নিত্যকালীন ও সর্বজনীন, কোনো বিশেষ কাল বা জনসম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়। তাই অজ্ঞাত-অখ্যাত লোকসাহিত্যেও এই রসের সন্ধান মিলতে পারে। কারণ আনন্দবেদনার হৃদয়রস অখ্যাত লোককবির রচনাতেও উচ্ছলিত হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু পরিমার্জিত অলংকরণ তথা সংরক্ষণপ্রয়াসের অভাবে এসব লিরিকজাতীয় লোকগীতি কালের বুকে উত্থিত হয়েই বিলীন হয়ে যায়। তবু খননলব্ধ লুপ্ত প্রত্নরত্নের মতোই এসব লৌকিক গীতিকবিতার দু-একটি টুকরো প্রতিভাবানের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে রক্ষা পেয়ে গেছে। এখানে তারই একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

একদা প্রদোষকালে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গাবক্ষে 'কাব্যের রাজ্য' উপস্থিত হল; অথচ মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্য পড়েও মনের তৃপ্তি হল না, এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্র শুনতে পেলেন গঙ্গায় জাল বাইতে বাইতে জেলের কণ্ঠের সুমধুর গান—

"সাধো আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।

তখন প্রাণ জুড়াইল— মনের সুর মিলিল— বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম।"

—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (১২৯২), উপক্রমণিকা

এক কথায়, এই গানটিতে বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি লিরিক সুরের সন্ধান পেলেন যা তৎকালীন উচ্চাঙ্গ সাধুসাহিত্যেও সুলভ ছিল না। বোঝা গেল, অবজ্ঞাত লোকসাহিত্যেও এমন সর্বজনীন গীতিরস থাকতে পারে যা আধুনিক শিক্ষিত ও মার্জিত মনের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ।

আর-এক দিন শ্রাবণের শেষে সূর্যাস্তবেলায় জলপ্লাবিত পল্লীবাংলার বুকে নৌকাভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন দশবারোজন লোক একসঙ্গে গান গাইতে গাইতে একটি ডিঙি বেয়ে চলেছে। গানের ধুয়োটি এই—

যুবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা থ্যাহে আন্তে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি॥

"গানের এই দুটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, এই গোয়ালঘরের পাশে, এই কুলগাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিলকটাক্ষপাতে গ্রাম্যকবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরে-তালে মাঠে-ঘাটে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।"

—'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য (১৩০৫)

বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথের মতে গানের এই দুটি পঙ্‌ক্তিতে যে সুর বেজে উঠেছে তাতে পল্লীজীবনের উপযোগী সর্বজনীন লিরিক রসের অভাব ঘটে নি।

সর্বশেষে বাংলা লোকসাহিত্যের আর-একটি বিভাগের কথা উল্লেখ করা উচিত। সে বিভাগের পরিচয় পাই ময়মনসিংহগীতিকায়। এই কবিতাগুলি ঠিক লিরিক বা গীতিকবিতা -জাতীয় নয়, এগুলি হচ্ছে বস্তুতঃ কাহিনীকবিতা। কিন্তু এই কাহিনীগুলিতে মাঝে মাঝে যে লিরিকসুলভ হৃদয়োচ্ছ্বাস কল্লোলিত হয়ে উঠেছে তাতে এগুলি স্থানে স্থানে গীতিকবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই হৃদয়লীলার রঙিন আভায় রঞ্জিত হয়ে এই কাহিনীগুলি চিরন্তন সৌন্দর্যলোকে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করে এই সৌন্দর্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবু সম্পূর্ণতার খাতিরে চন্দ্রাবতী-জয়ানন্দের কাহিনী থেকে একটি অংশ উদ্‌ধৃত করি—

শিশুকালের সঙ্গী তুমি,
যৌবনকালের মালা;
তোমারে দেখিতে, কন্যা,
মন হইল উতলা।
ভাল নাহি বাস, কন্যা,
এই পাপিষ্ঠ জনে;
জন্মের মত হইলাম বিদায়
ধরিয়া চরণে॥

'ময়মনসিংহগীতিকা' গ্রন্থের গাথাকবিতাগুলির রচয়িতাদের সম্বন্ধে বিচক্ষণ সমালোচক বলেছেন—

"তাঁহারা কোমলকান্ত কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গদেশকে সমৃদ্ধ ও চিরঋণী করিয়া গিয়াছেন।"

অতঃপর এই গাথাগুলির মূল্যনিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন—

"ইহাদের প্রধান মূল্য খাঁটি কবিত্বরসে; মানবমনের সুখদুঃখ, প্রেমবিরহ সম্বন্ধে প্রাণের দরদে; সমাজ ও সংস্কার অপেক্ষা মানুষ যে বড়, সেই অতি আধুনিক কথাটিকে জোর করিয়া প্রকাশ করিয়া বলিবার মতন সাহস ও শক্তিতে।... জীবনের ট্র্যাজেডি এমন সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে, এগুলি অতি উৎকৃষ্ট আধুনিক ছোটগল্পের সমকক্ষতা অর্জন করিয়াছে।"

—ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গবীণা' (১৯৩৪), পৃ ৪৬২-৬৩

এই গাথাকবিতাগুলি কবে রচিত হয়েছিল জানি নে, আধুনিক কালে যে নয় তা সুনিশ্চিত। তথাপি এগুলিতে এই অতি আধুনিক জীবনমূল্যবোধের এমন আশ্চর্য উচ্ছ্বাস দেখা দিল কেমন করে? আসল কথা এই যে, যথার্থ জীবনমূল্যবোধ কোনো বিশেষ কালের সম্পত্তি নয়। সত্যবস্তু সব কালেরই আধুনিক।

শুধু আধুনিকতার রাঙ্‌তা-মোড়া তকমা নিয়ে কোনো সাহিত্যই চিরন্তন বাণীমন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় না। ময়মনসিংহের গাথাগুলি সৌন্দর্যসত্যের জয়তিলক ললাটে নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল, চিরন্তন মর্যাদার সনদ ছিল তাদের দখলে। তাই তারা তখনকার দিনেও আধুনিকতার মর্যাদা পেয়েছিল, এখনও পায়। সব সত্যের ন্যায় সৌন্দর্যসত্যও যুগে যুগে দেহান্তর পরিগ্রহ করে, তাদের রূপান্তর ঘটে; কিন্তু তার আত্মার পরিবর্তন হয় না, কেননা, আত্মা অবিনশ্বর। উক্ত গাথাকবিতাগুলি জন্মান্তর গ্রহণ করে বর্তমান কালে অংশতঃ গীতিকবিতায় ও অংশতঃ ছোটগল্পে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মা রয়েছে অপরিবর্তিত।

১৮৫৯-৬০ সালে বাংলা সাহিত্যে এক যুগের অবসান ও অন্য যুগের আরম্ভ হল, এ ধারণা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, আশা করি এ কথা এখন স্পষ্ট করতে পেরেছি। সেই যুগসন্ধিকালে বাংলা সাহিত্য নবজন্ম লাভ করে নবকলেবরে আবির্ভূত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু তার জীবনধারা ছিল অবিচ্ছিন্ন। তার দেহেরই রূপান্তর ঘটেছিল, আত্মার নয়। কিশোর বালক যখন যৌবনে উপনীত হয় তখন তার দেহে মনে নবীনতার আবির্ভাব ঘটে, তার জীবনপ্রবাহে ছেদ ঘটে না।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যে প্রকৃতিপুরাণ

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলি কাব্য, সংগীত ও নাটকের ত্রিবেণীসংগম। ঋতুনাট্যের কাব্যসৌন্দর্য সকলের কাছেই সুপ্রত্যক্ষ। এর সংগীতরসও অবিসংবাদিত। কিন্তু নামে নাটক হলেও ঋতুনাট্যের নাট্যরসের গভীরতাটা সেরকম প্রশ্নাতীত নয়। উৎসব হিসেবে ঋতুনাট্যের মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। ঋতুনাট্যের নাট্যমূল্য সেরকম সর্বসমালোচকস্বীকৃত নয়।

গোড়াতেই জানিয়ে রাখা ভাল যে, ঋতুনাট্যের নাট্যমূল্য সম্পর্কে সমালোচকদের মতামতের খণ্ডন বা সমর্থন এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ঋতুনাট্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার আমাদের বর্তমান বিষয়-পরিধির বাইরে। অন্তত তা আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নয়। আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয় ঋতুনাট্যের উপাদান— রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলিতে যে বিশেষ ধরণের 'নেচারমিথ্' বা প্রকৃতিপুরাণ ব্যবহৃত হয়েছে, সেইগুলি। বিশেষ উপাদানের কারণে রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যে যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য-নিরূপণই এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলি যে তাদের উপাদানের দিক থেকে— এবং সেই সঙ্গে তাদের ভাবে ও রূপে— কতখানি পরিমাণে বিশিষ্টতাসম্পন্ন তা বুঝতে হলে এদের নাট্যগত পরিচয় সম্পর্কে একটু অনুসন্ধান করা দরকার। এরা নাট্যসাহিত্যের কোন্ শ্রেণীর, কোন্ গোত্রের অন্তর্গত? এরা ট্র্যাজেডি না কমেডি? পৌরাণিক না সামাজিক? রূপক না সাংকেতিক না বাস্তবিক?

এ গোত্র-নিরূপণ সহজ নয়। ঋতুনাট্যে রূপকের আভাস আছে। কিন্তু সেটা যৎসামান্য। মূল ভাবটা রূপকের নয়। কেননা, ঋতুরা স্বরূপতই ঋতু, অপর কারো প্রতিনিধি নয়, ছদ্মবেশধারী অপর-কোনো সত্তা নয়। ঋতুনাট্যে অল্পস্বল্প সাংকেতিকতাও হয়তো আছে। কিন্তু সেও বাহ্য। যেহেতু ঋতুনাট্য ঋতু-অতীত কোনো অতীন্দ্রিয় রহস্যের সংকেতবাহী নয়, সেই কারণে একে সাংকেতিক নাটকও বলা চলবে না। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক এই তিন সুপরিচিত শ্রেণীর কোনোটার মধ্যেই ঋতুনাট্যের স্থান হবে না। তা যদি না হয় তা হলে একে বাস্তবিকই বা বলি কি করে? কাব্যনাট্য তত্ত্বনাট্য— এ-সব অভিধাও এখানে সন্তোষজনক নয়, তার কারণ এর কোনোটাই গোত্রপরিচয়বাহী নয়।.

নাট্যসাহিত্যে ট্র্যাজেডি, কমেডি, স্যাটায়ার ইত্যাদি ভাগগুলি বহুকাল ধরে প্রচলিত। প্লট, পাত্রপাত্রীর চরিত্র এবং রসাবেদনের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে সুপ্রাচীন কাল থেকে সাহিত্যশাস্ত্রীরা এই-সব ভাগের প্রত্যেকটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে আসছেন। এই ব্যাখ্যায় ঋতুনাট্যের স্বরূপ ধরা পড়বে না।

তা হলে কি ঋতুনাট্য একটা স্বতন্ত্র গোত্র, একটা পৃথক্ নাট্যশ্রেণী? অথবা, ঋতুনাট্য কি আদৌ নাটক নয়?

ঋতুনাট্য ঠিক মানুষের নাটক নয়, ঋতুদের নিয়ে নাটক। তার নাট্যঘটনা হল ঋতুবিশেষের আসা-যাওয়া। ঋতুর চলে-যাওয়া ফিরে-আসার আবর্তনের মধ্যে যে-একটা যাওয়া না-যাওয়ার লীলা আছে, নাটকের ভাবের কেন্দ্র সেইখানে। নাটকের রূপও এই আসা-যাওয়া, এই বারবার চলে-যাওয়া এবং বারবার ফিরে-আসার নির্দিষ্ট প্যাটার্নে গাঁথা।

প্যাটার্নটা অভিনবও নয়, আধুনিকও নয়। বরং বলতে পারি সনাতন। রূপকথা, লোককথা, প্রাচীন কিংবদন্তী, প্রাচীন এপিক, সবের মধ্যেই খুঁজলে আমরা এই প্যাটার্নটির সাক্ষাৎ পাব। আধুনিক কালের সুপরিচিত নাট্যধারাসমূহের নাটকদের সঙ্গে রূপে, ভাবে, বিষয়বস্তুতে রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যের খুব বেশি মিল নেই বটে, কিন্তু নাটকের উৎস-সন্ধানী আধুনিক গবেষকদের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে মানতেই হবে যে, সুপ্রাচীন কালের একেবারে প্রাথমিক নাট্যচেষ্টার সঙ্গে ভাব, রূপ, বিষয় তিন দিক থেকেই ঋতুনাট্যের মিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বলা বাহুল্য, মিলের থেকে অমিলের পরিমাণই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মিলটাও উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

আধুনিক নাট্য-গবেষকেরা বলে থাকেন যে প্রাচীন কালের প্রাথমিক নাটক সবই নাকি মূলত ঋতুসম্ভব নাটক, ঋতুভাবে-ভাবিত নাটক। মিলের প্রাথমিক সূত্রটা এইখানে। ভাব এবং রূপের মিল এর সঙ্গেই জড়িত, পৃথক্ কিছু নয়।

প্রকৃতিতে ঋতুচক্রের আবর্তনে যে নাটক সব সময়ই ঘটে চলেছে, আজকের দিনের নাগরিক মানুষদের তা হয়তো সামান্যই স্পর্শ করে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন মানুষের পক্ষে নিসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো জীবনই ছিল না। তখন নিসর্গে ঘটমান ঋতুর নাটকই ছিল মানুষের প্রাথমিক নাট্যভাবনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা। প্রকৃতির পটপরিবর্তনকে জীবনের পটপরিবর্তনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা, এইটেই নাকি মানুষের আদিম নাট্যচেষ্টার প্রধান বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যেও আমরা এই বিশেষত্বের সাক্ষাৎ পাই।

যে পটপরিবর্তনলীলা নিসর্গে ও মানবজীবনে অভিন্নভাব অভিব্যক্ত, তাকে মিথ্, রিচুয়াল এবং জাদুধর্মী অনুকরণাত্মক ক্রিয়ায় প্রকাশ করার মধ্যে দিয়েই আদিম নাট্যকারেরা তাঁদের প্রাথমিক নাট্যরচনার পথে পা বাড়িয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই প্রাথমিক পদক্ষেপ নাটক নয়, অস্ফুট সূত্রপাত মাত্র। কালক্রমে সেই আদিম মিথ পূর্ণতর আখ্যানে পরিণত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সাহিত্যায়িত হয়ে উচ্চাঙ্গের নাট্যকাহিনী হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে তার থেকে রিচুয়াল বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষ সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে তাকে অনেকখানি পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে তার জাদুধর্মী অনুকরণক্রিয়া কালক্রমে তার জাদুশক্তি হারিয়ে বিশুদ্ধ অভিনয়ে রূপ নিয়েছে।— এইভাবে দীর্ঘকালের ক্রমপরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আদিম প্রত্ননাট্য ধীরে ধীরে খাঁটি সাহিত্যিক নাটক হয়ে উঠেছে। সেদিনের প্রত্ননাটক আর আজকের খাঁটি নাটকের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। একটা ধর্মাচরণের কাছাকাছি ব্যাপার, আর-একটা রস-সাহিত্য। তবু, সমস্ত কালের সব নাটকেরই প্রধান অবলম্বন যখন জীবনের দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য, তখন আদিম নাটক আর আজকের নাটকের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য স্বভাবতই প্রত্যাশিত।

আদিম নাট্যকারেরা জীবন ও জগতের সমস্ত বৈপরীত্যকে একটি অভিন্ন দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি রূপে দেখেছিলেন। শীত আর গ্রীষ্মের মধ্যে যে সংগ্রাম, সেই একই সংগ্রাম— অনুরূপ নয়, অভিন্ন সংগ্রাম— রাত্রি আর দিনের মধ্যে, অন্ধকার আর আলোর মধ্যে, ভালো আর মন্দের মধ্যে, ভয় আর অভয়ের মধ্যে, মৃত্যু আর জীবনের মধ্যে। এ দেখা শাদা চোখের দেখা নয়, কবিদৃষ্টির সাদৃশ্যকল্পনার দেখা নয়, অদ্বৈতবাদীর নাম-রূপ-ভেদ-পরিচয়গ্রাসী দার্শনিকদৃষ্টির দেখাও নয়। এ দেখা অনেকটা জাদুদৃষ্টির দেখা, ভাবের-ঘোরে দেখা, সম্মোহিত-চৈতন্যের দেখা। বলতে পারি মিথিক্যাল দেখা, পুরাণদৃষ্টির দেখা।

আজকের দিনের কবিত্বের দৃষ্টি সব সময় এইরকম ঘোর-লাগা দৃষ্টি নয়। আজকের নাটকও এইরকম

ভাবের ঘোর-লাগা সম্মোহিত-চৈতন্যের অনুভবের নাটক নয়। সাধারণত নয়, কিন্তু কখনোই নয় এমন বলতে পারি না। যদি কোনো আধুনিক রচনার অল্প পরিমাণেও এইরকম ঘোর-লাগা দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই, তা হলে তার সমস্ত আধুনিকতা সত্ত্বেও তাকে আমরা অন্তত আংশিকভাবে আদিমতাধর্মী রচনা বলে আখ্যা দিতে পারি।

ঋতুনাট্য নিজেই একটা অধুনালুপ্ত স্বতন্ত্র নাট্যশ্রেণী। ঋতুর নাটক, এইটেই তার গোত্রগত পরিচয়। গোত্রটা সুপ্রাচীন। এক সময় সে-ই ছিল এক এবং অদ্বিতীয় গোত্র— আদি গোত্র।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য কিছু-পরিমাণে সেই লুপ্ত নাট্যগোত্রের পুনরুজ্জীবন। এদের মধ্যে যে কিছু-কিছু আদিমতার চিহ্ন পাই, তা এদের গোত্র-লক্ষণেরই পরিচয় দেয়।

২

আধুনিক মিথ্-পন্থী সমালোচকেরা অবশ্য ঋতুনাট্যের ব্যাপারটাকে ঠিক এ-ভাবে গ্রহণ না-ও করতে পারেন। না করাই স্বাভাবিক, কেননা, তাঁদের মতে আদিমতার লক্ষণ— অল্প-বিস্তর পুরাণধর্মিতা— সব নাটকেই বিদ্যমান। শুধু রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য কেন, তাঁরা বলবেন, আধুনিক অনাধুনিক সমস্ত নাটকই মূল বিষয়বস্তুতে মূল ভাব-রূপে প্রাথমিক প্রত্ননাটক থেকে অভিন্ন। তার কারণ, আদিম নাটকের মৌল কাঠামোটি পরবর্তীকালের সমস্ত নাটকের মধ্যেই সূক্ষ্মদেহে আত্মগোপন করে আছে। আভ্যন্তরীণ চরিত্রের দিক থেকে সব নাটকই শেষ পর্যন্ত ঋতুনাট্য। এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করলে মানতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যের এদিক থেকে বাড়তি কোনো বিশেষত্ব নেই।

মিথ্-পন্থী সমালোচকেরা ট্র্যাজেডি, কমেডি, স্যাটায়ার প্রভৃতি প্রচলিত নাট্যশ্রেণীর এক-একটিকে এক-এক ঋতুর সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে সেই ঋতুর আলোতে উক্ত নাট্যশ্রেণীর প্রত্যেকটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের নাট্যতত্ত্বে শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের ঋতু-অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে বটে, তা হলেও এর মূল তাৎপর্যটা ভিন্নতর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও সহজেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। তত্ত্বটা সংক্ষেপে বলি।—

দিনের নানান ভাগ— সকাল দুপুর রাত্রি— আর বিভিন্ন ঋতু, এরা যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রতিফলন, মানুষের জীবনের নানা পর্ব— তার শৈশব যৌবন বার্ধক্য, এও তাই ;— ঋতু এবং জীবন এরাও পরস্পর পরস্পরের প্রতিরূপ। কিন্তু প্রতিরূপ বা প্রতিফলন বলাটা যথার্থ হবে না, এর মধ্যে পরবর্তী বিচারবুদ্ধির সিদ্ধান্ত ক্রিয়াশীল। আসলে আদিম চেতনায় জীবন ও ঋতু অভিন্ন। শুধু আদিম চেতনাতেই নয়, নিজের অগোচরে আধুনিকের কাছেও তাই। বসন্ত মানবজীবনের প্রভাতসৌন্দর্য, গ্রীষ্ম জীবন-মধ্যাহ্নের খরদীপ্তি, হেমন্তে জীবন-অপরাহ্ণের ম্লানতা আর শীত হল বার্ধক্যের নৈশ-অন্ধকার।

নাটকে এই চেতনারই ঘনীভবন ও রূপায়ণ। বসন্ত হল আনন্দের উল্লাসের উৎসবের কাল, মিলনের কাল। কমেডি এই মিলনোল্লাসের প্রকাশ। কমেডির স্বরূপ বুঝতে হলে তাকে দেখতে হবে বসন্ত-পুরাণ রূপে। তেমনি গ্রীষ্ম— ঠাণ্ডার দেশের গ্রীষ্ম— সে হল রোমান্সের ঋতু, বাস্তবকে ছাড়িয়ে-যাওয়ার ঋতু, ইচ্ছা-পূরণের ঋতু। গ্রীষ্ম যেমন রোমান্সধর্মী, রোমান্সও তেমনি গ্রীষ্ম-স্বভাবী। গ্রীষ্ম-পুরাণ রূপে দেখলে তবেই রোমান্সের ঠিক চেহারাটি ধরা পড়বে। ট্র্যাজেডিতে হেমন্তের রূপ, গ্রীষ্মের আলোকিত শিখরচূড়া থেকে শীতের অন্ধকার গহ্বরের দিকে অবতরণ। ট্র্যাজেডিকে বলতে পারি হেমন্ত-পুরাণ। নির্মম শীত ঋতুতে

ক্ষমাহীন বাস্তবের কঠিনতা। তার উপযুক্ত প্রকাশ বিদ্রূপের সূচীমুখে, ব্যঙ্গের চাবুকে, স্যাটায়ারে, আয়রনিতে। স্যাটায়ার, আয়রনি এরা রোমান্সের সম্পূর্ণ বিপরীত। রোমান্স যেমন গ্রীষ্মনাট্য, এরা তেমনি শীতনাট্য।

তত্ত্বটির পরিকল্পনাগত পরিচ্ছন্নতা যন্ত্রের পারিপাট্যকে স্মরণ করায়। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক, কেননা, তত্ত্বটা নাটকের নিছক কাঠামোকে নিয়েই, প্রাণলাবণ্যকে নিয়ে নয়। পূর্ণায়ত নাটকের রস-রহস্যের সমাধানে এই ধরণের প্রাথমিক বা কাঠামোগত ছক কার্যক্ষেত্রে কতখানি উপযোগী, আপাতত সে প্রশ্ন তুলব না। আমাদের প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যের স্বরূপ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও যে এই ঋতু-ভিত্তিক পরিকল্পনাটি খুব উপযোগী, এমন মনে হয় না।

প্রথম কথা, ঋতুনাট্যের বিভিন্ন ঋতুর স্বভাবের সঙ্গে ঋতু-ভিত্তিক পরিকল্পনার ঋতুগুলোর স্বভাবের মিল নেই। ঋতুনাট্যের বর্ষা মিথ্‌-পন্থী সমালোচকদের অপরিচিত। ঋতুনাট্যের শরৎ-হেমন্তে ট্র্যাজিক রসের বাষ্প মাত্র নেই। ঋতুনাট্যের শীত এক দিকে তপস্বী, অন্য দিকে ছদ্মবেশী বসন্ত। তার আচরণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আভাসমাত্র মিলবে না। ঠাণ্ডার দেশের গ্রীষ্ম রোমান্সের ঋতু, আমাদের দেশের গ্রীষ্ম রোমান্স-ভাগানোর ঋতু।

দ্বিতীয়ত, ঋতুতে ঋতুতে যে বিরোধ-বৈপরীত্যের অবলম্বনে ঋতু-ভিত্তিক বর্গীকরণের তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির কোনোটিরই নাট্যঘটনা সেই বিরোধ-বৈপরীত্যকে অবলম্বন করে নি।

আরো একটা কথা আছে। ঋতু-ভিত্তিক ছকের প্রয়োগ তেমন নাটকের ক্ষেত্রেই যথার্থভাবে সার্থক হতে পারে যে-নাটক প্রত্যক্ষত ঋতুর নাটক নয়। যে নাটক স্পষ্টতই ঋতুকে নিয়ে, তার ক্ষেত্রে গোপন ঋতু-স্বভাবের আবিষ্কার অর্থহীন। ট্র্যাজেডি কমেডি, এরা যদি ঋতুনাট্য হয় তো সে নিতান্তই সূক্ষ্ম অর্থে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য স্থূল অর্থেই ঋতুর নাটক।

এ কথা বলছি না যে ঋতুভিত্তিক নাট্যালোচনার গোটা পরিকল্পনাটাই ভুল। এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলিতে নিশ্চয়ই এমন কোনো বিশেষত্ব আছে যার জন্যে সেগুলি উক্ত পরিকল্পনার আওতাতেই পড়ে না। খুব সম্ভব এইজন্যেই পড়ে না যে, পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে যা বুঝি, ঋতুনাট্যগুলি সেই বস্তুই নয়।

আধুনিক কালের নাটক যেমন স্বাধীন এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্পবস্তু, পূর্বকালের প্রত্ননাটক যে মোটেই সেরকম ছিল না, এ কথা প্রায় সর্বগবেষকসম্মত। সম্ভবত সে একটা বৃহৎ সমগ্রতারই অংশ ছিল। এক দিকে মিথ্‌ অর্থাৎ একটি আদিম পুরাণকাহিনী, অন্য দিকে রিচুয়াল অর্থাৎ সেই কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং এতদুভয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অনুকরণাত্মক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, নাচ, গান— সব একত্র জড়িয়ে তবে সেই বৃহৎ সামগ্রিকতার প্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলিও নিছক নাটক হিসেবে পূর্ণায়ত নাটক নয়। তাদের মধ্যে নাট্যক্রিয়ার ঘনীভবন নেই। তারা স্বাধীন নয়, ঋতুবিশেষের সঙ্গে তাদের অভিনয়ানুষ্ঠান গাঁথা— বিচ্ছিন্ন করলে অঙ্গহানির মতো ঠেকে। তারা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, প্রত্ননাটকের মতো তারাও একটা বৃহৎ সমগ্রতার অংশ। এ সমগ্রতার কী নাম দেব জানি না। তবে তা নিছক নাট্যাভিনয় মাত্র নয়। বরং বলতে পারি উৎসব। নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, তৎসহ নির্দিষ্ট উৎসব-অনুষ্ঠানের অন্যান্য অঙ্গ— সেই সঙ্গে যথাযোগ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং যথানির্দিষ্ট ঋতু— সব মিলে তবে সেই উৎসবের পূর্ণতা।

৩

ঋতুনাট্য বলতে রবীন্দ্রনাথের কোন্ নাটকগুলিকে বুঝব? যে নাটকে ঋতুই বিষয়, ঋতুকে নিয়েই নাট্যকাহিনী, ঋতুরাই পাত্রপাত্রী, সাধারণভাবে তাকেই আমরা ঋতুনাট্য বলে থাকি। ঋতুনাট্যে মানবভাব অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু তা সরাসরি মানুষকে আশ্রয় করে নয়। ঋতুকে আশ্রয় করেই তার সব রসের সঞ্চার, সে রস মানবরসই হোক আর নিসর্গরসই হোক।

মোটামুটি এই রকম অর্থ গ্রহণ করে সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানা নাটিকাকে ঋতুনাট্য বলে স্বীকার করেছেন: বসন্ত (১৯২২), শেষবর্ষণ (১৯২৫), নটরাজ (১৯২৭), নবীন (১৯৩১) এবং শ্রাবণগাথা (১৯৩৪)।[১]

আরো দুখানি নাটকের কথা এখানে উল্লেখ করতে হবে। একটি শারদোৎসব (১৯০৮)।[২] দ্বিতীয়টি হল ফাল্গুনী (১৯১৬)। নাটক দুটির মধ্যে যে প্রচুর নিসর্গরসের সঞ্চার ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমালোচকেরা এদের ঠিক ঋতুনাট্য বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। তার কারণ, প্রকৃতির ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক-না কেন, দুই নাটকেই সে নেপথ্যচারী, রঙ্গমঞ্চে তার প্রত্যক্ষ প্রবেশ নেই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে-সব ঋতুমুখ্য নাটক রচনা করেছেন, এ দুটিতে তাদের ভাবের আভাস পাওয়া যায়। পূর্বাভাস আর পরিণত বস্তু যখন এক নয়, তখন ইচ্ছা করলেই শারদোৎসব আর ফাল্গুনীকে আমরা ঋতুনাট্যের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি।

ঋতুনাট্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হলেও, ঋতু-উৎসবের তালিকা থেকে এদের বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্য ঋতুনাট্যের মতো এরাও ঋতু-উৎসবের নাটক। এরাও ঋতুবিশেষের সঙ্গে গ্রথিত, শারদোৎসব শরতের সঙ্গে, ফাল্গুনী বসন্তের সঙ্গে। এই গ্রন্থি ছিন্ন করলে নাটকের অঙ্গহানি অনিবার্য।

অন্যান্য ঋতুনাট্যগুলির সঙ্গে শারদোৎসব-ফাল্গুনীর আসল মিল যেখানে সে হল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই কাহিনীতে পুরাণ-সংসর্গ ঘটেছে; শারদোৎসবে যৎসামান্য, ফাল্গুনীতে অপেক্ষাকৃত বেশি, তুলনায় ঋতুনাট্য বসন্তে তা নিবিড়তর, গভীরতর, তীব্রতর। ঋতুনাট্যগুলির মতো শারদোৎসব-ফাল্গুনীতেও আমরা রূপাত্মক, ভাবাবিষ্ট, পুরাণধর্মী দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাব। পার্থক্য কেবল মাত্রার।

'পুরাণধর্মী দৃষ্টি' কথাটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিন্তু তার আগে পুরাণ কথাটিকে এখানে আমরা কী অর্থে ব্যবহার করছি এবং কী অর্থে করছি না, সেইটে স্পষ্ট করে বলে রাখা দরকার।

প্রথমেই জানিয়ে রাখি, পুরাণ কথাটিকে এখানে আমরা প্রচলিত ভারতীয় অর্থে ব্যবহার করছি না। ব্যবহার করছি আদিম সমাজের আদিম কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট বস্তু এই অর্থে, পাশ্চাত্যে মিথ্ কথাটি সাধারণত আজকাল যে-অর্থে ব্যবহৃত। আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব মিথ্ কথাটিকে যে-অর্থে গ্রহণ করে সেই অর্থে। পুরাণ কথাটির এরকম ব্যবহার সম্প্রতি আমাদের দেশেও প্রচলিত হয়ে উঠছে।

---

১ নটরাজ প্রথমে বিচিত্রায় 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' নামে প্রকাশিত হয় (১৯২৭)। পরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে 'ঋতুরঙ্গ' নামে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয় (১৯২৮)। দুই পাঠ সমন্বিত করে বনবাণী গ্রন্থের 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'। শ্রাবণগাথা শেষবর্ষণেরই ঈষৎ রূপান্তরিত সংস্করণ।

২ ঋণশোধ (১৯২১) আর শারদোৎসব প্রায় অভিন্ন, সেই কারণে ঋণশোধের পৃথক্ উল্লেখ বা আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন

এ কথা অনেকেরই সুবিদিত যে, পাশ্চাত্য দেশে মিথ্ কথাটার একটা বিচিত্র অর্থ-পরিবর্তনের এবং মর্যাদার উত্থান-পতনের ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ শতক মিথ্-কে ধিক্‌কৃত করেছে উদ্‌ভট ও বর্বর কল্পনার প্রকাশ হিসেবে গণ্য করে। কালক্রমে, উনবিংশ শতকে সভ্যতা নিজেই যখন অনেকটা সন্দেহভাজন হয়ে পড়ল, তখন অকৃত্রিমতার বিশুদ্ধ প্রকাশ হিসেবে মিথের প্রভূত মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটল। অষ্টাদশ শতকে যে-কারণে মিথ্ তাচ্ছিল্য পেয়েছে, ঠিক সেই একই কারণে— অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার সৃষ্টি বলে— উনবিংশ শতকের রোমান্টিক কবি-সাহিত্যিকদের কাছে সে সম্মানের উচ্চাসন পেল।

এন্‌লাইটেনমেণ্ট যুগের অতি-তাচ্ছিল্য এবং রোমান্টিক যুগের অতি-সম্মান, এই দুই আতিশয্যকেই বিংশ শতকের সমাজবিজ্ঞানীরা সযত্নে পরিহার করে থাকেন। মিথ্‌কে তাঁরা তার আদিম জীবনযাত্রার বাস্তব অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অনিচ্ছুক। চিরকালের সত্যদ্রষ্টা হিসেবে মিথের যে দাবি, তা তাঁদের কাছে গণনীয় নয়। অন্যপক্ষে, উদ্‌ভট কল্পনা হওয়া সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক দলিল হিসেবে পরোক্ষ ভাবে মিথের যে দাবি আছে, তা তাঁদের কাছে মহামূল্যবান।

যখন কবিতা ছিল না, ইতিহাস ছিল না, দর্শন-বিজ্ঞান ছিল না, উন্নত ধর্মবোধ ছিল না, তখন যে-বস্তু একই সঙ্গে কবিতা ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান এবং ধর্মের কাজ করত, তাকে এক-কথায় মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। উল্টোদিকে, তাকে নিত্যকালের সত্য বলে আঁকড়ে ধরাও হয়তো সমানই ভ্রান্তি। আমাদের বিশেষ কালের বিশেষ চাহিদার সঙ্গে যুক্ত না করে, মোহহীন সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালে, তবেই মিথের আসল চেহারাটা দৃষ্টিগোচর হবে। তখন দেখতে পাব, মিথ্ হচ্ছে আদিম সমাজের আদিম জীবনযাত্রা থেকে উদ্‌ভূত এমন এক বস্তু— চিন্তা অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার এমন এক যৌথ নির্মাণ— যা মাত্র কল্পনা হয়েও তাৎকালিক সত্য, মাত্র চিন্তা হয়েও ক্ষেত্রোপযোগী বাস্তব, মাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়েও অবস্থানুযায়ী ফলপ্রাপ্তি, মাত্র কর্মানুষ্ঠান হয়েও যৌথ উপলব্ধি— জীবন্ত কাব্যবীজ।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরাণ বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝে থাকি, তা হল বিশদীকৃত এবং সাহিত্যায়িত মিথ্— অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী সুসংস্কৃত— এমন বস্তু যার আদিম মিথ্-স্বভাব একেবারে লুপ্তপ্রায়, অথবা সম্পূর্ণ লুপ্ত। অর্থাৎ তা আর মিথ্ নয়, মিথ্-ভিত্তিক সাহিত্য। ভারতীয় অর্থে পুরাণ হল পুরাতন কথা, প্রাচীন ইতিবৃত্ত বা কিংবদন্তীমূলক আখ্যায়িকা। পুরাণ হল প্রাচীন মুনিদের রচিত এমন সব পুরাতন কাহিনী যা সত্য বলে গৃহীত। পুরাণ হতে হলে সে-কাহিনীকে সর্গ প্রতিসর্গ বংশ ইত্যাদি পঞ্চ লক্ষণের দ্বারা বিশেষিত হতে হবে। এই অর্থে মূল পুরাণ বা মহাপুরাণ আঠারোটি, উপপুরাণ আরো অনেক।[৩]

হিন্দু পুরাণের পাশাপাশি বৌদ্ধ পুরাণেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বৌদ্ধ উভয়

৩ পুরাণের পরিণত রূপ অপেক্ষা তার কাহিনীগুলি প্রাচীনতর। অনেকগুলি কাহিনীর বীজ সুপ্রাচীন, ঋগ্‌বেদের কালের। পরিণত রূপে নানা কাল, নানা দেশ ও নানা সম্প্রদায়ের ছাপ পড়েছে। প্রসিদ্ধি এই যে, মহাপুরাণসমূহ ব্যাস-রচিত, উপপুরাণগুলি পরবর্তী কালের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রচনা। কেউ কেউ মনে করেন ব্যাস অর্থ সংগ্রহকার। কেউ কেউ বলেন, এখানে ব্যাস অর্থ ব্যাস-সম্প্রদায়। কিন্তু সমস্ত মহাপুরাণ একই সম্প্রদায়ের রচনা বা একই সম্প্রদায়ের দ্বারা সমভাবে সমাদৃত এমন মনে হয় না। কোনোটি শৈব, কোনোটি বৈষ্ণব, কোনোটি শাক্ত। কোনোটি মহাভারত অপেক্ষাও প্রাচীনতর, কোনোটি অনেক পরবর্তী। কোনোটি উত্তর-ভারতের, কোনোটি বা দক্ষিণের। একই আখ্যান-বীজ বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। যেমন কার্তিকের জন্মকাহিনী। পরিণত বা শাস্ত্রীয় পুরাণে আদিম মিথের রূপ বা চরিত্রের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই।

পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করেই কাব্য-নাটকাদি রচনা করেছেন এবং তার ফলে এদের মধ্যে নতুন ভাব-রূপের, নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। এই-সব হিন্দু বা বৌদ্ধ পুরাণের কোনোটিই আদিম মিথ্ নয়। সবই শাস্ত্রীয় পুরাণ। ঋতুনাট্যে কোথাও কোথাও শাস্ত্রীয় পুরাণের ছায়াপাত ঘটেছে বটে, কিন্তু সমগ্র-ভাবে দেখলে তাকে কোনোমতেই শাস্ত্রীয় পুরাণ বলা চলবে না। ঋতুনাট্যে আমরা যে-পুরাণকে, অথবা পুরাণের যে-লুপ্তাবশেষকে সন্ধান করছি, তা অপেক্ষাকৃত আদিমতাধর্মী এবং শৈশব-স্বভাবী বস্তু।

আরো একটা কথা। অনেকে মিথ্ মাত্রকেই কবিতা বলে মনে করেন। অনেকে আবার কবিতা মাত্রকেই মিথ্ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। মিথ্ বা কবিতা—এদের ব্যাপক এবং ঢিলে-ঢালা অর্থে ধরলে এরকম হয়তো বলা যায়। কিন্তু এখানে আমরা কবিতা বা মিথ্ কোনোটিকেই সেরকম অতি-ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করছি না। আমরা যে-অর্থে ধরছি তাতে কবিতা এবং মিথ্ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ভিন্ন স্তরের জিনিস।

মিথ্ কবিতার অস্ফুট পূর্বাভাস—কবিতার ভ্রূণাবস্থা, কাব্যবীজ। ক্ষেত্রবিশেষে নাটক-উপন্যাসেরও। কবিতা বা নাটক হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে তার পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। এমন, যাকে বলতে পারি জন্মান্তর।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য নিঃসন্দেহে কবিতা, নিঃসন্দেহে সাহিত্য। তা চেতনাপ্রত্যুষের আলো-আঁধারির মায়াসৃষ্টি নয়। আদিম জীবনযাত্রার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। মিথ্ যেমন অনামী এবং গোষ্ঠীগত ব্যাপার—প্রায় একটা স্বয়ম্ভু আবির্ভাবের মতো, ঋতুনাট্যগুলি মোটেই সে জাতের জিনিস নয়। কিন্তু তার কবিদৃষ্টিতে পুরাণের রূপসৃষ্টিকারী সত্যসৃষ্টিকারী দৃষ্টির মিশ্রণ ঘটেছে। তাকে খাঁটি পুরাণ বলব না, কিন্তু আপেক্ষিক অর্থে পুরাণধর্মী বা পুরাণকল্প বলতে কোনো বাধা দেখি না।

এই-যে রূপ ও সত্য-সৃষ্টিকারী দৃষ্টি, পুরাণধর্মিতার প্রসঙ্গে এইটেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪

সাহিত্যশাস্ত্রীদের অনেকে বলেন, সাহিত্য নাকি জীবনের অনুকরণ, নাটক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুকরণ। অনুকরণ কথাটাতে তত্ত্বের দিক থেকে যেসব আপত্তি উঠতে পারে তা এখানে উত্থাপন করব না ; নাট্যসাহিত্যের ইডিপাস বা শকুন্তলা, ম্যাকবেথ বা মালিনী কোন্ মূলের নকল সে প্রশ্নও এখানে তুলব না। ধরে নেব, নাটক যদি জীবনের অনুকরণ হয়ও, তা হলে অনুকরণ সত্ত্বেও সে সৃষ্টি। ধরে নেব, অনুকরণ এমন একটা পারিভাষিক শব্দ যার সঙ্গে সৃষ্টি কথাটার কোনো বিরোধ নেই। ধরে নেব, যিনি ইডিপাসের দুর্গতি অথবা হ্যাম্‌লেটের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী চিত্রিত করেন, যিনি নিমচাঁদ অথবা নন্দিনী রচনা করেন, তিনি অনুকরণ করুন আর না-ই করুন, সৃষ্টি অবশ্যই করেন।

কিন্তু ঋতুনাট্য-রচয়িতা কার অনুকরণ করেন? নিসর্গে যে ঋতুপরিবর্তনের পালা সতত ঘটমান, তার? আর যদি অনুকরণ না বলি, ঋতুনাট্য-রচয়িতা কী সৃষ্টি করেন? কোন্ শীত কোন্ বসন্ত নিসর্গে যা দৃশ্যমান নয়?

ঋতুনাট্য যদি সত্যই নিসর্গের ঋতুবদল পালার অনুকরণ মাত্র হয়, তা হলে তার সাহিত্যমূল্য আর কতটুকু? যেখানে ছটা মাত্র ঋতু, যেখানে সেই গুহামানবের কাল থেকে আমরা তাদের গতিবিধি দেখে

আসছি, সেখানে তার যথাযথ অনুকরণে রসই বা কোথায় আর রহস্যই বা কোথায়। জীবন এমন বিচিত্র এমন সহস্রবিধ অভাবিত সম্ভাবনায় ভরা রহস্য বলেই তো তার অনুকরণ, অনুকরণ হয়েও সৃষ্টির গৌরব পায়। ঋতুর অনুকরণ সৃষ্টি হয়ে উঠবে কোন্ গুণে?

আর যদি স্বাধীন রচনা হয়, ঋতুনাট্য যদি নিসর্গের ঋতু-সত্যের সঙ্গে না মেলে? কিন্তু তা হলে তাকে আদৌ ঋতুনাট্য বলব কেন? সমস্যাটা এখানেই। ঋতুর অসদৃশ হলে তা ঋতুনাট্য নয় এবং সদৃশ হলে তা তুচ্ছ এবং অ-সাহিত্য।

মনে রাখতে হবে, প্রকৃতি যদি নিছক জড়-প্রকৃতিই হয়, তা হলে তার নিজের কোনো নাটক নেই। জড়ের নাটক নেই, যন্ত্রের নাটক নেই। নাটক হতে হলে চৈতন্য থাকতে হবে, সুখ-দুঃখ থাকতে হবে, জীবন-মৃত্যু থাকতে হবে, মানব-জীবনের জটিল রহস্যময় অভাবিত বৈচিত্র্য থাকতে হবে। ঋতুনাট্য যান্ত্রিক নিয়মবদ্ধ নিসর্গের নাটক নয়।

তা হলে কি তা মানুষেরই নাটক? ঋতুরা কি মানব-জীবনের রূপক? তাই বা মেনে নিই কী করে? রূপক তো সাধারণত অল্প-পরিচিতকে বেশি পরিচিত দিয়ে, কম-প্রত্যক্ষকে অধিক-প্রত্যক্ষ দিয়ে, স্বল্প-সংবেদনার বিষয়কে গভীর-সংবেদনার বস্তু দিয়ে, অমূর্তকে মূর্ত দিয়ে প্রকাশ করে। জীবন কি কম পরিচিত, কম প্রত্যক্ষ? জীবনের থেকে মূর্ত মানুষের কাছে আর কী হতে পারে? তা ছাড়া, ঋতুনাট্যের ঋতুরা যে অপর কারো ছদ্মরূপ— সত্যি সত্যি ঋতু নয়, এ কথা তো অনুভবসিদ্ধও নয়।

আসলে ঋতুনাট্য নিছক মানবনাট্যও নয়, নিছক ঋতুর নাটকও নয়, এক সঙ্গে দুই-ই। ঋতুনাট্য একই কালে মানবস্বভাবী নিসর্গের এবং নিসর্গস্বভাবী মানব-জীবনের রূপায়ণ। অর্থাৎ ঋতুনাট্য-রচয়িতার কাছে জীবননাট্য আর নিসর্গনাট্য দুটো আলাদা নাটক নয়, একই নাটক। যে দৃষ্টিতে জীবনসত্য আর নিসর্গসত্য অভিন্ন সত্তায় উদ্‌ভাসিত, সে দৃষ্টিই ঋতুনাট্য-রচয়িতার বিশিষ্ট দৃষ্টি।

যে মানবস্বভাবী নিসর্গ ঋতুনাট্য-রচয়িতার রচনার আদর্শ, সে নিসর্গ অনেকখানি পরিমাণে নাট্যকারের নিজেরই সৃষ্টি। তাকে বলতে পারি যৌথ রচনা, তার খানিকটা নিসর্গের দান আর খানিকটা নাট্যকারের দৃষ্টির দান। তা একই সঙ্গে নাট্যকারের মনে, তাঁর চোখের সামনে এবং তাঁর রচনায় দীপ্যমান। রচয়িতার দৃষ্টির বাইরে, তাঁর রচনার বাইরে আর কোথাও এই আদর্শকে খুঁজে পাবার চেষ্টা বৃথা।

এই একান্তভাবে আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টি আদিমতার স্বধর্মসিদ্ধ। এ দৃষ্টি আরোপের দৃষ্টি নয়। আরোপের ক্ষমতা দৃষ্টির পক্ষে একটা অর্জিত সম্পদ যা বুদ্ধির সহযোগিতা বিনা অলভ্য। আরোপ করতে হলে প্রথমে গুণ এবং বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করবার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। আরোপ-দৃষ্টির ক্রম আছে, পারম্পর্য আছে, প্রয়োগ-প্রত্যাহারের স্বাধীনতা আছে। আত্মনিষ্ঠ অভেদ-দৃষ্টি সনাতন। সব-কিছুকে জীবন্ত দেখা, সব-কিছুকে ব্যক্তি রূপে দেখা— নিজের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা, এই হল এ দৃষ্টির বিশিষ্ট ধর্ম। এরই আর-এক নাম পুরাণদৃষ্টি।

পুরাণদৃষ্টি সর্ব-ঘটে মানবত্বের প্রকাশ দেখতে পায়, অমানবিক কোনো-কিছুকে সে কখনোই চেনে না, কখনোই জানে না। দ্রষ্টব্যকে সে নিজের চেনা দিয়ে নিজের মতো করে রচনা করে নেয়, বিষয়ের রূপ এবং ব্যক্তিত্বকে সে নিজে সৃষ্টি করে নেয়। এই রূপের বাইরে বিষয়ের আর-কোনো অস্তিত্বই তার কাছে সিদ্ধ নয়। এই কারণে এই দৃষ্টিকে আমরা রূপসৃষ্টিকারী, বিষয়সৃষ্টিকারী, সত্যসৃষ্টিকারী দৃষ্টি বলে বর্ণনা করতে পারি।

এই বিশিষ্ট দৃষ্টির কারণেই সাহিত্যের ঋতুনাট্যকে আমরা নিসর্গের ঋতুর পালার অনুকরণ বলে গ্রহণ করতে পারি না। অনুকরণ নয় এইজন্যে যে, নিসর্গের পালা স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা নয়, সে সাহিত্যের ঋতু-নাট্যের অগ্রগামী নয়। এরা পরস্পরের সহগামী। অথবা, তলিয়ে দেখলে বুঝব, ভাবে এবং রূপে এরা অভিন্ন। এমন-কি, সত্তাতেও।

ঋতুনাট্যে যতই পরিণত সংস্কৃতির কাব্যদৃষ্টির উদ্‌ভাস থাক-না কেন, যতই আধুনিকতা থাক-না কেন, এর মধ্যে আমরা রূপ ও স্বরূপের, প্রকাশ ও প্রকাশিতব্যের, দৃষ্টি ও দ্রষ্টব্যের যে দুর্ভেদ্য ঐক্য দেখতে পাই, তা নিঃসংশয়ে পুরাণলক্ষণাক্রান্ত।

৫

পুরাণদৃষ্টি প্রবলভাবে ব্যক্তিগত, প্রভূতভাবে আবেগরঞ্জিত এবং সর্বতোভাবে সংসক্ত। এ দৃষ্টি বিজ্ঞানদৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কাছে আমি আর না-আমির সম্পর্কটা আসলে হল আমি আর তুমি-র সম্পর্ক। এ সম্পর্ক বিরোধে-মিলনে নিবিড়, শত্রুতায়-মিত্রতায় উজ্জীবিত, আকর্ষণ-বিকর্ষণের মন্থনে উচ্চকিত।

তুমি অর্থই ব্যক্তিত্ব, তুমি অর্থই অনন্যতা, তুমি ব্যাপারটাই রহস্যময়, অনন্ত বৈচিত্র্য এবং অভাবিত সম্ভাবনার আকর। পুরাণদৃষ্টিতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সাক্ষাৎকার সব সময়ই জীবনের সঙ্গে জীবনের সাক্ষাৎকার। শুধু বুদ্ধি, শুধু অনুভব বা শুধু কর্ম দিয়ে নয়, এ হল সর্ব বৃত্তির সমন্বিত সাক্ষাৎকার— সমগ্র সত্তার মোকাবিলা।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যে যে-নিসর্গের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, সে-ও এইরকম রহস্যময় তুমি। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক তার মধ্যে হয়তো বিকর্ষণের জ্বালা নেই, বিষামৃত নয়— হয়তো শুধুই অমৃত, কিন্তু সে-নিসর্গও দ্বিতীয়-রহিত, অফুরন্ত সম্ভাবনার আকর। তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারও সর্ব বৃত্তির সম্মিলিত সাক্ষাৎকার, সত্তার সামগ্রিক সমর্পণ।

একটু শিথিল অর্থে ধরলে, রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যের পুরাণকল্প ভাব-বস্তুকে আমরা নবপুরাণ আখ্যা দিতে পারি। কথাটাকে খুব আক্ষরিক অর্থে ধরলে অবশ্য ভুল হবে। কেননা, নব হলে তা পুরাণ নয় আর পুরাণ হলে তা নব হতে পারে না। নবপুরাণ বলার ব্যঞ্জনাটা এই যে তা আধুনিক হয়েও পুরাণ-কল্প। আদিম জীবনযাত্রার সঙ্গে তার যোগ নেই, তা এ কালেরই— কিন্তু তার মধ্যে একটা সনাতনত্বের ভাব আছে। পুরাণের যেমন একটা সামাজিক ভূমিকা ছিল, এরও অনুরূপ একটি সামাজিক ভূমিকা আছে। পুরাণ যেমন সামগ্রিক জীবনচর্যার অঙ্গ, এ-ও তাই। পুরাণের কল্পনাদৃষ্টি যেমন রূপ বিষয় এবং সত্য -সৃজনকারী দৃষ্টি, এর কল্পনাদৃষ্টিও— অন্তত অংশত— সেইরকম রূপসৃজনকারী, বিষয়সৃজনকারী, সত্যসৃজনকারী কল্পনাদৃষ্টি।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। ঋতুনাট্যকে আমরা নবপুরাণ বলতে পারি, কিন্তু পুরাণের নব-রূপায়ণ কখনোই বলতে পারি না।

নবপুরাণ আর পুরাণের নবীনায়ন বা নব-রূপায়ণ মোটেই এক জিনিস নয়। উনবিংশ শতকের অনেক বাঙালি কবিই রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে, পুরাণের বিভিন্ন আখ্যানকে নিজের মনের মতন করে ঢেলে সাজিয়েছেন, তাতে নিজের কালের চাহিদা এবং নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নতুন-নতুন

ভাষ্য সংযোজন করেছেন। বাইরের সংযোজন বললে ভুল হবে, শুধু নাম-রূপ আর ঘটনার স্থুল কাঠামোটাই পুরাণের, এই নবীনায়নের ফলে আসল বিষয়টা— তার ভাব-সত্যটা সম্পূর্ণভাবে কবির নিজের কালের উপযোগী হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব বা মেঘনাদবধ এই জাতের জিনিস। ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনাও তাই। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার অথবা নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, এরাও এই জাতের নবীনায়ন। বলা হয় বটে পুরাণের নব-রূপায়ণ, আসলে এ কিন্তু পুরাণের পুরাণত্ব মোচন। অথবা বলতে পারি— নবীনের উপর পুরাণের নাম-রূপ আরোপ, পুরাতনের আধারে নতুনের পরিবেশন। পরিবেশিত বস্তু অন্তরের দিক থেকে মোটেই পুরাণধর্মী নয়।

এই নবীনায়ন যে শুধু আধুনিক কালে বা শুধু বাংলা সাহিত্যেই ঘটেছে তা নয়। এ প্রায় সর্বদেশে সর্বকালে ঘটে আসছে। ইস্কাইলাস থেকে আনুই পর্যন্ত পাশ্চাত্য কাব্যনাটকাদিতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাব। কালিদাসের কাব্য-নাটকেও এর নিদর্শন কিছু কম নেই। পুরাণের আখ্যান কালে কালে যতই নবীকৃত হয়, ততই তার পুরাণত্ব একটু একটু করে খসে যেতে থাকে। পুরাণের এই নবীকরণ-প্রক্রিয়া সংস্কৃতির ক্রম-বিবর্তনের সূচক। এর গতি ইতিহাস-অনুসারী, নবপুরাণের মতো ইতিহাস-উজানী নয়।

পুরাণকাহিনীতে স্বকালের ভাবনাবেদনার সঞ্চার রবীন্দ্রসাহিত্যেও আমরা প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাই। রামায়ণের থেকে কাহিনী নিয়ে রচিত বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, পতিতা কিংবা ভাষা ও ছন্দ, মহাভারত অবলম্বনে বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, কিংবা ছান্দোগ্য উপনিষদের আখ্যান অবলম্বনে ব্রাহ্মণ, এসব সকলেরই সুপরিচিত। কুশজাতক থেকে নেওয়া রাজা, মহাবস্তাবদানের আখ্যান নিয়ে পরিশোধ (শ্যামা), শার্দুলকর্ণাবদানের কাহিনী ভেঙে রচিত চণ্ডালিকা, এদেরও আমরা বৌদ্ধ পুরাণের নব-রূপায়ণ বলে গ্রহণ করতে পারি।

ঋতুনাট্যগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জিনিস। পুরাণত্বের মোচন নয়, বরং পুরাণত্বের সঞ্চারেই এদের বিশেষত্ব। এদের মুখ ইতিহাসের সামনের দিকে নয়। বলতে পারি— সনাতনের দিকে।

সনাতন এবং আদিম। আদিম বলেই ঋতুনাট্যের কল্পনাদৃষ্টিতে আরোপের অবকাশ নেই। ঋতুনাট্যের বসন্তের উপর বাইরের থেকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয় নি। একটু আদিমতার ঘোর নিয়ে যদি তাকাতে পারি তা হলে ঠিক দেখতে পাব, সে স্বভাবতই ব্যক্তি— অনন্য তুমি। শ্রাবণের উপর কোনো সন্ন্যাসীর ভাব চাপানো হয় নি ; দেখতে জানলেই দেখতে পাব, শ্রাবণ স্বরূপেই ক্ষ্যাপা, জপ-ভোলা তপ-ভাঙা সমুৎকণ্ঠচিত্ত এক অধীর সন্ন্যাসী। দেখব, বৈশাখের তপস্যা সত্যিকারের তপস্যা, হেমন্তিকার অবগুণ্ঠন সত্যিকারের অবগুণ্ঠন। মালতী মাধবী করবী— এইসব নিসর্গকন্যারা তাদের নারীত্বকে কারো কাছ থেকে চুরি করে আনে নি। অর্জিত বুদ্ধির ঠুলিটাকে খুলে ফেললেই দেখতে পাব, নিসর্গকন্যারা চির-দিনের নিসর্গকন্যা। দেখব, কম্প্রবক্ষ দীপশিখা, সে চিরকালের প্রণয়ভীরু কিশোরী। দেখব, নদী চিরদিনই নারী।

৬

প্রাচীন ব্রতকথাগুলির মধ্যে কৃষিজীবী সমাজের রমণীকুলের যৌথ কামনার অভিব্যক্তির বিষয় নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। ব্রতকথা কতদিনের জানি না। তেমন প্রাচীন যদি না-ও হয়, তার মধ্যে যে

আদিমতার আভাস আছে এটা সুনিশ্চিত। কামনার রূপময় অভিব্যক্তি হিসেবে ব্রতকথা পুরাণের সমধর্মী। একটু পরোক্ষভাবে রূপকথাও হয়তো তাই। এ দিক থেকে ব্রতকথা-রূপকথার সঙ্গে ঋতুনাট্যের মিল অনেকখানি।

ঋতুনাট্যে শীতকে উদ্দেশ করে যখন স্তবগান ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য ?
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।[৪]

—তখন বুঝতে পারি, এ মিনতি একা কুন্দমালতীর নয়। এ মিনতি নিসর্গকন্যাদের যৌথ মিনতি। এ মিনতি সমস্ত নিসর্গ-সংসারের, সমস্ত বসন্তকামীর। কবি তাদেরই একজন। আমরাও তাই। আমরা নিসর্গ-পরিজনেরা সকলেই একটি বিরহিণী নায়িকার কারণে উৎকণ্ঠিত: আপাত-বিমুখ কোনো নায়ককে প্রসন্ন করবার জন্যে উৎসুক আবেদন জানাচ্ছি—

ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য ;
হও প্রসন্ন।[৫]

—এর ভাষার ঐশ্বর্যটা অবশ্যই ব্রতকথার নয়, কিন্তু প্রার্থনার সারল্য ব্রতকথারই সমধর্মী। গানের মধ্যে ওই যে ধুয়োর মতো 'হও প্রসন্ন' কথাটি, ওইখানেই কামনার অভিব্যক্তি। ওইটি হলেই ধরণী শস্যশালিনী হয়ে উঠবে।

এই কামনা মোটেই তত্ত্বভিত্তিক নয়, চিন্তার অনুগামী নয়, চিন্তার পুরোগামী। অথবা বলতে পারি, চিন্তা যে-জগতের অধিবাসী, সে-জগতেরই নয়, ভিন্ন জগতের। সাধারণভাবে বলা যায়, পুরাণ-রচয়িতার মেজাজ আদৌ মননশীল দার্শনিকের মেজাজ নয়। ঋতুনাট্যে যতই জ্ঞানের কথা থাক-না কেন, ঋতুনাট্যের মেজাজও জ্ঞানমার্গে বিচরণকারীর মেজাজ নয়। মননের বিগলিত আত্মসমর্পণ ঋতুনাট্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। গানের কথা বাদ দিলে, সজাগ তর্ক-বুদ্ধির এমন দ্বিধাহীন আত্ম-বিসর্জন রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ।

ঋতুনাট্যে কখনোই যে মননের অনধিকার প্রবেশ ঘটে নি এমন অবশ্য বলা যাবে না। বস্তুত মননের অনুপ্রবেশই শেষের দিকের ঋতুনাট্যগুলির পুরাণত্বকে ক্ষীণ এবং কুণ্ঠিত করে দিয়েছে। নটরাজ থেকেই এর সূত্রপাত।

ক্ষেত্রবিশেষে তত্ত্বকথাটা কেবল বহিরাবরণ, অনেকটা ছবির ফ্রেমের মতো। যেমন বসন্ত ঋতুনাট্যে। 'বসন্তে'র ফ্রেমের গায়ে অনেক তত্ত্বকথা, অনেক মনন-সম্পদ। সে-সবের বাহন হলেন রাজা আর

৪ স্তব, নটরাজ, র/৫/৬৫১ [র—রবীন্দ্ররচনাবলী শতবার্ষিক সং ; প্রথম সংখ্যাটি খণ্ড-সূচক, পরবর্তী সংখ্যা পৃষ্ঠাসূচক।]
৫ ঐ ঐ

কবি। রাজা কিংবা কবি কেউ-ই কিন্তু আসল নাটকের কুশীলব নন, কেবল সূত্রধার। এঁদের কাজ শুধু প্রস্তুতি, তার পর যবনিকা তুলে ধরা। আসল নাটক যখন থেকে শুরু হল, তখন থেকে শুধুই গানের উৎসার, শুধুই রূপের উৎসব। সেখানে টীকা নেই ভাষ্য নেই তত্ত্ব নেই, আছে নিসর্গকন্যারা— মালতী মাধবী করবী বকুল। আসর জুড়ে কেবল নিসর্গ-পরিজন— বেণুবন আর আম্রকুঞ্জ, নদী আর বনপথ, ধুতুরা আর আকন্দ। আছে বসন্তের পরিচরগণ। আর ঋতুরাজ স্বয়ং। আসল নাটক এদের নিয়ে।

আসল নাটক সেইখানে, যেখানে 'সব দিবি কে' -আহ্বানের উত্তরে শুনতে পাই, 'আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।' যেখানে বেণুবন দখিন হাওয়াকে ডাকে, 'জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ', আর দীপশিখা উতল হাওয়াকে বলে, 'ধীরে ধীরে ধীরে বও'। যেখানে মাধবী আর মালতী-র আত্মনিবেদন পূর্ণ হয়, 'তুমি হৃদয় পূর্ণ-করা, ওগো তুমিই সর্বনেশে'। নাটক সেইখানে, যেখানে বসন্তের বিদায়বেলায় ঝুমকোলতা মিনতি জানায়, 'না, যেয়ো নাকো'। শেষের ক্ষণে চুকিয়ে দেবার ক্ষ্যাপামিতে যেখানে ধুতুরা ডাক দেয় 'খেলা-ভাঙার খেলা' খেলতে। আর শেষ সান্ত্বনায় জবা গায়—

চোখের জলে সে-যে নবীন রবে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে।[৬]

আসল নাটক যেখানে, সেখানে আবেগের উত্তাপে ভাবনার তুষার গলে গিয়েছে, ইচ্ছা প্রত্যাশা আশ্বাসে মিলে রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে।

সাহিত্যশাস্ত্রীরা বলেন, কবিতায় অবিশ্বাসের সচেতন প্রত্যাহার ঘটে। হয়তো সত্যিই তাই। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি, অবিশ্বাসের অবকাশই নেই। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই নেই। এ যেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অতীত এক সর্বগ্রহিষ্ণুতার ভাব— কল্পনার নিত্য-শৈশব।

৭

পুরাণের বাইরের রূপে বা তার কাহিনীর বিস্তারে একের সঙ্গে অপরের যতই ভেদ থাক-না কেন, সমস্ত পুরাণের ভাব-বস্তুর মধ্যে একটা মোটামুটি রকমের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ বোধ করি এই যে, সমস্ত পুরাণ রচনারই মূল প্রেরণাটা এক জায়গায়: সে হল বেঁচে-থাকা। আদিম জীবনযাত্রার মৌল উৎকণ্ঠা-গুলির মধ্যেই সমস্ত প্রাচীন পুরাণের উৎস। সমস্ত পুরাণই আদিম চেতনার প্রাথমিক জীবনোপলব্ধি, জীবন-রহস্যের প্রাথমিক সমাধান-চেষ্টা। আহার্য-সংগ্রহ, শস্য-উৎপাদন, সন্তান-জন্ম, বিচ্ছেদ, মৃত্যু— এক কথায় বলতে পারি, জন্ম জীবনযাপন আর মৃত্যু— এই ছিল সেদিনকার জীবনের সব সময়ের উৎকণ্ঠা। সমস্ত আদিম পুরাণের ভাব-বস্তুতেই এই-সব নিত্য-রহস্যের স্বীকৃতি এবং সমাধানচেষ্টা প্রতিফলিত।

জীবনযাত্রার পদ্ধতি-প্রকরণে এক দেশের সমাজের সঙ্গে অপর দেশের সমাজের যেখানে যত গভীর সাদৃশ্য, সেখানে উভয় সমাজের পুরাণকাহিনীর মর্মগত মিল তত গভীর। সমস্ত কৃষি-নির্ভর আদিম সমাজেরই পুরাণকাহিনী যে অনেকটা এক রকমের, এইটেই এর প্রধান কারণ।

আদিম কৃষিজীবীর অনুভবে ঋতুচক্র, শস্যচক্র আর মানুষের জন্মমৃত্যুচক্র, তিনটে পৃথক্ চক্র নয়, একই

৬ জবা, বসন্ত, র/৫/৬০০

চক্র। জন্ম যেমন শস্য-উৎপাদনের সঙ্গে অভিন্ন, মৃত্যুও তেমনি শস্য-রিক্ততার সঙ্গে অভিন্ন। ঠিক তেমনি শীতের রিক্ততাকে উদ্‌ভিন্ন করে বসন্তের বার বার ফিরে আসা আর মৃত্যুকে পরাস্ত করে জীবনের বার বার ফিরে আসা, এরাও অভিন্ন। ঋতুর ফসলের মানুষের— তিনেরই আসল সত্য হল এই ফিরে আসাটা। প্রায় সমস্ত পুরাণেরই এই হল মর্মকথা: পুনরাগমন। ইংরেজিতে বলা হয়েছে, 'Myth of Eternal Return'।

চলে যাওয়াটাও মিথ্যা নয়, ফিরে আসাটা তারই পটভূমিতে তাৎপর্য পায়। দেবতার মৃত্যু এবং মৃত দেবতার পুনরাগমন, অধিকাংশ কৃষি-পুরাণ এই কাহিনীরই হের-ফের। মিশরের ওসিরিস, ব্যাবিলনের তাম্মুজ, গ্রীসের অ্যাডনিস, সবই দেবতার মৃত্যু এবং পুনর্জীবন-লাভের কাহিনী। প্রত্যেকটি দেবতাই মূলত শস্য-দেবতা এবং প্রত্যেকটি পুরাণই মূলত ঋতু-আশ্রিত। গ্রীক পুরাণের শস্যদেবী ডিমিটার ও তাঁর কন্যার আখ্যানও ভাবের দিক থেকে এই কাহিনীরই রকম-ফের। এর প্রত্যেকটিরই মর্মকথা এক: মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নবজীবনলাভ।[৭]

এই প্রসঙ্গে গ্রীক পুরাণের ডিওনিসাসের কথা অবশ্য-স্মরণীয়। গ্রীক নাটকের উৎস-সন্ধানীরা বলেন, ডিওনিসাসের মিথ্‌ এবং রিচুয়াল থেকেই— ডিওনিসাসের মৃত্যু এবং নব-জীবনলাভের আনুষ্ঠানিক প্রতি-রূপায়ণের মধ্যে দিয়েই গ্রীক নাটকের জন্ম ঘটেছে। আদিতে ডিওনিসাস ছিলেন ফল ও উদ্ভিদের দেবতা, সম্ভবত কোনো অপেক্ষাকৃত পূর্বদেশের কৃষি-সমাজের শস্য-দেবতা, যিনি পরবর্তীকালে গ্রীক দেব-মণ্ডলীতে সবলে আপনার স্থান করে নিয়েছেন এবং যাঁর সর্ব আচরণে— আমাদের পৌরাণিক দেব-মণ্ডলীতে শিবের মতো— উৎকট রকমের স্বাতন্ত্র্য। ডিওনিসাস দ্রাক্ষা এবং সুরার দেবতা, বসন্ত এবং বাসন্তী উন্মাদনার দেবতা, যৌবন এবং প্রজননের দেবতা। এ দিক থেকেও শিবের সঙ্গে তাঁর মিল আছে, শিবের মতো তিনিও নটরাজ।

ডিওনিসাসের অনুষ্ঠান আসলে ঋতু-উৎসব ছাড়া আর-কিছু নয়— বিশেষভাবে বসন্ত-উৎসব। তপোভঙ্গের পরে অবসিত-সন্ন্যাস নটরাজের যে উৎসুক ভাবোন্মাদনা, সকল দেশের সকল কালের বসন্ত-উৎসবেই তার প্রতিফলন দেখতে পাই। ঋতুনাট্যের শ্রাবণ-সন্ন্যাসীতে তার এক-ধরণের প্রকাশ, বসন্ততে তার আর-এক বিচিত্র রূপাভিব্যক্তি।

গ্রীক পুরাণের ডিওনিসাস যেমন শুধু ফসল-রহস্যেরই উত্তর নয়, জীবন-রহস্যেরও উত্তর, ঋতুনাট্যের ঋতু-রাজও তাই— ঐশ্বর্য এবং রিক্ততা, জীবন এবং মৃত্যু, চলে-যাওয়া এবং ফিরে-আসা, সব রহস্যেরই উত্তর। জীবন-যাপনের মন্ত্রও তারি কাছে লুকোনো আছে।

সুদূর অতীতকালের মানুষ একদিন জীবন-মৃত্যুর প্রহেলিকার সমাধান খুঁজেছিল পুনরাগমনের পুরাণের মধ্যে, মৃত্যুভয়কে জয় করতে চেয়েছিল নবজীবনলাভের প্রতীতি দিয়ে। আজকের ঋতুনাট্য, সে কি সেই পুরাণের সমাধানকেই নিজের সমাধান বলে গ্রহণ করবে? ইতিমধ্যে কি মানুষের সভ্যতা, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বহু বহু দূর এগিয়ে চলে আসে নি, জীবনে যুক্তি-বুদ্ধির অধিকার কি অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয় নি?

তা হয়েছে। কিন্তু তবু মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর মেলে নি, সব রহস্যের আজও সমাধান ঘটে নি।

---

৭ প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি যে, প্রাচীন গ্রীকদের এল্যুসিনিয়ান এবং অর্ফিক মিস্টি-র সর্বত্রই সেই একই ভাবসত্যের প্রকাশ: নবজীবনলাভ।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান আজো সমানই দুস্তর। সেই অতৃপ্ত-কামনার বেদনালোকে অ-বিজ্ঞানের অধিকার। সে অ-বিজ্ঞান যে পুরাণই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তা দর্শনও হতে পারে, ধর্মও হতে পারে, এমন-কি কবিতাও হতে পারে। কিন্তু পুরাণই বা নয় কেন ?

কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বলেন, সুদূর অতীতকালের আদিম জীবনের কিছু কিছু ভগ্নাংশ, হারানো জীবনযাত্রার কোনো কোনো সংস্কার এখনো আমাদের মনের মধ্যে গোপনে সঞ্চিত হয়ে আছে। ইয়ুং-প্রমুখ কেউ কেউ বলেন, ভগ্নাংশমাত্র নয়, আদিম অভিজ্ঞতার সারাংশটাই জাতির মানসলোকে জমা হয়ে থাকে। আদিম জীবনে তখনকার মানুষের উপলব্ধিতে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার পৌনঃপুনিকতা থেকে এমন সব স্থায়ী ভাবনা-কূটের জন্ম হয় যা চিরকাল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রবাহিত হতে থাকে। এই ভাবনা-কূটেই পুরাণের স্থায়ী অধিষ্ঠান।

প্রত্নভাবনা-কূটের স্থায়ী মূর্তির (Archetype) এই তত্ত্বকে যদি আমরা আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করতে না-ও পারি, সভ্য মানুষের মনের মধ্যেও কোথাও যে একটা অন্ধকার অবুদ্ধি-লোক লুকিয়ে আছে, এ সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই অবুদ্ধি-লোকের অন্ধকারে পুরাণের আধিপত্য।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যের ভাব-বস্তু খাঁটি পুরাণের ভাব-বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব পুরাণরচয়িতা ব্লেক বা ইয়েট্‌সের কবিস্বভাব থেকে ভিন্নতর ধাতু দিয়ে গড়া। ঋতুনাট্যের প্রকৃতিপুরাণকে যথার্থ ই পুরাণ বলে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তার রূপদৃষ্টিতে পৌরাণিকতার আভাস আছে, তার সমস্যা-পূরণের ধাঁচটা পৌরাণিক। দিবালোকবিহারী হয়েও সে একটা মায়া-গোধূলির কুহক বিস্তার করতে পারে।

৮

ঋতুচক্রের আবর্তনে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি অখণ্ড মণ্ডলকে দেখতে পেয়েছিলেন, যার মধ্যেকার বিচ্ছিন্ন অংশ-গুলির, বিক্ষিপ্ত বিরোধ-বৈপরীত্যগুলির কোনোটাই চরম নয়। তারা সবাই কালগত। অখণ্ড মণ্ডলটাই সত্য, সকল কালকে নিজের মধ্যে সংহৃত করে নিয়ে অখণ্ড মণ্ডলই কালাতীত।

বিরোধ, বৈপরীত্য, চলে-যাওয়া— এ সব শুধু ছদ্মবেশ, ছলনালীলা, শুধু খেলা। ঋতুনাট্য এই ছদ্মবেশ মোচনের পালা। চলে-যাওয়া আর ফিরে-আসা দুয়ে মিলেই যে খেলাটা পূর্ণ হয়, ঋতুনাট্য যেন এইটেকে ধরিয়ে দেবারই রঞ্জন-রশ্মি। হাসি যে অশ্রুতে পূর্ণ, মিলন যে বিরহে পূর্ণ, শরতের আলো যে শ্রাবণের কালোয় মিলে তবে পূর্ণ, এই পূর্ণতাকে মেলে ধরাই ঋতুনাট্যের কাজ।

সমগ্রকে এইভাবে সমগ্র করে দেখতে হলে কালপ্রবাহের বাইরে তাকে দেখতে হবে— ত্রিকালের অধীশ্বর-রূপে।

কালপ্রবাহকে এইভাবে কালাতীত মণ্ডলরূপে দেখা, এ দেখা দার্শনিকের দেখা হতে পারে, ধর্মদৃষ্টির দেখাও হতে পারে, কিন্তু ঋতুনাট্যের ক্ষেত্রে এই দেখাটা মুখ্যত পুরাণধর্মী কল্পনাদৃষ্টির দেখা, ভাবাবিষ্ট কবির দৃষ্টি দিয়ে দেখা। এ-দেখা এক দিকে যেমন ঋতুনাট্যের ভাব-বস্তুকে পুরাণকল্প করে তুলেছে, অন্য দিকে আবার এই দেখাই কিন্তু ঋতুনাট্যের নাট্যধর্মকে অনেকখানি পরিমাণে স্তিমিত করে দিয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে পারি, নাটকের দৃষ্টি এরকম অখণ্ড দৃষ্টি নয়, এরকম কালাতীত দৃষ্টি নয়। আদিম ঋতুর নাটকে যে-নাট্যদৃষ্টির প্রকাশের কথা বলা হয়, তা কখনোই এরকম বিরোধ-গলানো বৈপরীত্য-মেলানো

সৌম্যদৃষ্টি নয়। বরং তার উল্টো। ঋতুচক্রে যেখানে বিরোধ এবং সংঘর্ষ, যেখানে শীতে এবং বসন্তে যুদ্ধ, যেখানে জয়-পরাজয়, যেখানে একের মৃত্যুতে অপরের প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই যথার্থ নাট্যরস, সেইখানেই ঋতুর নাটক। ঋতুরা সব জীবন্ত এবং স্বতন্ত্র, পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে রত, তারা কেউ ভাল কেউ মন্দ, বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বে সতত-উচ্চকিত, ঋতুচক্রকে এইভাবে দেখাকেই বেন্‌সিক্ বলেছেন, 'dramatic conception of nature'— নাট্যরূপায়ণকারী নিসর্গদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যের নিসর্গদৃষ্টিকে এই দিক থেকে নাট্য-রূপায়ণকারী দৃষ্টি বলে বর্ণনা করা যায় না। এ দৃষ্টি রূপসৃষ্টিকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে নাট্য-সৃষ্টিকারী নয়। ঋতুনাট্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধের কোনো চরমতা নেই, মৃত্যুর চরমতা নেই, নাট্যক্রিয়ার চরমতা নেই।

এ কথা বলার অর্থ অবশ্য ঋতুনাট্যের নাট্যধর্মকে একেবারে সরাসরি অস্বীকার করা নয়। ঋতুনাট্যের রঙ্গমঞ্চে বিরোধ-বৈপরীত্যের সশরীরী উপস্থিতি নেই বটে, কিন্তু তার নেপথ্য-ভূমিতে তারা সতত-সক্রিয়। ঋতুনাট্য যে নানামুখী কামনার অভিব্যক্তি, ঋতুনাট্যে যে বহুস্তরায়িত উৎকণ্ঠার উপশম, সেই কামনা সেই উৎকণ্ঠাই তার নেপথ্যভূমিতে পরিব্যাপ্ত অভাববোধের অভিজ্ঞান। জীবনের মৌল উৎকণ্ঠাকে অতিক্রম করার মধ্যে দিয়েই ঋতুনাট্য ঋতুনাট্য। প্রকাশ্য মঞ্চ-কাহিনীতে নাট্যরস পরিমিত হলেও, রচয়িতার প্রয়োজন এবং প্রেরণা সুস্পষ্টভাবেই নাটকীয়। নাট্য-অঙ্গে তার প্রতিফলন স্বাভাবিক।

হারানোর কূলে দাঁড়িয়ে ঋতুনাট্যের দৃষ্টি ফিরে-পাওয়ার কূলের দিকে। সমস্ত ঋতুনাট্যের প্রস্তাবনায় 'ফিরে চল্'— এই আহ্বান-বাণী গুঞ্জরিত। ঋতুনাট্যের প্রেরণা জীবনের সমস্ত স্তরের সকল বিচ্ছেদের উত্তরণ-প্রেরণা, সংযোগসাধনের প্রেরণা, মিলনের প্রেরণা। ঋতুনাট্যের প্রয়োজন পূর্ণতার প্রয়োজন। আধুনিক জীবন বহু বিচ্ছেদে শতধা-বিভক্ত। ঋতুনাট্য তার উত্তরণ-প্রয়াস। এক দিকে প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ, অন্য দিকে গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে— সমাজজীবনের সঙ্গে, লোকযাত্রার সঙ্গে বিচ্ছেদ, দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ, জাতির সঙ্গে বিচ্ছেদ! মনের গভীরের দিকে তাকালে নিজের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন টুক্‌রোগুলির মধ্যে বিচ্ছেদ— বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের বিচ্ছেদ, যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণধর্মের বিচ্ছেদ, শক্তির সঙ্গে প্রেমের বিচ্ছেদ। ঋতুনাট্য প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের মধ্যে দিয়ে, বৃহৎ লোকযাত্রার মাঝখানে ফিরে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে এবং নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে জীবনের পূর্ণতাকে ফিরে পাওয়ার প্রয়াস।

আরো-এক বিচ্ছেদ আছে। প্রিয়জনের চলে যাওয়া আর প্রিয়জনকে ছেড়ে যাওয়া। হয়তো এ-বিরহ নিত্য-বিরহ— ভালোবাসার দাম। ঋতুনাট্য আমাদের এই মৃত্যু-চিহ্নিত জীবনের আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত বিরহ-বেদনার সকরুণ উত্তরণ-প্রয়াস।

৯

ঋতুনাট্যের রঙ্গমঞ্চে মৃত্যুর প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু মৃত্যুচেতনাই বোধ করি ঋতুনাট্যরচনার মুখ্য প্রেরণা, মৃত্যু-ভয়ের উত্তরণেই ঋতুনাট্যের প্রধান পুরাণ-মূল্য।

সমস্যাটা কালপ্রবাহকে নিয়ে। কালপ্রবাহ অর্থই ক্ষয়প্রবাহ, মৃত্যুপ্রবাহ। প্রাচীন ঋষি বলেছেন, বর্ষই মৃত্যু। বলেছেন, দিন আর রাত্রির মধ্যে দিয়ে বর্ষই জীবনকে বিনষ্ট করে দেয়।[৮] বর্ষের প্রবাহকে স্তম্ভিত

৮ শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০/৪-৩-১

করে দিলেই মৃত্যু থমকে যাবে। ঋতুনাট্যের পুনরাগমন-পুরাণ মৃত্যুর মধ্যে জীবন-আবিষ্কারের, মৃত্যুর চরমত্বকে খণ্ডন করার আশ্বাস। আসা আর যাওয়াকে মিলিয়ে নিয়ে পূর্ণ করে দেখার প্রয়াস। সময়ের হলাহল, যাকে বলতে পারি সর্বক্ষয়কারী কালকূট— সেই কালকূটকে ত্রিকালেশ্বরের কণ্ঠে স্থাপন করা, কালপ্রবাহকে মহাকালের মধ্যে সংহরণ করে নেওয়া— এই হল ঋতুনাট্যের প্রাথমিক উৎকণ্ঠা।

সময়কে পরাভূত করার পুরাণ সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। যে-কোনো রকম উৎসে ফিরে যাবার পুরাণই এক হিসেবে কালের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার পুরাণ। এইরকম কালপ্রবাহকে পিছিয়ে উৎসের দিকে নিয়ে যাবার বা উজিয়ে যাবার পুরাণ বিশেষ করে প্রাচ্য ভূখণ্ডের নানা দেশে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও নানান্ রকমের 'উজান-সাধনা'র প্রক্রিয়া আছে। অনেক পুরাণবিদ্ আমাদের দেশের উজান-সাধনার মধ্যে কালচক্রকে জয় করবার পুরাণের সন্ধান পেয়েছেন।[৯] ঋতুনাট্য উজিয়ে-যাবার পুরাণ নয়। কিন্তু তার লক্ষ্য অনেকটা একই : মৃত্যুর হলাহলকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া, কালকে মহাকালের কণ্ঠলগ্ন করে দেওয়া।

প্রত্যুষের সেই কড়ি ও কোমলের বিখ্যাত ঘোষণা, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' -থেকে সায়াহ্নে শেষ লেখার সেই 'রাহুর মতন মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া' -পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যুচেতনার কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি বিভিন্ন হলেও তার উৎসটা অভিন্ন, তার সত্যটা এক। ভালোবাসাই তার প্রথম এবং শেষ কথা।—

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।[১০]

—এই ভালোবাসাই রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনব্যাপী মৃত্যুরহস্যসন্ধানের মূল প্রেরণা। এই ভালোবাসার এক বৃন্তেই দুটি বেদনা একসঙ্গে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। তার একটি হল—

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন 'পরে অন্তিম নিমেষ।[১১]

আর অপরটি—

মৃত্যু দূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি।[১২]

মৃত্যু কবি অকবি সকলের পক্ষেই সমান সত্য। কিন্তু ভালোবাসার দায় সকলের সমান নয়। মৃত্যুর অভিজ্ঞতামাত্র আর মৃত্যুকে আবিষ্কার করা এক নয়। এই সক্রিয় বোঝাপড়া সকলের জন্যে নয়। মৃত্যুকে বুঝে নেওয়া, মৃত্যুর সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করা, রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনারই অঙ্গ। এ বোঝাপড়ার নানা পথ, নানান্ পদ্ধতি। জীবনের নানা পর্বে এর নানান্ রূপ। পুনরাগমনের পুরাণ তারই একটা।

মৃত্যু রোমান্টিক কবিমাত্রেরই বিশেষ আকর্ষণ ও মুগ্ধতার বস্তু। যুগপৎ বিষাদ এবং রহস্যের এমন ভীমকান্ত রূপ রোমান্টিক কবি আর কোথায় খুঁজে পাবেন? মৃত্যুর মেঘ-বরণ শ্যাম-সমান কুহক-মূর্তি যে এক সময়

---

৯ Myth and Reality, Mircea Eliade.

১০ দুর্লভ জন্ম, চৈতালি, র/১/৫৪৮

১১ দুর্লভ জন্ম, চৈতালি, র/১/৫৪৮

১২ যাত্রা, পূরবী, র/২/৬২৮

তরুণ রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার কত বড় অবলম্বন হয়ে উঠেছিল তা আমাদের সকলেরই সুবিদিত। রবীন্দ্র-কাব্যের এই ফেলে-আসা করুণ রঙিন পথটিকে কতদূর বোঝাপড়ার পথ বলা যাবে তা জানি না।

স্মৃতি যখন সৌন্দর্যে পরিণত হয়, বেদনা যখন আর্টে রূপ নেয়, তখন সে-ও বোধ করি কালের প্রহারকে প্রতিহত করবার আর-এক উপায়, বিচ্ছেদের সঙ্গে সন্ধি করবার আর-এক প্রয়াস। বলাকার শাজাহান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রয়াসের উল্লেখ করেছেন। সম্রাট-কবির শঙ্কিত হৃদয় 'চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ সৌন্দর্যে ভুলায়ে'। বোঝাপড়ার এ-পথও যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার পথ এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যে এই বোঝাপড়া কখনো তত্ত্বজ্ঞের প্রজ্ঞার আলোকে উদ্‌ভাসিত, আবার কখনো-বা পরিহাস-বিজল্পিত। তেমনি কখনো এ বোঝাপড়া পুরাণের পথে, পুনরাগমনের প্রতীতির মধ্যে, যাওয়া-আসাকে মিলিয়ে দিয়ে, ক্ষয়-ক্ষতিকে গলিয়ে দিয়ে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে।

যে যায়, সে ফিরে আসবে বলেই যায়। ফিরে আসে নবীন হয়ে। যায় বলেই তো উজ্জ্বল হয়ে ফেরে। ফাল্গুনী নাটকে প্রত্যাগত যৌবনের গানে এই নবীনের, এই উজ্জ্বলের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে—

> বিদায় নিতে গিয়েছিলাম
> বারে বারে।
> ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
> এই তো আবার নবীন বেশে
> এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।[১৩]

১০

প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ, জাতির সঙ্গে বিচ্ছেদ, নিজের সঙ্গে বিচ্ছেদ, এই তিন বিচ্ছেদ পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাদের উত্তরণ-চেষ্টাও তাই তিনটি স্বতন্ত্র চেষ্টা নয়। ঋতুনাট্যে অভিব্যক্ত সংযোগসাধনপ্রয়াস একই গভীর প্রয়াসের নানামুখী অভিব্যক্তি। কৃষিজীবী দেশের বিচ্ছিন্ন কবির পক্ষে প্রাথমিক সংযোগই হল মাটির সঙ্গে সংযোগ। এক দিকে তা যেমন প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ, অন্য দিকে সেই পথেই জনসমাজেরও সংযোগ। আপন হৃদয়ের সঙ্গে সংযোগও সম্ভবত ওই পথেই।

ঋতুনাট্যে যা পুরাণ-রূপের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্ন, সেই একই কালপর্বে রচিত কাব্য-নাটকে অনেক সময় তা অনেক স্পষ্টতর ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। যেমন রক্তকরবীতে। রক্তকরবী নাটকে পৌষের পাকা ফসলের গানের মধ্যে বার বার যে আহ্বান শুনতে পাই, তা একই সঙ্গে প্রকৃতির আহ্বান, কৃষি-সমাজের লোকজীবনের আহ্বান এবং স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতির— অখণ্ড মনুষ্যত্বের আহ্বান। এই আহ্বানই সমস্ত ঋতুনাট্যের আবহ-সংগীত।

প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের কথা রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রথম থেকে শেষ অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু শারদোৎসব (১৯০৮) বা তপোবন-প্রবন্ধের (১৯০৯) কাল থেকে তা যেন একটা স্বতন্ত্র বিষয়-গৌরব লাভ

---

১৩ প্রত্যাগত যৌবনের গান, ফাল্গুনী, র/৬/৪৭৬

করেছে, এবং বনবাণীতে (১৯৩১) এসে তা প্রায় তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এই সময়টাই রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যরচনার কালপর্ব।

মানুষের বৃত্তি-নিচয়ের বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে, হৃদয়স্পর্শবর্জিত শুষ্ক বুদ্ধির বিরুদ্ধে, প্রাণের সঙ্গে সংযোগ হারানো যন্ত্রের বিরুদ্ধে, প্রেমহীন শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্র মুখরিত। কিন্তু এই প্রতিবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবস্বভাবের অখণ্ড ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যের দাবি— এ-ও যেন একটা বিশেষ কালপর্বে এসে স্বতন্ত্র গুরুত্বে শিখরস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ঋতুনাট্যের প্রকৃতিপুরাণ এই কালপর্বেরই রচনা। এই পর্বেই ফাল্গুনী এবং বসন্ত। আবার এই পর্বেই মুক্তধারা এবং রক্তকরবী।

আলাদা করে দেখলে, এ দেশের বুদ্ধিজীবীর পক্ষে আজকের দিনে সব থেকে বড় বিচ্ছেদ হল জনজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ। বুদ্ধিজীবীর এই বিচ্ছেদ হয়তো তেমন নতুন কিছু নয়, কিন্তু দু শো বছরের ইংরেজ শাসনে এ বিচ্ছেদ আজ আমাদের জীবনে যে-রকম অতলস্পর্শী গভীরতা ও সর্বনাশা ব্যাপকতা পেয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই। এর মূল কারণ ঔপনিবেশিক শোষণ-ব্যবস্থা, অব্যবহিত কারণ আমাদের উনবিংশ শতকের উৎকেন্দ্রিক নবজাগরণ, আমাদের ভিত্তিভূমিহারা আধুনিকতা।

রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের স্বদেশসাধনা এই নষ্ট-আত্মীয়তার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসাধনা একটি সর্বাত্মক মিলনসাধনা, শহরের সঙ্গে গ্রামের, ইংরেজি-শিক্ষিতের সঙ্গে কৃষিজীবী লোকসাধারণের— এ হল গোটা দেশের সঙ্গে জীবনে জীবন যোগ করবার সাধনা।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসাধনা তাঁর প্রথম-যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। তবু সাহিত্যসৃষ্টিতে এবং কর্মসাধনায় এর তীব্রতার অল্প-বিস্তর হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্যই লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের কাছাকাছি সময় থেকে অসহযোগ-আন্দোলন (১৯২১) এবং তার পরের কয়েকটা বছর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসাধনায় গণসংযোগকামনার তীব্রতম অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রকৃতি-পুরাণরচনার কালও এইটেই। এর এক প্রান্তের কাছাকাছি শারদোৎসব (১৯০৮) প্রকৃতিপুরাণের সূত্রপাত। অসহযোগ-আন্দোলনের অব্যবহিত পরে বসন্ত (১৯২২), যেখানে এর উচ্চতম শিখর। তার পর থেকেই একটু একটু করে ভাঁটার শুরু। শেষ প্রান্তের কাছাকাছি শেষবর্ষণ (১৯২৫) এবং নটরাজ (১৯২৭)। আরো পরে নবীন (১৯৩১) এবং শ্রাবণগাথা (১৯৩৪)। এরা এ পর্বের প্রান্তসীমাকে অনেকটা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, প্রকৃতিপুরাণের দিক থেকে এ-দুটিতে কিছুমাত্র নতুনত্ব নেই। অনুভব এবং প্রকাশ দুই দিক থেকেই এরা পূর্ববর্তীদের পুনরাবৃত্তি।

সকলেই জানেন, অসহযোগ-আন্দোলনের অব্যবহিত পরে, সেই উত্তেজনা এবং উন্মাদনার কালেই, নীরব নিরাবেগ নিরবচ্ছিন্ন সংগঠনকর্মের সংকল্প নিয়ে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা (১৯২২)। এ হল একই সঙ্গে অসহযোগের সংশোধন, পরিপূরণ এবং প্রতিবাদ। এ প্রসঙ্গে কালান্তরের সত্যের আহ্বান প্রবন্ধটি (১৯২১) স্মরণীয়। শ্রীনিকেতন, বস্তুত, কর্মের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আহ্বান'। এর সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে নিতে হবে শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার সমকালে রচিত মুক্তধারা নাটক (১৯২২) এবং ঠিক তার পরের বছরে রচিত নাটিকা রথযাত্রা (১৯২৩)।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর সূত্রে শ্রীনিকেতন আর মুক্তধারাকে আমরা সহজেই মিলিয়ে নিতে পারি এবং সত্যের আহ্বানের যথার্থ তাৎপর্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। সেই একই সূত্রে শ্রীনিকেতন বা মুক্তধারার সঙ্গে

রথযাত্রার যোগটাও সহজেই নজরে পড়বে। রথযাত্রার মূল কথা হল জনসাধারণের অধিকারের স্বীকৃতি। বসন্ত ঋতুনাট্য এই বিদ্যুৎগর্ভ সময়েরই রচনা। হঠাৎ মনে হবে বসন্ত যেন ঐতিহাসিক পারম্পর্যহীন একটি আকস্মিক ব্যতিক্রম, সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার অতীত একটি মধুর সৌন্দর্যস্বপ্ন। মনে হতে পারে যে, বসন্তের সঙ্গে শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠা বা সমকালীন রচনাবলীর ভাবগত কোনো যোগ নেই।

বসন্ত যে মধুর সৌন্দর্যস্বপ্ন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ স্বপ্ন যে পৃথিবীর পুষ্পিত হয়ে ওঠারই স্বপ্ন, বসন্তের পালা যে ধরণীর পূর্ণতারই পালা, বসন্তের ডাক যে প্রকৃতিরই ডাক— ফলপুষ্পের ডাক, মাটির ডাক, এই সত্যটা স্মরণে রাখলে বসন্তের আপাত-অলক্ষ্য যোগসূত্রকে খুঁজে পাওয়া কিছু কঠিন হবে না।

যোগসূত্রের প্রসঙ্গে পূরবীর (১৯২৫) অন্তর্ভুক্ত 'মাটির ডাক' কবিতাটিকে স্মরণ করা যেতে পারে। কবিতাটি রচিত হয় শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার ঠিক এক মাস পরে (২৩ ফাল্গুন ১৩২৮)। কবিতাটি যেন শ্রীনিকেতনের মর্মবাণীরই কাব্যাভিব্যক্তি। কবিতাটিতে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের কথাও নেই, জাতীয় আন্দোলনের কথাও নেই, স্বদেশসাধনার কথাও নেই। প্রত্যক্ষভাবে যা আছে সে হল মাটির কথা, ফসলের কথা, ঋতুদের কথা, প্রকৃতির কথা। আছে ঋতুচক্রের সঙ্গে জীবনযোগের কথা, নগরজীবনের কৃত্রিমতার মোহকে ছিন্ন করে চলে আসার কথা।

কিন্তু কৃষিজীবীর দেশে মাটির ডাক তো কেবল মাটিরই ডাক নয়, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি' তারও ডাক— লোকযাত্রার ডাক, গোটা দেশের ডাক। এ ডাক শস্যচক্র ও ঋতুচক্রের মিলিত ডাক, একই সঙ্গে জনজীবন ও নিসর্গজীবনের সঙ্গে মিলনের ডাক। এই ডাকই বসন্তের ডাক, সমস্ত ঋতুনাট্যের ডাক।—

ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।[১৪]

—মাটির ডাক কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলিই সমকালীন রচনাগুলির যোগসূত্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে।

কবিতাটির সংগীত-সংস্করণকে স্মরণ করা যাক —

ফিরে চল্‌ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।
... ...
দিক্‌ হতে ওই দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।[১৫]

—এর শেষের পঙ্‌ক্তিটি যেন ঋতুনাট্যের সঙ্গে এই গানের আর-একটি অলখ সুতোর গ্রন্থি।

এ গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি দুটি :

ফিরে চল্‌ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।

---

১৪ মাটির ডাক, পূরবী, র/২/৬১৯

১৫ আনুষ্ঠানিক গান : ১০, গীতবিতান, র/৪/৪৭৫

—এই আহ্বানের মধ্যে রক্তকরবী নাটকের মর্মবাণীরও সন্ধান পাব। কান পাতলে এরই সুর-গুঞ্জরণের মধ্যে রক্তকরবীর সেই পৌষের পাকা ফসলের ডাক শুনতে পাব—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।[১৬]

১১

বসন্তের পর থেকে ক্রমেই ঋতুনাট্যগুলিতে টীকাভাষ্য এবং বাগ্-বৈদগ্ধ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে এক দিকে নাটকীয়তা চাপা পড়ে গিয়েছে, অন্য দিকে পুরাণধর্মিতাও স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

বসন্তের তিন বছর পরে শেষবর্ষণ (১৯২৫)। বিষয়টা হল বর্ষার মধ্যে দিয়ে শরতের প্রকাশ। মূল কথাটা, আলোয় কালোয় যুগল-মিলন— কান্নাহাসি বিরহমিলনের অখণ্ড পরিপূর্ণতা।

বিষয়টা ঋতুনাট্যেরই, কিন্তু মননপ্রাধান্যের ফলে চরিত্রটা মিশ্রিত ধরনের। শেষবর্ষণে নিসর্গজগতের কুশীলবেরা প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে স্থান পায় নি। গানগুলি উক্তি-প্রত্যুক্তি নয়। রাজা নটরাজ রাজকবি নাটকের ফ্রেম ছেড়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

শেষবর্ষণের দুবছর পরে নটরাজ (১৯২৭)। নটরাজ নৃত্য গীত আবৃত্তি সম্বলিত এক বিচিত্র পালাগান। এর আবৃত্তিযোগ্য কবিতাগুলির কাব্যসৌন্দর্য এবং ভাব-গৌরব অসামান্য। কিন্তু সমগ্র পালাগানটির সংহতির দিক থেকে দেখলে এই কবিতাগুলির স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমাই এর ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বিচিত্রানুষ্ঠান হিসেবে নটরাজ অতুলনীয়। কিন্তু নাটক বা পুরাণ হিসেবে যদি দেখতে চাই, তা হলে এই কবিতাগুলিই তার বাধা।

নবীনের (১৯৩১) মূল কথা হল, চিরপুরাতন আর চিরনবীনের অভিন্নতা। বক্তব্যে নবীনের সঙ্গে ফাল্গুনী ও বসন্ত দুয়েরই মিল স্পষ্ট। কিন্তু নবীনের ভাষাটা পুরাণের নয়। নবীনে নিসর্গ-পরিজনেরা কেউ নেই, অন্য ভাষ্যকারেরাও স্থান পায় নি। তাদের সকলকে নেপথ্যে রেখে রঙ্গমঞ্চে একা বিরাজ করছেন গ্রন্থনাকার ও ভাষ্যকার রূপে রচয়িতা স্বয়ং। এর ফলে ভাষ্যবৈভব অসাধারণ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু নাটককে পেলাম না। পুরাণকেও নয়।

এর তিন বছর পরে শেষবর্ষণের রূপান্তরিত সংস্করণ শ্রাবণগাথা (১৯৩৪)। প্রকৃতিপুরাণের দিক থেকে দেখলে শেষবর্ষণ-নটরাজকেই প্রান্তসীমা বলে ধরা যেতে পারে।

সামনের দিকের সীমারেখাটা কিন্তু অনেক দূর বিস্তৃত। পুরাণদৃষ্টির অস্ফুট সূত্রপাতকে যদি গণনার মধ্যে ধরি, তা হলে ফাল্গুনীকে (১৯১৬) আমরা বাদ দিতে পারি না। এমন-কি শারদোৎসবকেও (১৯০৮) নয়।

ফাল্গুনী প্রত্যক্ষত ঋতুনাট্য নয়, কিন্তু তার ভাব-বস্তু ঋতুপুরাণেরই ভাব-বস্তু। ফাল্গুনী বসন্তেরই নাটক। তার বিষয় হল বসন্তের স্বরূপ-সন্ধান। অনুসন্ধানের ধাঁচটা পুরাণধর্মী। ফাল্গুনীর মর্মকথাও সেই পুনরাগমন, পুরাতনে নবীনে অভেদ। কিন্তু তার প্রকাশটা ঈষৎ স্বতন্ত্র। তাকে বলতে পারি সন্ধান ও প্রাপ্তির পুরাণ। বিভিন্ন দেশের রূপকথা-লোককথায়, প্রাচীন এপিকে, প্রাচীন পুরাণকাহিনীতে আমরা এই ধরণের সন্ধান ও

১৬ রক্তকরবী, র/৬/৬৯২

প্রাপ্তি-আখ্যানের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। একে সুন্দর ভাবে পুনরাগমনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া অনেকখানি পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

ফাল্গুনীতে পাশাপাশি আর-একটা তত্ত্ব আছে। তাকে বলতে পারি, সহজ-মানুষের তত্ত্ব, স্বাভাবিক হৃদয়-ধর্মের তত্ত্ব, অন্ধ বাউলে যার আশ্রয়। ফাল্গুনীর শেষের দিকে যে আধ্যাত্মিকতার গুঞ্জরণ শুনতে পাই, তা-ও ওই বাউলেরই একতারা থেকে ধ্বনিত। এই আধ্যাত্মিকতার সুরটা মোটেই ঋতুনাট্যের সুর নয়, কিন্তু ওর সেই সহজ-রসের বাণী, হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির আত্মসমর্পণের বাণী— এর সঙ্গে ঋতুপুরাণের যোগ সুগভীর। ফাল্গুনীতে সহজ-রসের এই বাণীটি প্রকাশ পেয়েছে পথ-প্রদর্শন আখ্যানের মধ্যে দিয়ে। এ আখ্যানও পুরাণধর্মী। অনেক প্রাচীন পুরাণে, এপিকে, রূপকথা-লোককথায় অন্ধ বাউলের মতো অপ্রত্যাশিত এবং উল্টো-জাতের পথ-তত্ত্বজ্ঞের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাবে। কোথাও সে শিশু, কোথাও বৃদ্ধ, কোথাও রমণী, কোথাও অন্ধ, কোথাও মূর্খ, কোথাও-বা সে একটি পাখি মাত্র।

মর্মকথাটা এই : যে-পথ আসল পথ, ব্যাবহারিক কুশলতা বা বাস্তব-বুদ্ধি তার নাগাল পায় না, জ্ঞান তার সন্ধান জানে না, হিসেব তর্ক চাতুর্য শক্তি সব সেখানে অন্ধ। সহজ-বোধই কেবল সে-পথের খবর জানে। সহজ-বোধই জীবনের মৌল রহস্যের চাবি। এমনই জীবনের প্যারাডক্স যে, অন্ধই সেখানে চক্ষুষ্মান আর চক্ষুষ্মানই অন্ধ।

মরমীয়া সাধকেরা বহুকাল ধরে তাঁদের হেঁয়ালির ভাষায় এই একই কথা আমাদের শুনিয়ে আসছেন। রবীন্দ্রনাথও ফাল্গুনীতে সেই কথাই শোনালেন। বুদ্ধি নয়, জ্ঞান নয়, বোধি, অন্তর্দৃষ্টি, সহজ অনুভূতি— হৃদয় দিয়ে দেখা, প্রেমের চোখ দিয়ে দেখা, রসের মধ্যে দেখা। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর একটি প্রিয় এবং পুরাতন প্রত্যয়কেই পুরাণের ধাঁচে, লোককল্পনার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

১২

রাসে যেমন গোপরমণীকুলের মধ্যবর্তী শ্রীকৃষ্ণ, বসন্ত ঋতুনাট্যে তেমনি নিসর্গরমণীকুলে ঋতুরাজ বসন্ত। নিসর্গরমণীদের আকুল আত্মনিবেদন, বসন্তবিদায়ে তাদের অশ্রুসজল মিনতি, 'ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে'— এই সান্ত্বনায় বিরহের শূন্যতাকে ভাবসম্মিলনের মাধুর্যে পূর্ণ করা— বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য যে এর আবেদনকে অনেকখানি ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

রাধা-মূর্তি আমাদের সুপরিচিত, কিন্তু মানতেই হবে যে, নিসর্গের এই শৃঙ্গার-মূর্তি, পৃথিবীর এই বাসক-সজ্জা, এর সঙ্গে আমরা ততটা পরিচিত নই। বাঙালির কাছে প্রকৃতি সব সময়ই মাতৃরূপা। পুরাণেও তাই, সাহিত্যেও তাই। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যে প্রকৃতির— সমগ্র মহাপ্রকৃতির এই মাতৃরূপের দেখা পাই না। প্রকৃতির মাতৃমূর্তি, পৃথিবীর মাতৃমূর্তি রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যত্র সুপ্রচুর। কিন্তু ঋতুনাট্যে তা দেখি না। অন্তত মাতৃভাবটা সেখানে প্রত্যক্ষ নয়। মাতৃরূপা অখণ্ড মহাপ্রকৃতির বদলে এখানে পাই দ্যুলোকের দেবতার পুরুষমূর্তি আর পৃথিবীদেবীর নারীমূর্তি— নিসর্গকন্যা পৃথিবীর প্রণয়িনীর বেশ।

ঋতুনাট্যের প্রকৃতি বাঙালি-কল্পনার ইচ্ছাময়ী মাতা নয়, সর্বময়ী বিশ্ব-প্রসবিনী নয়। পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো 'আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং' উমার মধ্যে— কালিদাসের সেই উৎসুক উন্মুখ উমার মধ্যে যতটুকু মাতৃভাব, এর মধ্যে তার বেশি মাতৃভাবের অবকাশ নেই। বস্তুত, এর আসল রসটা শৃঙ্গার-রস, প্রতিবাৎসল্যের রস নয়। বাঙালির পুরাণ প্রতিবাৎসল্যের পুরাণ।

ঋতুপুরুষেরা ভিন্ন-ভিন্ন নয়, সকলে জ্যোতির্লোকের একই দেবতার রূপভেদ। নিসর্গরমণীরাও একই পৃথিবীদেবীর নানান্ অভিব্যক্তি। দ্যুলোকের দেবতার কখনো-বা তপস্যার কাল, কখনো তপোভঙ্গে তার মিলনের লগ্ন। যতক্ষণ তপস্যা, ততক্ষণ পৃথিবীর প্রতীক্ষা। ততক্ষণ—

কাঁকন-ধ্বনি তপোবনের পারে
চপল বায়ে আসিছে বারে বারে,…[১৭]

তার পর—'হেনকালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে'—তপস্যার অবসান, দ্যুলোকের দেবতার প্রসন্নতা। তখন বিরহিনীর বিরহ ঘোচে, পৃথিবী ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মে বর্ষায়, শীতে বসন্তে বারবার এই একই পালা।

এর মধ্যে যে পৌরাণিক শিব-পার্বতী কল্পনার প্রভাব, তার অনেকখানিই কালিদাসীয়। এর মধ্যে যে পরিমার্জিত শৃঙ্গার-রস তার কিছুটা বৈষ্ণবীয়, আর অনেকখানিই রাবীন্দ্রিক। কিন্তু কাঠামোটা সুপ্রাচীন। ঊর্ধ্বে দ্যুলোকের প্রসন্নতা, নিম্নে ধরিত্রীর উর্বরতা, এই হল ঋতুনাট্যের মূল প্যাটার্ন। এ সেই ঋগ্‌বেদের দ্যাবা-পৃথিবী কল্পনার প্যাটার্ন, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় পুরাণের প্যাটার্ন।

১৩

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যের প্রকৃতিপুরাণে আর যা-ই থাক-না কেন, বাঙালির লৌকিক পুরাণের আভাসমাত্র নেই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক পুরাণকাহিনীগুলিকে যে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই প্রীতির চোখে দেখতে পারেন নি, এ কথা সকলেরই সুবিদিত। বাঙালি লোকজীবনের যে-সব অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কারের সঙ্গে এইসব লৌকিক পুরাণের নাড়ীর সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সেগুলিকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়ে এসেছেন। বোঝা কঠিন নয় যে, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল মানবিকতার আদর্শের কাছে কোনো পুরাণই নিছক পুরাণ হিসেবে খুব বেশি প্রশ্রয় পেতে পারে না। বাংলার লৌকিক পুরাণ তো কখনোই নয়।

নির্বিশেষ ভারতীয়ত্বই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপুরাণের বিশিষ্ট গোত্র-পরিচয়। পুরাণমূল্য নয়, আমাদের কাছে ঋতুনাট্যের প্রধান আকর্ষণ তার সাহিত্যমূল্য, তার সৌন্দর্যমূল্য। এবং তার উৎসবমূল্য। ঋতু-নাট্যের প্রকৃতিপুরাণকে বড় জোর বলতে পারি সাংস্কৃতিক পুরাণ। কিন্তু এ-কথা বলা আর তার পুরাণত্বকে অস্বীকার করা প্রায় একই ব্যাপার।

তার কারণ, খাঁটি পুরাণ সব সময়ই গোষ্ঠীগত, সব সময়ই সাম্প্রদায়িক, সব সময়ই সংস্কারাচ্ছন্ন। তা সব সময়ই কোনো-না-কোনো বিশেষ দেশের বিশেষ কালের লোকজীবনযাত্রার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি, কখনোই নির্বিশেষ নয়, কখনোই উদার মানবত্বের প্রকাশ নয়। তার পথ জাতির অবচেতনার পথ। মানুষ যেমন কখনো কখনো ভূতাবিষ্ট হয়, লৌকিক সমাজমনের প্রতিনিধি পুরাণকারও তেমনি কখনো কখনো পুরাণাবিষ্ট হন। এ কালের কোনো কোনো কবিও কখনো ভূত-কালের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে পুরাণরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এও এক-ধরণের ভূতাবিষ্ট হওয়াই বটে। এ ধরনের ভূতাবিষ্টতা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবধর্মের অনুকূল নয়। বোধ করি কোনোরকম আবিষ্টতাই নয়।

---

১৭ মাধুরীর ধ্যান (২), নটরাজ, র/৫/৬৩০

ঋতুপুরাণরচনার দূর-অভিপ্রায় যা-ই হোক-না কেন, ঋতুনাট্যরচনার মুখ্য অভিপ্রায় সাহিত্যসৃষ্টিরই অভিপ্রায়। কিন্তু উৎসবের অভিপ্রায়টাও নিতান্ত গৌণ নয় এবং আমাদের আলোচনার দিক থেকে তার গুরুত্বও নিতান্ত কম নয়।

আমরা জানি, শান্তিনিকেতনের আকাশে-মাটিতে ঋতুবদলের পালা, শান্তিনিকেতনের নিসর্গসৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের ঋতু-উৎসবগুলির অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রেরণা। কিন্তু যে প্রেরণা আরো প্রত্যক্ষ, আরো অব্যবহিত—এবং বোধ করি আরো গুরুত্বপূর্ণ, সে হল শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনের প্রয়োজন। ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান-বর্জিত বিদ্যালয়-জীবনে উৎসবের শূন্যতাকে পূরণ করে নেবার জন্যে—এবং প্রধানত এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথকে অনেক সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিকল্পনা করতে হয়েছে, এবং সেইসব উৎসবকে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যে তাঁকে অনেক সাংস্কৃতিক পুরাণ ও সাংস্কৃতিক রিচ্যুয়াল রচনা করে নিতে হয়েছে। বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ বা বসন্তোৎসবের এ গুরুত্বটা মোটেই অবহেলা করবার মতো নয়।

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এ উৎসবগুলির উপযোগিতা তর্কাতীত। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের এই উপযোগিতাকে ছাপিয়ে বাঙালি-জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-পরিকল্পিত এই সাংস্কৃতিক উৎসবগুলি কতদূর প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে, সে বিচারের ভার ইতিহাসের হাতে।

আমাদের যন্ত্রবদ্ধ নাগরিক জীবনে, আমাদের রিক্ত নিঃস্ব বঞ্চিত গ্রামজীবনে—সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত পারা-পারহীন নিরানন্দের মধ্যে উৎসবের প্রয়োজনীয়তা যে কত গভীর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভালো হোক মন্দ হোক আমাদের পুরানো উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির প্রাণশক্তি আজ অনেকটা নিঃশেষিত। বাইরে থেকে হয়তো তা এখনো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করবে যে, আমাদের জীবন-যাত্রার মধ্যে এখন আর তাদের কোনো শিকড় নেই, আমাদের প্রাণধারণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে তারা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গিয়েছে। পুরানো উৎসব মৃতপ্রায়, নতুন উৎসবের অঙ্কুর দেখি না—তার বীজও উপ্ত হয় নি। এইখানে রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক উৎসবের কোনো ভূমিকা রচিত হয় কি না—অন্তত মধ্যবিত্ত-জীবনে তার কোনো দান সঞ্চিত হয় কি না, তা দেখবার জন্যে আমরা আগ্রহের সঙ্গে ভাবীকালের দিকে তাকিয়ে থাকব।

কালচার জিনিসটা আনুষ্ঠানিক ধর্মের অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্থান কতটা দখল করতে পারে, এই পুরানো তর্কের এখানে অবকাশ নেই। এখানে সে-প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই নেই। ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ঐতিহাসিক কারণেই আজ গতায়ু হয়ে পড়েছে। যা চলে যায়, ইতিহাস পিছু হটলেও, তা আর কখনোই ফিরে আসে না। ইতিহাসে পুনরাগমন নেই। তার আশ্বাস মিথ্যা আত্ম-ছলনা। ধর্মীয় বা পৌরাণিক উৎসব নেই, আমাদের সর্বজনীন পূজামণ্ডপাদিতে ধর্মীয় উৎসবানুষ্ঠানের নামে আজ যা আচরিত হচ্ছে, সে-ও সাংস্কৃতিক। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, অপ-সাংস্কৃতিক। কিন্তু এখানে উচ্চ-নীচের প্রশ্ন অবান্তর। অপ-সংস্কৃতিও সংস্কৃতি বই অন্য কিছু নয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন যদি ওঠেই, তো তা ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সাংস্কৃতিক উৎসবের নয়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই জাতের সাংস্কৃতিক উৎসবের মধ্যে। একটি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত, অপরটি বারোয়ারি-তলার। বারোয়ারি-তলার বলেই সে যে কম শক্তিশালী এমন মনে করবার হেতু নেই। বরং উল্টো। অনুমান করি, আপাতত সে-ই ইতিহাস-সমর্থিত।

১৪

পুরাণের ভাষা জাতির হারানো-অতীতের ভুলে-যাওয়া মাতৃভাষা। তার সম্মোহন মন্ত্রশক্তির মতো। পুরাণের বাক্যে বিস্মৃত পূর্বপুরুষের অমোঘ আদেশ। তার ক্রিয়া রক্তের অন্ধকারে, গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। বাইরের থেকে এ-শক্তির পরিমাপ হয় না। এই শক্তিতেই পুরাণ গোষ্ঠীমনের সংহতি-বিধায়ক, লোকজীবনের সংযোগ-সাধক। এবং এই কারণেই লোকজীবনের সঙ্গে সংযোগকামী কবি অনেক সময় পুরাণের পথে পা বাড়িয়ে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথও প্রবলভাবে বিচ্ছেদ-সচেতন কবি, সংযোগ-প্রয়াসী কবি। জীবন-সায়াহ্নে সেই-যে তিনি বলেছিলেন—

যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো একসারে,…[১৮]

—প্রসঙ্গান্তরে এবং ঈষৎ ভিন্ন অর্থে উক্ত হলেও, আক্ষরিক অর্থেও এ-কামনা রবীন্দ্র-জীবনের অন্যতম প্রধান প্রবর্তনা। পুরাণ-প্রচেষ্টা তাঁর ক্ষেত্রে কতটা সচেতন-অভিপ্রায়প্রসূত তা বলা কঠিন। যদি হয়ে থাকে, মানতেই হবে, এ ক্ষেত্রে তাঁর অভিপ্রায় ও তাঁর সিদ্ধিতে মিল ঘটে নি।

কয়েকটি কথা এখানে স্পষ্ট করে বলে রাখা দরকার। সাংস্কৃতিক পুরাণের পুরাণমূল্য কম হতে পারে, কিন্তু সেই কারণে তার সাহিত্যমূল্যও যে কম হবে এমন কোনো কথা নেই। আরো মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যমাত্রেই সংযোগ-সাধক। সাংস্কৃতিক পুরাণ সব সময় হয়তো জনচিত্তকে সরাসরি স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু তারও নিজস্ব একটা সংযোগ-সাধনের ক্ষেত্র আছে।

কবিমাত্রকেই যে পুরাণরচয়িতা হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কবিতার ভালোমন্দের সঙ্গে—অন্তত সব রকম কবিতার ভালো-মন্দের সঙ্গে পুরাণের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। পরোক্ষ যোগ কিছু থাকতেও পারে, কিন্তু তার মূল্য কতখানি তা এখনো নির্ণীত হয় নি।

আরো-একটি কথা। পুরাণ লোকসংযোগের অন্যতম পথ। কিন্তু একমাত্র পথ নয়। এমন-কি প্রশস্ত রাজপথও নয়। পুরাণের অন্ধকার পথে যে-ধরনের সংযোগ সাধিত হতে পারে তা যে সব সময়ই শুভ-সংযোগ, এমনও বলা যায় না।

মনে রাখতে হবে, সংযোগের রাজপথ পুরাণও নয়, সংস্কৃতিচর্চাও নয়, কর্মই সংযোগের রাজপথ। আমাদের পক্ষে সে কর্মের দায়িত্ব বহুমুখী এবং ব্যাপক। সংস্কৃতি-সাধনা তার সহগামী অথবা তার অনুগামী, অগ্রগামী নয়। পুরাণও তাই। অনেক সময় সহায়। আবার অনেক সময় প্রতিবন্ধক।

অগ্রাধিকার যে কর্মেরই, রবীন্দ্রনাথ এ সত্যটি সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তার নিঃসংশয় প্রমাণ শ্রীনিকেতনের কর্ম-প্রচেষ্টা। এইখানে নীরব নিরলস কর্ম-সাধনায় তিনি সেই ভূমির খুব কাছাকাছি নেমে আসতে পেরেছিলেন, 'যেইখানে লোকযাত্রা চলে'।

পুরাণের ঘোর-লাগা রূপ রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণও করেছে, বিকর্ষণও করেছে। পুরাণ থেকে তিনি তার ভাবরসকে নিয়েছেন, তার আবিষ্টতাকে নেন নি। মাত্র সেইটুকুই নিয়েছেন, যেটুকু তাঁর কর্মসাধনার সহায়, যেখানে সে ভাবনার ফাঁকগুলোকে পুরিয়ে দেয়, যেখানে সে জীবনের রন্ধ্রগুলিকে উৎসবে ভরিয়ে তোলে।

---

১৮ যাত্রী, পরিশেষ, ৯/২/৯৩৯

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকর

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকর এক বা একাধিক সে-সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১] এবং বসন্তরঞ্জন রায়[২] যে-ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেইটিই আজ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হয়ে আসছে। বলা বাহুল্য, পুথিতে লিপিকরের নাম-ধামের উল্লেখ নেই। তবে রাখালদাসবাবু এবং বসন্তবাবু পুথিতে তিন প্রকার হস্তাক্ষর দেখতে পেয়েছিলেন। এই তিন প্রকার হস্তাক্ষর একজন, দুজন বা তিনজন লিপিকরের সেটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সে-প্রশ্নের উত্তর লিপি-পরীক্ষক রাখালদাসবাবু এবং পুথি-সম্পাদক বসন্তবাবুর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। যোগেশচন্দ্র রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চুল-চেরা বিচার করেছিলেন। তিনি রাখালদাসবাবু এবং বসন্তবাবুর ইঙ্গিত অনুসরণ করে এবং পুথির হস্তাক্ষর বিচার করে জানিয়েছিলেন, 'পুথি তিন হাতে লিখিত' এবং এই তিন হাত তিনজন লিপিকরের।[৩] 'আমার বোধ হয়, কৃ-পুথির ক-লিপি বিষ্ণুপুরের রাজার মুন্সীর। খ-লিপি তাঁহার সাহায্যকারীর। ইহার হাত তখনও পাকে নাই। গ-লিপি অন্য কর্মচারীর। ইনি তৎকালপ্রচলিত অক্ষরে লিখিয়াছিলেন।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপির প্রকার-ভেদ সম্পর্কে রাখালদাসবাবু, বসন্তবাবু এবং যোগেশবাবুর অভিমতই প্রচলিত অভিমত। একমাত্র সুকুমার সেন ছাড়া সকলেই স্বীকার করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি তিন হাতে লেখা, যদিও লিপিকর তিনজন কি না সে-সম্পর্কে স্পষ্ট মত কেউই প্রকাশ করেন না। সুকুমারবাবুর ধারণা,[৪] 'কৃষ্ণকীর্তন পুথি এক হাতের লেখা নয়, দুটি ভিন্ন হাতের (আসলে ঢঙের) লেখা আছে।' এ থেকে কি বুঝব পুথির লিপিকর একজন, তিনি কখনো 'পুরানো গোটা গোটা অনুশাসন খোদাইয়ের রীতিতে' লিখেছেন, কখনো 'জড়ানো জড়ানো টানা হাতের অর্বাচীন ছাঁদের, পত্র দলিলের' রীতিতে লিখেছেন ; অথবা বুঝব দুজন লিপিকর দুটি রীতিতে লিখেছেন। সুকুমারবাবুর মতে লিপিকর একজন বা দুজন হন, তিনজন অবশ্যই নন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকর কজন এবং পুথিতে করকম হাতের লেখা আছে— এ সমস্যার সমাধান এখনো পাওয়া

---

১ বসন্তরঞ্জন রায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ১৩১৬, পৃ. ১৮/০ (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল')।

২ বসন্তরঞ্জন রায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', পৃ. ।।০

৩ যোগেশচন্দ্র রায়, 'চণ্ডীদাস', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২, পৃ. ২২। 'চণ্ডীদাস' প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ১৬ বছর আগে যোগেশবাবুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংশয়' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (দ্র. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৬, পৃ ১৯-৫৬)। এই প্রবন্ধে যোগেশবাবু 'প্রত্নলিপিবিৎ' রাখালদাসবাবু এবং 'সংস্কারক' বসন্তবাবুর অভিমতের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

'প্রাপ্ত পুথী বাস্তবিক অ-পূর্ব। ইহার লিপিকর এক, কিংবা একাধিক। একাধিক হইলে দুই কিংবা তিন। তিন হইলে দুই স্বতন্ত্র, এক পরতন্ত্র। তিনের এক লিপিকর এমন পরতন্ত্র যে "বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত" তাহার পৃথক অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। * * * প্রত্ন-লিপি-বিৎ পাঠককে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, পুথীর তিন প্রকার হস্তাক্ষর এক লিপিকরেরও হইতে পারে। শুনিয়াছি, আদালতে জাল দলীল আসে। গানের পুথী, বেদ নয়, চণ্ডীও নয়, গানের পুথী ; তাহাতে হস্তাক্ষরের অনুকরণ আছে। পুথীখানা অ-পূর্বই বটে।' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৬, পৃ ২১-২২)।

৪ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ১৯৬৩, পৃ. ১৩৪

যায় নি। রাখালদাসবাবু এবং বসন্তবাবু যে-অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার মূলে যুক্তি প্রমাণ যতটুকু তার চেয়ে বেশি অনুমান। সেই আনুমানিক সিদ্ধান্তকে নিঃসংশয়ে মেনে নিয়ে যোগেশবাবু এবং অন্যরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি সম্বন্ধে এমন কথা মেনে নিয়েছেন যা সতর্ক হলে তাঁরা কিছুতেই মানতে রাজী হতেন না।

২

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকার হস্তাক্ষর লক্ষ্য করেছিলেন— 'প্রাচীন হস্তাক্ষর', 'প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি' এবং 'অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর'। তিন প্রকার হস্তাক্ষরে রাখালদাসবাবু সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হলেও লিপিকর কজন সে-প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেছেন। তবে 'প্রাচীন হস্তাক্ষর' এবং 'প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি' একই লিপিকরের দ্বারা কি উপায়ে সম্ভব তা কল্পনায়ও আসে না। তাই অনুমান করি, রাখালদাসবাবুর বিশ্বাস ছিল লিপিকর একাধিক ; কিন্তু সে-কথা স্পষ্ট করে বলতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। যে তথ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে সে-কথা বলা যায় সে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ-অবসর হয়ত তাঁর ছিল না। সে কাজের ভার পুথি-সম্পাদকের উপর দিয়ে তিনি দায়মুক্ত হয়েছিলেন।[৫] আরো অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে রাখালদাসবাবু স্পষ্ট অস্পষ্ট কোনো কথাই বলেন নি। তিনি বলেন নি, কোন্ যুক্তিতে হস্তাক্ষর তিন প্রকার, পুথির কোন্ পত্রে কোন্ হস্তাক্ষর, 'অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর' কেন এবং কত আধুনিক, 'প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি' 'অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর'-এর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী, 'অনুলিপি' কে করেছেন, কি উদ্দেশ্যে করেছেন এবং কি উপায়ে করেছেন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে রাখালদাসবাবুর অভিমতকে গ্রাহ্য করতে পারি না।

৩

বসন্তরঞ্জন রায়ের অভিমত, পুথিতে তিন হাতের লেখা আছে। পুথির অধিকাংশই প্রথম হাতের লেখা, দ্বিতীয় হাতের লেখা কুড়ি পৃষ্ঠা ১৭৬।২ ; ২০৪।১, ২০৪।২ ; ২০৫।১, ২০৫।২ ; ২০৬।১, ২০৬।২ ; ২০৭।১ ; ২১২।১, ২১২।২ ; ২১৭।২ ; ২১৮।১, ২১৮।২ ; ২১৯।১, ২১৯।২ ; ২২০।১, ২২০।২ ; ২২১।১, ২২১।২ ; ২২২।১ ; তৃতীয় হাতের লেখা চার পৃষ্ঠা (৬০।১, ৬০।২ এবং ১১৫।১, ১১৫।২)। বসন্তবাবু আরো জানিয়েছেন, তৃতীয় হাতের লেখা পৃষ্ঠা চারটি 'পরবর্তী যোজনা' এবং 'তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না'। বসন্তবাবুও জানান নি প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হাত এক বা একাধিক লিপিকরের। কিন্তু তিনি যখন বিশ্বাস করেন তৃতীয় হাত প্রথম হাতের অনুকরণ তখন একাধিক লিপিকরের অস্তিত্ব তিনি অবশ্যই স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং স্পষ্ট করে না বললেও অনুমান করা শক্ত নয় যে, বসন্তবাবুর বিশ্বাস ছিল পুথির লিপিকর তিনজন। এবং এই তিনজন লিপিকরের লেখা আছে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হাতে লেখা পৃষ্ঠাগুলিতে।

---

৫ 'ভরসা করি, গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষর সম্বন্ধে তিনি [পুথি-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়] বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', পৃ. ১৸৵

বসন্তবাবুর এই সিদ্ধান্ত একটি বৃহৎ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটি হল, তৃতীয় লিপিকরের অস্তিত্ব কল্পনা। বসন্তবাবুর মন্তব্য দেখে বুঝতে পারি নিতান্ত সংকোচ এবং কুণ্ঠার সঙ্গে যেন তিনি তৃতীয় লিপিকরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'পুথিতে দুই হাতের লেখা সুস্পষ্ট' ; কিন্তু বলেন নি কোন্ দুই হাতের লেখা স্পষ্ট। তবে বুঝতে পারি প্রথম ও দ্বিতীয় হাতই তাঁর লক্ষ্য। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় হাতের পার্থক্য স্পষ্ট, কিন্তু এই দুই হাত থেকে তৃতীয় হাতের পার্থক্য বসন্তবাবুর কাছে স্পষ্ট ছিল না। যা স্পষ্ট তা যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই স্পষ্ট। পুথি খুললেই চোখে পড়ে একটি সাজানো লেখা আর-একটি টানা লেখা।

তৃতীয় হাতের এমন স্পষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তাই অস্পষ্ট তৃতীয় হাতকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট করা প্রয়োজন ছিল। বসন্তবাবু তা করেন নি বা করতে পারেন নি। তাই তৃতীয় হাতকে আনুমানিক ছাড়া আর-কিছু মনে করতে পারি না। অথচ এই অনুমানকে সত্য প্রতিপন্ন করতে বসন্তবাবু আরো দুটি অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। একটি, তৃতীয় হাত প্রথম হাতের অনুকরণ ; অন্যটি, তৃতীয় হাতের লেখা পৃষ্ঠা চারটি পরবর্তী যোজনা।

তৃতীয় লিপিকর সম্বন্ধে বসন্তবাবুর মন্তব্য অতিশয় গুরুতর। বসন্তবাবু তাঁর মন্তব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি দাবি করছেন, আসল-নকলের পার্থক্য বিচার করে তিনি জেনেছেন যে, প্রথম লিপিকরের হস্তাক্ষর কৌশলে অনুকরণ করে তৃতীয় লিপিকর ৬০ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতা দুটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে লিখে (বসন্তবাবুর মন্তব্য 'পরবর্তী যোজনা' স্মরণীয়) পুথির প্রাচীনতর অংশের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে আসল-নকলের পার্থক্য বিচার করা হল, বিচারে কোন্ যুক্তি-প্রমাণকে সাক্ষ্য মানা হল সে-সম্পর্কে আমাদের কিছুই না জানিয়ে বসন্তবাবু তৃতীয় লিপিকর সম্বন্ধে, এবং সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি সম্বন্ধেও বটে, এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেছেন। পুথির আবিষ্কারক-সম্পাদক সতর্কতার সঙ্গে পুথি পরীক্ষা করে বলছেন, পুথির সবটা এক সময়ে লেখা নয়। এর

চারটি পৃষ্ঠা 'পরবর্তী যোজনা'। বসন্তবাবুর কথা সত্য হলে বিশ্বাস করতে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির চারটি পৃষ্ঠা জাল। এবং যাঁরাই স্বীকার করেছেন পুথির লিপিকর তিনজন, তাঁরাই স্বীকার করেছেন পুথির চারটি পৃষ্ঠা জাল।

প্রাচীন-আধুনিক, আসল-জালের কথায় অনেক কথা ওঠে। আধুনিক লিপিকর প্রাচীন হস্তাক্ষর অনুকরণ করেছেন কি উদ্দেশ্যে। শ্রম এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া একে অন্যের হস্তাক্ষর অনুকরণ করতে পারে না। অন্যযুগের হস্তাক্ষর অনুকরণ দীর্ঘকালের অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা -সাপেক্ষ। বসন্তবাবু বলছেন, মূল এবং অনুকরণ প্রায় পার্থক্যহীন, বিশেষ পরীক্ষা ছাড়া পার্থক্য ধরা যায় না। দীর্ঘকাল যাবৎ অনুকরণ-বিদ্যা অভ্যাস না করলে অনুকরণ এরকম মূলানুগ হয় না। পেশাদার অনুকারক না হলে তৃতীয় লিপিকর এরকম অসম্ভব ব্যাপার কি উপায়ে সংঘটন করলেন, বোঝা শক্ত। হস্তাক্ষর অনুকরণ ছাড়াও পুথি জাল করার বাধা অনেক ; শুধু হস্তাক্ষর অনুকরণ করলে সব বাধা দূর হয় না। প্রাচীন কাগজ-কালিও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে হয়। কাগজ সম্বন্ধে বসন্তবাবু কিছুই বলেন নি, কালি সম্বন্ধে যা বলছেন তা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। ধরা গেল, তৃতীয় লিপিকর প্রাচীন হস্তাক্ষর অনুকরণ করেছিলেন এবং কাগজ-কালিও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বিষয় এবং ভাষা তিনি কি উপায়ে সৃষ্টি করলেন? কাগজ-কালির মতো তাও কি অনুকরণ? অনুকরণ যদি না হয় তা হলে অনুমান করতে হয়, তৃতীয় লিপিকরের কাছে পুথি ছিল এবং সেই পুথি দেখে তিনি এই অংশটুকু লিখেছিলেন। অর্থাৎ বর্তমান পুথি এবং প্রাচীন বা আধুনিক আর-একখানি পুথি এই দুখানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি একসঙ্গে তৃতীয় লিপিকরের হস্তগত না হলে ৬০ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতা দুটি তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় লিপিকরের কাছে যদি পুথিই ছিল তা হলে তিনি কৌশলে অন্যের হস্তাক্ষর অনুকরণ এবং কৃত্রিম উপায়ে কাগজ-কালি সৃষ্টি করবেন কেন? প্রকাশ্যে নিজের হস্তাক্ষরে একখানি পুথির লুপ্তাংশ আর-একখানি পুথি থেকে সংগ্রহ করে দেওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তাতে হস্তাক্ষরে রীতির বৈষম্য দেখা দিলেও ক্ষতি নেই ; একাধিক রীতির হস্তাক্ষর একই পুথিতে থাকা দোষের নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেই আছে। তবে বসন্তবাবু যদি মনে করেন, কাগজ-কালি-বিষয়-ভাষা সবই তৃতীয় লিপিকর কৌশলে অনুকরণ করেছেন তা হলে অবশ্য অন্য কথা। বিষয় এবং ভাষার দিক থেকে ৬০ এবং ১.৫ সংখ্যক পাতা দুটিতে এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যা বসন্তবাবুর অনুমানের পক্ষে যুক্তি হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে।

৪

৬০ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতা দুটিতে বসন্তবাবু হয়ত এমন হস্তাক্ষর দেখতে পেয়েছিলেন যা তথাকথিত প্রাচীন হস্তাক্ষর থেকে পৃথকও নয়, আবার সম্পূর্ণ একও নয়। এই জটিল পরিস্থিতি এড়াবার জন্যই হয়ত তৃতীয় লিপিকরের অস্তিত্ব এবং 'অনুকরণ' থিওরি উদ্ভাবন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু যে-যুক্তিতে লিপিকর তিনজন সেই যুক্তিতে লিপিকর চারজন হতেও বাধা নেই। পুথির ৩-১৫ পৃষ্ঠাগুলি চতুর্থ লিপিকরের লেখা বলে অনুমান করা অসংগত নয়। পুথির অন্যান্য অংশের তুলনায় এই পৃষ্ঠাগুলিতে অক্ষরের আকার ক্ষুদ্রতর এবং কোনো কোনো অক্ষরের আকারও ভিন্নতর (তুলনীয় 'দ', 'প', 'চ' ইত্যাদি অক্ষরগুলি)। তথাপি এই পৃষ্ঠাগুলি চতুর্থ লিপিকরের লেখা বলে অনুমান করছি না কেন। করছি না

এই কারণে যে, পুথির প্রতি পৃষ্ঠায় অক্ষরের পরিপূর্ণ সমতা অপ্রত্যাশিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত বিপুল পুথি দীর্ঘকাল ধরে লেখা হয়েছিল। প্রথমাংশ এবং শেষাংশের মধ্যে কালগত ব্যবধান ৬ মাস, ৮ মাস, এমন-কি এক বছর হওয়াও অসম্ভব নয়। লিপিকরের ক্লান্তি, অবসাদ, শৈথিল্য এবং অমনোযোগিতার কথা বিবেচনা করলে পুথিতে হস্তাক্ষরের কিছু পরিবর্তন, কিছু ইতরবিশেষ হওয়া একান্তই স্বাভাবিক, না-হওয়াই অস্বাভাবিক। তা ছাড়া, লিপিকর একটিমাত্র ছাঁদে বা রীতিতে লিখবেন এমন অনুমানও অসংগত। একই অক্ষর একাধিক আকারে লেখা তাঁর পক্ষে যেমন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, তেমনি একাধিক রীতিতে লেখাও অস্বাভাবিক নয়। একই শব্দের একাধিক বানান দেখে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হই না, কিন্তু একই অক্ষরের আকারভেদ দেখে লিপিকরের ভিন্নতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই। হস্তাক্ষর-রীতিতে decorative এবং cursive ভেদ আছে। একটি ধীরে ধীরে সাজিয়ে-গুছিয়ে কৃত্রিমভাবে লেখা, আর-একটি দ্রুত, জটিল এবং স্বাভাবিকভাবে লেখা। সময়, ধৈর্য এবং উদ্দেশ্য অনুসারে একই লিপিকর এই দ্বিবিধ রীতিতে লিখতে সক্ষম। সুতরাং অক্ষরের আকৃতিগত পার্থক্য বা লিখন-রীতির পার্থক্য নিশ্চিতভাবে একাধিক লিপিকরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। তা হলে কোন্ সাক্ষ্যে প্রমাণিত হবে, লিপিকর এক বা একাধিক? সমস্যা সেখানেই। সমস্যা জটিল এবং সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়ার মতো প্রমাণ সংগ্রহ করাও শক্ত। কিন্তু দুজন লিপিকরের হস্তাক্ষর সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করলে এমন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষ্য করা যায় যা নিশ্চিতভাবেই লিপিকর-বিশেষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অক্ষরের গঠনে ধরা না পড়লেও কলমের বিশেষ টানে ধরা পড়ে। া-কার, ি-কার, ু-কার প্রভৃতিতে, 'ক'-র আঁকুড়িতে, 'জ'-র বাহুতে, 'র'-র বিন্দুতে, 'ই'-র ঊর্ধ্বরেখায়, ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা শক্ত নয়। এ ছাড়া আছে, হস্তাক্ষর-রীতির সামগ্রিক রূপ, যা স্বতন্ত্রভাবে অক্ষর-বিশেষের মধ্যে নেই, শব্দ-বিশেষের মধ্যেও নেই। অক্ষরসমষ্টি এবং শব্দসমষ্টি নিয়ে হস্তাক্ষর-রীতির যে সামগ্রিক রূপ, সেই সমগ্রতার রূপ একান্তভাবেই লিপিকরের নিজস্ব।

বসন্তরঞ্জন রায় হস্তাক্ষর-রীতির এবং অক্ষরের গঠন-রীতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ না করেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে তিন প্রকার হস্তাক্ষর আবিষ্কার করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র রায় তিনজন লিপিকর সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকর তিনজন এবং একজন প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুকরণে পরবর্তীকালে পুথির দুটি পাতা লিখেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার আগে জানা চাই— ১. অক্ষরের আকারগত এবং হস্তাক্ষরের রীতিগত কোন্ পার্থক্যে লিপিকর একাধিক, ২. পার্থক্য থাকলে সে-পার্থক্য নিশ্চিতভাবে একাধিক লিপিকরের অস্তিত্ব নির্দেশ করে অথবা একই লিপিকরের মানসিক অবস্থার ভিন্নতা নির্দেশ করে, ৩. প্রাচীন হস্তাক্ষর অনুকরণের উপায় এবং উদ্দেশ্য কি? বসন্তবাবু এই প্রশ্নগুলির কথা বিবেচনা করেন নি, সেই কারণে তাঁর সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার প্রয়োজন।

৫

৬০ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতায় বসন্তবাবু তৃতীয় লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখতে পেয়েছিলেন। পাতা দুটি পরীক্ষার প্রয়োজন। পরবর্তী চিত্রে ৬০।২ পৃষ্ঠার শেষ অর্থাৎ সপ্তম ছত্রের শেষ অংশটুকুর প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। লিপি বিচার না করে কেবলমাত্র এই প্রতিলিপি দেখেই বলা যায় যে, শেষ ছত্রের শেষ কয়েকটি

অক্ষর ছাড়া ৬০।২ পৃষ্ঠার হস্তাক্ষরে এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যা প্রথম লিপিকরের পক্ষে লেখা অসম্ভব।

গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলী বরব ॥ ৪ ॥ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী ॥

সম্ভবত শেষ ছত্রের '…স বাসলীর রব (?) ॥ ৪ ॥ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী ॥' অক্ষরগুলির জন্যই তৃতীয় লিপিকরের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয়েছিল। ভূমিকায় স্পষ্ট করে না বললেও মূল গ্রন্থের পাদটীকায় বসন্তবাবু বলেছেন, 'চ-ণ্ডী-দা-স'-এর '-স' থেকে পাঁচটা 'শ্রী' পর্যন্ত পৃথক কালি এবং পৃথক হাতের লেখা। বসন্তবাবুর এই মন্তব্য সত্য কি মিথ্যা তা বিচারসাপেক্ষ এবং সে-বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এই মন্তব্য থেকে শুধু এইটুকু লক্ষ্য করতে বলি যে, ৬০।২ পৃষ্ঠার শেষ ১২টি অক্ষর পৃথক কালির এবং পৃথক হাতের হলেও গোটা পাতাটির (অর্থাৎ ৬০।১ এবং ৬০।২) কালি এবং হস্তাক্ষর যে পুথির অন্যান্য পাতা থেকে পৃথক নয় সে-কথা বসন্তবাবু নিজেও স্বীকার করেন। সুতরাং বসন্তবাবু অসাবধানে ভুল করে বলেছিলেন, 'পুথির ৬০ সংখ্যক পত্র পরবর্তী যোজনা।' আসলে বসন্তবাবুর বক্তব্য ছিল, ৬০।২ পৃষ্ঠার শেষ ১২টি অক্ষর 'পরবর্তী যোজনা'। এই ১২টি অক্ষর মূল পাঠে পরিত্যক্ত হলেও অক্ষরগুলি কে লিখেছেন এবং কেন লিখেছেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)। যিনিই লিখুন, কেবলমাত্র এই অক্ষরগুলির সাক্ষ্যে ৬০ সংখ্যক পাতা তৃতীয় লিপিকরের লেখা মনে করলে ভুল হবে। সাবধান হলে বসন্তবাবুও এ ভুল করতেন না।

৬

সংশয় জাগিয়ে না দিলে ১১৫ পাতার হস্তাক্ষরে সংশয়ের কোনো কারণ ছিল না। যেটুকু কারণ আছে সেরকম বা তার চেয়ে জোরালো কারণে আরো বহু পৃষ্ঠার হস্তাক্ষরে সংশয় প্রকাশ করতে পারি। সেগুলি বাদ দিয়ে এবং চতুর্থ বা পঞ্চম লিপিকরের অস্তিত্ব কল্পনা না করে ১১৫ সংখ্যক পাতাটিতে বসন্তবাবু কেন তৃতীয় লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখতে পেলেন তার কারণ অজ্ঞাত। সংশয়ের কারণ স্পষ্ট নয় বলে নিঃসংশয় হওয়ারও স্পষ্ট কারণ নির্দেশ করা শক্ত। যতদূর মনে হয়, পুথির এই পাতাটি হয়ত সামান্য ভিজে ছিল। ভিজে কাগজের উপর লিখলে যেরকম হয় অনেকগুলি অক্ষরের চেহারা সেরকম। আরো দু-একটি পাতায় ভিজে কাগজের উপর লেখার জন্য অক্ষরের আকারে কিছু পরিবর্তন, কিছু অপরিপক্কতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে (তুলনীয় 'বি-গু-তে', 'আ-শে-ষ' ৫০।১।৭)। এই পৃষ্ঠার কাগজ-কালি সম্পর্কে বসন্তবাবু কোনো মন্তব্য করেন নি। সুতরাং অক্ষরের আকারই তাঁকে বিভ্রান্ত করেছিল। এই পাতার হস্তাক্ষর দেখে অনুমান হয়, লিপিকর যথেষ্ট যত্ন নিয়ে লেখেন নি। decorative রীতিতে দ্রুত লেখার ফলে অক্ষরের আকারে যে বৈলক্ষণ্য ঘটে এই পৃষ্ঠায় অক্ষরের বৈলক্ষণ্য তার চেয়ে বেশি নয়। এরকম বৈলক্ষণ্য পুথির আরো বহু পাতায় লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কতকগুলি অক্ষরের বিশেষত্বও হয়ত বসন্তবাবুকে বিভ্রান্ত করেছিল। কারণ, অক্ষরের গঠন-বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীনত্ব-অর্বাচীনত্ব সম্পর্কে রাখালদাস-বাবুর নির্দেশ ছিল বসন্তবাবুর কাছে চূড়ান্ত।

রাখালদাসবাবুর সিদ্ধান্ত—'অ ও আ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই দুইটি স্বরে অক্ষরের দক্ষিণাংশের সহিত বামাংশের যোজক অর্ধবৃত্তাকৃতি।' ১১৫ পাতার অধিকাংশ 'অ' এবং 'আ'-র যোজক 'অর্ধবৃত্তাকৃতি'

নয় ; সুতরাং প্রাচীন নয়। সেই কারণে বোধহয় বসন্তবাবু এই পাতাটিকে 'পরবর্তী যোজনা' বলে মনে করেছিলেন। 'অর্ধবৃত্তাকৃতি' যোজক প্রাচীন কেন, বোঝা শক্ত। তার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় নি। তথাপি যদি ধরে নিই, অর্ধবৃত্ত যোজক প্রাচীন এবং সরল যোজক অর্বাচীন তা হলেও সমস্যার সমাধান হয় না। অর্ধবৃত্ত যোজক এবং সরল যোজক অর্থাৎ তথাকথিত প্রাচীন এবং অর্বাচীন যোজক ১১৫ পাতায় আছে এবং পুথির অধিকাংশ পাতাতেই আছে। প্রথম লিপিকর অর্ধবৃত্ত এবং সরল দ্বিবিধ প্রকার যোজকই ব্যবহার করেছেন, সংখ্যায় অবশ্য অর্ধবৃত্ত যোজকই বেশি। সুতরাং যোজকের প্রকারভেদে লিপিকরের ভিন্নতা প্রমাণ হয় না। রাখালদাসবাবুর আর-একটি সিদ্ধান্ত—'খ', 'ঘ', 'থ', 'য' প্রভৃতি অক্ষরগুলির প্রাচীনত্বের প্রমাণ, এই অক্ষরগুলির 'নিম্নভাগে কোণ নাই'। 'কোণ'-এর পবিবর্তে যে অক্ষরগুলির 'নিম্নদেশ গোলাকৃতি এবং বামভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উঠিয়া দক্ষিণভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে' সে অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং রাখালদাসবাবুর মতে 'গোলাকার' এবং 'কোণাকার' অক্ষরের প্রাচীনত্ব-অর্বাচীনত্বের প্রমাণ। এই প্রমাণও যুক্তিসহ নয়। এবং 'গোলাকার' এবং 'কোণাকার' অক্ষর শুধু ১১৫ পাতায়-ই নয়, পুথির প্রতি পৃষ্ঠায়-ই আছে। রাখালদাসবাবু এবং বসন্তবাবু পুথির অক্ষরগুলি যদি সযত্নে পরীক্ষা করতেন তা হলে অবশ্য দেখতে পেতেন যে, 'গোলাকার' এবং 'কোণাকার' অক্ষর প্রথম লিপিকরের হস্তাক্ষরের বৈশিষ্ট্য। 'কোণাকার' অক্ষরগুলি সংখ্যায় যে নগণ্য তা নয় ; তবে 'গোলাকার' অক্ষর পুথিতে দেখতে পেয়ে সকলে এমনই চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন[৬] যে 'কোণাকার' অক্ষরগুলির দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। যদি এ-কথা ঠিক হয় যে, 'অর্ধবৃত্ত' যোজক এবং 'সরল' যোজক, 'গোলাকার' এবং 'কোণাকার' নিম্নদেশই অক্ষর-বিচারে বসন্তবাবুর নিরিখ ছিল তা হলে বলব, ১১৫ পাতার অক্ষরের গঠনে এমন বিশেষত্ব নেই যার জন্য এই পাতাটিকে প্রথম লিপিকরের লেখা নয় বলে মনে করা যেতে পারে। যেহেতু রাখালদাসবাবু বলেছেন, পুথিতে তিন প্রকার হস্তাক্ষর আছে, তাই বসন্তবাবু এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য বিচার না করে পুথিতে এর প্রমাণ অনুসন্ধান করেছেন। এবং কোনোক্রমে যুক্তি-অযুক্তির কথা বিবেচনা না করে ৬০ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতা দুটিকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এবং বলবার চেষ্টা করেছেন, পাতা দুটি 'পরবর্তী যোজনা' আর এই পাতা দুটিতে যে হস্তাক্ষর দেখা যাচ্ছে তা প্রথম হস্তাক্ষরের অনুকরণ। বিস্মিত হই দেখে যে, বিশেষজ্ঞেরা বসন্তবাবুর যুক্তিতে সংশয়ও প্রকাশ করেন নি। এমন-কি, যোগেশবাবুও বসন্তবাবুর অনুসরণে বলেছেন, 'ক-হাতের কয়েকটি অক্ষর পুরাতন, খ-হাতের অক্ষর ক-হাতের অনুকরণ, গ-হাতের সমুদয় অক্ষর অপেক্ষাকৃত আধুনিক।'

---

৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ব্যঞ্জনাক্ষরে কোণশূন্যতা এক সময় বিশেষ গবেষণার বস্তু হয়ে উঠেছিল। এমন-কি, এই কোণশূন্যতা নাগরীর বৈশিষ্ট্য বলে পুথির হস্তাক্ষরে নাগরীর প্রভাবের কথাও কারো কারো মনে এসেছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু জানিয়েছিলেন, বিষ্ণুপুরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা নাগরী লিখতেন। পুথি বিষ্ণুপুরে পাওয়া গেছে এবং পুথির হস্তাক্ষরে নাগরীর প্রভাব। যোগেশচন্দ্র রায় জানালেন, 'বিষ্ণুপুরে এবং বাঁকুড়া জেলায় অনেক রাজপুতের বাস আছে, কেহ কেহ পুথী লিখিত। শুনিয়াছি, তাহাদের লিপিতে নাগরী ছাঁদ থাকিত।...বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়] ক-হাতের কয়েকটি ব্যঞ্জনাক্ষরে কোণশূন্যতা ও উ স্বরাক্ষরে শৃঙ্গহীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কোণশূন্যতা নাগরীর চিহ্ন।' (দ্র. 'চণ্ডীদাস', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২, পৃ. ২৩)। পুথির লিপির বিস্তৃত আলোচনা না হওয়ার ফলে এরকম বিভ্রান্তিকর সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। এখনও হচ্ছে। 'কোণ'-যুক্ত এবং 'কোণ'-শূন্য দুই রকম ব্যঞ্জনই যদি পুথিতে থাকে তা হলে 'কোণ'-শূন্যতাকেই এতখানি গুরুত্ব দেওয়ার সার্থকতা কি। 'কোণ'-শূন্য ব্যঞ্জন নাগরীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে, কিন্তু সেটা যে বাঙ্গালা লিপিরও বৈশিষ্ট্য নয় সে কথা কে বলেছে। অন্যান্য বাঙ্গালা পুথির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপির তুলনামূলক আলোচনা না করেই সকলে নিজের নিজের মতের অনুকূলে সমর্থন সংগ্রহ করেছেন।

৭

৬০ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতা দুটি পরীক্ষা করে নিঃসংশয় হওয়া গেছে যে এই পাতা দুটি তৃতীয় লিপিকরের লেখা বলে অনুমান করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাখালদাসবাবু যদি পুথির তিন প্রকার হস্তাক্ষরের কথা বসন্তবাবুর মাথায় ঢুকিয়ে না দিতেন তাহলে ৬০ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতা দুটিতে বসন্তবাবু তৃতীয় লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখতে পেতেন না। সুতরাং রাখালদাসবাবু এবং বসন্তবাবু অনুমিত তিন প্রকার হস্তাক্ষর দু প্রকারে এসে ঠেকছে এবং যোগেশবাবু অনুমিত তিনজন লিপিকর দুজনে এসে পৌঁচেছে। এবার অনুসন্ধান প্রয়োজন, লিপিকর দুজন বা একজন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে decorative এবং cursive এই দ্বিবিধ রীতির হস্তাক্ষর আছে। পুথির অধিকাংশই decorative রীতিতে লেখা, কুড়িটি পৃষ্ঠা cursive রীতিতে লেখা। আপাতদৃষ্টিতে এই দ্বিবিধ রীতির হস্তাক্ষর দুজন লিপিকরের, এ-অনুমান অসংগত বোধ হয় না। ধরা যাক, decorative রীতিতে একজন লিপিকর লিখেছেন, তিনিই পুথির প্রথম ও প্রধান লিপিকর। cursive রীতির হস্তাক্ষর আর-একজন লিপিকরের, ইনি পুথির দ্বিতীয় লিপিকর। এখন প্রশ্ন, এই দ্বিবিধ রীতির হস্তাক্ষর একজন লিপিকরের হওয়া সম্ভব কি না। অর্থাৎ পুথিতে আমরা একজন লিপিকরের decorative এবং cursive হস্তাক্ষর পাচ্ছি, অথবা প্রকৃতই দুজন লিপিকরের হস্তাক্ষর পাচ্ছি। হস্তাক্ষরের প্রাচীনত্ব-আধুনিকত্বের সূত্র ধরে সমস্যার মীমাংসা হবে না। কারণ পুথির দু-ভাঁজ করা অচ্ছিন্ন পাতার এ-পিঠে একপ্রকার হস্তাক্ষর, ও-পিঠে আর-এক প্রকার হস্তাক্ষর আছে। সুতরাং লিপিকর দুজন হলেও তাঁরা সমসাময়িক এবং যে-কালে প্রথম প্রকার হস্তাক্ষর চালু ছিল সে-কালে দ্বিতীয় প্রকার হস্তাক্ষরও চালু ছিল।

৮

হস্তাক্ষর বিচার ছাড়া আর-কোনো উপায়ে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় কি না অনুসন্ধান করতে গিয়ে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই তথ্যগুলি থেকে কি ইঙ্গিত পাওয়া যায় দেখা যাক।

১. 'ভা-ঠি-আ-লী' শব্দটি প্রথম লিপিকর ১৫ বার লিখেছেন। শব্দটির দুরকম বানান তাঁর জানা ছিল, 'ভা-ঠি-আ-লী' এবং 'ভা-ঠি-য়া-লী'। '-য়া-' বানানে তিনি একবার মাত্র শব্দটি লিখেছেন। দ্বিতীয় লিপিকর শব্দটি লিখিছেন মাত্র দুবার। দু বারই তিনি লিখেছেন 'ভা-ষ্টি-ঠা-লী'। যদি অনুমান করি, দ্বিতীয় লিপিকর ভুল করে 'ভা-ঠি-আ-লী-'র পরিবর্তে 'ভা-ষ্টি-ঠা-লী' লিখেছেন তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায় ভুলের পুনরাবৃত্তি হল কেন। নিয়মবিরুদ্ধ বানান পুনরাবৃত্ত হলে বুঝি, নিয়মের বিরুদ্ধতাই লিপিকরের কাছে নিয়ম। যে-লিপিকর দশবার 'পু-জা' লেখেন তিনি 'পূ-জা'-কে 'পু-জা' বানানেই জানেন। 'পূ-জা' ভুল হতে পারে তবে সে-ভুল লেখকের অসতর্কতার ভুল নয়। সেই যুক্তিতে দ্বিতীয় লিপিকরের 'ভা-ষ্টি-ঠা-লী'-কে লিপিকর-প্রমাদ বলতে পারি না। স্বীকার করতে হবে, প্রথম লিপিকর যে-শব্দটিকে 'ভা-ঠি-আ-লী' বলে জানতেন, দ্বিতীয় লিপিকর সেই শব্দটিকে 'ভা-ষ্টি-ঠা-লী' বলে জানতেন। তর্কের খাতিরে প্রশ্ন করা যেতে পারে, একই শব্দের একাধিক রূপ একই লিপিকরের জানা থাকতে পারে। 'চু-ম' এবং 'চু-ম্ব', 'ভু-ঞ্জ' এবং 'ভুঁ-জ' যদি একই লিপিকরের পক্ষে লেখা সম্ভব হয় তা হলে 'ভা-ঠি-আ-লী' এবং 'ভা-ষ্টি-ঠা-লী'-তে বাধা কি। এর উত্তরে বক্তব্য, পুথিতে আছে দ্বিবিধ রীতির হস্তাক্ষর। এক রীতিতে পাচ্ছি 'ভা-ঠি-আ-লী', আর-এক রীতিতে পাচ্ছি 'ভা-ষ্টি-ঠা-লী'।

দুই রীতির হস্তাক্ষর একই লিপিকরের হলে ১৫ বার 'ভা-ঠি-আ-লী'-র মধ্যে অন্তত একবারও 'ভা-য়ি-ঠা-লী' লেখা হতে পারত। তা হয় নি। সেই কারণে একজন লিপিকর দুরকম বানান লিখেছেন, এ-অনুমানের চেয়ে দুজন লিপিকর দুরকম বানান লিখেছেন, এ-অনুমানের পক্ষে যুক্তি বেশি।

২. বানানের অনিয়ম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও প্রথম লিপিকরের লেখা আনুমানিক ৩০০ গানের ভণিতার লাইনে বানানের কোনো অনিয়ম নেই। 'ব-ড়ু', 'চ-ণ্ডী-দা-স', 'বা-স-লী', 'শি-রে', 'ব-ন্দি-আঁ' শব্দগুলি পর্যায়ক্রমে প্রায় প্রত্যেকটি গানেই ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো একটি ক্ষেত্রেও প্রথম লিপিকর এই শব্দগুলিকে অন্য বানানে লেখেন নি। দ্বিতীয় লিপিকর ১৯টি গানের ভণিতা লিখেছেন। এই ১৯টি গানের ভণিতায় লেখা হয়েছে, ৬ বার 'ব-ড়ূ', ১ বার 'বা-স-লি', ১ বার 'বা-শ-লী', ২ বার 'চ-ণ্ডি-দা-স', ১ বার 'সি-রে', ২ বার 'ব-ন্দি-এাঁ' ('ব-ন্দি-আঁ' একবারও নেই)। প্রথম লিপিকর 'ব-ড়ূ', 'চ-ণ্ডি-দা-স', 'বা-স-লি', 'বা-শ-লী', 'সি-রে', 'ব-ন্দি-এাঁ' জানতেন, এমন প্রমাণ পুথিতে নেই।

অনিয়মের মধ্যে যে নিয়ম সে-নিয়মের জোর বেশি। ৩০০ ভণিতায় প্রথম লিপিকর 'ব-ড়ু', 'চ-ণ্ডী-দা-স', 'বা-স-লী' প্রভৃতি শব্দগুলি লিখেছেন, একবারও মনোযোগের শিথিলতায় বানানের নিয়মভঙ্গ হয় নি। সমগ্র পুথিতে বানানের সর্বব্যাপী স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি শব্দের বানানে নিয়মরক্ষা হয়েছে বলে অনুমান করতে পারি, শব্দগুলির বানান প্রথম লিপিকরের কাছে তাঁর নিজের নামের বানানের মতো ছিল। দ্বিতীয় লিপিকর ১৯টি ভণিতায় ১৩ বার নিয়মভঙ্গ করেছেন। তাঁর কাছে 'ব-ড়ু' এবং 'ব-ড়ূ', 'চ-ণ্ডি-দা-স' এবং 'চ-ণ্ডী-দা-স' অভিন্ন। এক রীতির হস্তাক্ষরে বিশেষ কয়েকটি শব্দের বানানে নিয়মের এরকম আনুগত্য, অন্য রীতির হস্তাক্ষরে ঠিক সেই বিশেষ শব্দগুলির বানানে নিয়মের এরকম শৈথিল্য দেখে অনুমান করতে পারি, এই দুই রীতির হস্তাক্ষর সম্ভবত একজন লিপিকরের নয়।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অসমাপিকা ক্রিয়া দুই প্রকার— ১. -আঁ / -ইআঁ (যেমন, 'ল-আঁ', 'থাক-ইআঁ') ২. -এাঁ / -ইএাঁ (যেমন, 'দি-এাঁ', 'যাগ-ইএাঁ')। এই দ্বিবিধ প্রকার অসমাপিকার ব্যবহার দেখে যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেছিলেন, এক গীতরসিক 'দুই গায়নের পুথী পাইয়াছিলেন। একটি আঁ, অপরটি এাঁ। আঁ পুথী বৃহৎ। ইহাতে বংশীখণ্ড পর্যন্ত ছিল। এাঁ পুথী ছোট, কেবল বিরহ খণ্ড ছিল।' যোগেশ-বাবুর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে '-আঁ' এবং '-এাঁ'-র পার্থক্য ধরা পড়েছিল। কিন্তু পার্থক্যের যে-কারণ তিনি নির্দেশ করেছিলেন তা সংশয়রহিত ছিল না। অনুসন্ধান করলে যোগেশবাবু দেখতে পেতেন বিরহখণ্ডে '-আঁ' এবং '-এাঁ' দুইই আছে। একটি দুটি জায়গায় নেই যে, লিপিকর-প্রমাদ বলে সেগুলিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু এক দিক থেকে যোগেশবাবুর অনুমানে কিছু সমর্থন ছিল। বংশী-বিরহ-খণ্ডের পূর্ববর্তী কোনো খণ্ডে '-এাঁ' অসমাপিকার ব্যবহার নেই। যোগেশবাবুর কাছে ছাপা বই-এর পরিবর্তে পুথি থাকলে তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করতে পারতেন যে, '-এাঁ' অসমাপিকার ব্যবহার কেবলমাত্র দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা পৃষ্ঠাগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। পুথিতে ৭৮টি '-এাঁ' অসমাপিকা, সব কটিই লিখেছেন দ্বিতীয় লিপিকর। প্রথম লিপিকর কতগুলি '-আঁ' অসমাপিকা লিখেছেন তার সংখ্যা নির্দেশ করা শক্ত। প্রথম লিপিকরের লেখা অসংখ্য '-আঁ' অসমাপিকার মধ্যে একবারও '-এাঁ' ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পুথিতে আছে '-আঁ' অসমাপিকা এবং 'এাঁ' অসমাপিকা। একটি পাওয়া যাচ্ছে কেবলমাত্র প্রথম রীতির হস্তাক্ষরে, আর-একটি পাওয়া যাচ্ছে দ্বিতীয় রীতির হস্তাক্ষরে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো অযৌক্তিক নয় যে, প্রথম ও

দ্বিতীয় রীতির হস্তাক্ষর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিকরের। প্রথম লিপিকর '-এঁ'া' অসমাপিকা এবং দ্বিতীয় লিপিকর '-আঁ' অপমাপিকার ব্যবহার জানতেন এমন প্রমাণ পুথিতে নেই। সুতরাং একাধিক লিপিকরের নিঃসংশয় প্রমাণ, '-আঁ' এবং '-এঁ'া' অসমাপিকা। যে-লিপিকর গোটা পুথির সর্বত্র '-আঁ' লিখেছেন সেই একই লিপিকর হস্তাক্ষর-রীতি পরিবর্তন করে ২০টি পৃষ্ঠায় '-এঁ'া' লিখেছেন, এ অনুমান অযৌক্তিক।

উপরের তথ্য এবং যুক্তির সাক্ষ্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকর দুজন। একজন পুথির অধিকাংশ লিখেছেন, আর-একজন লিখেছেন শেষের দিকের মাত্র কুড়িটি পৃষ্ঠা। প্রথম লিপিকর decorative রীতিতে লিখেছেন। তিনি যখন ধীরে ধীরে যত্ন নিয়ে লিখেছেন তখন অক্ষরের গঠনে সুষমা সামঞ্জস্য এসেছে। ক্লান্তি অবসাদের জন্য যখন তিনি দ্রুত লিখেছেন তখন অক্ষরে বাঁধুনি শিথিল হয়েছে। decorative রীতির বৈশিষ্ট্যই এই, ধীরে ধীরে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখলে লেখায় শ্রী ফোটে, দ্রুত লিখলে অপরিপক্ব দেখায়। পুথির কোনো কোনো পাতার অক্ষরে এই ত্রস্ততাজনিত অপরিপক্বতা আছে। দ্বিতীয় লিপিকর টানা লেখেন এবং দ্রুত লেখেন। তাঁর লেখায় 'ব' 'র' 'ধ' 'য' 'থ' 'খ' প্রভৃতি অক্ষরগুলি সূক্ষ্ম কোণ -বিশিষ্ট। প্রথম লিপিকরের লেখায় এই অক্ষরগুলিতে কখনো 'কোণ' কখনো 'অর্ধবৃত্ত'। এরকম সূক্ষ্ম পার্থক্য আরো অনেক থাকলেও[৭] প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিকরের হস্তাক্ষরে রীতিগত পার্থক্য ছাড়া অক্ষর-গঠনে গুরুতর পার্থক্য নেই। সুতরাং প্রথম লিপিকর যে দ্বিতীয় লিপিকরের সমসাময়িক সে কথা লিপির সাক্ষ্যেও সমর্থিত।

পরিশিষ্ট ১

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির দু-রীতির হস্তাক্ষর দুজন লিপিকরের একথা স্বীকার করলে এ-সম্পর্কে আর-একটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রশ্নটি এই, প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিকর যদি একই মূল থেকে বর্তমান পুথির পাঠ সংগ্রহ করে থাকেন তা হলে একজনের লেখায় '-আঁ' অসমাপিকা, অন্যজনের লেখায় '-এঁ'া' অসমাপিকার ব্যবহার সম্ভব হল কি করে। এ-প্রশ্নের দুটি উত্তর হতে পারে— ১. -আঁ / -এঁ'া পার্থক্য মূল পুথিতে ছিল, লিপিকরেরা '-আঁ-'র জায়গায় '-আঁ', '-এঁ'া'-র জায়গায় '-এঁ'া' লিখেছেন। ২. -আঁ / -এঁ'া পার্থক্য লিপিকরদের সৃষ্টি, মূল পুথিতে এ-পার্থক্য ছিল না। উত্তর দুটি বিচার করা প্রয়োজন। যদি অনুমান করি মূল পুথিতে '-আঁ' এবং '-এঁ'া' দুইই ছিল তা হলে প্রশ্ন, সমগ্র পুথিতে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত না হয়ে -আঁ / -এঁ'া পুথির অংশ-বিশেষে এবং লিপিকর-বিশেষের লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন। আবার, যদি অনুমান করি পুথিতে কেবলমাত্র '-আঁ' ছিল এবং দ্বিতীয় লিপিকর '-আঁ' পরিবর্তন করে '-এঁ'া' লিখেছেন তা হলে বিশ্বাস করতে হয়, ৭৮টি জায়গায় মূল পুথির '-আঁ' বর্তমান পুথিতে '-এঁ'া' হয়েছে। একথাও বিশ্বাস করতে হয় যে, দ্বিতীয় লিপিকর এত সতর্ক যে, ভুল করেও তিনি একবারও মূল পুথির '-আঁ' বর্তমান পুথিতে লেখেন নি।

---

৭ দ্বিতীয় লিপিকরের আর-একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। তিনি পুথির পৃষ্ঠা-সংখ্যা লিখবার আগে 'শ্রীঃ' লিখেছেন। দ্রষ্টব্য, 'শ্রীঃ। ২০৪', 'শ্রী ২০১', 'শ্রী ২০৬', 'শ্রী ২১২', 'শ্রী ২১৮', 'শ্রী ২১৯', 'শ্রী ২২০', 'শ্রী ২২১'। '১৭৬' এবং '২১৭' সংখ্যক পাতা দুটি দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা হলেও পৃষ্ঠা-সংখ্যার আগে 'শ্রী' লেখা হয় নি। '১৭৬' সংখ্যাটি দ্বিতীয় লিপিকরেরই লেখা তবে হয়ত 'শ্রী' লিখতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। '২১৭' পৃষ্ঠা-সংখ্যাটি প্রথম লিপিকরের লেখা, যদিও এই পাতার গানগুলি দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা।

এরকম সতর্কতা বিশেষ করে দ্বিতীয় লিপিকরের পক্ষে সম্ভব কি না সন্দেহ। দ্বিতীয় লিপিকর যে-কয়েকটি গান লিখেছেন তাতে এত কাটা-ছাঁটা-সংশোধন রয়েছে যে মনে হয় সতর্কতার চেয়ে অসতর্কতাই দ্বিতীয় লিপিকরের বিশেষত্ব। বংশীখণ্ডের দুটি গানের ভগ্নাংশ ছাড়া দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা বাকি গানগুলি রাধাবিরহের। এই গানগুলির '-ঞাঁ' যদি দ্বিতীয় লিপিকরের দ্বারা পরিবর্তিত না হয়ে থাকে তা হলে অনুমান করতে হয় দ্বিতীয় লিপিকরের মূল পুথি প্রথম লিপিকরের মূল পুথি থেকে পৃথক এবং যোগেশবাবুর অনুমানের সমর্থনে বলতে হয়, দ্বিতীয় লিপিকরের কাছে যে পুথি ছিল তাতে বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ ছিল। '-ঞাঁ' অসমাপিকা এই পুথি থেকে এসেছে। রাধাবিরহের সব কটি গানই দ্বিতীয় লিপিকরের পুথি থেকে আসে নি। যে গানগুলি প্রথম লিপিকরের মূল পুথিতে ছিল না শুধু সেই কটিই দ্বিতীয় লিপিকর তাঁর নিজের হাতে নিজের পুথি থেকে লিখে দিয়েছেন। এরকম কোনো একটা কারণ না থাকলে দ্বিতীয় লিপিকর হঠাৎ কুড়িটি পৃষ্ঠা লিখতে গেলেন কেন তার সদুত্তর পাওয়া যায় না। প্রথম লিপিকর গোটা পুথিখানি অপরের সাহায্য ছাড়া লিখতে পারলেন, তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হল একেবারে পুথি লেখা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন, এটা খুবই বিসদৃশ। সুতরাং প্রথম লিপিকরের ক্লান্তি দূর করবার জন্য দ্বিতীয় লিপিকর এই কুড়িটি পৃষ্ঠা লেখেন নি। এই কুড়ি পৃষ্ঠার গানগুলি সম্ভবত দ্বিতীয় লিপিকরেরই জানা ছিল। এই অনুমান ঠিক হলে, মূল পাঠে পরিত্যক্ত 'কিসক পাতসি রাধা ডোম্ব চাণ্ডালী' লাইনটির উৎস জানতে পারি। এই ছত্রটির উৎস অজ্ঞাত। পুথিতে ভুল করে আগের লাইন দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে, পরের লাইন আগে লেখা হয়েছে। এ জাতীয় সব ভুলের সংশোধনও হয়েছে, লিপিকরের নিজের হাতে অথবা সংশোধকদের হাতে। কিন্তু 'কিসক পাতসি রাধা ডোম্ব চাণ্ডালী' লাইনটি মূল পাঠে কোথাও নেই। দ্বিতীয় লিপিকর লাইনটি লিখেছিলেন, পরে তিনি নিজে বা অন্য কেউ লাইনটি কেটে দিয়েছেন। দ্বিতীয় লিপিকর এই লাইনটি কোথা থেকে পেলেন ? অবশ্যই তিনি নিজে রচনা করেন নি। লাইনটির উৎস হয়ত দ্বিতীয় লিপিকরের পুথি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্তমান পুথিতেই একাধিক পুথির মিশ্রণ ঘটেছে কিনা নিশ্চয় করে বলা না গেলেও বর্তমান পুথির মূল বা তার মূল পুথিতে এরকম মিশ্রণ যে হয়েছিল -আঁ / -ঞাঁ পার্থক্যই তার প্রমাণ।

পরিশিষ্ট ২

পুথির ৬০।২ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে কি ঘটেছে তা অনুমানের বিষয়। এখানে ৬০।২ পৃষ্ঠার শেষ লাইনের শেষ অংশটুকুর এবং ৬১।১ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনের প্রথম অংশটুকুর প্রতিলিপি দেওয়া হল।

গাইলবডুচণ্ডীদাসবাসলীররব ।। ৪ ।। শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী ॥

সবাসলীরব ।৪

প্রতিলিপি দেখে মনে হয়, 'গাইল বডু চণ্ডীদা-স বা-স-লী-র র-ব (?)' লাইনটির শেষ সাতটি অক্ষর [অর্থাৎ '-স বা-স-লী-র র-ব (?)]' লাইনটির অন্য অক্ষর থেকে পৃথক। পার্থক্য অবশ্য কালির যতটা অক্ষরের ততটা নয়। কালির পার্থক্য নানা কারণে ঘটতে পারে। 'চণ্ডীদা-' পর্যন্ত লেখা হওয়ার পর অন্য দোয়াতের

কালি হয়ত ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সে-কালিতে লিখে দেখা গেল কালি আশানুরূপ ঘন নয়। সুতরাং পার্থক্য যদি শুধু কালির-ই হয় তা হলে সে-পার্থক্য গুরুতর নয়। অক্ষরের আকারে পার্থক্য আছে কি না তা বসন্তবাবুর মতো নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। তবে হস্তাক্ষরে যদি কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে তা হলে তা শেষ তিনটি অক্ষরে। প্রথম চারটি অক্ষর '-স বা-স-লী' প্রথম লিপিকরের লেখা নয় বলবার পক্ষে প্রবল যুক্তি নেই। এইটুকু বলা যায় অক্ষর কটি হয়ত ভিন্ন সময়ে লেখা। 'গা-ই-ল ব-ড়ু চ-ণ্ডী-দা-' যে-সময়ে লেখা সেই একই সময়ে '-স বা-স-লী' লেখা নয়। সুতরাং সাতটি অক্ষরের প্রথম চারটিতে সংশয় থাকলেও গুরুতর সংশয় নেই, যেমন আছে শেষ তিনটি অক্ষরে। ছবি দেখে যতটুকু অনুমান করতে পারি তাতে মনে হয়, শেষ অক্ষর তিনটি 'র', 'র', এবং 'ব'। এই 'র' এবং 'ব' অক্ষর দুটির আকারে কিছু অভিনবত্ব আছে। 'র' অক্ষরটির নিম্নদেশে একটি সূক্ষ্ম বাঁক আছে, 'ব' অক্ষরে সে-বাঁক নেই। 'ব' অক্ষরের বাঁ এবং ডান অংশের সংযোগে একটি 'লুপ' আছে। তা ছাড়া 'ব' এবং 'র' অক্ষর দুটির উৎপত্তি একেবারে মাত্রারেখা থেকে এবং অক্ষর দুটির বাঁ অংশ ঠিক অর্ধবৃত্তাকার নয়, উপরের দিকটা একটু চাপা। পুথির এই পাতার অন্যান্য 'ব' এবং 'র'-র সঙ্গে এই তিনটি অক্ষর তুলনা করলে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য।

র ব

র ব

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, '-স বা-স-লী-র র-ব (?)' এই সাতটি অক্ষরের মধ্যে 'র' এবং 'ব' অক্ষর দুটির আকার কিছু পৃথক। এবং সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে পুথিতে 'র' এবং 'ব' অক্ষরের একাধিক আকার-ভেদ ছিল। 'র' এবং 'ব' অক্ষরের সব আকার-ভেদের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে বলা সম্ভব নয়, প্রথম লিপিকর এরকম 'র' এবং 'ব' অন্যত্র লেখেন নি। সুতরাং পুথির লিপি এবং হস্তাক্ষর বিস্তৃতভাবে আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত এ-সম্পর্কে যা-ই বলা হবে তা আনুমানিক। তবে অক্ষরের আকার ছাড়া লাইনটিতে সন্দেহ প্রকাশ করার অন্য কারণও আছে। 'বাসলীর রব (?)' পাঠ পুথিতে আছে বটে, কিন্তু এ পাঠ অর্থহীন। 'বাসলীর বর' এই পাঠ যদি অনুমান করি তা হলে অর্থ-সংগতি রক্ষা হয় এবং পুথির অন্যান্য ভণিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। 'বাসলীর বর' পাঠ অনুমান করলেও সব সংশয় দূর হয় না। 'বাসলীর বর' ভণিতা পুথির অন্যত্র পাওয়া যায় নি। পুথির অন্যত্র আছে 'বাসলী বর' বা 'বাসলী বরে'। সুতরাং নানা কারণে এই লাইনের শেষ অক্ষরগুলি সন্দেহজনক। এই লাইনটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য— ১. লাইনটি লেখা হওয়ার পরও যে ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে পরবর্তী গানটি লিখতে শুরু না করে পাঁচটি 'শ্রী' লেখা হল কেন, ২. পৃথক কালিতে লেখা অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ৬১।১ পৃষ্ঠার শুরুতে '-স বা-স-লী বর' নূতন করে লেখা হল কেন, ৩. 'বা-স-লী-র রব' যদি ভুল করে লেখা হয়ে থাকে তা হলে ভুলের সংশোধন করা হল না কেন। সুতরাং পুথির এই জায়গায় ঠিক কি ঘটেছে নিশ্চিতভাবে তা বলা শক্ত। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় পুথির পাঠ-সংশোধকেরাও পৃথক কালিতে লেখা অতিরিক্ত অক্ষরগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে অক্ষরগুলির উপর কোনোরকম সংশোধন করেন নি। তবে এই অতিরিক্ত অক্ষরগুলি প্রথম লিপিকরের লেখা নয় বলে অনুমান করলে অন্যায় হয় না।

পরিশিষ্ট ৩

দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা গানগুলির তালিকা এখানে দেওয়া হল। বন্ধনীর মধ্যে যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর চতুর্থ সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা। এই গানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখা দরকার যে, এর মধ্যে আর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি না যা প্রথম লিপিকরের লেখা গানে নেই।

বংশীখণ্ড— 'কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে।' (১২১)

এই গানটির প্রথম দুটি লাইন (লাইন অর্থে এখানে মুদ্রিত পাঠের লাইন, পুথির লাইন নয়।) এবং তৃতীয় লাইনের 'বাঁশী না-' পর্যন্ত প্রথম লিপিকরের লেখা, অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় লিপিকরের।

'অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাবন।' (১২১)

প্রথম পাঁচটি লাইন এবং ষষ্ঠ লাইনের 'কালী প-' পর্যন্ত দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা।

রাধাবিরহ— 'নিকট না আইস লোক বুলিব আবোল।' (১৪১)

প্রথম লাইনটি বাদে সবটাই দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা।

'গুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন।' (১৪১)

'আহোনিশি যোগ ধেআই।' (১৪১-৪২)

'আতি দুখিণী বালী ল।' (১৪২)

'রঘুবংশ পরধান।' (১৪২-৪৩)

'নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।' (১৪৩)

'আতি বিরহে অন্ন না খাইলোঁ' (১৪৩)

'আছে কাহ্নাঞি॥ আছিলোঁ' (১৪৪)

প্রথম লাইন এবং দ্বিতীয় লাইনের প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা।

'নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।' (১৪৭)

'যখন কাহ্নাঞি তোরে পাঠাইলে পানে।' (১৪৭)

'শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে।' (১৪৭)

প্রথম দুটি লাইন দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা।

'আল রাধা শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা' (১৫০)

চতুর্থ পদ থেকে দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা।

'ভুজ যুগে ধরি কাহ্নে।' (১৫১)

'এহে রতিসুখ ভুঞ্জিঞাঁ রাধা গোআলিনী' (১৫১)

'পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে' (১৫১-৫২)

'এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে' (১৫২)

'এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞি ল' (১৫২)

'প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি' (১৫২-৫৩)

'তার সুভদিন ভৈল সেসি পুনমন্তী।' (১৫৩)
'চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার তীতে।' (১৫৩)
'হেন রাধিকার বচনে।' (১৫৩)
'হরি হরি আয়াসেঁ কাহ্নের উরে' (১৫৪)
'চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে।' (১৫৪)

ধ্রুবপদ পর্যন্ত দ্বিতীয় লিপিকরের লেখা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হল। বঙ্গদর্শন বাঙালির কাছে কী সম্পদ বহন করে এনেছিল, তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই বর্ণনার দুটো দিক আছে। *একটি* তাঁর বালকচিত্তে বঙ্গদর্শনের রসবর্ষণের স্নিগ্ধ অনুভূতি ; অপরটি তাঁর পরিণত বয়সের ইতিহাস-চিন্তা। রবীন্দ্রনাথের তখন এগারো বছর বয়স। সেই বয়সে স্বভাবতই কল্পনা এবং কাহিনীর আকর্ষণেই বালকচিত্ত বঙ্গদর্শনের প্রতীক্ষায় থাকত।

> 'অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পরে মাস, কামনা করিয়া অপেক্ষা করিয়া অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া— তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।'

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের প্রথম আবির্ভাবের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এই পত্রিকার গুণাগুণ বিচার ছিল না, কিন্তু বর্ষার প্রথম মেঘাসমাগম পৃথিবীর আবহাওয়াতেই যেমন একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে, এই পত্রিকার রসের ধারাও তেমনি অনির্বচনীয় একটি মানসিক পরিবর্তন এনেছিল বাঙালির মনে, তারই ইঙ্গিত ছিল এতে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। তাতেও বঙ্গদর্শনের পূর্বে এবং পরের বাংলা সাহিত্যের তুলনা করে এই পত্রিকাটির অমিত প্রভাবের উল্লেখ করেছেন।

এর পরেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গেই সশ্রদ্ধ স্মৃতি-মন্থন করেছেন। এই পত্রিকাটি বাংলা-দেশের আধুনিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে যে কী শস্য ফলিয়ে তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ পরিণততর বিচারে বালক-কাল থেকে পরবর্তী সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই তা উপলব্ধি করেছেন। বাঙালির আধুনিক সংস্কৃতির স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এ-জাতির চিৎপ্রকর্ষ কী ভাবে গড়ে উঠল তা স্বচক্ষেই দেখেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন আমাদের মনের জগতে কতখানি গুরুত্বমণ্ডিত ভূমিকা পালন করেছিল, রবীন্দ্রনাথের সেটা স্বীকার করে নিতে কোনোই দ্বিধা ছিল না। তিনি বললেন—

> 'তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরসভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে

বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো।'[১]

এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বাংলাভাষার সাহায্যে আধুনিক বিদ্যা বিতরণের প্রয়োজনীয়তা-প্রসঙ্গে। কিন্তু এরই মধ্যে বঙ্গদর্শনের স্মরণীয় দানের অনেকগুলি ইঙ্গিতই আভাসিত হয়েছে। গদ্যভাষার পূর্ণতা, য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে স্বদেশের অঙ্গীভূত করে তোলবার দুরূহ একক দায়িত্ব, স্বদেশীয় চেতনার নব উদ্‌বোধন, সৃষ্টিমূলক রসসাহিত্যের আদর্শ-গঠন এবং যুক্তিবোধ— এ-সবই বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যে বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব প্রকৃতিতে পরিণত হল। বঙ্গদর্শনের এই অম্লান মহিমা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এতই অবিচল ছিল যে এরই শ্রদ্ধাপূর্ণ পুনরুল্লেখ করেছেন তাঁর বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থেও।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদর্শন-প্রকাশের পরে একে একে আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্যপত্র দেখা দিয়েছে। 'ভারতী' 'হিতবাদী' 'প্রবাসী' 'সবুজপত্র' 'পরিচয়' 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাংলা সাহিত্যের পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে, কিন্তু বঙ্গদর্শনের একটি নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় ছিল যা একান্তভাবেই তার। কোনো পত্রিকাই বোধ হয় জাতীয় সংস্কৃতির গঠনমূলক কাজে এমনভাবে ব্যাপৃত হয় নি। বঙ্গদর্শন তো শুধু সাহিত্যচর্চার আশ্রয় ছিল না, সে আরো বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল এবং সেকাজ সে সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছিল। বঙ্গদর্শনের তিনটি পর্যায় ছিল— বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত প্রথম পর্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত দ্বিতীয় পর্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত তৃতীয় পর্যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন এই পত্রিকার পুনরুজ্জীবন ঘটালেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয় জীবন তখন অগ্রসর, অতএব পত্রিকার প্রকৃতিও পরিবর্তিত। সেই পরবর্তী জীবনলীলার উপযুক্ত রঙ্গভূমি রচনা করেছিল প্রথম পর্যায়; আজ সে কথা বিশেষভাবেই স্মরণ করি।

বঙ্গদর্শনের আগেও বাংলায় কয়েকটি স্মরণীয় পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। রামমোহন রায়ের সম্বাদ-কৌমুদী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ-সংগ্রহ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ— এই পত্রিকাগুলি বাংলা গদ্যভাষা সৃষ্টির প্রথম যুগে নানা বিষয়ের আলোচনা দ্বারা ইতিহাসে স্থান নিয়েছে। কিন্তু কোনো পত্রিকাই সম্ভবত সর্বব্যাপী চিত্তজাগরণের কার্যে এমন ভাবে নিযুক্ত হয় নি। বঙ্গদর্শন পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ত্বকে তুলে ধরেছিল, তার পূর্বে যে চিন্তাগত বিচ্ছিন্নতা ছিল এবং ভাবগত অপূর্ণতা ছিল বঙ্গদর্শন তাকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে দিল। তারই থেকে গড়ে উঠল আধুনিক জীবনমূল্যবোধ। বিবিধার্থ-সংগ্রহ নানা বিচিত্র বিষয়ের সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু কোনো পরিপূর্ণ উপলব্ধি নিয়ে আসে নি অর্থাৎ সে-পত্রিকা থেকে কোনো গঠনমূলক আদর্শ তৈরি হয়ে ওঠে নি। তত্ত্ববোধিনী গভীর ধর্ম-বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তাতে সমাজ-সচেতন একটি ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিও আনতে চেয়েছিলেন, তৎসত্ত্বেও তত্ত্ববোধিনী আমাদের জাতীয় মানসের সমগ্র রূপটিকে বরণ করে নেয় নি। সোমপ্রকাশ জ্ঞানের বিভিন্ন দিককে এমন করে কর্ষণ করে নি যার থেকে বাঙালি জীবন ও সমাজ কোনো স্থায়ী সম্পদ আহরণ করে নিতে পেরেছে। বঙ্গদর্শন একটি অসামান্য দীপ্ত প্রতিভাকে আশ্রয় করে সারা বাংলাভাষা ও সাহিত্যে আলো বিচ্ছুরিত করেছে। সে-আলো অন্ধ বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করল, আর বিশ্বব্যাপ্ত প্রাকৃতিক সত্যের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করল, ব্যক্তিচেতনাকে সার্বভৌম নীতি-নিয়মে অবহিত করে তুলল। বস্তুত বঙ্গদর্শনকে দেখতে হবে উনিশ শতকে বাংলা ও বাঙালির নবজাগরণের পটভূমিতেই।

---

১ 'ছাত্রসম্ভাষণ' ১৩৪৩। 'শিক্ষা'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদর্শন কোনো একক আকস্মিক আবির্ভাব নয়। বঙ্গদর্শন বাঙালির দর্শন-অভিলাষকে প্রতিফলিত করেছে। রামমোহন থেকে শুরু হয়েছিল যুক্তিবাদের যাত্রা, অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর থেকে শুরু হয়েছিল গদ্যভাষাবাহন গড়ে তুলবার প্রয়াস, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনীর পুনর্বর্ণনায় এবং প্যারীচাঁদের উপন্যাস-কল্প রচনায় শুরু হয়েছিল রস-সাহিত্যসৃষ্টির আয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে সেই-সব বিচিত্র প্রবাহ একটি পূর্ণ সিদ্ধিতে এসে পৌঁছল।

দীর্ঘকাল বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির নবপ্রাণস্পন্দনের নীরব দর্শক হয়েই ছিলেন। তিনখানি উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে। কিন্তু তাঁর চিন্তা-ভাবনার আর-কোনো পরিচয় পাই না।[২] ইংরেজিতে লেখা চারটি প্রবন্ধ তিনি ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছিলেন— On the Origin of Hindu festivals (Transactions of the Social Science Association, January 1869), A Popular Literature of Bengal (Transactions of the Social Science Association, 28 February 1870), Bengali Literature (Calcutta Review 1871, No. 104) এবং Buddhism and the Sankhya Philosophy (Calcutta Review, 1871, No. 106) বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের এবং অন্যান্যের যে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, বঙ্কিমের এই চারটি লেখাতেই তার সূচনা। এদের মধ্যে আবার পপুলার লিটারেচর প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় পত্রসূচনা নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম পত্রিকা প্রকাশের যে-সব উদ্দেশ্য বিবৃত করেছিলেন তার অনেক কথাই ছিল ওই ইংরেজি প্রবন্ধে। লোকপ্রিয় সাহিত্য বলতে তিনি বাংলা সাহিত্যকেই বুঝিয়েছেন। বাঙালি প্রাচীনকালে সংস্কৃত চর্চা করেছে, আধুনিক কালে তার ইংরেজির দিকেই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ইংরেজির ভাণ্ডার থেকেই বিদ্যাকে আহরণ করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে এখনো ইংরেজি জানে না। এই সাধারণ বাংলাভাষীদের জন্য সাহিত্য চাই—

> It is only through the Bengali that the people can be moved. We preach in English and harangue in English and write in English, perfectly forgetful that the great masses, whom it is absolutely necessary to move in order to carry out any great project of social reform, remain stone-deaf to all our eloquences. To me it seems that a single great idea, communicated to the people of Bengal in their own language, circulated among them in the language that alone touches their hearts, vivifying and permeating the conceptions of all ranks, will work out grander results than all our English speeches and preachings will ever be able to achieve.

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল যে উদ্দেশ্য, দেখা যাচ্ছে দু-বছর

২ ব্রজমোহন মল্লিক বলেছেন, 'বঙ্কিমবাবু তখন সবেমাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে এডুকেশন গেজেটে লিখিতেন।' —বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১৩৭৩, পৃ. ১৯৭। বঙ্কিমচন্দ্রের এই লেখাগুলি নির্ণয় করা যায় নি। নির্ণয় করতে পারলে একটি স্মরণীয় কাজ হবে সন্দেহ নেই।

আগেই তাঁর মনে সেই চিন্তা দেখা দিয়েছে। হয়তো তখনো এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্বয়ং পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবেন নি, কিন্তু তরুণ বঙ্কিম আকণ্ঠ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেও সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। এই শিক্ষার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু উৎকণ্ঠিত ছিলেন শিক্ষাকে কেমন করে বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি চাকরিতে ঢুকলেন বটে, কিন্তু বৃহত্তর এবং মহত্তর চিন্তায় তিনি মগ্ন। আধুনিক বিদ্যাকে দেশে সার্থক করে তুলতে হবে, শুধু তাঁর মতো কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে থাকলেই সমাজের রূপান্তর ঘটে না। এই শিক্ষাকে সমাজের সর্বদেহে রক্তের সঙ্গে সঞ্চারিত করে দিতে হবে। 'শিক্ষা' অর্থে তো কেবল তথ্য সঞ্চয় বোঝায় না, শিক্ষা একটা দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশস্ত উদার মানবিক যুক্তিবাদী এবং সহৃদয় চেতনার অধিকারী হওয়াই শিক্ষা। যারা ইংরেজি ভাষা জানে না, তাদের ক্ষেত্রে কী নবজাগরণের নির্দেশ ব্যর্থ হবে? বঙ্কিমচন্দ্র এই চিন্তাতেই পীড়িত হচ্ছিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র যখন সরকারি কর্ম উপলক্ষে বহরমপুরে তখন তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখার্জির আমন্ত্রণ পান মুখার্জিস ম্যাগাজিনে লেখা দেবার জন্য। তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র জানালেন তিনি নিজেই একটি বাংলা পত্রিকার পরিকল্পনা করেছেন 'with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and uneducated classes।' এই পত্র ১৪ই মার্চ ১৮৭২ সালে লেখা। ঠিক একমাস পর বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। তার 'পত্রসূচনা'তেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দীর্ঘপোষিত প্রত্যাশাকে ব্যক্ত করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের যে প্রণালী অনুসরণ করেছে, তিনি তার সমালোচনা করলেন। 'শিক্ষা জল বা দুগ্ধ নহে' যে সে-বস্তু গড়িয়ে আসবে। এভাবে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয় মাত্র, যারা বিদ্যার রহস্যটুকু করতলগত রেখে দেশের বৃহৎ জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে। বঙ্কিমচন্দ্র অন্য একটি প্রবন্ধে বলেছেন, এরাই আধুনিক-কালের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক শিক্ষার ফলকে বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ করে বাঙালির সর্বজনলভ্য সম্পদে পরিণত করতে চাইলেন। তার নাম দিলেন বঙ্গদর্শন।

শুধু শ্রুতিসুখকর করবার জন্য এই নাম নয়। এই নামের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বঙ্কিমের বহু দিবসের ধ্যান ও চিন্তা। বঙ্গদর্শন শুধু যে ভবিষ্যৎ বাঙালির আত্মানুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরিণত হবে তা নয়, বঙ্গদর্শন অতীত বাঙালির ভাবনা ও চিন্তাকে উপস্থাপিত করবে। নিকট অতীতেও যারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের মর্মকোষের সন্ধান প্রথম পেয়েছিল, সেই নব্যবঙ্গ জাতির ভাবনাতেই প্রায় একই ধরনের নাম দিয়ে ইংরেজি-বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেছিল 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। তাতেও তারা বাঙালি সমাজ গঠন ও সংস্কারের স্বপ্ন নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছিল। বেঙ্গল স্পেকটেটর (১৮৪২) এবং বঙ্গদর্শন— নাম দুটির মিল সহজেই চোখে পড়ে। তবু বেঙ্গল স্পেকটেটরে কোনো একক প্রতিভার আধিপত্য ছিল না। তা ছাড়া এ পত্রিকা যতখানি সমালোচনা করেছে, ততখানি গঠনমূলক আলোচনা করে নি। জ্ঞানের বিভিন্ন দিককে উন্মোচিত করে মানুষকে চিন্তা করতে শেখানো বেঙ্গল স্পেকটেটরের উদ্দেশ্য ছিল না যদিও সমাজসংস্কারমূলক আলোচনা দিয়ে এই পত্রিকাটি নব্য-দলের মুখপত্র হয়ে উঠতে পেরেছিল। বঙ্গদর্শনের লেখায় সাময়িক বিষয়ের অবতারণা খুব কম। বঙ্গদর্শন বাঙালিকে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে না দিয়ে স্থিরভাবে স্থায়ী মূল্যমানগুলিকে ভাবতে শিখিয়েছে। অথচ বঙ্গদর্শন প্রাচীনপন্থী পত্রিকা ছিল না। য়ুরোপীয় দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্যতত্ত্ব নিয়েই বঙ্গদর্শনের

বিচিত্র পরিক্রমাক্ষেত্রে। বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র শিশু। এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু দুই পত্রিকাই যে বাঙালির জাগরণের বার্তা বহন করছে, এটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৮৭৪ পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধটি বহরমপুরে থাকতেই রচিত হয়। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে বহরমপুরে থাকতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বঙ্গদর্শন-জাতীয় পত্রিকার পরিকল্পনা জাগে। এর পরিকল্পনার অনুকূলতাও তিনি পেয়েছিলেন সেখানকার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে। তখন বহরমপুরে ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।[৩] কিছুকাল জল্পনা চলার পর কয়জন লেখকের নাম দিয়ে ভবানীপুরের ব্রজমাধব বসুকে প্রকাশক করে বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন বের হল। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; লেখক দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তখনকার বঙ্গদর্শনে সকল রচনার নীচে লেখকের নাম থাকত না; সুতরাং এঁদের মধ্যে সকলেই শেষ পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন কি না বলা কঠিন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বঙ্গদর্শনে কখনোই লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর স্মৃতিকথায় তার কোনো উল্লেখ নেই। কৃষ্ণকমলের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে ল ক্লাসে। কোমৎ দর্শন নিয়ে দুজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কৃষ্ণকমলও লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। সেই সূত্রেই হয়তো তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। পরিচয়ও বহুকালের। জগদীশনাথের স্বনামে কোনো লেখা নেই। তবে বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরে সংগীত বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার 'কিয়দংশ ৺জগদীশনাথ রায়ের রচিত'। সেই অংশ বর্জন করে বঙ্কিম স্বরচিত অংশ বিবিধপ্রবন্ধে সংকলন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কোনো লেখাও সম্ভবত প্রকাশিত হয় নি। তাঁর 'বঙ্গোন্নয়ন' প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বের হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় এই প্রবন্ধের বিষয় এবং বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় বিষয়েরই অনুরূপ। বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশের সময় তারাপ্রসাদ বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ওকালতি করতেন এবং কলেজে আইনের ক্লাসও নিতেন। তারাপ্রসাদ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনের ক্লাস করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গুরুদাস বঙ্গদর্শনে লেখেন নি, কিংবা তাঁর নাম বিজ্ঞাপিতও হয় নি। কিন্তু অনুমান দৃঢ়ভাবেই করা যায় যে বঙ্গদর্শনের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যে তাঁর গভীর সমর্থন ছিল। ১২৯৯ সালের চৈত্রমাসে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় 'শিক্ষার হেরফের' লিখলে বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাস রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে মন্তব্য লেখেন।[৪] বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করাই ছিল তাঁদের প্রধান বক্তব্য। বঙ্গদর্শন পত্রিকার মূল উদ্দেশ্যও ছিল বাংলা ভাষার সাহায্যে জ্ঞান বিস্তার করা।

---

৩ এই তালিকা সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' থেকে নেওয়া। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে বহরমপুরের সাহিত্যিক পরিবেশের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন; তাতে ভূদেব এবং রামদাস সেনের নাম নেই। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তও লিখেছেন, 'ভূদেব রামদাস সেন ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যিকও অনেকেই এই সময়ে বহরমপুরে ছিলেন।' বহরমপুরে রামদাস সেনের বিরাট গ্রন্থাগার বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করতেন। ভূদেবের সঙ্গে বঙ্কিমের যোগাযোগ সম্ভবত চুঁচুড়া থেকেই।

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্র. ১২, পৃ. ৬১৬-১৭। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় গুরুদাস বহরমপুরে ছিলেন না। তাঁর পূর্বেই ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে তিনি বহরমপুরে ওকালতি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন।

বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে লিখেছিলেন হেমচন্দ্র, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং দীনবন্ধু মিত্র। হেমচন্দ্র কবিতাই লিখতেন সাধারণত। কিন্তু একটি প্রবন্ধও লিখেছেন 'মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়'। রামদাস সেন ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক। তাঁর প্রাচীন ভারত বিষয়ক বহু প্রবন্ধই বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল। তার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, সংগীতশাস্ত্র, বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয় ছিল। মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসরে তিনি মারা যান, কিন্তু এই বয়সেই তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যানুসন্ধান দেশ-বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রামদাস তাঁর গবেষণা বাংলা ভাষাতেই করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তনাতেই তিনি প্রবন্ধ লেখায় মনোনিবেশ করেন, আগে তিনি কবিতাই লিখতেন। ঐতিহাসিক-রহস্য ১ম ভাগ (১৮৭৪)-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

> 'আমার পরম সুহৃদ্ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকারপূর্বক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরেজি গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি।'

রামদাস আরও বহু প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ও তৎপরবর্তী বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করে বাংলায় জটিল ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত করেন। এ শ্রেণীর কাজ করবার যোগ্যতা সেকালে ছিল আর একজনের। তিনি ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের মূল্যবান গবেষণা সবই ইংরেজি ভাষায় নিবদ্ধ।[৫] বঙ্গদর্শন যে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত ছিল তার সার্থক সিদ্ধি ছিল রামদাসের প্রবন্ধ।

বিজ্ঞাপিত অন্য দুইজন লেখক ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার। দীনবন্ধু তখন অতি প্রসিদ্ধ নাট্যকার। বস্তুত বঙ্গদর্শন প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। বঙ্গদর্শনে তাঁর একটি কবিতা 'ঊষা' এবং একটি গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়— 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দীনবন্ধুর পরিচয় কলেজ-জীবনেই, বাংলা সাহিত্যে পরিচিত 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' -প্রসঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধুর সৌহার্দ্য-কথা সুজ্ঞাত। অক্ষয়চন্দ্র সরকারই বরং বঙ্গদর্শন-প্রকাশকালে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নবাগত। অক্ষয়চন্দ্রের পিতা গঙ্গাচরণ সরকারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বাবধি বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। অক্ষয়চন্দ্র 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। অক্ষয়চন্দ্রকে বঙ্কিমই আবিষ্কার করেছিলেন বলা যেতে পারে। বঙ্গদর্শনের মতো অতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্রকে লেখকশ্রেণীভুক্ত করে নেওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গদ্যরচনার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমের উৎসাহেই বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনাকে স্থান দিয়েছেন। পরে অক্ষয়চন্দ্র যখন 'সাধারণী' পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন বঙ্কিম তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত লেখাও তাতে দেন।

---

৫ As an earnest and indefatigable student of Indian antiquities he has no equal in this country, with the single exception of Dr. Rajendra Lala Mitra. But he is in one respect, a greater benefactor to his country than even Dr. Mitra. Dr. Mitra's antiquarian writings are a sealed book to those who know not English; Dr. Ram Das Sen's antiquarian writings are open to those who know only Bengali, as well as those who know English.— Calcutta Review, 1884. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, 'রামদাস সেন'-এ উদ্ধৃত।

'সাধারণী' কাঁঠালপাড়ার বঙ্গদর্শন যন্ত্রেই মুদ্রিত হত। 'উদ্দীপনা' ছিল যুক্তিবদ্ধ তথ্যমূলক রচনা, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষ পটুতা ছিল আর-এক শ্রেণীর রচনায়, বঙ্গদর্শনেই সেই শ্রেণীর রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তী কালে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামে যে গদ্যধারা বাংলা সাহিত্যে প্রবহমান হয়েছে কমলাকান্তের দপ্তর থেকেই তার সূত্রপাত ঐতিহাসিকেরা নির্দেশ করে থাকেন। এই শ্রেণীর রচনায় অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহেই অনুপ্রেরিত হয়েছেন। অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যবৈশিষ্ট্য দেখেই যেন তিনি বুঝেছিলেন কৌতুকরসমূলক লঘুবিষয়কে ব্যক্তিস্পর্শে মণ্ডিত করে এক অভিনব সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর সহজ দক্ষতা।

লেখকরূপে নাম বিজ্ঞাপিত হয় নি অথচ বঙ্গদর্শনের একজন প্রধান লেখক হয়ে উঠলেন বঙ্কিমের বিশেষ প্রীতিভাজন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। নাম প্রচারিত না হওয়ার কারণ হিসাবে মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন[৬]—

> 'বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যাইবার কয়েকমাসের মধ্যেই রাজকৃষ্ণ পাটনা কলেজে যান এবং বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালা প্রবন্ধকার বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।'

কিন্তু পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় রাজকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই দিয়েছেন। রাজকৃষ্ণ বাংলা রূপককাব্য লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রবন্ধ লিখেছেন ইংরেজিতেই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের একজন অতি উজ্জ্বল ছাত্র। কিন্তু তাঁর অধিকার ছিল নানা বিষয়েই। রামদাস সেন যেমন ছিলেন বঙ্গদর্শনের ইতিহাস-লেখক, রাজকৃষ্ণ তেমনি ছিলেন বঙ্গদর্শনের তত্ত্ববিদ্ দার্শনিক লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে বাংলা লেখায় টেনে নিয়ে আসেন। বঙ্গদর্শনে তাঁর অন্ততঃ ষোলোটি বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ছিল নীতি, ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-তত্ত্ব, সংস্কৃত সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি। কোনো প্রবন্ধই অপরিপক্ক লেখা নয়, এটাই আশ্চর্য। উল্লেখযোগ্য, ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি তথ্যগত কারণে আজও মূল্যবান। বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবিরূপে তিনিই সর্বপ্রথম নির্দেশ করেন। রামদাস সেনের মতো ঐতিহাসিকের শ্রীহর্ষ-সম্বন্ধীয় মতেরও তিনি প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ লেখেন। তা ছাড়া, 'কোমৎ দর্শন' 'মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ' 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' প্রভৃতি দার্শনিক প্রবন্ধগুলি বাংলা ভাষায় জটিল তাত্ত্বিক আলোচনার চমৎকার সার্থকতা দেখিয়ে দিয়েছে। বঙ্গদর্শনের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন, রাজকৃষ্ণের লেখার মধ্যে দিয়েই পাঠক তার পরিচয় পেল। অবশ্য এই শ্রেণীর লেখা যে বাংলায় আগে হয় নি, তা নয়। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা, তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই সে-আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। রাজকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। রাজকৃষ্ণ আধুনিক পাশ্চাত্য রীতির চিন্তাধারার সঙ্গে বাঙালি চিত্তের যোগ-সাধন করাচ্ছিলেন।

বঙ্গদর্শনে কল্পনামূলক সাহিত্য রচনার ভার প্রধানত নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছে।[৭] প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকল বিষবৃক্ষ। উপন্যাসের নায়িকা হল আমাদের বাঙালি ঘরের মেয়ে, 'সূর্যমুখী আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে দেখা দিল।' উল্লেখ-

---

৬ মন্মথনাথ ঘোষ, মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়. ১৩৪০, পৃ. ৬৩

৭ বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' এবং 'শৈশব-সহচরী' উপন্যাস দুটি বঙ্গদর্শনে (১২৮০ এবং ১২৮২ সালে) প্রকাশিত হয়। কারো মতে 'মধুমতী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প ; দ্রষ্টব্য ভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার ১৯৬২, পৃ ৭৮। আবার কারো মতে দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' -এই ছোট গল্পের আভাষ দেখা গিয়েছে ; দ্রষ্টব্য মিহিরকুমার দাশ, দীনবন্ধু মিত্র ১৯৭০, পৃ ১০১। মূলকথা এই যে বঙ্গদর্শনেই বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব।

যোগ্য, সোমপ্রকাশ বিষবৃক্ষের ভাষা নিয়ে নানা ব্যাকরণের ও প্রয়োগের ত্রুটি দেখিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসটির সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্র সে-সম্বন্ধে শম্ভুচন্দ্রকে লেখেন[৮]—

> An exquisite critic in the *Somprokash*— Pot Belly himself for aught I know— pronounces the book unreadable, and the author an unmitigated dunce. This is high praise. Praise from such a quarter would have damned the book.

বিষবৃক্ষ ছাড়া বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের বেরিয়েছিল চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা, রাধারাণী, কমলাকান্তের দপ্তর-এর সন্দর্ভগুলি, কৃষ্ণকান্তের উইলের কিয়দংশ। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের আরো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য এই উপন্যাস দিয়েই বঙ্গদর্শনের বিশিষ্টতা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি চিন্তামূলক রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়ে পরবর্তী বাঙালি মানসের গতিপথের দিকনির্দেশক হয়েছিল। উপন্যাস তিনি বঙ্গদর্শন প্রকাশের আগেই রচনা করে এসেছেন; বঙ্গদর্শনে যদিও সামাজিক ও পারিবারিক বাস্তবতার অবতারণা করলেন, রোমান্সের প্রতি তাঁর আকর্ষণ পরবর্তী কালেও অব্যাহত থেকেছে। সেজন্য বঙ্গদর্শন-কালীন রোমান্সকে পূর্বের অনুবৃত্তি বলা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে হয়তো এ-কথাও আমরা বলতে পারি, বঙ্গদর্শনের যুগ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কবিত্ব-কল্পনার সঙ্গে মিশেছে বাস্তবতা-বোধ, রোমান্সের সঙ্গে জীবনতত্ত্ব। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত বঙ্কিমের উপন্যাস মাত্রেই সৌন্দর্যসৃষ্টিই চরম লক্ষ্য স্বীকার করেও বলেছিলেন 'প্রথম তিনখানি উপন্যাস পাঠ করিবার পর বিষবৃক্ষ পাঠে প্রবৃত্ত হইলে একটা ভিন্ন রকমের আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম বোধ হয়। ইহার কারণ এবারে বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ নূতন প্রকারের উপাদান লইয়া আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' সমসাময়িক সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে উপন্যাসের কল্পনার মিশ্রণ বঙ্গদর্শন-যুগের বৈশিষ্ট্য। বাস্তবতা-সচেতনতা এলেই লেখকের নীতি-জিজ্ঞাসা স্বভাবতই এসে পড়ে। এই জিজ্ঞাসা প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ও ধর্ম-দর্শন-অর্থনীতি-সমাজনীতি -চর্চা থেকেই এসেছে। বঙ্গদর্শনে কল্পনামূলক গদ্যরচনা একটিই থাকত, বাকি কিছু কবিতা, আর বারো-আনাই গুরু প্রবন্ধ।

বঙ্গদর্শনের কবিতার প্রকৃতিতেও বক্তব্যধর্মেরই আধিপত্য। প্রধানত তিনজন এতে কবিতা লিখতেন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের কবিতা জাতীয়ভাবোদ্দীপক, নবীনচন্দ্রের কবিতা ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা 'ফ্যান্সি'— কল্পনামূলক। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবিতা সেকালে আদর্শ বলে বিবেচিত এবং অনুকৃত হলেও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে বঙ্গদর্শনগোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে সূক্ষ্ম মন্ময়তার অভাব ছিল। সে-কালে সে-অভাব লোকে যে খুব অনুভব করত তা বলা যায় না। বিহারীলাল তখন কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য-সন্ধানী কাব্যগুঞ্জন জনকোলাহলের বাধা ঠেলে সুপরিচিত হয়েছে মনে হয় না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত ছিলেন না, বঙ্গদর্শনেও কখনও লেখেন নি। বঙ্গদর্শনের গদ্যলেখার মতো কবিতাও বক্তব্যপূর্ণ আবেগ দিয়েই পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করেছে। এই কবিতার আদর্শ দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে টিঁকে ছিল; কিন্তু বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ভাবময় রসসৃষ্টিই বাংলা কবিতায় যুগান্তর নিয়ে এল।[৯]

---

৮ **English Works (Bangiya Sahitya Parisad)**

৯ **এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'কাব্যবাণী' (১৯৬৭) গ্রন্থের 'কাব্যে দুই রীতি'-অধ্যায় দ্রষ্টব্য।**

এই প্রসঙ্গে আর-একটি সংবাদ কৌতূহলোদ্দীপক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য তিনি বঙ্গদর্শনেই প্রকাশার্থ পাঠিয়েছিলেন। এর প্রথম সর্গ যে বঙ্গদর্শনে (শ্রাবণ ১২৮০) প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের সে-কথা মনে ছিল না। কিন্তু বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো-কোনো অংশে স্বপ্নপ্রয়াণের অনুকরণ করেছিলেন বলে তিনি মনে করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার প্রশংসাও করতে পারেন নি।[১০]

বঙ্কিমচন্দ্র চার বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করে পত্রিকা বন্ধ করে দেন। অথচ সে-সময়ে বঙ্গদর্শনের প্রচার সবচেয়ে বেশি। এক বছর বন্ধ থাকবার পর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন আবার প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ের বঙ্গদর্শনের বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন সঞ্জীবনী-সুধাতে। বঙ্গদর্শন প্রথমে মুদ্রিত হত ভবানীপুরে। সঞ্জীবচন্দ্রই কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গদর্শন প্রেস স্থাপন করেন, পরে সেখান থেকেই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার এক বছর পর সঞ্জীবচন্দ্রই স্বত্ব চেয়ে নিয়ে আবার প্রকাশ আরম্ভ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায়—

> 'আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক— যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন।... কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্যাধ্যক্ষতার কার্যের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না।'

সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্যালয় কলকাতায় নিয়ে এলেন ; কিন্তু বিশৃঙ্খল অবস্থায় বঙ্গদর্শনের 'অপঘাত মৃত্যু' হল। তার পরে ১২৯০ সনে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শন আবার প্রকাশ করেন। শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। বঙ্কিমের পরামর্শ ও নির্দেশ তিনি মান্য করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের থেকেই শ্রীশচন্দ্রকে বলেন, উপন্যাস হয়তো তিনি দেবেন, কিন্তু প্রবন্ধ দিতে পারবেন না। কিন্তু চার মাস মাত্র (কার্তিক-মাঘ) চলেই বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। শোনা যায়, চন্দ্রনাথ বসুর একটি লেখাতেই বঙ্কিমের বিরক্তি জন্মে। এর আঠারো বছর পর ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শ্রীশচন্দ্রের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা করতে থাকেন নবপর্যায় বঙ্গদর্শন। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন থেকেই আবার বাংলা উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধে নতুন যুগের হাওয়া এল। বঙ্কিম-যুগের বঙ্গদর্শন থেকে এই বঙ্গদর্শন প্রকৃতিতে হল ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ সমালোচনী দৃষ্টিতে পুরনো বঙ্গদর্শনের বৈশিষ্ট্য সহজেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সূচনাতেই তিনি লিখলেন[১১]—

> '...কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে, ভাবের পথ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যদি কেবল বঙ্কিমের কালের মধ্যেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, জীবিত কালের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বভাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধূলি-সমাচ্ছন্ন ইতিহাসের বিবরমধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আমাদের নিত্য-ব্যবহারের অতীত হইয়া যাইবে। মহাপুরুষদিগের কীর্তি

---

১০ ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাপুস্তকের সমালোচনা। বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরে প্রকাশিত কবিতা এবং বাল্যরচনা ললিতা ও মানস সংকলিত হয়েছিল কবিতাপুস্তকে।

১১ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ. ৩

এক কালকে অন্য কালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগসূত্রের কাজ করে। যাঁহারা জাতিগত মাহাত্ম্যের প্রার্থী তাঁহারা সেইরূপ কোন যোগসূত্রকেই নষ্ট হইতে দিতে চাহেন না।

…তখনকার সেই নির্ঝর-ধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক্ নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটীর মধ্যে সর্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন।'

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের একক ব্যক্তিত্বই যে সকল রচনার মধ্যে অধিপতি হয়ে বিরাজ করত, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যথার্থ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বলেছিলেন বঙ্গদর্শনের প্রায় প্রতি লেখাই খুব ভালো করে সংশোধন ও পরিমার্জনা না করে তিনি প্রেসে দিতেন না; একমাত্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ব্যতিক্রম। যে চার বছর বঙ্কিম সম্পাদনা করেছেন, সেই চার বছরে বঙ্কিম একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি করে দিয়েছিলেন, যাঁদের প্রেরণা ও চিন্তা-পদ্ধতি ছিল ঐক্যবদ্ধ। সমাজপতিকে তিনি একথাও বলেছিলেন[১২]—

'তখন বাঙ্গালায় অনেক জিনিস লেখা হয় নাই। প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোকে কিছু জানে না, সে বিষয়ে যৎসামান্য লিখিলেও চলিত, লোকে তাহাই পড়িত, সেইটুকুই শিখিত।'

বঙ্কিমের এই উক্তিতে কিছু অযুক্ত কথাও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল নতুনতর দৃষ্টি, নতুনতর ভাবনাকে গড়ে দেওয়ার। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম যোগ ঘটছে, সেই সূত্রে বিশ্ব ও সমাজ সম্পর্কেও কতকগুলি ভাবনাপথ তৈরি করে দিতে হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বঙ্কিমের মতো চিন্তানায়ককে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে অন্যান্য লেখকদের রচনাকে যথার্থ পথে চালিত করে নিয়ে যাওয়ার দিকে। এই মনোভঙ্গি তৈরি করে দেওয়ার কাজে চারটি শাস্ত্রই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়— ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্য। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র বৈজ্ঞানিক লেখক খুব বেশি পান নি— সে-কাজ তাঁর নিজেকেই করতে হয়েছে। অন্য তিনটি বিষয়ের লেখাগুলি পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, এদের মধ্যে বঙ্কিম-মানসের প্রতিফলন কত ব্যাপক হয়েছে। পূর্বেই বলেছি বঙ্গদর্শনের লেখাগুলি নির্বিকার পুঁথিগত আলোচনা মাত্র হত না। এই আলোচনাগুলির মূলে ছিল একটি উৎকণ্ঠা, পাঠকের চিত্তে নতুন মূল্যমান রচনা করে তোলার। দেশ ও জাতি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে আসা ছিল বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নানা ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে যা করতে চেয়েছিলেন, বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন প্রবন্ধে তারই অনুসরণ দেখতে পাই। ইংরেজদের লেখা ইতিহাসে নির্ভর করে নিজেদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে স্বাধীন ভাবে ইতিহাস-চর্চা করবার জন্য তিনি আহ্বান করলেন বঙ্গদর্শনের মাধ্যমেই। বিপিনচন্দ্র পাল অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী চিন্তা ও সাধনার ইতিহাসে এনসাইক্লোপিডিস্টদের স্থানের সঙ্গে বাংলার সাধনা ও ইতিহাসে বঙ্গদর্শনের স্থানের তুলনা করেছিলেন।[১৩] এঁরাই ছিলেন পরবর্তী বিপ্লব-আন্দোলনের ভাব-উৎস। তেমনি বঙ্গদর্শনের ইতিহাস-চর্চার মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয়তার পূজাবেদী।

ইতিপূর্বে 'মৃণালিনী' উপন্যাসেই (১৮৬৯) বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দেখা গিয়েছে।

---

১২ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৪৯

১৩ বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা (দ্বিতীয় সং), ১৯৬৪, পৃ. ১৬০

তখন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কয়েকটি দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। প্রথমত তিনি সতেরোজন অশ্বারোহী দ্বারা বঙ্গবিজয়ের প্রচলিত ইতিহাসকে মেনে নিতে বাধ্য হলেও তাঁর অন্তরতর মন যেন কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছিল না। মাধবাচার্যের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমের সেই গূঢ় বাসনা প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন এবং স্বার্থপর পশুপতির উদ্যমহীনতা এই গৌরবহীন পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাসের এই তথ্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। দ্বিতীয়ত এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল আর-একটি দ্বন্দ্বের বীজ। তৎকাল-প্রচলিত ইতিহাস-তত্ত্বের শিক্ষায় তিনি জানতেন ভৌগোলিক কারণে একটি জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতি গড়ে ওঠে। বাক্‌ল্-এর এই মতবাদ বঙ্কিমকে চিরকালই প্রভাবিত করে এসেছে। ইংরেজিতে লেখা 'পপুলার লিটারেচর' (১৮৭০) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> The popular literature of a nation and the national character act and react on each other. At least in Bengal there has been a singular harmony of character between the two since the days of Vidyapati and Jayadeva.
>
> And it would be difficult to conceive a poem more typical than the *Gita Govinda* of the Bengali character as it had become after the iron heel of the Musalman tyrant had set its mark on the shoulders of the nation. From the beginning to the end it does not contain a single expression of manly feeling— of ***womanly*** feeling there is a great deal.

জলবায়ুই যদি একটা জাতির প্রকৃতির অমোঘ নিয়ামক হয়, তা হলে প্রকৃতির আশীর্বাদ-বঞ্চিত জাতির কী আর আত্মপুনর্গঠনের কোনোই উপায় নেই ? তাকে চিরকালই দুর্বল নিরুদ্যম পরমুখাপেক্ষী এবং পরাজিত হয়েই থাকতে হবে ? বঙ্কিমের মনের এই দুটি সংশয়ের আলোচনা ও বিচার বঙ্গদর্শনের একাধিক রচনাতেই দেখা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাসের যুগে বঙ্কিমের মতো অনেকেই ভাবতেন পারিপার্শ্বিক কারণেই মানুষের সৃষ্টিপ্রতিভা চালিত হয়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন লেখাতেও এই চিন্তাটি বিস্তৃত হয়েছে। 'মানসবিকাশে'র সমালোচনায় (১২৮০) এবং 'বাঙ্গালির বাহুবল' (১২৮১) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির দুর্বলতাকে বাহ্য প্রকৃতির ফল বলেই বর্ণনা করেছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি একান্ত আস্থা বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাতেই সূত্ররূপে দেখা যেত, শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক নিয়ম বস্তুটি কী সে-আলোচনাও আলাদাভাবে বঙ্গদর্শনে দেখা যায়। এ বিষয়টির আলোচনা প্রথম করেন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থে।[১৪] বঙ্গদর্শনে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ধারাবাহিক আলোচনায় একটি অধ্যায়ে (ফাল্গুন ১২৭৯) 'প্রাকৃতিক নিয়ম' শিরোনামে এর তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ভারতবর্ষে তার প্রয়োগ-ফল দেখানো হয়েছে।[১৫] প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী চিন্তাধারার ফলে। আমাদের কর্ম, নীতি, এবং জাগতিক ঘটনামাত্রই

১৪ এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়টির নাম 'প্রাকৃতিক নিয়ম'। স্মরণীয়, অক্ষয়কুমার প্রত্যক্ষতাবাদের দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবিত ছিলেন।

১৫ প্রাকৃতিক নিয়ম-তত্ত্বের আলোচনা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত ভারতীতে 'প্রকৃতি ও তাহার মূল নিয়ম' শিরোনামে ধারাবাহিক ক্রমে (পৌষ ১২৮৫-ভাদ্র ১২৮৬) প্রকাশিত হয়েছে।

কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী নৈসর্গিক কার্যকারণগত যোগাযোগের ফল, এই ধারণাই ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ধারণার মূলে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মূলেও ছিল এই বিশ্বাস। বঙ্গদর্শনের কতকগুলি লেখাতেই এই তত্ত্বটিকে নানা ভাবে আলোচিত হতে দেখতে পাই। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব কিনা' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)। এতে লেখকের বক্তব্য এই যে ঈশ্বর কী নিয়মে কাজ করেন তা আমরা জানি না। কিন্তু সে-চিন্তায় সময় হরণ না করেই আমাদের কর্মে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব কতটুকু ? এখানে বঙ্কিমচন্দ্র মিলের মতানুবর্তী হয়েছেন। প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট বিধান যাই থাক প্রবল ইচ্ছাশক্তি, উদ্যম এবং অভিলাষ দিয়ে মানুষ নিজেকে বিশিষ্টরূপে গঠন করে নিতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন বিচারবোধ, সুনির্দিষ্ট জ্ঞানে ব্যক্তির মনে নবকীর্তির অনুপ্রেরণা সৃষ্ট হতেই পারে। প্রাকৃতিক নিয়ম জাতির ললাটে যে পরিণামই এঁকে দিক, পুরুষকার দিয়ে জাতি তাকে অতিক্রম করে কীর্তি-গৌরবের অধিকারী হতে পারে। বাঙ্গালির বাহুবল (শ্রাবণ ১২৮১) প্রবন্ধে নৈসর্গিক প্রকৃতির ললাট লিখনের বিস্তৃত আলোচনা করেও উপসংহার-অংশে বললেন—

> 'যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোনো জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয় (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোক প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়,— তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।'

অতএব উদ্দীপনা উৎসাহ অধ্যবসায় দিয়েই একটি জাতিকে পুনর্জীবিত করে তোলা সম্ভব। 'শারীরিক বল বাহুবল নহে'— এই বিশ্বাসই ফিরিয়ে নিয়ে এসে পরাধীন, নিরুৎসাহ, গৃহসুখপরায়ণ অলস জাতিকে জাগিয়ে তোলার মহৎ দায়িত্ব বঙ্গদর্শন গ্রহণ করেছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'উদ্দীপনা' (বৈশাখ ১২৭৯) প্রবন্ধটি এই সূত্রেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[১৬] জাতীয় উন্নতির মূল প্রেরণা কোথায়, সৃষ্টি এবং কীর্তির উদ্দীপনা আলোচনা করেই অক্ষয়চন্দ্র এই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এইরকম আর-একটি প্রবন্ধ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, 'মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব— কিসে হয়' (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯)। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে হেমচন্দ্র দেখিয়েছেন প্রত্যেক জাতি একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা সাধন করেই মহত্ত্ব লাভ করে। ভারতবাসীও একোদ্যোগ হলে নিজের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে একদিন উন্নতি করবেই। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতকলঙ্ক (বৈশাখ ১২৭৯) প্রবন্ধেও ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। হেমচন্দ্র ইসলামের ইতিহাস থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে লিখেছিলেন—

> 'যতদিন মহম্মদ ধর্মসূত্রে তাহাদিগকে একতাবন্ধন না করিয়াছিলেন এবং অনন্যকাম করিয়া, তাহা-দিগকে এক মহাসংকল্পে ব্রতী করিতে না পারিয়াছিলেন ততদিন তাহারা মহৎ হইতে পারে নাই।'

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মধ্যে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি বিশ্বাস ছিল, তেমনি আবার স্বদেশ ও স্বজাতিকে উজ্জীবিত দেখবারও প্রবল বাসনা ছিল। তিনি যেন কিছুতেই বাঙালি এবং ভারতবাসীকে চিরকালের জন্য অলস এবং মোহগ্রস্ত দেখতে সম্মত নন। ফলে বাক্‌ল-এর মত মেনে নিয়েও নিজে যেমন বাঙালিকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন, অন্যকেও এ বিষয়ে চিন্তা করতে প্রবর্তিত করতে চেয়েছেন। অন্ধ ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নিরুপায় জাতি ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে, এ তিনি ভাবতে পারেন নি। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে তিনিই প্রথম বহুভেদ থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীকে 'একজাতি'

১৬ 'ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা— নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া আমি 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম, বঙ্কিমবাবু বড় খুশি।'— পিতাপুত্র।

হয়ে উঠবার পরিকল্পনা দিলেন। 'বঙ্গভূমি শস্যশালিনী বলিয়া কি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য' (আশ্বিন ১২৮০) প্রবন্ধটিতে সম্পাদক তাঁর নিজের পূর্বেকার মতকেও খণ্ডিত হতে দিয়েছেন। বাকল সাহেবের মতের প্রতিবাদ করে লেখক বলছেন—

'সমাজের অবস্থাভেদে বৈষম্য এবং তাহার অপনয়ন সম্বন্ধে আমরা যে এত কথা বলিলাম, তাহা কেবল বাকল সাহেবের মতের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত। আমাদের দেশের যে বৈষম্য তিনি দর্শাইয়াছেন, তাহা ফ্রান্সদেশে ছিল, ইংলণ্ডে ছিল, জর্মনিতে ছিল। কিন্তু সমাজের চতুর্থাবস্থায় তাহা প্রায় সমুদায় অপনীত হইয়াছে। সেই অবস্থা যখন ভারতবর্ষের হইবে তখন এ দেশেরও বৈষম্য দূরীভূত হইবে।··· এক সময়ে আমাদের দেশে বিদ্যাজাত বৈষম্য ছিল, তাহা এক্ষণে বড় নাই। ধনজাত বৈষম্যই প্রবল। অতএব যে কারণে তাহা অন্য দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই কারণে আমাদের দেশ হইতেও যাইবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে কখনো রাজনীতি আলোচনা করেন নি। তখনকার রাজনীতি ছিল সহযোগিতার রাজনীতি, ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরেজি শিক্ষার সর্বোত্তম সম্পদ আহরণ করা। কিন্তু দেশ এবং জাতি -ভাবনাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্গদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়েছিলেন বিশেষ করেই জাতীয় চরিত্র গঠনের উপর। ইতিহাস থেকে তিনি এর স্বরূপ সন্ধান করেছেন। কিন্তু বাঙালির ইতিহাসে প্রথম দিকে তিনি গৌরববোধ করবার মতো কিছু পেলেন না। মৃণালিনী উপন্যাসে এবং বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের লেখায় বাঙালিচরিত্র বিচারে এ-অভাব ফুটে উঠেছিল। কিন্তু এ-অভাব ঘুচিয়ে দিল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪)। এই বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামে (মাঘ ১২৮১)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বতন মত পরিবর্তন করে বাঙালির উজ্জ্বল অতীত, গৌরবমণ্ডিত কৃতিত্ব, স্মরণীয় কীর্তিমালায় মুখর হয়ে ওঠেন এই বই পড়েই। রাজকৃষ্ণ এই বই প্রকাশের পূর্বেই বঙ্গদর্শনে 'ঐতিহাসিক ভ্রম' (ভাদ্র ১২৮১) নামে একটি প্রবন্ধে নতুন কণ্ঠে বললেন—

'অনেকের মনে তিনটী সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটী এই যে, বাঙ্গালীরা কখন বিদেশ বিজয় করে নাই ; দ্বিতীয়টী এই যে, যেদিন বখতিয়ার খিলিজি সপ্তদশজন অশ্বারোহী সমাভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেন বংশের রাজত্ব বিলুপ্ত এবং সমুদায় বাঙ্গলাদেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল ; তৃতীয়টী এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা করসংগ্রাহক রাজকর্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে এ তিনটী সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।'

যে দ্বিধা বঙ্কিমের মনে এতদিন ছিল, এই প্রবন্ধের ফলে সে দ্বিধার নিরসন হল। নানা ভাবে, নানা রচনার দ্বারা বাঙালি জাতির মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করবার চেষ্টা তিনি করেছেন, রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধে তিনি ঐতিহাসিক কারণও খুঁজে পেলেন। বাঙালি দুর্বল নয়, ভীরু নয়, 'গৃহসুখপরায়ণ' নয়— রাজকৃষ্ণের গবেষণাতেই বঙ্কিম তার প্রচুর সমর্থন পেলেন। অতঃপর বঙ্গদর্শনের পাতায় বাংলা ও বাঙালি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন নতুন ঐতিহাসিককে এ-পথে প্রবর্তিত করবার চেষ্টা করেছেন। লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থটির উচ্চ প্রশংসা বঙ্কিম করেছিলেন।[১৭] তাঁর প্রবন্ধে বাঙালিজাতির সমাজ-বিন্যাসের পরিচয়

১৭ 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' সম্বন্ধ নির্ণয়ের আলোচনাসূত্রে রচিত।

পেয়ে তিনি ইতিহাস রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। লালমোহনের 'ভারতবর্ষীয় আর্যগণের আদিম অবস্থা' ১২৮১ সালে কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া তাঁর আর-একটি প্রবন্ধ 'দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত' (ভাদ্র ১২৮২)।

রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধ থেকে সমর্থন লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নতুন আবেগের সৃষ্টি হল। তাঁর দেশাত্মবোধক প্রেরণা আবেগোচ্ছ্বসিত হল। ১২৮১ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হল তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার দুর্গোৎসব', দেশের মাতৃমূর্তি। এখানেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ আনন্দমঠের বীজ। সম্ভবত এরই কাছাকাছি সময়ে তিনি 'বন্দেমাতরম' সংগীতটিও রচনা করেন। কিম্বদন্তী এই যে, প্রেসের ম্যানেজার পত্রিকার পাদপূরণের জন্য এই কবিতাটি চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এর মহত্তর সার্থকতা অনুভব করেই তখন প্রকাশ করতে দেন নি। দেশের মহিমা বঙ্কিমের অন্তরকে আচ্ছন্ন করেছিল। এক দিকে উদ্দীপনা ও অভিলাষকে জাগিয়ে তুলবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অন্য দিকে দেশের হৃত গৌরবের জন্য বেদনা— কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত'-এ বঙ্কিমচিত্তের সুতীব্র অনুভূতি গীতি-কাব্যের ভাষায় রূপায়িত হয়েছে। বন্দেমাতরম সংগীতে দেশজননী ঐশ্বর্যময়ী হয়ে দেখা দিলেন ; সেই সঙ্গে তিনি হলেন আত্মবিগলিত ভক্তির প্রতিমা। বঙ্গদর্শনের এটি একটি স্মরণীয় দান। বঙ্গদর্শন আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করল ; আমাদের মধ্যে জাগিয়ে দিল আত্মমর্যাদা ও সম্বিৎ। আমাদের ব্যর্থ ইংরেজ অনুকরণকে উপহাস করে 'মণিজালে পূর্ণ' মাতৃভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিল। প্রায় সমসাময়িক আর্যদর্শন পত্রিকা ইতালীয় গ্যারিবলডী ম্যাটসিনীর বিপ্লব-প্রেরণায় রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার কাজে নিয়োজিত ছিল। বঙ্গদর্শন পত্রিকা কখনো অতীত গৌরবের স্মৃতিচারণ করে, কখনও লোকরহস্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে, কখনো কমলাকান্তের আর্তকণ্ঠে, জাতি হিসাবে নিজেদের পরিচয় উদ্ধার করে ফিরছিল।

বঙ্গদর্শন নাম হলেও শুধু বাংলা নয় একটি বৃহত্তর জাতির অঙ্গ হিসাবে বাঙালিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই বঙ্গদর্শনের ইতিহাস-চর্চা শুধু বাংলাদেশের অতীত মন্থন নয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পর্যালোচনা সমান গুরুত্ব পেয়েছে। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' (অগ্রহায়ণ ১২৮২) প্রবন্ধে বঙ্কিম দেখিয়েছেন বাঙালি আর্যজাতির মিশ্রণে গঠিত। আর্যজাতির কীর্তি-গৌরবের অংশী বাঙালি। বাঙালিকে আত্ম-চেতন হতে হলে তার এই পূর্ব ইতিহাসের জ্ঞানও থাকা চাই। তিনি নিজে 'ভারতকলঙ্ক' লিখেছিলেন, উত্তরচরিত এবং শকুন্তলার সমালোচনা করেছেন, 'সাংখ্যদর্শন' লিখেছেন। তেমনি অন্যকে অনুপ্রেরিত করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে গবেষণায় ও আলোচনায়।[১৮] বঙ্কিমের উৎসাহে ও অনুরোধে রামদাস সেন সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। রামদাস ছাড়া আর-একজন প্রবন্ধকার প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' (মাঘ ১২৮০-শ্রাবণ ১২৮২, মাঝে মাঝে বাদ) রামায়ণ ও ভারতীয় সমাজের পরিচয় স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'উত্তরচরিত' (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯)।

বিশ্বজাগতিক নিয়ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তিবাদ, দেশপ্রীতির আবেগ সঞ্চার, জাতিগঠন-

---

১৮ বাংলা প্রবন্ধে প্রমাণ ও উৎস নির্দেশ করে পাদটীকার ব্যবহার বঙ্গদর্শন থেকেই আরম্ভ হয়। রাজকৃষ্ণ যখন 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ লেখেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণোল্লেখ করে পাদটীকা দিতে বলেন। তখন থেকেই বাংলায় এ রীতি প্রচলিত। এই তথ্য বঙ্গদর্শনের লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের থেকে লব্ধ। দ্রষ্টব্য মন্মথনাথ ঘোষ, 'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়', পৃ ৮৯

মূলক প্রয়াস ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, অতীত-গৌরববোধ— বঙ্গদর্শনের এই-সব মূল্যমান বাঙালির চিন্তায় ও কর্মে প্রবল বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছে। বঙ্গদর্শনের রচনা শুধু রসবিলাস বা তত্ত্বচর্চা নয়; এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল জাতির জীবনে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসা। এ-পরিবর্তন আধুনিক জীবনবোধে বাঙালি চিত্তকে উপনীত করে দেওয়ার জন্যই দরকার ছিল। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি আপাতদৃষ্টিতে তাত্ত্বিক বলে মনে হলেও এই-সব পাশ্চাত্য দার্শনিক তত্ত্ব, এবং ইতিহাস-আলোচনার বিশিষ্ট প্রকৃতি থেকে বঙ্গদর্শনের জীবন-ঘনিষ্ঠ মর্মবাণী আমাদের অগোচর থাকে না। বঙ্গদর্শন সাময়িক সমস্যা নিয়ে সোজাসুজি বিচারে প্রবৃত্ত হয় নি। রাজনীতি সামাজিক বা ধর্মীয় আন্দোলনের দোষগুণ নিয়ে প্রবন্ধ ফাঁদে নি। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্র-নাথের মতবৈষম্য বা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে আলাদা কোনো প্রবন্ধ দেখা যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১, ১৮৭৩) গ্রন্থের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি (আষাঢ় ১২৮০) লেখেন। সম্ভবত সাময়িক উপলক্ষ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই একটি প্রবন্ধই লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলনকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করেন নি। সমর্থন না করার যে কারণ তিনি দেখিয়েছেন তার যুক্তিযুক্ততার বিচারে প্রবেশ আমাদের বর্তমানে অনাবশ্যক, কিন্তু এটা অবশ্যই লক্ষ্য করব যে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে জাতির নীতি এবং আচরণের একটা তাত্ত্বিক মূল্যমানই রচনা করে দিতে চেয়েছেন। সেই যুক্তিবাদ এবং আদর্শ স্বীকার্য হলে সাময়িক সমস্যাগুলির মীমাংসা অনায়াসসাধ্য হতে পারে। বিধবাবিবাহ সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের আলাদা আলোচনা নেই, কিন্তু সাম্যে (কার্তিক ১২৮২) স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার-তত্ত্ব প্রসঙ্গে সে-আলোচনা এসেছে।

বস্তুত এ-সব সমস্যাকে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির জীবন-মরণ সমস্যা বলে ভাবতেন কি না সন্দেহ। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে এবং বিদেশী শিক্ষা ও রুচির সংঘাতে জাতির জীবনে যে আলোড়ন এবং রূপান্তর আসবে সেটাই অধিকতর উদ্বেগের বিষয়। কারণ তার সঙ্গে জড়িত আছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। আধুনিক যে-সব মূল প্রশ্ন আমাদের মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল বঙ্গদর্শন সেই-সব আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। নতুন শাসন-রাজ আমাদের সমাজকে নাড়া দিয়েছে। বাঙালি পরিবার-প্রথার মধ্যে আসছে পরিবর্তন। একান্নবর্তী পরিবার অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনৈতিক এবং রুচিগত কারণে। এভাবে পরিবার বিযুক্ত হতে থাকলে তার পরিণাম সুদূরপ্রসারী। সমাজের চেহারাই বদলে যায়। বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রশ্ন বস্তুত এই সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গেই যুক্ত। এই সমাজ-পরিবর্তনের আলোচনাই স্বভাবত বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলেছে; এর পরিণাম তিনি চিন্তা করেছিলেন।

এই চিন্তার ফল আমরা বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের কৃষক' (ভাদ্র, কার্তিক ১২৭৯) প্রবন্ধে 'সাম্যে' (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১২৮০ এবং কার্তিক ১২৮২), কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার মন' (মাঘ ১২৮০) প্রভৃতি রচনাগুলিতে পাই। এই পরিবর্তনের ভালো-মন্দ দুই দিকই আছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তনকে রোধ করা সম্ভব নয়। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙবেই, ভাঙা অকারণও নয় অবাঞ্ছনীয়ও নয়। 'একান্নবর্তী পরিবার' নামে একটি প্রবন্ধে (আশ্বিন ১২৭৯) এর দোষগুণ আলোচনা করা হয়েছে। লেখক পৃথগন্ন পরিবারকেই স্বীকার করে নিতে বলেছেন। আবার এই অবস্থান্তর শুধু যে অর্থনৈতিক কারণেই ঘটে তা নয়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্রমোন্মেষও এর কারণ। শিক্ষা-দীক্ষার বিভিন্নতার ফলে রুচি এবং মতের পার্থক্য ঘটে। আধুনিক সমাজ-জীবনের এই লক্ষণটি বঙ্গদর্শনে নানাসূত্রে আলোচিত হয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের ইনডিভিজুয়ালিজমের

বাংলা করা হয়েছে 'স্বস্বভাবানুবর্তিতা'। মিলের অনুসরণে এই মতটির বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বঙ্গদর্শনের দুই সংখ্যায় (শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৭৯)। এই আলোচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রচালিত সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান ছিল না। একালে শাস্ত্র-বন্ধন শিথিল হওয়াতে সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টি-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটছে। আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছি। 'ঐক্য' (মাঘ ১২৭৯) নামে একটি প্রবন্ধে লেখক বলছেন—

'এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমরা প্রাচীনকালে যে প্রণালীতে ঐক্য সাধন করিতাম এক্ষণে তাহা পুনরুত্থাপন করিবার সম্ভাবনা নাই।···অতএব পরামর্শ এই যে দলবদ্ধ হইবার জন্য পদে পদে এরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট করা উচিত যে প্রত্যেকে আপন কর্তব্যকর্ম স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারে এবং তাহা প্রতিপালন করা সকলের পক্ষে সুসাধ্য হয়।'

মিলের ইনডিভিজুয়ালিজম্ এবং ডেমোক্রেসির অনুসরণেই বর্তমান কালে আমাদের সমাজেও এই নীতি পরিগ্রহের কথা বিচার্য। আধুনিক অথচ নিজস্ব এক চিন্তাশক্তির পরিচয় বঙ্গদর্শনের লেখায় ফুটে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রেরই নায়কতায়। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একালে'র সমালোচনায় (পৌষ ১২৮১) বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী অনুকরণকে জাতির জাগরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন। আবার বিদেশী ব্যর্থ অনুকরণকে ব্যঙ্গ করেও তিনি নানাস্থানে মন্তব্য করেছেন। 'প্রাচীনা ও নবীনা' (বৈশাখ ১২৮১) প্রবন্ধে এই অন্ধ অনুকরণের নিন্দা আছে।

আধুনিক অর্থে বিশ্বমানবতাবাদের প্রচার বঙ্গদর্শন করে নি। জাতিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ না রাখার কল্পনা তখনও দেখা দেয় নি। সে-জন্যই নিজস্ব ভাবসম্পদ গড়ে তুলবার ভাবনাই বঙ্গদর্শনে ছড়িয়ে আছে দেখতে পাই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছিলেন—

'বাঙ্গালা সাহিত্যে উঁহার কোন কাজ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য হইয়াছেন, অন্য কেহই সেরূপ হয় নাই।'

এই ঘরে ফেরার অর্থ মধ্যযুগীয় বিচারহীন অন্ধ মূঢ়তায় নয়— আধুনিক সভ্যতাসূর্যের আলোক-স্নানে অবগাহন করে নতুন প্রাণ নতুন উৎসাহ নতুন দৃষ্টি নিয়ে নিজেরই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। বঙ্গদর্শন বাঙালিকে ঐতিহ্য-চেতন করে তুলেও চেষ্টা করেছে নতুন রুচি এবং দৃষ্টি দিতে। বঙ্গদর্শনে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প' (ভাদ্র ১২৮১) বের হয়, তখন দেশীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন আরম্ভ হয় নি। বাঙালিকে শিল্পতত্ত্ব এবং সংগীত-রুচিতে নতুন করে দীক্ষা দিতে বঙ্গদর্শনই উদ্যোগী হয়েছে। রামদাস সেন ভারতবর্ষের 'সঙ্গীতশাস্ত্র' (ফাল্গুন ১২৮০) 'প্রাচীন হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়' (শ্রাবণ ১২৮০) জগদীশনাথ রায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'সঙ্গীত' বিষয়ে নতুন করে আলোচনা করলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বস্তুত একা বঙ্কিমচন্দ্রই করেছিলেন। সাহিত্য-তত্ত্বেও তিনি নির্দেশ করলেন এক অতি উচ্চ মান, সে-মানের প্রয়োগও দেখালেন কালিদাস এবং শেক্সপীয়রের সৃষ্টির তুলনাত্মক আলোচনায়। সাহিত্যতত্ত্বের সূত্রগুলি পাশ্চাত্য সাহিত্যনীতি থেকে নিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। সাহিত্য-সূত্র ইংরেজি সাহিত্য থেকে নিলেও তাঁর উপন্যাসের চরিত্র এবং পরিবেশ বাঙালির আপন জাতীয় প্রকৃতির উপাদান দিয়েই তিনি গড়লেন। বঙ্গদর্শন বাঙালিকে ঘরে ফিরতেই বলেছে, কিন্তু চক্ষু কর্ণ ডানায় ঢেকে মূঢ় নিশ্চিন্ততায় সমাহিত হতে বলে নি।

বাংলার ডোকরাশিল্প ও শিল্পীজীবন

বিনয় ঘোষ

বাংলার ডোকরা কামারদের ধাতুশিল্প একটি অতিপ্রাচীন লোকশিল্পের নিদর্শন তো বটেই, সাংস্কৃতিক সমান্তরতারও একটি বিশেষ উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্বকালের অনেক বড় বড় যুগান্তকারী আবিষ্কার (inventions)— যেমন অগ্নি-উৎপাদন, কৃষি বা ফসল-উৎপাদন— অনেক ক্রমায়ত শিল্পকর্ম (traditional arts and crafts), যেমন কাঠখোদাইশিল্প মৃৎশিল্প ধাতুশিল্প— এবং জীবন ও পরিবেশগত অনেক রহস্যচিন্তা, যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি— তার বিকাশ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে, মোটামুটি সভ্যতার সমস্তরে, জীবনযাত্রার অনুরূপ বাধ্যতায় ও প্রয়োজনে। দৈশিক দূরত্ব তার যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু কালিক দূরত্ব সামান্য। সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা বিচ্ছুরণবাদী (diffusionist), একদা তাঁদের ধারণা ছিল যে এই-সব জনকৃতির বিকাশ হয়েছে এক-একটি বিশেষ ভৌগোলিক কেন্দ্রে এবং অতঃপর সেখান থেকে অন্যান্য জনপদে তার প্রসারণ ও বিচ্ছুরণ হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা আধুনিক মানববিজ্ঞানের গবেষণার আলোয় একরকম ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে বলা চলে। বিভিন্ন দেশে ও ভৌগোলিক কেন্দ্রে, সদৃশ সংস্কৃতিকর্মের স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল বিকাশের ধারা আধুনিক মানববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যসহযোগে প্রমাণ করেছেন, এবং এই ধারাকেই তাঁরা সাংস্কৃতিক সমান্তরতা (cultural parallel) বলেন। এই সমান্তর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন কৃষিকাজ, লিখনপ্রণালী (writing), ব্রোঞ্জ ইত্যাদির মতো মোমছাঁচ-গলানো ঢালাইরীতির ধাতুশিল্পও (lost wax বা *cire perdue* metal casting) অন্যতম নিদর্শন। বাংলার ডোকরাশিল্প এই বিশিষ্ট রীতি-অনুগামী ধাতুশিল্প, এবং এটি একটি অতিপ্রাচীন ভারতীয় জনকৃতিধারা, কোনো বিদেশাগত ধারা নয়। দৈশিক ব্যবধানের দিক থেকে দেখা যায়, ভারতবর্ষ থেকে মালয়-এশিয়া, প্রাচীন মিশর, আফ্রিকা থেকে সুদূর মধ্য-আমেরিকা পর্যন্ত এই lost-wax বা মোমছাঁচ-গলানো ধাতুশিল্পরীতির বিকাশ হয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। কালিক সামীপ্যের দিক থেকে দেখা যায়, সভ্যতার প্রায় সমস্তরে, Neolithic Age বা নবোপলীয় যুগে কৃষিকর্মের উন্নত পর্বে, যখন কারিগরি ও শ্রমকুশলতার চর্চা সম্ভব হয়েছিল, তখন এই বিশেষ ধাতুশিল্পের বিকাশ হয়।

এই মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের প্রাচীনতার পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র ও পুরাণাদি থেকে। মানসার, অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে এই ধাতুশিল্পরীতির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সংক্ষেপে শিল্পরীতিটি হল এই: স্থপক ও স্থপতি, অর্থাৎ শিল্পী প্রার্থনাদি ধর্মীয় ক্রিয়া-অনুষ্ঠান শেষ করে, ঢালাইয়ের জন্য চুল্লী এবং মূর্তির জন্য মোমছাঁচ তৈরির কাজ শেষ করবেন। মোমের সঙ্গে ধুনো ও তেলের আনুপাতিক মিশ্রণের কাজ সাবধানে করতে হবে। তার পর যে-মূর্তি গড়া হবে, সেটি শিল্পী বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে মোম-ধুনো-তেলের মিশ্রিত পিণ্ড দিয়ে তৈরি করবেন। ধ্যান করে নিখুঁতভাবে মূর্তি রূপায়িত করার কথা বলা হয়েছে শিল্পশাস্ত্রে। মোমছাঁচের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তাতে গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়ার জন্য ছিদ্র রাখা হবে। তার পর চুল্লী থেকে বার করে, জলে ঠাণ্ডা করে, ছাঁচটিকে ভেঙে ফেললে ভিতরের ধাতুমূর্তিটি বেরিয়ে আসবে, বাকি থাকবে ঘষে মেজে ঠুকে পরিষ্কার করার কাজ।

এই শিল্পরীতির মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। শিল্পটি যদিও ধাতুশিল্প (metalcraft), তা হলেও ধাতুর যে আসল নিরেট সত্তা তার যেন কোনো সক্রিয় ভূমিকাই নেই এর মধ্যে। অর্থাৎ ধাতুর স্বাভাবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই এই ধাতুশিল্পের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। এমন-কি, এর যা-কিছু শিল্পকর্ম তার সঙ্গেও আসল ধাতুর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, যাবতীয় সম্পর্ক ধাতু-নয় এমন-সব বস্তুর সঙ্গে, যেমন মোম ধুনো মাটি ইত্যাদি। ধাতুর প্রধান ভূমিকা হল এখানে নিজের কঠিন সত্তাটিকে আগুনের তাপে বিগলিত ও তরলিত করে ধাতুশূন্য ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করা এবং তারই অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হয়ে পুনরায় নিরেট কঠিন হয়ে যাওয়া। প্রক্রিয়াটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সরল মনে হলেও, ধাতুশিল্পের বিকাশের ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডোকরাশিল্প বা মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের আলোচনাকালে সাধারণত এই গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। নবোপলীয় যুগের আদিম কৃষিজীবী মানুষ যখন দেখল যে কঠিন নিরেট ধাতু আগুনের তাপে গলানো যায়, তখন কিভাবে তাকে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির কাজে লাগানো যায়, সে কথা তারা ভাবতে থাকল। তাদের ভাবনার সবচেয়ে সহজ সমাধান এই পন্থা বা রীতি, এবং সেটা অতি সহজেই তারা মৃৎশিল্পীর (clay-modeller's) অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্‌ভাবন করল। কাজটা এক্ষেত্রে সবটুকুই প্রায় প্রধানত মৃৎশিল্পীর, এবং পরিষ্কার বোঝা যায় যে নবোপলীয় যুগের মৃৎশিল্প থেকে chalco-lithic বা তাম্রপ্রস্তর যুগের ধাতুশিল্পে উত্তরণকালে এই মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পরীতির বিকাশ হয়। ভারতের সিন্ধুসভ্যতা ও প্রাচীন মিশরের এই রীতির ধাতুশিল্প-নিদর্শন থেকে তা প্রমাণিত হয়। প্রত্নবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরাও এ কথা স্বীকার করেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বাংলার ডোকরাশিল্প একটি অতিপ্রাচীন ধাতুশিল্প, প্রত্নবিজ্ঞানের বিচারে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও এই সুপ্রাচীন লোকায়ত শিল্পধারা আজ পর্যন্ত বহমান রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন বাংলাদেশে।

পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীর ধাতুশিল্পীদের 'ডোকরা কামার' বলা হয়। কেউ কেউ 'ঢোকরা' বলেন, কিন্তু কথাটা 'ডোকরা'। যারা লোহার কাজ করে তাদের বলা হয় 'কামার' বা 'কর্মকার' বা 'লোহার', আর যারা অন্যান্য ধাতুর কাজ করে, যেমন সোনা-রূপার, তাদের বলা হয় 'স্যাকরা'। পশ্চিমবঙ্গের ডোকরারা সাধারণত 'কামার' নামেই পরিচিত, কোথাও কোথাও তারা নিজেদের 'স্যাকরা' বলেও পরিচয় দেয়। কিন্তু তাদের 'ডোকরা' বলা হয় কেন? 'ডোকরা' কথার অর্থ ইতরজন, অন্ত্যজ, নীচকুলোদ্‌ভব, যেমন—

কোথা হইতে বুড়া এক ডোকরা বামন
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ। —ভারতচন্দ্র

এই অবজ্ঞাসূচক অর্থেই বাংলার এই সুপ্রাচীন লোকশিল্পের উত্তরাধিকারীদের 'ডোকরা কামার' বলা হয়। বস্তুত ডোকরারা আজ আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তরের জীব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল সামাজিক মানমর্যাদার দিক থেকে যে নিম্নতম স্তরের তা নয়, দারিদ্র্যের দিক থেকেও। এই ডোকরাদের সঙ্গে বাংলার চিত্রকর বা পটুয়াদের সামাজিক জীবনের অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। সে কথা পরে বলব।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে, প্রধানত বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়, বর্তমানে ডোকরা কামারদের বসতি সীমাবদ্ধ। তার মধ্যে দেখা যায়, মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলের (যেমন খড়্গপুর) এবং বর্ধমানের (যেমন আউসগ্রাম থানার দরিয়াপুর) ডোকরারা বাইরে থেকে— বেশির ভাগ বাঁকুড়া থেকে

বাংলার ডোকরাশিল্পের নিদর্শন

ডোকরাশিল্পের নিদর্শন এবং ডোকরা-শিল্পী

এসে বসবাস করছে। বিবাহসূত্রে অথবা ভ্রাম্যমান কর্মজীবনের টানে তারা এসেছে। এই ভ্রাম্যমানতা একদা ডোকরাজীবনের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো কিছু কিছু আছে পুরুলিয়া অঞ্চলে, তাই ডোকরাদের স্থায়ী বসতিকেন্দ্রের সংখ্যা বেশ কম। এখন তাদের প্রধান বসতিকেন্দ্র বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রাম। বর্তমানে বাঁকুড়ার বিক্‌না (বাঁকুড়া সদর থানা), লক্ষ্মীসাগর (খাতড়া থানা), বিন্ধ্যজাম ও নেতকাম্‌লা (সালতোড়া থানা) গ্রামে ডোকরাদের বসতি আছে। বিকনায় দশটি পরিবার, লক্ষ্মীসাগর ও বিন্ধ্যজামে তিনটি করে পরিবার এবং নেতকাম্‌লায় পাঁচটি পরিবার বাস করে। ১৯৬৯-৭০ সালে আমার নিজের সমীক্ষার কথা বলছি। ১৯৭২ সালের মধ্যে পরিবারসংখ্যা কিছু কমে যাওয়া অসম্ভব নয়। কয়েক বছর আগে বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে রামপুরে যে ডোকরাদের বাস ছিল, সরকারী পোষকতায় শিল্পীসমবায়ের উদ্‌যোগে তাদের নতুন উপনিবেশ গড়া হয়েছে বিক্‌নায়। কিন্তু ১৯৭০ সালে বিক্‌নার এই নতুন উপনিবেশের যে চেহারা দেখেছি, তাতেও ডোকরাশিল্পীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হতে পারি নি। শ্রীমতি রুথ রীভ্‌স তাঁর *Cire Perdue Casting in India* গ্রন্থে বাংলার ডোকরাশিল্পীদের আলোচনাপ্রসঙ্গে কেবল রামপুরের ডোকরাদের (যারা এখন বিক্‌নাতে বাস করে) কথা বলেছেন, তাদের অন্যান্য বসতিকেন্দ্র দেখেন নি। তার ফলে তাঁর বিবরণ থেকে বাংলার ডোকরাদের কথা সম্পূর্ণ জানা যায় না।

বিক্‌নার ডোকরারা এখন লক্ষ্মী গজলক্ষ্মী লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ-কার্তিকসহ শিব-পার্বতী, হাতী ঘোড়া পেঁচা মাছ ময়ূর প্রভৃতি দেবদেবী ও পশুপক্ষীর মূর্তি তৈরি করে, প্রধানত শিল্পীসমবায়ের ও সরকারের চাহিদা অনুযায়ী। এই পোষকতার জন্য তাদের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য ডোকরাদের তুলনায় অনেকটা ভালো, অন্তত কয়েকজন দক্ষ কারিগরের। নেতকাম্‌লা ও বিন্ধ্যজামের ডোকরারা দেবদেবী পশুপক্ষীর মূর্তি গড়ে না, একসেরী থেকে একছটাকী পর্যন্ত নানা আকারের পাইকোনা (মাপের খুচি), পায়ের মল, নূপুর, সাঁওতালী নাচের ঘুঙুর ইত্যাদি তৈরি করে। লক্ষ্মীসাগরের ডোকরারা মূর্তি গড়ে এবং স্থানীয় বাজারে হাটের দিনে ও উৎসব-পার্বণের মেলায় বিক্রি করে। তবে স্থানীয় চাহিদা তেমন নেই। নেতকাম্‌লা ও বিন্ধ্যজামের ডোকরাশিল্পীরা নিজেদের 'ডোকরা' বলে পরিচয় দেয় না, 'ডোকরা' বললে ক্ষুব্ধ হয় এবং 'স্যাকরা' বলে পরিচয় দেয়। এটা সাম্প্রতিক ব্যাপার এবং এর কারণ পরে বলছি।

পুরুলিয়া (মানভূম) অঞ্চলে এই শ্রেণীর শিল্পীদের বিচ্ছিন্ন বসবাসের কথা শোনা যায়, কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া মুশকিল। অনেক খোঁজখবর করে কয়েকটি মাত্র বসতির সন্ধান পেয়েছি, যেমন—নডিহা (পুরুলিয়া টাউন থেকে মাইল দুই দূরে), আক্রো (বান্দোয়ান থেকে পাঁচ মাইল), পাবড়াপাহাড়ী (হুড়ার কাছে), কুলাবহাল (লোধুড়কার কাছে), নরকলি (মানবাজারের কাছে)। গড়ে তিন-চারটি করে শিল্পী-পরিবার বাস করে এই গ্রামগুলিতে এবং পরিবার-প্রতি দু-তিনজন কারিগর বা শিল্পী কাজ করে। পুরুলিয়ায় 'ডোকরা' কথার বিশেষ প্রচলন নেই, এই ধাতুশিল্পীরা সাধারণত 'মাল' ও 'মালহার' নামে পরিচিত। এই মাল ও মালহাররা বলে যে, বাঁকুড়া-মেদিনীপুর অঞ্চলে যারা ডোকরা ও স্যাকরা বলে কথিত, তারা একদা তাদেরই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। পরে উন্নত হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে এসে তারা নিজেদের মাল ও মালহারদের থেকে উন্নত ভাবতে আরম্ভ করেছে। বাঁকুড়ার ডোকরাদের সম্পর্কে পুরুলিয়ার মালহারদের এই অভিযোগ আমি অনেক জায়গায় শুনেছি। অথচ বাঁকুড়ার ডোকরারা বলে যে মাল ও মালহাররা তাদের চেয়ে অনেক ছোট জাত, আবার ডোকরা-রূপী স্যাকরারা বলে ডোকরারা ছোট,

যদিও বাঁকুড়ার হিন্দুসমাজের কাছে ডোকরাদের ও তাদেরই সগোত্র তথাকথিত স্যাকরাদের মতো ছোট জাত এবং উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র আর দ্বিতীয় কেউ নেই, চিত্রকররা ছাড়া। ডোকরারা যেখানে বাস করে, সমাজের সেই প্রায়ান্ধকার কানাচে পর্যন্ত এরকম সূক্ষ্ম জাতবিচার ও সামাজিক মানমর্যাদার মন-কষাকষির কথা ভাবলে বাস্তবিক অবাক হতে হয়। কিন্তু অবাক হলেও, মাল-মালহার-ডোকরা-স্যাকরাদের এই বিভেদবোধের মধ্যে সমগ্রভাবে ডোকরাশিল্পীদের জীবনের পর্বানুক্রমের আভাস পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাল-মালহার থেকে ডোকরা-স্যাকরা পর্যন্ত বিকাশের স্তরগুলি বোঝা যায়।

ডোকরাশিল্পীদের সামাজিক জীবনের এই পূর্বানুক্রমের বিস্তারিত বিবরণের অবকাশ নেই এখানে, যদিও সেই বিবরণ অত্যন্ত মনোগ্রাহী। খুব সংক্ষেপে আমরা পরিবর্তনের ধারাটি উল্লেখ করব— ডোকরাদের বিশেষ ধাতুশিল্পরীতির পরিবর্তন নয়, কারণ তার কোনো পরিবর্তন হয় নি— শিল্পীদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন। প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল, দক্ষিণ বাঁকুড়ার ডোকরাদের সামাজিক সম্পর্ক (বিবাহ ইত্যাদি) মেদিনীপুর বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু উত্তর-বাঁকুড়ার ডোকরাদের সমাজের বিস্তার পুরুলিয়া সিংভূম ছোটনাগপুরের ভিতর দিয়ে আরো দূর পর্যন্ত। এই দ্বিমুখী সামাজিক জীবনের প্রসারের তাৎপর্য পরিষ্কার। ছোটনাগপুর-অভিমুখী সমাজ ডোকরাদের আদি ও অতীত জীবনের ধারা ইঙ্গিত করছে, দক্ষিণ বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-বর্ধমান -অভিমুখী সমাজ হিন্দুসমাজের সান্নিধ্যজনিত ডোকরাদের পরবর্তী পরিবর্তিত জীবনধারা ইঙ্গিত করছে। আরো-একটি বিষয় লক্ষণীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় আচার-আচরণের দিক থেকে ডোকরা কামাররা না-হিন্দু না-মুসলমান, অথবা কোথাও হিন্দু, কোথাও-বা মুসলমান, যেমন পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর-পটুয়ারা। এরকম সামাজিক জীবনের সাদৃশ্য এ দেশের আর-কোনো লোকশিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, উত্তর-বাঁকুড়া থেকে ছোটনাগপুর-অভিমুখী ডোকরাশিল্পীরা আজও প্রকাশ্যে ইসলামধর্মী, অন্তত তারা যে মুসলমান সে কথা বলতে তাদের কোনো দ্বিধাসংকোচ নেই। কিন্তু দক্ষিণ বাঁকুড়া-মেদিনীপুর -অভিমুখী ডোকরাশিল্পীরা মুসলমানত্ব স্বীকারই করতে চায় না, এ বিষয়ে ইঙ্গিত করলেও ক্ষুব্ধ হয়। তারা যে হিন্দু এ কথা বেশ জোর করেই তারা ঘোষণা করে, এবং কেউ একটু সন্দেহ প্রকাশ করে কোনো কথা বললে তৎক্ষণাৎ বসতিকেন্দ্রের তুলসীমঞ্চটি দেখিয়ে দেয়। এর জন্য অনুসন্ধানকালে মধ্যে মধ্যে আমাদের বেশ বিপদে পড়তে হয়েছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

বিক্‌নার নতুন সমবায়-উপনিবেশে শিল্পীদের ঘরদোর যাই হোক-না কেন, তুলসীমঞ্চটি বেশ সযত্নে স্থাপিত মনে হয়। শিল্পীদের উপাধি 'কর্মকার' এবং নাম রাজেন্দ্র ধনু যুগল উপেন্দ্র নব শম্ভু ইত্যাদির মধ্যে হঠাৎ জব্বর ও বাবুয়ার মতো দু-তিনটি নাম কানে লাগে। তুলসীমঞ্চের দিকে চেয়ে ভয়ে কোনো প্রশ্নও করা যায় না। নীরবে জব্বর কর্মকারের নামের সাংস্কৃতিক মাধুর্যের কথা চিন্তা করতে হয়। উত্তরে শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে নেতকাম্‌লা ও বিদ্ধ্যজাম গ্রাম। ১৯৬৭ সালে নেতকাম্‌লার ডোকরারা 'মাল' উপাধি ব্যবহার করত, ১৯৬৯ সালে তারা 'স্যাকরা' হয়ে গেল। সনাতন মাল হল সনাতন স্যাকরা, অথচ মালডাঙ্গা জায়গার নাম বাঁকুড়ায় এখনো আছে, সেটা স্যাকরাডাঙা করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যখন তারা 'মাল' ছিল, তখন তারা যে না-হিন্দু না-মুসলমান সে কথা স্বীকার করতে

কুণ্ঠিত হত না। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন, দু-তিন বছর আগে কোনো হিন্দু সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা এই সব অঞ্চলের আধা-মুসলমানদের পুরো হিন্দু করার অভিযানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তার ফলেই আধা-মুসলমান মালরা পুরো হিন্দু স্যাকরা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি, এই পুরো হিন্দুত্বের চারি দিকে ছিদ্র, ডোকরা বা স্যাকরাদের পরিধানের বস্ত্রের মতো, এবং তালি দিয়ে তা ঢাকা যায় না। নেতকাম্‌লার 'স্যাকরা'দের অতিনিকট আত্মীয়স্বজন চার মাইল দূরে বিন্ধ্যজামে বাস করে। তাদের উপাধিও 'স্যাকরা', কিন্তু তারা যে মুসলমান সে কথা তারা স্বীকার করে। পিতামহের নাম রহিম স্যাকরা, পিতার নাম সুচাঁদ স্যাকরা, পুত্রের নাম আলিজান স্যাকরা। পিতামহের নাম রহিম স্যাকরা, পিতা মতিলাল স্যাকরা, পুত্র দিলজান স্যাকরা। মেয়েদের নাম কমলা বিবি, বিলাসী বিবি, মুসুরি বিবি, লক্ষ্মী বিবি ইত্যাদি। বিবাহে ও ধর্মকর্মে মুসলমানী আচার তারা পালন করে, কাছে আবার মসজিদেই অনুষ্ঠান হয়। বিবাহিত মেয়েরা সিঁথেয় সিঁদুর দেয়, হাতে নোয়া পরে (শাঁখা নয়)। সমাধি, ছুন্নৎ, তালাক বা ডিভোর্স, বিধবার পুনর্বিবাহ ইত্যাদিও পালিত হয়। নেতকাম্‌লা-বিন্ধ্যজামের ডোকরা-স্যাকরাদের আত্মীয়রা থাকে পুরুলিয়ার নডিহা আক্রো প্রভৃতি অঞ্চলে। তারা পুরো মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। শিল্পীদের নাম শেখ ইসমাইল, শেখ শম্ভু, শেখ দবিরুদ্দিন, শেখ ফকির ইত্যাদি। কিন্তু তারা ডোকরাদের পদ্ধতিতে দেবদেবীদের ধাতুমূর্তি গড়তে পারে, যা নেতকাম্‌লা-বিন্ধ্যজামের শিল্পীরা আজকাল আর পারে না, কেবল মল ঘুঙুর ঘাগর তৈরি করে। তা ছাড়া পুরুলিয়ার নডিহা প্রভৃতি অঞ্চলের ডোকরাশিল্পীরা পুরো মুসলমানত্ব স্বীকার করলেও হিন্দু দেবদেবীর মাটির প্রতিমাও গড়ে। বাংলার চিত্রকরদের সঙ্গে এক্ষেত্রেও এদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। পুরুলিয়ার ডোকরাশিল্পীরা আবার আত্মীয়তাসূত্রে সিংভূম ছোটনাগপুরের বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত আবদ্ধ। তারা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান খানিকটা পালন করে বটে, কিন্তু মুসলমানত্বও অস্বীকার করে না। দেবদেবী পশুপক্ষী থেকে আদিবাসীদের মল ঘুঙুর গহনা পর্যন্ত সবই ডোকরা-রীতিতে তৈরি করতে পারে। এইভাবে উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ ও আরো দূর পর্যন্ত এই ধাতু-শিল্পীদের আত্মীয়তার যোগসূত্র প্রসারিত। উত্তরভারতের কথা বলছি, দক্ষিণভারতের কথা স্বতন্ত্র।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ডোকরাশিল্পী যাদের আমি দেখেছি, তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ বিক্‌নার রাজেন্দ্র কর্মকার। ১৯৭০ সালে রাজেন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তার বয়স ছিল ৯৫ বছর। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী রিভার্স (W. H. R. Rivers) তাঁর 'Ethnological Analysis of Culture' প্রবন্ধে (*Psychology and Ethnology* : London 1926) বিলীয়মান জনগোষ্ঠীর লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে অতিবৃদ্ধদের স্মৃতিকথাকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো মূল্যবান বলেছেন। রিভার্স লিখেছেন :

> In many parts of such a region as Melanesia, it is even now *only from the old men that any trustworthy information can be obtained*, and it is no exaggeration to say that with the death of every old man there and in many other places there goes, and goes for ever, knowledge, the disappearance of which the scholars of the future will regret as the scholars of the past regretted such an event as the disappearance of the Library of Alexandria. (Italics বর্তমান প্রবন্ধলেখকের)।

রিভার্সের এই উক্তির কথা মনে করে বিক্‌নার অতিবৃদ্ধ ডোকরা রাজেন্দ্রর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। প্রধানত আমি তাকে ডোকরাসমাজের মৌল গড়ন জানার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করেছি, তার কারণ যে-কোনো জনগোষ্ঠীর সমাজের এই মূল কাঠামোটি বাইরের ভিন্ন জনসমাজের সংস্পর্শে ও সংঘাতে সহজে বদলায় না, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। তাই সামাজিক গঠনবিন্যাস (social structure), রিভার্সের মতে, 'furnishes by far the firmest foundation on which to base the process of analysis of culture.' কিন্তু যেহেতু 'most of the essential social structure of a people lies below the surface', সেইজন্য ঠিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মতো ধৈর্য ধরে প্রশ্ন করে করে তা উদ্‌ঘাটন করতে হয়। কতকটা আমাকেও তাই করতে হয়েছিল। প্রশ্নোত্তরে রাজেন্দ্র যা বলেছিল তার মর্ম এই :

ডোকরাদের আদি বাসভূমি হল নাগপুর বা ছোটনাগপুর। সেখান থেকে রাজেন্দ্রর জন্মের প্রায় চার-পাঁচ পুরুষ আগে, অর্থাৎ প্রায় তিন শো বছর আগে, তার পূর্বপুরুষরা ঘুরতে ঘুরতে সিংভূমের রাঁচি চাইবাসা প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুকাল বাস করে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের দিকে আসে। বিষ্ণুপুর টাউনের কাছে গোপালপুরে রাজেন্দ্রর পিতামহ এসে বাস করতে আরম্ভ করে। প্রায় দু শো বছর আগেকার কথা। বিষ্ণুপুরের রাজারা তাদের বাস্তু ও চাষের জমিজমা দিয়েছিলেন বলে তারা বেশ কিছুকাল সেখানে বসবাস করেছিল, যদিও কোথাও দীর্ঘকাল বসবাস করা তাদের রীতি নয়। কেন রীতি নয়? প্রশ্নের উত্তরে রাজেন্দ্র সরল ভাষায় বললে, 'কারণ আমরা ধাতুর জিনিস গড়ি, সহজে তা নষ্ট হয় না, কাজেই স্থানীয় লোকের চাহিদা মিটে গেলে আমাদের অন্য জায়গায় কাজের জন্য যেতে হয়।' ডোকরাশিল্পীরা প্রধানত ধর্মীয় শিল্পবস্তু ও অলংকারাদি ধাতু দিয়ে তৈরি করত, কর্মকার (লোহার) কুম্ভকার ও সূত্রধরদের মতো গ্রাম্যলোকের প্রয়োজনীয় জিনিস বিশেষ তৈরি করত না (মাপের পাইকোনা ছাড়া), তার উপর তাদের তৈরি জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হত। কাজেই মার্কেট-পূর্ব যুগে স্বনির্ভর গ্রাম্যসমাজে তাদের স্থায়ী বসতির প্রয়োজন ছিল না। ভ্রাম্যমানতাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। এই ভ্রাম্যমানতার পর্বে মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অথবা ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বিষ্ণুপুর-গোপালপুর থেকে তারা বাঁকুড়া শহরের প্রান্তে রামপুরে আসে, সেখান থেকে বিক্‌নার কো-অপারেটিভ উপনিবেশে (১৯৬৮-৬৯)।

ডোকরাসমাজের মূল গড়ন সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে হলে সকলের আগে তাদের গোত্র (clan) ও উপজাতিভেদ (sub-castes) এবং পরস্পরের বিবাহরীতি সম্পর্কে জানা দরকার। এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে ডোকরাদের গোত্রভেদ ও উপজাতিভেদের কথা রাজেন্দ্র যা বলল তা এই :

গোত্র	উপজাতি
নাগ (নাগপুরিয়া)	ডোমার
বাঘ	চোরবন্দী
কর্কট	বান্‌থা
কচ্ছপ	কুলিয়ার

এই গোত্রগুলির মধ্যে বিবাহসম্পর্ক বহির্গোত্রীয় (exogamous)। বয়সে নবীন শিল্পী বৈকুণ্ঠ (জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত) গোত্রগুলি ঠিক বলে মেনে নিলেও, পূর্বোক্ত চারটি উপজাতির মধ্যে 'ডোমার' ও 'বান্‌থা'র

বদলে 'মণ্ডল' ও 'চৌধুরী' নামে দুটি নতুন উপজাতির কথা উল্লেখ করল। বিভিন্ন গোত্রের শিল্পী বিক্নাতেই দেখা গেল, যেমন রাজেন্দ্রর গোত্র 'বাঘ', বৈকুণ্ঠর গোত্র 'কচ্ছপ', যুগলের গোত্র 'নাগ'। এর মধ্যে তিনটি গোত্র প্রাণীসূচক টোটেম (totem), আর-একটি স্থানসূচক, যেমন 'নাগপুরিয়া' থেকে 'নাগ'। উপজাতিগুলি সমাজকর্মসূচক (functional)। যেমন :

ডোমার

ডোমারকে বলা হয় 'ভাঁড়ারে'। কোনো উৎসবপার্বণে ও অনুষ্ঠানে ভোজের ব্যাপার থাকলে যারা ডোমার তাদের উপর ভাঁড়ারের ভার থাকে। অনুষ্ঠানের আগে তাদের ডাকা হয় এবং ভোজের আয়োজন করতে বলা হয়। এইটাই হল ডোমারদের প্রধান কাজ।

চোরবন্দী

নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করা এবং ভোজনের সময় তাদের খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করার দায়িত্ব থাকে চোরবন্দীদের উপর।

বান্থা

ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন, যেমন ফুলফল লতাপাতা তেল তেঁতুল ও অন্যান্য জিনিস তা সংগ্রহ করার দায়িত্ব বান্থাদের।

কুলিয়ার

কুলিয়ার হল গণবিচারক। গোষ্ঠীভুক্ত যে-কোনো ব্যক্তির অন্যায় অপরাধ ও অভিযোগের বিচারের ভার কুলিয়াদের। গোষ্ঠীর প্রত্যেককে তার বিচার মেনে নিতে হবে, এই হল তাদের ঐতিহ্যগত অমোঘ নির্দেশ।

'মোহন্ত' নামে আর-একটি পঞ্চম উপজাতির কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছে, কিন্তু অনেকে তা স্বীকার করে না। মোহন্তদের কাজ হল হরকরাদের কাজ, অর্থাৎ গ্রামের ভিতরে বা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

হিন্দুসমাজের বৃত্তিগত জাতি-উপজাতিভেদের সঙ্গে ডোকরাদের পার্থক্য লক্ষণীয়। হিন্দু জাতি-উপজাতির মধ্যে স্বজাতিবিবাহ (endogamy) প্রচলিত, কিন্তু টোটেমিক গোত্রবিভক্ত আদিম সমাজের মতো ডোকরাদের মধ্যে ভিন্ন উপজাতির সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক প্রচলিত (exogamy)। পরিষ্কার বোঝা যায় যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও ডোকরারা কোনো সমাজেরই অঙ্গীকৃত হয় নি। ডোকরাসমাজের মূল গড়ন সেই আদিম টোটেমিক গোত্রবিভক্ত স্তরেই বিরাজ করছে। অবশ্য 'টোটেম' আছে, 'ক্লান' নেই এবং 'ক্লান' আছে, 'টোটেম' নেই, এরকম আদিম জনগোষ্ঠীও অনেক আছে। সে-বিষয় আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। এ যুগের বিখ্যাত ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভী-স্ট্রোজ (Claude Levi-Strauss) সম্প্রতি টোটেম, জাতি-উপজাতি ও সামাজিক বর্ণভেদ, এবং আদিম মানুষের চিন্তাধারার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তা থেকে আমাদের ভারতীয় সমাজের বিকাশধারার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় (*The Savage Mind*, London 1966— চতুর্থ অধ্যায় 'Totem and Caste' এবং *Totemism*, Pelican 1969, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। লেভী-স্ট্রোজ বলেছেন :

"The symmetry between occupational castes and totemic groups is an inverted symmetry. The Principle on which they are differentiated is taken from *culture* in one case and from *nature* in the other." (Italics বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের)।

মোট কথা ডোকরারা আজও 'প্রকৃতির' আদিম স্তর থেকে 'সংস্কৃতি'র উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে নি, সংস্কৃতিবান হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গণ্ডিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। সেইজন্য নৃবিজ্ঞানী রিভার্স তাঁর সারাজীবনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন— 'Even the whole religious cults can pass from one people to another without any real intermixture of peoples' (পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ)। উন্নত 'সংস্কৃতি'র টানে হিন্দুসমাজে যেমন একাধিক লোকশিল্পীগোষ্ঠীর স্থান হয়েছে, অবশ্যই নিম্নস্তরে, ডোকরাদের ঠিক তেমন হয় নি, যেমন হয় নি বাংলার পটুয়াদের। তাই ডোকরারা, যেমন হিন্দুসমাজে তেমনি মুসলমানসমাজে, আজও ভেলার মতো ভাসমান। ডোকরাশিল্পের কত কদর, শিল্পরসিক ও নন্দনতত্ত্ববিদের কাছে তার কত মর্যাদা, স্বদেশে ও বিদেশে পর্যন্ত, কিন্তু ডোকরা-শিল্পীরা অন্ত্যজের দুর্বিষহ অভিশাপে দ্রুতবিলীয়মান। এক দিকে সামাজিক উপেক্ষা অবহেলা, অন্য দিকে চরম দারিদ্র্য, এই দুয়ের সাঁড়াশীচাপে, ডোকরাশিল্পের ক্রমাবনতির কাহিনীও অত্যন্ত করুণ।

আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে ডোকরাশিল্পের শুধু নয়, যে-কোনো লোকশিল্পের ক্রমাবনতির সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না, লোকশিল্পীদের বসতি ও জীবনযাত্রা স্বচক্ষে দেখলেই বোঝা যায়। বাংলার অধিকাংশ পটশিল্পী দারুশিল্পী মৃৎশিল্পী আজ নিজেদের শিল্পকর্ম ছাড়া ক্ষেতমজুরের কাজ ক'রে জীবনধারণ করে, কারণ শিল্পকর্ম ক'রে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না। ডোকরাশিল্পীরাও তাই করে। তাদের সমস্যা আরো কঠিন, কারণ তাদের শিল্পকর্মের উপাদান প্রত্যেকটির বাজারমূল্য খুব বেশি, যদিও কাজকর্মের যন্ত্রপাতিগুলি (tools) সরল ও সুলভ। মৌল উপাদান ধাতুর কথাই ধরা যাক :

পাইকোনা ইত্যাদি	বিক্রয় মূল্য	ধাতুর পরিমাণ
একসেরী	১৫৲ টাকা	১৫০০ গ্রাম (প্রত্যেকটির জন্য)
আধসেরী	৮৲ টাকা	৯০০ গ্রাম
একপোয়া	৫৲ টাকা	৫০০ গ্রাম
আধপোয়া	৩৲ টাকা	৩০০ গ্রাম
একছটাকী	২৲ টাকা	২০০ গ্রাম
নূপুর	৯৲ টাকা জোড়া	৭০০ গ্রাম (একজোড়ার জন্য)
ঘুঙুর	১৲ টাকা (৮টি)	৫০০ গ্রাম (৭২টির জন্য)

ধাতু ছাড়াও অন্যান্য উপাদান যা লাগে, তেল ধুনো কয়লা মোম ইত্যাদি, তার প্রত্যেকটির দাম যথেষ্ট বেড়েছে এবং ক্রমে বাড়ছে, কমছে না। অথচ ডোকরাশিল্পীদের আর্থিক সঙ্গতি আদৌ বাড়ে নি। বিকনার ডোকরারা, সরকারী ও আধাসরকারী পোষকতা সত্ত্বেও, ৩৲ টাকা থেকে ৬৲ টাকা পর্যন্ত দৈনিক মজুরি

পায় (১৯৭০), অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পীদের (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) দৈনিক আয় গড়ে ২৲ টাকা থেকে ৩৲ টাকা। এই আয় থেকে শিল্পকর্মের জন্য মূলধন বিনিয়োগ সম্ভব নয়। তাই পুরুলিয়া চাকুলিয়া (সিংভূম) প্রভৃতি অঞ্চলে সস্তা মিশ্রধাতু (অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি) দিয়ে শিল্পীদের নানারকমের জিনিস তৈরি করতেও দেখা যায়। দেবদেবী পশুপক্ষী ইত্যাদির মূর্তিও ক্ষুদ্রাকারে যে-কোনো প্রকারে গড়া হয়, উপাদানের অভাবের জন্য। কাজেই কুলানুক্রমিক শিল্পকর্মে ডোকরাশিল্পীদের আর মন নেই, নিষ্ঠা নেই, আগ্রহ নেই। সামাজিক পরিবেশ এত দ্রুত এবং এত দূর বদলে গিয়েছে যে শিল্পীর জীবনের সঙ্গে শিল্পকর্মের কোনোরকম সংযোগ রক্ষা করাই আর সম্ভব হচ্ছে না।

ডোকরাশিল্পীদের বসতি-বিস্তার, ভ্রাম্যমানতা, সামাজিক গড়নবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিবরণ আগে দিয়েছি, সংক্ষিপ্ত হলেও তার ভিতর থেকে এই ধাতুশিল্পীগোষ্ঠীর জীবনের ঐতিহাসিক পর্বানুক্রমের একটা খসড়া এইভাবে করা যেতে পারে :

আদিপর্ব

নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকর্মের উন্নত পর্বে, ভারতবর্ষে তাম্রপ্রস্তর যুগে, এই ডোকরা-রীতির মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের বিকাশ হয়েছিল, যেমন হয়েছিল পৃথিবীর আরো অন্যান্য দেশে, প্রায় সমকালে। ভারতবর্ষেও কোনো বিশেষ কেন্দ্র থেকে এই ধাতুশিল্পের অন্যত্র বিচ্ছুরণ হয় নি, প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সমস্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে সমান্তরাল বিকাশ হয়েছিল। তার মধ্যে পূর্বভারতের ছোটনাগপুর-উত্তররাঢ় বা বাংলার পশ্চিমাংশ একটি প্রধান অঞ্চল। এটি হল ডোকরাশিল্পের আদিপর্বের প্রথম স্তর। এই পর্বে তারা 'মাল-মালহার' নামে পরিচিত ছিল।

আদি পর্বের দ্বিতীয় স্তরে প্রাচীন বৈদিক ও হিন্দুযুগে, প্রাক্-আর্য জনগোষ্ঠীকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করার যে সমস্যা দেখা দেয়, তার সমাধান করার জন্য যে-সব পন্থা উদ্‌ভাবন করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল— পেশা বা বৃত্তিভিত্তিক জাতিবর্ণবিন্যস্ত (occupational caste-hierarchy) সমাজ-গঠন। এই বৃত্তি-ভিত্তিক জাতিবর্ণবিন্যাসে সমাজের নিম্নস্তরের সোপানগুলিতে প্রাক্-আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা স্থান পায়, তাদের মধ্যে লোকশিল্পীরা নিঃসন্দেহে প্রধান গোষ্ঠী। তার পর্যাপ্ত নিদর্শন আজও হিন্দুসমাজে লোকশিল্পীদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে রয়েছে। সমাজের উপরতলা দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের স্রোত বয়ে গেছে, কিন্তু সমাজের নিম্নসোপানে 'হিন্দু' নামে গৃহীত ও অধিষ্ঠিত এই লোকশিল্পীদের জীবন ও বৃত্তিগত শিল্পকর্মের কোনো পরিবর্তন হয় নি, মধ্যে মধ্যে কেবল তারা সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের মধ্যে দু-এক ধাপ উপরে উঠে পরস্পর মর্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা করেছে মাত্র। এই হিন্দুপর্বেই তাদের একাংশের নাম হয় 'ডোকরা কামার'।

মধ্যপর্ব

মধ্যপর্বে মুসলমানযুগে, হিন্দুসমাজের অন্যান্য আরো অনেক অন্ত্যজ বর্ণের মতো, লোকশিল্পীরাও অনেকে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে, প্রধানত উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ও অবজ্ঞা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায়। যেমন ইংরেজযুগে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একটা বড় অংশ খ্রীস্টান হয়েছিল তেমনি। লোকশিল্পীরা অনেকে মুসলমান হয়েছিল,

কিন্তু কোনো শিল্পীগোষ্ঠী খ্রীস্টান হয়েছিল বলে, অন্তত বাংলাদেশে, আমার জানা নেই। মুসলমান হলেও লোকশিল্পীরা তাদের পূর্বাচরিত হিন্দু আচার-অভ্যাসগুলি ছাড়তে পারে নি, এবং তার ফলে মুসলমানসমাজেও তাদের সাঙ্গীকরণ অসমাপ্ত থেকে যায়। একূল ওকূল দু-কূল হারিয়ে তারা সমাজের উপেক্ষিত প্রান্তে ভাসতে থাকে। এরকম হিন্দু-মুসলমান দুকূল-হারানো ভাসমান লোকশিল্পীদের মধ্যে বাংলাদেশে প্রধান হল ডোকরাশিল্পী ও চিত্রকররা।

আধুনিক পর্ব

আধুনিক পর্বে তাদের এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি, বরং স্বাভাবিক অবনতি হয়েছে। মানববিজ্ঞানী রিভার্সের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি অনুযায়ী বলা যায় যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে-কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমগ্রভাবে আদানপ্রদান হলেও, তাদের পরস্পর মিলনমিশ্রণ ও সামাজিক অঙ্গীকরণ সম্ভব না হতেও পারে। তাই দেখা যায়, নমাজ ছুন্নৎ কবর ইত্যাদি প্রথা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যেমন ডোকরাশিল্পীরা মুসলমানসমাজে স্বজন বলে গৃহীত হয় নি, তেমনি বর্তমানে হরিসভা সংকীর্তন তুলসীমঞ্চ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও তারা প্রকৃত হিন্দুজন বলে গৃহীত হচ্ছে না। জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছাড়া কোনো সমাজেই বাংলার লোকশিল্পীদের মতো অনুন্নত জনগোষ্ঠীর সাঙ্গীকরণ ও স্বজনমর্যাদালাভ সম্ভব হবে না। আপাতত আমাদের সমাজে তার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

জীবনের সঙ্গে শিল্পকর্মের প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ নিশ্চয় শুদ্ধাচারী শিল্পরসিকরাও স্বীকার করবেন। যে ডোকরাশিল্পীদের জীবন বংশপরম্পরায় চরম সামাজিক অবজ্ঞা ও দারিদ্র্যের অভিশাপে জর্জর, তাদের শিল্পকর্মের স্ফূর্তি ও ক্রমোন্নতি নিশ্চয় কল্পনা করা যায় না। উপরন্তু যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন-প্রেরণার তাগিদ তাদের শিল্পকর্মে উৎসাহ দিয়েছে এককালে, আজ সেই প্রয়োজন ও প্রেরণা কোনোটাই নেই। অবশ্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডোকরাশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ উদ্‌যোগী হয়েছেন এবং কয়েকটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। প্রায়বিস্মৃত ডোকরাশিল্পকে তাঁরা যে অন্তত লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন এবং তার শৈল্পিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন, তার জন্য ডোকরাশিল্পী ও শিল্পরসিকরা নিশ্চয় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেকালের স্বনির্ভর গ্রাম্যসমাজে অভাব-অনটন-অমর্যাদা প্রভৃতি যেমন কতকটা সহনীয় ছিল, বর্তমান সমাজের উৎকট আত্মসর্বস্ব পরিবেশে তার কোনোটাই তেমন সহনীয় নয়। এই অবস্থায় বর্তমানে ডোকরাশিল্প ও শিল্পী উভয়ই দ্রুতবিলীয়মান। ডোকরাশিল্পের অবনতিও মনে হয় অবশ্যম্ভাবী। বেশি নয়, এক শো দেড় শো বছর আগেকার বাংলার ডোকরাশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দুপরিবারে এখনো দেখা যায়— সেগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিক ডোকরাশিল্পের তুলনা করলেই এই অবনতির পরিমাপ করা সম্ভব হবে। এবং এ কথাও মনে হবে যে শিল্পীদের সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছাড়া, তাদের প্রাপ্য সম্মান-মর্যাদা তাদের দেওয়া ছাড়া, আর এই শিল্পকর্মের প্রেরণা দিতে পারে এরকম নতুন সামাজিক চাহিদা (social demand) সৃষ্টি করা ছাড়া, কেবল বাইরের পোষকতায় ও লোকসংস্কৃতিসভার সহানুভূতিশীল বাহবায় ডোকরাশিল্প ও শিল্পীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে কি না!

রবীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

জন্ম : ১৬ আষাঢ় ১৩০০ । ২৯ জুন ১৮৯৩

মৃত্যু : ১৪ আষাঢ় ১৩৭৯ । ২৮ জুন ১৯৭২

তিনটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের অন্তরঙ্গ যোগ ছিল : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বিশ্বভারতী ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ছিল নাড়ির যোগ, বিশ্বভারতীর সঙ্গে অন্তরের ও আদর্শের ; আর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট তো তাঁর নিজের হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, ভারতীয় বিজ্ঞানসাধনার গৌরব।

বংশ ও পূর্বপুরুষ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের ঠিক পাশের তিনতলা বাড়ি, ২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, তাঁর জন্মস্থান। এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্রের পিতামহ গুরুচরণ মহলানবিশ। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের (মোগল আমলের পরগনা) পঞ্চসার গ্রাম মহলানবিশদের আদি বাসস্থান। এই পঞ্চসার গ্রামের প্রায় মাইলখানেক দূরে ছিল বল্লালসেনের রাজধানী। বল্লালসেনের পূর্বপুরুষ রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থকে নিমন্ত্রণ করে এনে প্রভূত জমিজমা দিয়ে নিজরাজ্যে স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, কিংবদন্তী এই যে, এই ঘটনাই হল পঞ্চসার নামের উৎপত্তির কারণ। ওই পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণ নাকি মহলানবিশ বংশের আদিপুরুষ। এঁর দশম বংশধর মহেশ্বরকে বল্লালসেন দিয়েছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি। এ হল দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। এর পর নবাবি আমলে বন্দ্যোপাধ্যায়রা অর্জন করলেন নতুন খেতাব— মহলানবিশ ; এই নামেই আজ পর্যন্ত তাঁরা পরিচিত।

জীবিকার অন্বেষণে আরো বহু বিক্রমপুরবাসীর মতো গুরুচরণ কলকাতায় আসেন, ১৮৫৪ সালে। তখন তাঁর বয়স ২১ বৎসর। পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ছিল, কিন্তু বংশবৃদ্ধির ফলে কালক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এই সম্পত্তির যেটুকু ভাগ গুরুচরণ লাভ করেছিলেন তা একটি ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তখন বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে নতুন এক সমাজ। গুরুচরণ ইংরেজি জানতেন না, কিন্তু তাঁর উন্মুখ মন বরণ করে নিল তখনকার দিনের প্রগতি-আন্দোলন। ১৮৬১ সালে গুরুচরণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করলেন এবং বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা অসাধারণ বাগ্মী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহচর হয়ে কলকাতার পথে পথে বেড়াতে লাগলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ক'রে। এর অল্পদিন পরেই তখনকার ব্রাহ্মদের মধ্যে এক উৎসাহী গোষ্ঠী শুরু করলেন নারী-মুক্তি আন্দোলন। গুরুচরণ এই গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৬৪ সালে গুরুচরণ তাঁর স্বগ্রামের একটি বিধবাকে বিবাহ করেন বিদ্যাসাগরের উদ্‌যোগে ও উৎসাহে। ব্রাহ্মদের পক্ষেও বিধবা-বিবাহ তখন ছিল দুঃসাহসিক কাজ, কেননা বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মরা

তখনো প্রতিষ্ঠালাভ করেন নি। এই ঘটনার এক বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল ব্রাহ্মযুবক মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (নববিধান) স্থাপন করলেন তখন গুরুচরণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এর তেরো বছর পরে ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ আর-একবার আন্দোলিত হল প্রতিবাদের ঝড়ে। এর ফলে প্রশস্ত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্থাপিত হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাস প্রভৃতির সঙ্গে গুরুচরণ এইবারও ছিলেন বিদ্রোহীদের দলে। গুরুচরণ যে একেবারে প্রথম থেকেই এই নবগঠিত সমাজের কাজে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি নির্বাচিত হন সমাজের প্রথম কোষাধ্যক্ষ। এর পর আরো কয়েকবার গুরুচরণ উক্ত পদে এবং ১৯০০ সালে এই সমাজের সভাপতি নির্বাচিত হন।

গুরুচরণের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুবোধচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তা ছাড়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য হয়েছিলেন। কনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র কিছুদিন পিতার ওষুধের দোকান দেখাশোনার পর নতুন এক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাবসা হল 'স্পোর্টিং গুড্‌স্' বা খেলাধুলার সরঞ্জাম ও গ্রামোফোনের দোকান। এই দোকানটি প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন তাঁর শ্যালক বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার; তাই দোকানটির নামকরণ হয়েছিল "কার অ্যাণ্ড মহলানবিশ"। কিছুকাল পরে প্রবোধচন্দ্রই হলেন দোকানটির একচ্ছত্র মালিক। চৌরঙ্গির এই দোকানটি যতদিন টিঁকে ছিল ততদিন ছিল বাঙালি খেলোয়াড়-ক্রীড়ামোদীদের প্রধান আড্ডা।

বাল্য ও কৈশোর

প্রবোধচন্দ্রের দুই পুত্র: জ্যেষ্ঠ প্রশান্ত ও কনিষ্ঠ প্রফুল্ল (যিনি 'বুলা' নামে সমধিক পরিচিত)। ১৮৯৩ সালের ২৯ জুন ২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে প্রশান্তচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৯০৮ সালে ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স পাস করে প্রশান্তচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন ও ১৯১২ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্স-সহ বি.এস্‌সি. পাস করেন। এর পর তিনি বিলাতযাত্রা করেন; সে আর-এক পর্ব। কিন্তু তাঁর উত্তর জীবনের পূর্বাভাস ইতিপূর্বেই যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল। কৈশোর যেতে-না-যেতেই তিনি বেশ তার্কিক হয়ে উঠেছিলেন ও শাণিত যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে পারতেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবে আচ্ছন্ন হন এবং পারিবারিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পান। রবীন্দ্রনাথ তরুণ প্রশান্তচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ ও বিশ্লেষণীশক্তিতে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই সময় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়— বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে যা তখন ছিল পরিচিত— নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানই ছিল। প্রশান্তচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের নাম-লেখা ছাত্র কোনোদিন না হলেও আশ্রমবাসীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ হয়। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি প্রশান্তচন্দ্রকে বলেন এই সংঘের সভ্য হওয়ার জন্য। এর এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র পুনরুদ্‌বোধন করেন। কবির নির্দেশে এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি মনোনীত হন প্রশান্তচন্দ্র।

বিলাত-যাত্রা: কেম্‌ব্রিজ

১৯১৩ সালে গ্রীষ্মকালে প্রশান্তচন্দ্র বিলাত-যাত্রা করেন— উদ্দেশ্য ছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস্‌সি,

ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন। কিন্তু কেম্‌ব্রিজে বেড়াতে গিয়ে তাঁর মত বদলে গেল। অতঃপর অক্টোবর মাসে কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯১৪ সালে প্রশান্তচন্দ্র গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপোজ-এর প্রথম ভাগ ও ১৯১৫ সালে পদার্থবিদ্যার ট্রাইপোজ-এর দ্বিতীয় ভাগ পাস করে কেম্‌ব্রিজের বি.এ. উপাধি লাভ করেন। দ্বিতীয় পরীক্ষাটি তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র অধ্যয়নশীল ছাত্র ছিলেন, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। তাই কেম্‌ব্রিজের নানা সভা-সমিতিতে তিনি উৎসাহের সঙ্গেই যোগ দিতেন। সেই সময়ে কেম্‌ব্রিজের যে-সব নামকরা লোক ছিলেন যেমন, বিশ্ববিখ্যাত বার্ট্রাণ্ড রাসেল, 'লেটার্স অফ জন চায়নাম্যান' -প্রণেতা ঐতিহাসিক লোয়েস ডিকিনসন (রবীন্দ্রনাথের "চীনাম্যানের চিঠি" দ্রষ্টব্য) ও গাণিতিক হার্ডি— প্রশান্তচন্দ্র তাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন ও এঁদের মধ্যে বিশেষ করে রাসেল তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিলেন। অবশ্য এ ছাড়াও ছিলেন কেম্‌ব্রিজের তাঁর আপন গুরু বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরির অধ্যক্ষ ইলেকট্রন-আবিষ্কর্তা স্যার জর্জ টম্‌সন।

আর-এক অসাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে কেম্‌ব্রিজে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ইনি হলেন গণিতের জাদুকর রামানুজন্। প্রধানত হার্ডির চেষ্টায় রামানুজন্ কেম্‌ব্রিজে গবেষণার সুযোগ পান। প্রশান্তচন্দ্র ও রামানুজন্ প্রায়ই একসঙ্গে লম্বা পথ হাঁটতে বেরোতেন ও এই সময় নানা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে এঁদের আলোচনা হত; সেরা গাণিতিকরাও যে-সব জটিল সমস্যার সমাধান করতে যথেষ্ট বেগ পেতেন, রামানুজন্ নাকি সে-সব সমস্যা সমাধান করতেন প্রায় চক্ষের নিমেষে।

কৃতিত্বের সঙ্গে কেম্‌ব্রিজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশান্তচন্দ্র গবেষণার জন্য একটি বৃত্তিলাভ করেন ও কী বিষয়ে গবেষণা করবেন তাও স্থির করে ফেললেন এবং তার পর অল্পদিনের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরলেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন : কর্মজীবন ও সংসার

দেশে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ পেয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে পরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস্টিক্‌স্-এ তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল ও বিলাত থেকে ফেরার সময় তাই সঙ্গে এনেছিলেন ওই বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা 'বায়োমেট্রিকা'র (*Biometrica*) কয়েকটি খণ্ড। পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চলল পরিসংখ্যানের চর্চা। শুধু তাই নয়, যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনপুরুষের যোগ তার কাজেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মায় ওই সময় থেকে। এই-সকল কারণে তাঁর আর এ সময়ে কেম্‌ব্রিজে ফেরা হয় নি। চাকুরিতে তিনি কিছুকাল পরেই পাকা হলেন উচ্চতম স্তরে অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে'। পরিসংখ্যান-চর্চাও শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলল। ১৯২৩ সালে প্রশান্তচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়ের কন্যা নির্মলকুমারীকে বিবাহ করেন; কিন্তু বিবাহের পথে এমন বিঘ্ন ঘটেছিল যা প্রায় অলঙ্ঘনীয়। তাঁর সমসাময়িক আরো অনেক প্রবীণ ব্রাহ্মের মতন হেরম্বচন্দ্র আচ্ছন্ন ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে। ঋষিতুল্য মহর্ষির ঋষিতুল্য সন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথও তাঁদের অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা দেখতেন একটু ভিন্ন চক্ষে। একান্ত রবীন্দ্রভক্ত প্রশান্তচন্দ্র কী করে হেরম্বচন্দ্রের প্রিয়পাত্র হতে পারেন? কিন্তু বিবাহের পথে সমধিক বিঘ্ন হল আর-একটি ব্যাপার। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে প্রবর্তিত ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে বেশির ভাগ ব্রাহ্মবিবাহ এতাবৎ রেজেস্ট্রি করা হত— অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্রাহ্মবিধি

অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। যখন শেষপর্যন্ত হেরম্বচন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিলেন তখন প্রশান্তচন্দ্র বললেন এই ৩ আইন অনুসারে বিবাহ না করে তিনি শুধু ব্রাহ্মবিধি-মতে বিবাহ করবেন, নতুবা নয়। তাঁর যুক্তি হল এই যে, ৩ আইন অনুসারে বিবাহে পাত্রপাত্রীকে বলতে হয় যে তারা হিন্দু নয়, খ্রীস্টান নয় ইত্যাদি। ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি না এই নিয়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল ও রবীন্দ্রনাথ খুব জোরালো ভাষাতেই একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন যে ব্রাহ্মগণ অবশ্যই হিন্দু। প্রতিপক্ষের যুক্তি ছিল, প্রথমত শুধু ব্রাহ্মবিধি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহ বে-আইনি। কেননা ব্রাহ্মবিবাহবিধি হিন্দুবিবাহবিধি থেকে স্বতন্ত্র; দ্বিতীয়ত যদিও এই-জাতীয় বিবাহ হিন্দুবিবাহ বলে স্বীকৃত হয় তা হলে হিন্দু পুরুষদের মতো ব্রাহ্ম পুরুষেরাও একাধিকবার বিবাহ করার অধিকারী এবং তা অবশ্যই ব্রাহ্ম আদর্শের বিরোধী। প্রশান্তচন্দ্র নিজে প্রচুর আইন ঘেঁটে ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, যেহেতু ব্রাহ্মগণ সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় অতএব ব্রাহ্মবিধি অনুসারে নিষ্পন্ন বিবাহ শুধু সম্পূর্ণ আইনসংগত নয়, এ-জাতীয় বিবাহের পর কোনো পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা বে-আইনি— কেননা তা ব্রাহ্ম আদর্শ ও আচারের বিরোধী। প্রবল পিতৃনিষ্ঠা সত্ত্বেও নির্মলকুমারী এই মতে সম্পূর্ণ সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিতর্ক চলেছিল দীর্ঘ সাত বৎসর। ১৯১৬ সালে প্রশান্ত ও নির্মলকুমারীর প্রণয়ের সূত্রপাত থেকে সাত বৎসর পরে তাঁদের বিবাহ হয় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে প্রশান্তচন্দ্রের মাতুল ডাক্তার নীলরতন সরকারের গৃহে। কন্যার পিতা তখন কলকাতায় ছিলেন না। অনেকে যোগ না দিলেও বহু ব্রাহ্ম এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং গান গেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে তাঁর মত বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে 'ব্রাহ্মবিবাহবিধি' বলে একটি পুস্তিকা সে সময়ে প্রশান্তচন্দ্র প্রচার করেছিলেন। কিন্তু হেরম্বচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের তীব্র মতভেদের একমাত্র কারণ বিবাহবিধি নয়; সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্রের নেতৃত্বে সেই সময়ে আর-একটি প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল— এর লক্ষ্য ছিল দুটি: প্রথম, রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য (Honorary Member) রূপে গ্রহণ করা। এই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রশান্তচন্দ্র 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' এই নামে এক পুস্তিকা লিখে প্রচার করেন। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল শিবনাথ শাস্ত্রী -স্থাপিত 'ছাত্রসমাজ' প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধানের সংস্কার।

ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল যুবক বা যুবতী এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারতেন, কিন্তু সভ্যপদের আবেদনপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর করে শপথ করতে হত যে ধূমপান বা মদ্যপান করব না ও সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখব না। প্রশান্তচন্দ্রের বক্তব্য ছিল যে, এই-জাতীয় নেতিবাচক শপথ প্রায় বলপ্রয়োগেরই শামিল অতএব সুস্থ বিকাশের অন্তরায়। অবশ্য এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছিলেন সুকুমার রায় এবং তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব না হলে ব্রাহ্মসমাজের এই যুব আন্দোলন অগ্রসর হতে পারত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্বে দুইবার বিভক্ত হয়েছিল। এই যুব আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে মনে হয়েছিল চতুর্থ এক ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাচীনের দল হার মানলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্য নির্বাচিত হলেন ও 'ছাত্রসমাজ' স্থাপিত হল প্রশস্ততর ভিত্তিতে। যে-সব প্রবীণ ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের সম্মানিত সদস্যপদে নির্বাচনের সমর্থন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, প্রশান্তচন্দ্র তাতে নেমেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিয়েই।

এই কালে ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন মোড় ফিরছিল। এই যুগের বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা হল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড— যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে তাঁর বিখ্যাত চিঠি লেখেন এবং তাঁর 'নাইটহুড' (স্যার) খেতাব বর্জন করেন। ওই সময় প্রশান্তচন্দ্র নিরন্তর কবির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এই সময়কার একটি মনোজ্ঞ বিবরণও তিনি লিখেছিলেন দেশ পত্রে (শারদীয় ১৩৬৭)।

বিশ্বভারতী

১৯২১ সালের ২২ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার আগে কিছুদিন ধরে প্রশান্তচন্দ্রকে বিশ্বভারতীর সংবিধান রচনার কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পরও বিশ্বভারতী পরিচালনার অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর স্কন্ধে— রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ তিনি বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্মসচিব নির্বাচিত হয়ে দশ বৎসর এই দায়িত্ব বহন করেছিলেন। বিশ্বভারতীর কাজে তাঁর এতটা সময় দিতে হত যে, সরকারি শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলেছিলেন, সরকার বিশ্বভারতীর কাছে তাঁদের এক কর্মচারীকে খুইয়েছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যের অধ্যয়নে ও চর্চায় প্রশান্তচন্দ্রের গভীর আগ্রহ ছিল একেবারে বাল্যকাল থেকে। কিন্তু নানা কাজের প্রবল তাগিদে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ বড়ো করে কিছু লেখবার অবসর পান নি। বিশ্বভারতী যখন গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন প্রশান্তচন্দ্র বিশেষ সন্ধান করে সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি রচনা উদ্ধার করে গ্রন্থভুক্ত করেন, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গ্রন্থ তিনি সম্পাদনও করেন। 'মুক্তধারা' প্রকাশিত হলে (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯) প্রশান্তচন্দ্র 'পথ-মোচন' নামে প্রবাসীতে (আষাঢ় ১৩২৯) তার একটি ব্যাখ্যানও প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর তিনি 'কবি-কথা' নামে বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৫০) একটি প্রবন্ধে, সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কবিচরিতের বহু বৈশিষ্ট্য ও মহনীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম-যৌবনে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, যেগুলি পরবর্তীকালে আর প্রচলিত ছিল না, পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে, বহু বৎসর পূর্বে প্রশান্তচন্দ্র প্রবাসীতে (১৩২৮-২৯) "রবীন্দ্র-পরিচয়" প্রবন্ধমালায় বহুল উদ্ধৃতি -সহ এই গ্রন্থগুলির কয়েকখানির আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন।

১৩৩২ ফাল্গুনে প্রথম বিশ্বভারতী সংস্করণ 'চয়নিকা' প্রকাশিত হয়। প্রশান্তচন্দ্রের প্রস্তাবমত এই সংস্করণের কবিতা নির্বাচিত হয় বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণের ভোট নিয়ে। চয়নিকার 'পাঠ পরিচয়ে' প্রশান্তচন্দ্র লেখেন, "আমরা পাঠকবর্গের মত অনুসারেই চয়নিকা সংকলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।" তাঁর সাহিত্যিক-রচনার সংখ্যা খুবই সামান্য ; যে-কয়টির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল :

প্রবাসী

রবীন্দ্র-পরিচয়। মাঘ-চৈত্র ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
পথ-মোচন । আষাঢ় ১৩২৯
রবীন্দ্র-পরিচয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩২৯
চলতি ভাষার বানান। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কবি-কথা। কার্তিক-পৌষ ১৩৫০
'সৎপাত্র' গল্প কাহার রচনা। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫
'পালকি-বেহারার গান'। কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬
রাশিয়ার এক প্রান্তে। মাঘ-চৈত্র ১৩৫৮

বিচিত্রা

রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী। বৈশাখ, আষাঢ় ১৩৩৯

একটি রচনার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে— "রবীন্দ্র-পরিচয়" (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯)। যে বিশ্বমানবিক আদর্শের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন তার অঙ্কুর যে পাওয়া যায় কবির কৈশোর রচনায়, এই প্রবন্ধটিতে প্রশান্তচন্দ্র তা জানান। প্রশান্তচন্দ্রই সূচনা করেন রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী সংকলনের এবং বিভিন্ন পাঠান্তরের তুলনামূলক আলোচনার।

পরিসংখ্যান (স্ট্যাটিস্টিক্‌স)

প্রশান্তচন্দ্র পরিসংখ্যান-চর্চাতেও নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট ছিলেন। পরিসংখ্যান যে একটি বিজ্ঞান, এ ধারণা তখন এ দেশের লোকের ছিল না; তাই আত্মীয় ও বন্ধু মহলে এই নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক মজার কথা শোনা যায়, যেমন, শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের তক্তাপোষ নাকি তৈরি হয়েছিল প্রশান্তচন্দ্রের হিসেবমত এ দেশের শিশুদের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য অনুযায়ী। ফলে অবশ্য একটু লম্বা শিশু হলেই বাধত গোলমাল। পরিসংখ্যান-চর্চায় ক্রমশ তাঁর দু-চারটি তরুণ সহযোগীও জুটল এবং এঁদের নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার লেবরেটরিতে নিজের কামরায় উনি পত্তন করলেন 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল লেবরেটরি'। কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কামরার সংখ্যাও অবশ্য বাড়াতে হল— তার পর এই কাজ বেশ জমে উঠে পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ও ১৯৩১ সালের ২২ ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হল 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট।' এর তিন বছর পরে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে প্রশান্তচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ইন্‌স্টিটিউটের মুখপাত্র ত্রৈমাসিক 'সংখ্যা' ইংরেজি পত্রিকা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পত্রিকার অন্যতম বলে 'সংখ্যা' স্বীকৃত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯২৬ সালে য়ুরোপ-ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম যান ইটালিতে মুসোলিনির আমন্ত্রণে। মুসোলিনির অভিপ্রায় ছিল রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিস্ট মহিমা প্রচারের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা। তাই রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাগুলির বিকৃত রিপোর্ট ছাপা হত ওই দেশের কাগজে। প্রশান্তচন্দ্র প্রায় দিনরাত খেটে ডিকশনারি দেখে দেখে যতটা সম্ভব ইটালিয়ান কাগজের মিথ্যা প্রচারের তর্জমা করে রবীন্দ্রনাথকে সব কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন। এই-সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' (১৯৬৯) বইতে।

কবির সঙ্গে য়ুরোপ-ভ্রমণের সময় একাধিক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ধারা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ত হয়েছিল এবং দেশবিদেশ থেকে বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত প্রশান্তচন্দ্রের নিমন্ত্রণে ইন্‌স্টিটিউটের আতিথ্যগ্রহণ এবং এর কাজে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন।

চাকুরির শেষ অধ্যায়ে প্রশান্তচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মফস্বলে যেতে রাজি হলে তিনি বহুদিন আগেই অধ্যক্ষের পদমর্যাদা লাভ করতেন, উপরওয়ালাদের এক সময় তাই ছিল সিদ্ধান্ত। কিন্তু তখন পরিসংখ্যানের চর্চা যথেষ্ট জমে উঠেছে সুতরাং আর কলকাতা ছেড়ে গেলে প্রশান্তচন্দ্রের এই ঐকান্তিক সাধনা একেবারে পণ্ড হয়ে যেত। তাই তিনি স্থির করলেন চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সুবিধামত বাড়ি দেখে তাঁর কর্মকেন্দ্রকে তিনি সেখানে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে শুধু উৎসাহ দিলেন না, নির্মলকুমারী ও প্রশান্তর সঙ্গে কলকাতার আশেপাশে বাড়ি খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত তখনকার (তিরিশ দশকের মাঝামাঝি) প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন বেকার লেবরেটরিতে এসে পরিসংখ্যানের কাজ দেখে সরকারের পূর্বনির্দেশ রদ করলেন।

১৯৪৮ সালে প্রশান্তচন্দ্র চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট উঠে গেল কলকাতার উপকণ্ঠে তার বর্তমান আলয়ে। ইতিপূর্বে প্রশান্তচন্দ্র তাঁদের নিজের বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন ওইখানেই। রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত ও নির্মলকুমারীর নূতন বাসগৃহ দেখে যেতে পারেন নি কিন্তু এর সংলগ্ন আমবাগানের কথা শুনে বাড়িটির নামকরণ করে গিয়েছিলেন 'আম্রপালী' আর নির্মলকুমারীকে বলেছিলেন যে বুদ্ধদেবের শিষ্যার এই নামটির যেন অমর্যাদা না ঘটে।

পরিসংখ্যান-বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দেশে ও বিদেশে প্রভূত সম্মান অর্জন করেছেন, যথা : রয়্যাল সোসাইটি অফ লণ্ডনের এবং রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্সের সভ্যপদ লাভ। ১৯৪৬ সালে ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হবার পর থেকে উনি প্রায় প্রতি বৎসরই বিদেশ-যাত্রা শুরু করেন।

পরিসংখ্যান-বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রশান্তচন্দ্রের কীর্তির পরিচয় দিতে পারেন পরিসংখ্যান-বৈজ্ঞানিকেরাই। তাঁদের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্রের একাধিক শিষ্যের আজ জগৎ-জোড়া নাম। যেমন, রাজচন্দ্র বসু, যিনি এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একজন সম্মানিত অধ্যাপক ও ডক্টর সি. আর. রাও, যিনি ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ পদে প্রশান্তচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তবে একটি কথা বলা যেতে পারে— পরিসংখ্যানকে প্রশান্তচন্দ্র এমন একটা হাতিয়ার হিসাবে দেখতেন, যা দিয়ে জনগণের কল্যাণ প্রকৃষ্টতমভাবে সাধন করা যেতে পারে। যেমন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। এই কথা উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালে ১২ জুন তারিখের একটি চিঠিতে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখেন :

"দেশের নানা প্রয়োজনে তোমাকে যে চার দিকে ডাকাডাকি করে শুনতে খুব ভাল লাগে, মনে গর্ববোধ করি। প্রাদেশিক অহঙ্কার আমার মনে নেই, তবু যখন বাঙালির বুদ্ধির বিশিষ্টতার একটা কোনো পরিচয় পাওয়া যায় তখন সেটা স্বীকার করে নিতে হয়। তোমার কাজে যে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেটা কেবল একাডেমিক নয়, নানা দিকে তার ব্যাবহারিক মূল্য থাকাতে দেশের সর্বত্র সমাদরের সঙ্গে তোমার প্রবেশ ঘটেছে, সেটা তো কম কথা নয়, সকলের চেয়ে প্রশংসার বিষয় এই যে তুমি মানুষ তৈরি করচ, নানা লোককে তাদের প্রয়োজনীয়তার অবকাশ দিচ্চ। আশা করি তুমি যে কাজ গড়ে তুলচ যুদ্ধের হাঙ্গামে তাতে গুরুতর আঘাত লাগবে না।"

রবীন্দ্রনাথের মতন আর-একজন মনীষীর উৎসাহ পরিসংখ্যান-চর্চার পথে প্রশান্তচন্দ্রের মূল্যবান পাথেয় হয়েছিল— তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যে ক্রমশ প্রশস্ত হবে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে এই কথা বলেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেছে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট। তাই প্রশান্তচন্দ্র তাঁর একাধিক বক্তৃতায় বলেছেন, ভারতীয় পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের প্রসারে রবীন্দ্রনাথের ও ব্রজেন্দ্রনাথের দান পরিসংখ্যানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা অসম্ভব।

হিরণকুমার সান্যাল

অনুলেখন : সুবিমল লাহিড়ী

কবি ডে লুইস্ ও তাঁর যুগ ১৯০৪-১৯৭২

ইংলণ্ডের সভাকবি সেসিল ডে লুইস্ আটষট্টি বছর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

এ বর্ণনা পর্যাপ্ত নয়, কারণ তাঁর সভাকবিত্ব স্বল্পকালের, এবং পরিচয় হিসাবে অসার্থক। লর্ড টেনিসন যখন রাজকবি হয়েছিলেন সে-শোভা তাঁকে মানিয়েছিল। কিন্তু উইলিয়ম ওঅর্ডস্বর্থও রাজকবি হয়েছিলেন এবং অনেকের মতে তাতে তাঁর ধর্মচ্যুতি ঘটেছিল। ডে লুইসের এই পুরস্কার গ্রহণও অনেকের আক্ষেপের কারণ, যেহেতু ওঅর্ডস্বর্থের মতো তিনিও একদা ছিলেন নবীন বিদ্রোহী কবিদের মুখপাত্র। 'এস্ট্যাব্লিশ-মেণ্ট'-এর পুষ্পমাল্য এঁদের গলায় ঠিক মানায় না।

তা ছাড়া ডে লুইস্ তাঁর কালের অদ্বিতীয় কবিও ছিলেন না। তবু, মৃত্যুও একটা ঘটনা। এবং এই ঘটনার অবকাশে তাঁর রচনার খতিয়ান নিয়ে বসলে দেখা যাবে তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর যুগেরই ভাঙা-গড়ার হিসাব। অন্তত এই ইতিহাসগত প্রতিনিধিত্বের সম্মান তাঁকে দেওয়া যাক।

ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ইংরেজি কবিতায় যে রোমান্টিক মিনারগুলি গড়ে উঠেছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে তারা টুক্‌রো হয়ে পড়ল। বিপর্যস্ত কবিরা আবার আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন, এবং তাঁদের দৃষ্টি অনেকটাই হল অন্তর্মুখী। এঁদের প্রধানতম কবির প্রসিদ্ধতম কবিতা শেষ হয়েছে সংস্কৃত স্বস্তিবাচনে— ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তিনি নির্বেদ খুঁজেছেন নানা জায়গায়— গীতা উপনিষদ্ ও বৌদ্ধধর্মে, এবং অবশেষে আশ্রয় পেয়েছেন মধ্যযুগীয় খ্রীস্টধর্মের কোলে। আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি অভিনবত্ব এনেছেন সন্দেহ নেই। তাঁর পূর্ববর্তীরা যে টেনিসনীয় পদলালিত্যে মুগ্ধ ছিলেন তিনি তা সযত্নে বর্জন করেছেন। মধুকরকরম্বিত কবিতা তিনি লেখেন নি।

পরবর্তী ইংরেজ কবিরা— যাঁদের আমরা ত্রিশ দশকের কবি বলে আখ্যা দিয়ে থাকি— তাঁর উদ্ভাবিত আঙ্গিককে প্রশংসার সঙ্গে বরণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁরা স্বীকার করতে পারেন নি ওই অন্তর্লীন উদাসীনতাকে। তাঁরা হতে চেয়েছিলেন অনেক বেশি বস্তুবাদী, বর্তমানের পথিক, নগরসভ্যতার অনেক বেশি গুণগ্রাহী। কবিতা সেদিন তাঁদের কাছে আর তপস্যার মন্ত্রগুঞ্জরণ নয়; অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জঠরজ্বালার বিরুদ্ধে, সাম্যের স্বপক্ষে হাতিয়ারবিশেষ। তাঁরা চোখ তুলে দেখলেন, অর্থনৈতিক সংকটের ফলে য়ুরোপ-আমেরিকার অন্যান্য দেশে জীবনযাত্রার মান ক্রমে নেমে যাচ্ছে, অথচ ও-প্রান্তের রুশদেশে তখন সাধারণ মানুষ শিখছে ভালোভাবে খেতে পরতে। তাই স্বভাবত সেদিন এই কবিদের মনে বৈপ্লবিক সমাজবাদের আকাঙ্ক্ষা নাড়া দিয়েছিল। এঁদের কেউ কেউ সেদিন স্পেনে গিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য লড়তে, জর্মানি গিয়েছেন হিটলারি শাসনের চেহারাটা হৃদয়ংগম করতে, কেউ কেউ নাম লিখিয়েছেন কম্যুনিস্ট পার্টির খাতায়। সভ্যতার সংকট যদি রুখতেই হয়, তবে তাকে রুখতে হবে বাস্তবের ক্ষেত্রে, ভাবজগতের কোনো আপোষের খেলায় নয়— এই ছিল সেদিন তাঁদের বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস থেকেই ১৯৩২এ প্রসূত হল একটি কাব্যসংকলন— 'নিউ সিগ্‌নেচর্স' বা নতুন স্বাক্ষর। ভূমিকায় সম্পাদক মাইকেল রবার্টস্ লিখলেন, দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী মনোভাবকে বর্ণনা করে :

'যে কবি তাঁর চারপাশের সমাজকে অবজ্ঞা করেন, অথচ নিশ্চিত কোনো প্রত্যয়ের অভাবে, শ্লেষের

সেসিল ডে লুইস্

১৯০৪ - ১৯৭২

আলোকচিত্র Mark Gerson (London) কর্তৃক গৃহীত

কোনো সুদৃঢ় ভিত্তির অভাবে, প্রাত্যহিক জীবন থেকে দূরে সরে যান এবং কেবল বর্ণাঢ্য বা অবাস্তর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সাধারণের অগম্য, রচনা প্রকাশ করতে থাকেন, তাঁর পক্ষে সে বিচ্ছিন্নতা অতীব ক্ষতিকর।…

সেই ধরনের দুরূহ কাব্য, যাতে পাঠককে প্রতিটি কূট অনুষঙ্গের অর্থ উদ্ধার করে নিতে হয়, তার বিরুদ্ধে এ বইয়ের কবিতাগুলির স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া।'

রবার্টস্ দেখাতে চাইলেন কী ভাবে তাঁর সংকলনের নবীন কবিরা সমকালীন জীবন থেকে তাঁদের ভাষা ও রূপকল্প আহরণ করেছেন ; কী ভাবে 'ম্যানিফেস্টো' 'পিস্টন' 'পাইলন' 'পোস্টার' 'এয়ারোড্রোম' প্রভৃতি আধুনিক শব্দ তাঁদের কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন স্টীফেন স্পেণ্ডারের 'দি এক্সপ্রেস্' কবিতার সূচনায়, রেলগাড়ির গতিবর্ণনায় :

'After the first powerful plain manifesto,
The black statement of pistons, without more fuss
But gliding like a queen she leaves the station'.

হঠাৎ সন্দেহ হতে পারে, যে ট্রেন 'রানী'র মতো সগৌরবে চলে, তার কাছ থেকে আমরা 'সরল ম্যানিফেস্টো' বা 'পিস্টনের কালো বিবৃতি' আশা করতে পারি কি না। হয়তো-বা এ দুই ভঙ্গির অনৈক্য দেখানোই কবির সচেতন উদ্দেশ্য ছিল। হয়তো তিনি বলতে চান গাড়ির স্বচ্ছন্দ সচলতাটি সত্যিই রানীর মতো অভিজাত, যার তুলনায় তার দম নেওয়ার প্রস্তুতিপর্বটি নিতান্তই মেহনতি। যাই হোক, নিঃসন্দেহে এই শব্দ-প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পরের বছর মাইকেল রবার্টস্ সম্পাদন করলেন আরেকটি সংকলন 'নিউ কান্ট্রি'— নতুন দেশ। তার মতামত আরো বামগন্ধী। এবারের ভূমিকায় তিনি লিখলেন :

'যদি আমাদের সহানুভূতিগুলি কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে মোড় নিয়ে থাকে, তবে তা বেকার ও অল্পবিত্তদের প্রতি কোনো করুণাবশতঃ নয়— তার কারণ তাদের আর আমাদের স্বার্থ অভিন্ন।…

আজকের লেখক রাজনৈতিক বোধের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। যতই স্পষ্ট করে তিনি দেখবেন মেহনতি মানুষের সঙ্গে তাঁর স্বার্থ জড়িত, ততই তাঁর লেখা জটিলতা ও অন্তর্মুখিনতা থেকে, আজকের সংশয় এবং কুটিল অনাস্থা থেকে, মুক্ত হবে।'

এবারে আর-কিছুই অনুক্ত থাকল না। কোন্ পক্ষ সমর্থন করতে হবে তা খুব স্পষ্ট করেই এখানে বিবৃত। কিন্তু এর মতামতে বোধহয় একটু আতিশয্য রয়েছে। স্পষ্ট হতে গিয়ে বক্তব্যটি বোধহয় কিছু সংকীর্ণ, কিছু অসম্পূর্ণ। এ কথা ঠিক যে এ সময়ের কবিরা দল গড়তে সচেষ্ট এবং দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অডেন্ তাঁর 'এ কম্যুনিস্ট টু আদার্স' কবিতায় (১৯৩৩) আবাহনও জানিয়েছিলেন :

'Unhappy poet, you whose only
Real emotion is feeling lonely…
You need us more than you suppose
And you could help us if you chose,'

দুঃখী কবি, নিঃসঙ্গতাই যার একমাত্র প্রকৃত অনুভূতি, আমাদের তোমার কত প্রয়োজন তা তুমি জানো না, এবং ইচ্ছে করলে তুমিও আমাদের সাহায্য করতে পারো।

এবং ডে লুইস্‌ও এই সময়েই তাঁর 'দি কন্‌ফ্লিক্ট' কবিতায় লিখলেন :

'Move then with new desires,
For where we used to build and love
Is no man's land, and only ghosts can live
Between two fires.'

নব ইচ্ছায় উদ্যত হয়ে চলো।
যেখানে একদা বেঁধেছি প্রেমের নীড়
সেখানে যুদ্ধ ; শুধু প্রেতেরাই পারে
দুটি আগুনের মধ্যে থাকতে স্থির।

কবিতাটি পড়লে বুঝতে বাকি থাকে না যে এ কন্‌ফ্লিক্ট বা সংঘাত আসলে ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদেরই বিরোধ— যার মধ্যে পড়ে আজ পুরোনো ভাবের স্বাতন্ত্র্যকামী মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন। অর্থাৎ এ পরিস্থিতিতে প্রবীণ উদারপন্থী মতবাদের কোনো স্থান নেই— 'টু ম্যাসিং পাওয়ার্স', দুটি পুঞ্জিত শক্তির শিবির দুদিকে মাথা তুলেছে— যে-কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে ; এবং বিবেচক মানুষ যে কোন্ শিবির বেছে নেবেন, তা কি বলে দিতে হবে! কারণ

'The red advance of life
Contracts pride, calls out the common blood'—

প্রাণের 'লাল' অগ্রগতি অহংকারকে সংকুচিত করে, সবার রক্তে সাড়া জাগায়।

এ মনোভাব, তথা রচনাভঙ্গিকে বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। একদা কবি বিষ্ণু দে কি লেখেন নি :

'বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে'

অথবা

'তোমার সস্তা প্রগতি মেলাও আমার আকস্মিকে'

এবং কবি দিনেশ দাস ঘোষণা করেন নি কি—

'চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!'

ব্যক্তিগত নির্জনতাকে পরিত্যাগ করে মিছিল বা শিবিরে যোগদানের কথা একালের অসংখ্য বাঙালি কবি পৌরুষের সঙ্গে বলেছেন ; এবং তা সত্ত্বেও তাঁদের অনেকেই স্বাতন্ত্র্য এবং নির্জনতাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারেন নি, কারণ বাঙালি মেজাজ অত সহজে ঘুচবার নয়। তেমনি ত্রিশ দশকের এই ইংরেজ কবিরা কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ডের উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে পরিশীলিত বিবেকবোধ থেকে যতই গণ-আন্দোলনের কথা চিন্তা করে থাকুন, তাঁদের বিদগ্ধ ইংরেজি মন সহজে কম্যুনিজ্‌মের গণ্ডিতে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। তাই মনে হয় মাইকেল রবার্ট্‌সের ওই দৃপ্ত ঘোষণার মধ্যে কিছু অত্যুক্তি ছিল, পরবর্তী ইতিহাস তাকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দিতে পারে নি। তাঁর প্রিয় কবিরা আধুনিক কায়দায় দল গড়তে চেয়েছিলেন ঠিকই,

মার্ক্সবাদ তার অন্যতম উপাদান ছিল তাও ঠিক, কিন্তু যৌবনের মাদকতাও কিছু কম ছিল না, কম ছিল না অল্প বয়সের আত্মহারা যূথপ্রবৃত্তি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছাত্র ছিলেন লুই ম্যাক্‌নীস্— তাঁর দৃষ্টিও ছিল বোধহয় স্বচ্ছতম। তাঁর সতর্কবাণীটি এ প্রসঙ্গে শোনবার মতো :

> 'লেখক যদি রাজনীতি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামান, তাঁকে সদাজাগ্রত রাখতে হবে আপন বিচার-বুদ্ধিকে। এটি তাঁর বিশেষ দায়িত্ব। কেবলমাত্র সাদা-কালোর মাধ্যমে (স্প্যানিশ যুদ্ধের মতো ঘটনাকে) দেখলে তাঁর চলবে না।'
>
> — মডার্ন পোয়েট্রি, ১৯৩৮

তাঁর মোহ ছিল না, তাই মোহভঙ্গ হয় নি। স্টীফেন স্পেণ্ডারের হয়েছিল। অল্পদিনের জন্য কম্যুনিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়ে তিনি ছেড়ে দেন ; এবং তাঁর মতে

> 'আজ বুঝতে পারি কম্যুনিস্ট দলে যোগ দেবার আমার দরকার ছিল না, কারণ আমার দল আমি তার আগেই বেছে নিয়েছিলাম। যারাই সামাজিক ন্যায় ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত এবং সেই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সত্য কথা বলতে প্রস্তুত ছিল, আমি ছিলাম তাদেরই দলে।'
>
> — দি গড্ দ্যাট ফেল্‌ড্, ১৯৪৯

অবশেষে যুদ্ধের প্রাক্‌কালেই অডেন দেশ ছেড়ে চলে গেলেন আমেরিকা। স্পেণ্ডারের নতুন কাব্যগ্রন্থ 'দি স্টিল্ সেণ্টার' (১৯৩৯)-এ লাগল এলিয়েটের মতো ভাববাদী আত্মগত সুর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হল এঁদের বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা। ফ্যাসিবাদের পরাজয় হল ঠিকই, পুরোনো সাম্রাজ্যবাদেরও পক্ষচ্ছেদ হল, কিন্তু যে সামাজিক আন্দোলনের আদর্শ এই কবিদের মনে ছিল তা সফল হল না। বরং যেন এই তাণ্ডবের মধ্যে তাঁদের পুরোনো বিশ্বাস কিছুটা আপন্ন হল। যেন অভিজ্ঞতা ও বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা অনুভব করলেন যে বৈপ্লবিক সমাজবাদ মানুষকে যতটা এক করে ততটাই করে আলাদা। ফলে সাংগঠনিক উদ্যম শিথিল হয়ে এল, সম্প্রদায় ছেড়ে এই কবিরা আপন আপন মুক্তির পথ বেছে নিলেন।

অডেন, স্পেণ্ডার, ম্যাক্‌নীস্, ডে লুইস্। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে উইস্টান্ অডেন সবচেয়ে শক্তিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু সেসিল ডে লুইস্-ই বোধহয় ছিলেন এঁদের প্রধান প্রবক্তা। 'পোয়েট্রি ফর ইউ', 'এ হোপ ফর পোয়েট্রি', তাঁর এসব বইয়ের নামগুলিই কিছু প্রচারধর্মী, যদিও সে প্রচারে আন্তরিকতা যতটা আছে আজকের উচ্চকিত সওদাগরির গন্ধ ততটা নেই। (বরং গোয়েন্দাকাহিনী লিখে সাহিত্যের বেসাতি যখন ডে লুইস্ করতে গিয়েছেন, তাও উৎকটভাবে নয়, এবং স্বনামে নয়, নিকোলাস ব্লেক্ এই ছদ্মনামে। গল্পগুলি সুপাঠ্য, বিশেষত 'এ কোয়েশ্চন অভ্ প্রুফ' উপন্যাসটি)। তাঁর আদি কাব্যগ্রন্থগুলির নামেও বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। অডেন বা স্পেণ্ডারের প্রথম কবিতার বই শুধুই 'পোয়েম্‌স্' (উভয়ই ১৯৩০)। কিন্তু ডে লুইসের 'ফ্রম্ ফেদার্স্ টু আয়র্ন্' (১৯৩১) বা 'দি ম্যাগনেটিক মাউণ্টেন্' (১৯৩৩) নামগুলিই যেন প্রমাণ করতে চাইছে যে আজ সাহিত্যে পালকের আলতো স্পর্শ দূর করে দিয়ে প্রয়োজন ভীম অয়স্কান্তের। এর অনেক কবিতাতেই কিছু ঘোষণার সুর, এমন-কি, কিছু বাহাদুরির সুরও আছে, যেমন :

> 'You that love England, who have an ear for her music,…
> Listen. Can you not hear the entrance of a new theme ?'

কবি আদেশ করছেন কান পেতে শুনতে, নতুন কোনো বিষয়ের আবির্ভাব যাতে আমরা ঠিকমত ধরতে পারি। অবশ্য এর সবটুকুই এই বিঘোষণায় দৃপ্ত নয়। কবি তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে বাস্তবজীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতেও প্রস্তুত, তাঁদের আসন্ন সন্তানকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত :

'Our youngster joy barely conceived
Shows up beneath the skin'.

এবং সেই হঠাৎ উচ্ছ্বাসের জাতককে পূর্ণ মনুষ্যত্ব দেবার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন :

'Our joy was but a gusty thing
Without sinew or wit,
An infant flyaway ; but now
We make a man of it.'

এর সঙ্গে তুলনীয় তাঁর উত্তরযুগের কাব্যগ্রন্থের নামগুলি— 'ওভরচ্যুর্স টু ডেথ' (১৯৩৮) বা 'ওঅর্ড ওভর অল্' (১৯৪৩) বা তার অন্তর্গত সনেটগুচ্ছ 'ও ড্রীমস, ও ডেস্টিনেশন্‌স'। এখানে প্রেম ও রাজনীতির বাইরেও কিছু স্বীকৃত— স্বপ্নের সত্য, মৃত্যুর সত্য, বাণীর সত্য— যে বাণী ব্রহ্মের এবং সৃষ্টির স্বরূপ। (এ সময়ে ডে লুইস্ কিছু ভালো কাহিনীকাব্যও লিখেছেন— যেমন স্পেনীয় যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত 'নাবারা' কবিতাটি, একটি যুদ্ধজাহাজের মাল্লাদের বীরত্বই তার বিষয়। ভার্জিলের অনুবাদক হিসেবেও তিনি এ সময় যশস্বী হন)।

যুদ্ধের পরে তাঁর কেম্ব্রিজে প্রদত্ত বক্তৃতামালা 'দি পোয়েটিক ইমেজ' (১৯৪৭) নামে প্রকাশিত। এর সবচেয়ে মূল্যবান অংশ বোধহয় আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে। সে কবিতার দুরূহতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। পাঠকদের তিনি সহানুভূতি জানাচ্ছেন, কিন্তু সমর্থন জানাচ্ছেন আধুনিক কবিদের ; কারণ সব কিছু চিবিয়ে নরম করে পাঠকদের মুখে তুলে দিতে হবে এমন কথা অশ্রদ্ধেয়। আজকের দুনিয়ায় কবিতার সম্ভাব্য বিষয় এত, এবং একালের কবিতার গঠনপারিপাট্য এত পিনদ্ধ, যে তারই ফলে এই জটিলতার উদ্ভব, যা পাঠকসাধারণকে প্রায়ই ধৈর্যহারা করে।

'দি পোয়েটিক ইমেজ্' তাঁর পরিণত চিন্তার ফসল। এবং তার থেকে বোঝা যায় যে শেষ পর্যন্ত ডে লুইস্ নিজেকে একান্ত স্রষ্টা হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন, যাঁর কাছে শব্দই সবার উপরে প্রতিভাত— 'ওঅর্ড ওভর অল্'। বইখানির শেষে তিনি বলছেন, কবিতা

> 'একটি গুণ্ঠিত দৃষ্টি, একটি আংশিক প্রজ্ঞা, মানবহৃদয়ের তলদেশ থেকে উৎসারিত হয়ে মানুষেরই কাছে যা নিবেদিত। রহস্য যদি চাই, তবে এই তো পরম রহস্য ; এবং মানবহৃদয় থেকে যা কিছু নিঃসৃত হয়, তার মধ্যে মনুষ্যত্বের চেয়ে রহস্যময় আর-কিছু নেই।···কবি যখন উৎসাহভরে এতে সাড়া দেন এবং মনোরম রূপকল্পের সাহায্যে তাকে আমাদের কাছে আরো সত্য করে তোলেন, তখন তিনি পৃথিবীতে তাঁর বিশিষ্ট ব্রত পালন করেন, যে-পৃথিবীতে শুধু কবি এবং তাঁর বাণীই নয়, সকল মানুষের সকল কীর্তিই সেই চিরন্তন পুরুষের চিরন্তন খেলার সামগ্রী— যাঁর কাজ গড়া, ফিরে ফিরে গড়া।'

গ্যেটের উক্তি দিয়ে এ কথাগুলি শেষ হয়েছে। গ্যেটে এই সৃষ্টিশীলতার মূর্ত প্রতীক, চঞ্চল জীবনের ঊর্ধ্বে শিল্পসৃষ্টির সাধনায় তিনি ছিলেন অখণ্ড বিশ্বাসী, যেমন এ যুগে ছিলেন য়েট্‌স্ বা ভালেরি— যে

ভালেরির সিন্ধুসমাধি বা 'লে সিম্‌ত্যিয়ের মার‍্যাঁ' কবিতাটিকে লুইস্ সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছিলেন তাঁর পরিণত অধ্যায়ে।

ডে লুইসের নিজের সাহিত্যজীবনও সেই নানা পরিবর্তনশীল, নানা বিরোধাভাসে উদ্ভাসিত খেলার অঙ্গ। সে-জীবনের প্রথম প্রভাতে জনসমাজের মুখর সত্যগুলিকে উচ্চারণ ক'রে একটি নক্সা বোনা হয়েছে, আবার সায়াহ্নবেলায় নিভৃত সৃষ্টির অধ্যাত্মরূপটিকে উপলব্ধি ক'রে সে-নক্সার শেষ।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ। শ্রীরানী চন্দ। বিশ্বভারতী। বারো টাকা।

স্কেচ করবার একখানা নীল মলাটের খাতায় অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একবার: 'পুরোনো দিনের মানুষ চলে যায়, কালের পর্দা পড়ে যায়। মাঝখানে এখনতখনের আজকের দিন কালকের দিনের মিলন কোথায়, না স্মৃতির কোঠায়।'

এই স্মৃতির কোঠায় আমাদের আজকের দিনের পাঠকের সঙ্গে কালকের দিনের অবনীন্দ্রনাথের মিলন ঘটিয়ে দেন শ্রীমতী রানী চন্দ। শিল্পীর আপন মুখের কথা থেকে একদিন তিনি তুলে এনেছিলেন 'ঘরোয়া' বা 'জোড়াসাঁকোর ধারে'। আর, এই সম্প্রতি ছাপা হল তাঁর 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ', বলা যায় যেন ওই ধারারই তৃতীয় বই।

প্রথম পরিচয়ের অল্পদিন পরেই এই লেখিকাকে একদিন বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ: 'এগুলি মূল্যবান্ কথা। নষ্ট কোরো না, ধরে রেখো।' আর তার পর থেকে তাঁর ঝরনার মতো কথার স্রোত কেবলই অঞ্জলিতে ধরে নিয়েছেন এই শ্রুতিধরী, দিনের পর দিন। প্রায় তিরিশ বছর আগে মূল্যবান সেই কথাগুলি ছাপা হয়েছিল 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইতে। তার সঙ্গে আজ যুক্ত হল নতুন এই 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ'। এখন থেকে, অবনীন্দ্রনাথকে জানবার জন্যে আমাদের একই সঙ্গে পড়তে হবে এই তিনখানি বই।

এক দিক থেকে মনে হতে পারে যে একসঙ্গে এই তিনটির নাম করা ভুল হল। এটা ঠিকই যে 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথে'র ভঙ্গি খানিকটা ভিন্ন। এ-বইতে শ্রীমতী রানী চন্দ কেবল একজন শ্রোত্রীই নন, সেই সঙ্গে তিনি রচয়িত্রীও। 'ঘরোয়া' বা 'জোড়াসাঁকোর ধারে' ছিল যেন নাটকীয় একোক্তির মতো। কথক অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আর-কারো প্রত্যক্ষ ভূমিকা সেখানে নেই বটে, তবে পরোক্ষে টের পাওয়া যেত আরো-একজনকে, একজন শ্রুতিধরীকে। 'এইবারে বড়ো বাল্মীকিপ্রতিভার গল্প শোনো' অথবা 'দেখো সব মনে থাকে'—'ঘরোয়া'র এইসব কথা বলায়, কিংবা আরো-একটু বেশি যেন পরের বইটিতে: 'ও অভিজিৎ, রঙটঙ নিয়ে অত ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, বিপদ আছে' বা 'ওকি ও স্যাঙাত, সোয়েটার এঁটে এসেছ এরই মধ্যে' এই ধরনের দুটি-একটি কথার ঝোঁকে হঠাৎ-হঠাৎ যেন আমরা পৌঁছে যেতাম অতীত থেকে বর্তমানে।' তৃতীয় এই বইটি তেমন নয়। পাঠক প্রথমে ভাববেন এ যেন প্রথা-মতোই কোনো স্মৃতিকথা, লেখিকা যে নিরন্তর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের, সেই অভিজ্ঞতারই যেন বিবরণ বলছেন তিনি। কিন্তু অল্প এগিয়েই টের পাওয়া যায় যে নিজেকে খুব আলতো করে সরিয়ে নিয়ে বারেবারেই এ-বইতে লেখিকা সামনে নিয়ে আসেন কথক অবনীন্দ্রনাথকেই, 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র চেনা অবনীন্দ্রনাথকেই, যিনি আপন মনে কথা বলে যান শুধু, আর পাশাপাশি সেই কথা ধরে রাখেন কেউ। লেখার এই দুই ধরন এ-বইতে মিলে আছে একেবারে। অবনীন্দ্রনাথের অনেক ধূসর ছবিতে রেখা যেমন অনায়াসে মিলিয়ে যায় রঙে, এ-বইয়ের লেখিকা তাঁর নিজের ভাষাকে তেমনি অবলীলায় মিলিয়ে দেন অবনীন্দ্রনাথের কথায়। এইভাবে এটিও, পুরোনো দুটি বইয়ের মতোই, অসীম সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে।

তিনটিতেই আছে তাঁর জীবনকথা। কিন্তু 'ঘরোয়া'তে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন যেন সমস্ত কাহিনীর

পরিধিটুকু ছুঁয়ে, 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইতে তিনি এলেন বৃত্তের ভিতরে, আর এই শেষ বইটিতে তিনিই কেন্দ্র। 'ঘরোয়া'তে যেন বেশি করে জেগে উঠেছিল বাহিরমহলের ছবি, 'জোড়াসাঁকোর ধারে' তুলে এনেছিল জোড়াসাঁকোরই ভিতরমহল, আর এই শেষ বইতে ধরা আছে অবনীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-জীবন। 'ঘরোয়া' যেন রবীন্দ্রনাথের জগৎ, 'সে একটা যুগ— রবিকা তার মধ্যে ভাসমান' এই তার পরিচয়। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' হল অবনীন্দ্রনাথেরই পুরোনো জীবন, তাঁর শিল্পীমন তৈরি হয়ে উঠবার ইতিকথা, তাঁর নেবার জগৎ। আর 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' তাঁর পরিণত জীবনের মায়া, তাঁর দেবার জগৎ। এ-বইকে তাই বলা যায় পুরোনো বই দুটির পরিপূরক।

আরো-এক দিক থেকে বুঝে নেওয়া যায় এই ত্রিধারাকে। 'ঘরোয়া'তে প্রধান ছিল গল্প বলা, সে যেন ঘটনার পর ঘটনার মালা গাঁথা। সেকালটাকে প্রত্যক্ষ করে তুলবার জন্য ওর মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ একের পর এক বলে গেছেন রাখীবন্ধনের গল্প, হিন্দুমেলা বা প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের কাহিনী, অভিনয়ের বৃত্তান্ত। আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' যেন এক জীবন্ত মিউজিয়াম, সে যেন ছবির অ্যালবাম, চরিত্রের পর চরিত্র জেগে উঠছে তার মধ্যে। 'কত রকমের লোক দেখেছি কত রকমের ক্যারেক্টর সব'— এই বলে সেখানে তিনি এঁকে যান সেই পাড়িং-বলা মাস্টারমশাই বা ফার্সি পড়াবার মুনশী, মনোহর সিং দারোয়ান বা সমশের সহিস, নন্দ ফরাস বা ছিরু মেথর, কাঁচা মাংস খাওয়া রাক্ষস বা ছোট্ট মেয়ে ফেলাবতীর ছবি! কিন্তু 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথে'র ঝোঁকটা গল্পেও নয়, নানা-চরিত্রের মিছিলেও নয়, এখানে যেন জায়গা পেল তাঁর সাধনার কথা। কেননা এখানে তাঁর মুখের যে-কথাগুলি তুলে নিয়েছেন লেখিকা, সে যেন অনেকটা তাঁর অগোচরে। গল্প-বলার অভিপ্রায়ে এসব কথা-বলা নয়, এ হল তাঁর দিনযাপনের ছবি।

সেই দিনযাপনে মিলেমিশে আছে তাঁর ব্যক্তিজীবন আর শিল্পসাধনা। সেই দিনযাপন থেকে এক দিকে আমরা জানতে পাই কী ভাবে তিনি খুলে ফেলেন গম্ভীর তাঁর শিল্পীর মুখোশ (পৃ ৩২), সহজ হয়ে মিশে যান শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, কী ভাবে 'ফাল্গুনী'র অভিনয় দেখতে দেখতে হঠাৎ গান গাইতে ছুটে যান স্টেজে (পৃ ৩১), কী ভাবে লেখিকার শিশুপুত্র অভিজিতের সঙ্গে হয়ে যান সমান-সমান। এর থেকে আমরা জানতে পারি কী ভাবে তাঁর বুকে এসে লাগছিল রবিকার মৃত্যু (পৃ ২৮, ১৩৪) অথবা তাঁর স্ত্রীর (পৃ ৯২-৯৫), জানতে পারি কী ভাবে কেবলই তিনি সান্ত্বনা চেয়েছেন বা জীবনের মর্ম খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথের গানে (পৃ ১৩৫-৩৮)। তাঁর এই নিভৃত মনের প্রকাশ থেকে সহজেই আবার সরিয়ে নেন নিজেকে, 'তাঁর কথা বলার সুরের খেলাই ছিল এমনি, সুর ছেড়ে দিয়ে আবার পলকে গুটিয়ে' ফেলা (পৃ ৬৮), আর গুটিয়ে নিয়েই চলে আসেন কোনো শিল্পসৃষ্টির প্রসঙ্গে হয়তো, সবাই জানেন যে তিনি 'বসলেই শিল্প সম্বন্ধে কথা বলেন, তাই আঁকার কাজ ফেলে তাঁকে ঘিরে' জমে যান সবাই (পৃ ৬৪)।

এইসব শিল্পকথা থেকে অবনীন্দ্রজীবনের আরো-একটি নতুন পরিচয় উন্মোচিত হয় আমাদের সামনে। লেখিকা জানিয়েছেন, 'আমি যখন অবনীন্দ্রনাথের কাছে এলাম তখন তাঁর পুতুল-গড়ার যুগ' (পৃ ১২)। উত্তরজীবনে যখন অবনীন্দ্রনাথের মন খানিকটা সরে গিয়েছে ছবির পট থেকে, সেখানে যখন 'ডিফিকালটি ওভারকাম করবার··· আনন্দ' (পৃ ১৪) আর পাচ্ছেন না, নন্দলাল বসুর মতো শিষ্যরা যখন অনুযোগ করছেন 'তা হলে আমাদের এত করে শেখালেন কেন', তখন তিনি হাতে পেয়েছেন দুই নতুন শিল্প। বছরের পর বছর জুড়ে সেই সময়ে তিনি লিখছেন যাত্রা, এমন যাত্রা যা 'মাঠে ঘাটে ঘরে পথে গাছতলায় সব জায়গাতেই

হতে পারে··· দর্শক ও অভিনেতা সেখানে মিলে যায়' (পৃ ১০৪)। আর সেই সঙ্গে তাঁর চোখে পড়ছে রূপ, নিছক রূপ, দেখছেন 'ফর্ম ইটসেল্‌ফ কত সুন্দর' হতে পারে (পৃ ১২৬), আর সেই ফর্মকে ধরে রাখবার জন্য হেলাফেলায় ছড়িয়ে দেওয়া জিনিস থেকে গড়ে তুলছেন কুটুমকাটাম, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'বন্ধুশিল্প'। এই কুটুমকাটাম আর যাত্রায় মগ্ন অবনীন্দ্রনাথের কিছু ছবি নিবিড়ভাবে ধরা আছে এ-বইতে।

আর, ওরই সঙ্গে আছে তাঁর গুরুর ভূমিকা, শিল্পীগুরুর। কী ভাবে তিনি হাতে ধরে শেখাচ্ছেন ছবি-আঁকা (পৃ ৩৭-৩৮), কাগজে রেখার টান দিতে দিতে বোঝাচ্ছেন রেখার রহস্য, রঙ আর রেখার সম্পর্ক (পৃ ৪৬,১১২), দেখাচ্ছেন ছবির মধ্যে 'স্ট্রেংথ' রেখেও কী ভাবে তার 'ক্রুডিটি' ঢেকে দেওয়া যায় সৌন্দর্যের আবরণে (পৃ ৫৮-৫৯), জানাচ্ছেন কেন কিউবিজমকে তাঁর মনে হয় কুজ্জাইজম (পৃ ৭৮) অথবা তাঁর অতীত আঁকার ইতিহাস বলে বলে শেখাচ্ছেন অজন্তার ছবির প্রাণ কোথায়, কী-বা মোগল-পেন্টিং বা পার্শিয়ান ছবির বৈশিষ্ট্য (পৃ ৬৫-৬৬, ৮০-৮১)।

তা হলে কি এ-বই 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'র সঙ্গেও মিলিয়ে পড়া উচিত নয়? ঠিক। আগে বলেছি যে 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' হল 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র পরিপূরক বই। সেই সঙ্গে এখন বলতে হয় যে আরো-এক দিক থেকে বিচার করলে এটি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'র পরিপূরক। বাগেশ্বরীর বক্তৃতায় লোক হত না বলে আক্ষেপ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ, শিল্প বিষয়ে কেউ জানতে চায় না বলে তাঁর অভিযোগ (পৃ ৯০), কিন্তু শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া আসরে তিনি পেয়েছিলেন উৎসুক কিছু শিক্ষার্থী শ্রোতা। তাই বাগেশ্বরীর কথাগুলি, যা শিল্পের তত্ত্বকথা মাত্র, সেই তত্ত্বই তিনি বলতে পারছেন এখানে তার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে, প্রতি মুহূর্তেই প্রয়োগের সঙ্গে মিলিয়ে। একই শিল্পীর একই শিল্পতত্ত্বের প্রকাশ আছে এ-দুটি বইতে, সেইজন্যেই একসঙ্গে মিলিয়ে পড়া দরকার হবে এ-দুটিকে। কিন্তু কেবল সেজন্যেই নয়। হয়তো এজন্যেও যে 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথে' আছে আরো-একটু পরিণত মনের ভাবনা, বাগেশ্বরী-বক্তৃতা ছিল ১৯২১-২৯ সালের ব্যাপার। একবার বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ: 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে যা বলেছি তা পুরোনো জিনিস, নতুন করে বলতে হবে এবারে' (পৃ ১৪৭)। 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথে' যেন অনেকটা সেই নতুন করে বলা। হয়তো এই নতুন করে বলতে গিয়ে ধরা পড়ে যে একদিন যিনি ভাবছিলেন ছবিকে দিয়ে বলানো চাই, চলানো চাই, সে কেবল বিশেষ্যের মতো রূপের তালিকা নয় (দ্র. 'শিল্প ও ভাষা'), আজ তিনি একান্তভাবে দেখছেন সেই বিশেষ্যটিকেই, যেখানে মাটির ক্যারেক্টর মাটি, পিঁড়ির ক্যারেক্টর পিঁড়ি, যেখানে ফর্ম ইটসেল্‌ফ জেগে উঠছে তার নিজের নিশ্চিত মহিমায়।

এইভাবে, অবনীন্দ্রনাথের অন্ত্যজীবন, কখনো তাঁর নিজেরই বাচনে আর কখনো-বা লেখিকার প্রসন্ন ভাষায়, ছবির মতো ভরে আছে 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' বইটিতে। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ের শেষে অবনীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন: 'এতকাল চলার পরে বকশিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোঁটা মধু'। অবনীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠ শিষ্যা এতদিন ধরে শিল্পীর জীবনটিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দিলেন এই তিনখানি বইতে, যেন আমাদের কাছে হয়ে ওঠে ও-রকমই তিন রঙের তিন ফোঁটা মধু।

শঙ্খ ঘোষ

পত্রস্মৃতি। শ্রীপরিমল গোস্বামী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। মূল্য ২২'০০ টাকা।

পরিমল গোস্বামী তাঁর লেখক ও সম্পাদক -জীবনের চিত্তাকর্ষক স্মৃতিকথা লিখেছেন চার খণ্ডে। পত্রস্মৃতি চতুর্থ এবং এ পর্যন্ত প্রকাশিত শেষ খণ্ড। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি যথাক্রমে স্মৃতিচিত্রণ, দ্বিতীয় স্মৃতি এবং আমি যাঁদের দেখেছি।

স্মৃতি-সাহিত্যে পত্রস্মৃতি এক অভিনব সৃষ্টি। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে যে-সব চিঠি পেয়েছেন, তাদের কেন্দ্র করে কতকগুলি উপভোগ্য স্মৃতিচিত্র রচনা করেছেন লেখক। এই সব চিত্রের পরিবেশ কোথাও কৌতুকের, কোথাও বৈদগ্ধ্যের, কোথাও-বা সাহিত্যরসের। মালার সুতোর মতো লেখক নিজে প্রায় অদৃশ্য থেকে এই বিচ্ছিন্ন স্মৃতিচিত্রের মিছিলের মধ্যে একটি সংহতরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রিয়জনের কাছে চিঠি লেখবার সময় মনের মুখোশটা খুলে রাখি; যে লেখা ছাপা হবে, অনেকের হাতে পৌছবে, তা লিখতে বসে মুখোশটা পরে নিতে হয়। চিঠিপত্রে নির্বাধ মনের প্রকাশ পাওয়া যায় বলেই জীবনীকারের নিকট এদের বিশেষ মূল্য। চিঠিপত্রে এমন পরিচয় ধরা পড়ে যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থে এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও অমিয়া চৌধুরানীর পত্রাচার থেকে। নীরদবাবুর ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনা থেকে পাঠকের মনে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, এই কটি চিঠি তা বদ্‌লে দেয়। এখানে তাঁর অন্য পরিচয়। চিঠির মধ্যে ধরা পড়েছে তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব, আমাদের অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন তিনি।

এখানে অবশ্য পরিমলবাবু চিঠিপত্র সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। পত্রচারীর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উদ্ভাসিত করাই তাঁর লক্ষ্য; আবার অনেক ক্ষেত্রে এক-একটি চিঠি চাবির মতো লেখকের স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়। পাঠক তাঁর সঙ্গে পশ্চাতে তাকিয়ে নিজেও স্মৃতিচারণার অংশীদার হয়ে পড়েন।

পত্রস্মৃতির লেখকও নিশ্চয় এমন-এক স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী যার আকর্ষণে বহু লেখক, সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী, নাট্যশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, জাদুকর, পর্বতারোহী, শিকারী প্রভৃতি বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। বিখ্যাত, স্বল্পখ্যাত, অখ্যাত— সকল পত্রলেখকের প্রতিই লেখকের সমান দৃষ্টি, সকলকেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন তিনি।

পত্রচারীর লেখকসত্তা বা শিল্পীসত্তা উদ্‌ঘাটনের অথবা তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জী বিবৃত করবার কোনো চেষ্টা এখানে নেই। বড় বড় সমালোচনা ও জীবনীগ্রন্থ থেকেই তা পাওয়া যাবে। অন্যত্র যা পাওয়া যাবে না এমন দু-একটি কথার সাহায্যে পত্রলেখকের চরিত্রের কোনো-একটি দিক উদ্ভাসিত করা হয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে পত্রস্মৃতিকে চরিত্রচিত্রশালা বলা যেতে পারে।

পরিমলবাবু হাস্যরসাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত। সুতরাং স্বাভাবিকরূপেই এ বইয়ের সর্বত্র অনেকগুলি ছোট ছোট হাসির কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁদের কোনো দান আছে তাঁদের অনেকেই কোনো-না-কোনো রূপে পত্রস্মৃতিতে উপস্থিত আছেন। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলার শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার টুকরো টুকরো পরিচয় পাওয়া যাবে পত্রস্মৃতি থেকে। এ কালের পাঠক অনেক নতুন তথ্য পাবেন।

কারো জীবন সম্বন্ধে লিখতে হলে বাঙালি লেখকরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। সত্য হলেও অপ্রিয় হবার আশঙ্কায় অনেক কথাই এড়িয়ে যান। পরিমলবাবু তা করেন নি। যা জেনেছেন তা বলেছেন। অথচ সেই বলার মধ্যে কোথাও শ্রদ্ধাহীনতার প্রকাশ নেই। বরং যে ভাবে বলেছেন তাতে চরিত্রচিত্রণ উজ্জ্বলতর হয়েছে। ব্যক্তিকে ঋষি বা অতিমানব করে দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় জীবনীকারদের মধ্যে এবং সেইজন্যই হয়তো পাশ্চাত্য সাহিত্যের জীবনীগ্রন্থের মতো বাংলা জীবনীগ্রন্থের আবেদন গভীর হতে পারে না। কোনো দ্বিধা না করে পরিমলবাবু নামী লোকের জীবনের সহজ সত্য কথা সুন্দর ভাবে বলেছেন দেখে ভালো লাগল।

উপন্যাস নয়, রহস্যকাহিনী নয়, তথাপি প্রায় সাড়ে চার শো পৃষ্ঠার বইটি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আগ্রহ নিয়ে পড়া যায়। লেখক নিজের জীবনকে প্রাধান্য দিলে একঘেয়েমি এসে যাবার আশঙ্কা ছিল। এ জাতীয় রচনায় নিজেকে যতটা পশ্চাতে রাখা যায় লেখক তাই করেছেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা পত্রালাপ করেছেন তাঁদের বৃত্তিগত ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতার জন্য পাঠক নতুনত্বের স্বাদ পান প্রতি পরিচ্ছেদে। তথ্য, কৌতুক ও গল্পরসে সমৃদ্ধ এই রচনা পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে।

লেখকের ভাষা সাবলীল, বলবার ভঙ্গিটিও মনোরম। মনে হয় যেন আড্ডা দিতে বসে গল্প শুনছি। রচনার এই বৈশিষ্ট্যও পাঠককে কম আকৃষ্ট করে না।

রচনাশৈলীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে লেখকের তোলা ছত্রিশখানি চমৎকার ফটোগ্রাফ। চরিত্রচিত্রণ উজ্জ্বলতর হয়েছে এই ছবিগুলির সাহায্যে।

পত্রস্মৃতিতে পঁচাত্তর জন পত্রলেখকের ৩৫০ খানি চিঠি ব্যবহার করা হয়েছে। নিশ্চয়ই পরিমলবাবুর ভাণ্ডারে এমনি আরো চিঠি সঞ্চিত আছে। চিঠিপত্র, ছবি, দলিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রবৃত্তি বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে দুর্লভ। এই দুর্লভ গুণের অধিকারী হিসাবে গবেষকমাত্রেই পরিমলবাবুকে ধন্যবাদ জানাবেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বী কৃ তি

শ্রীবিনয় ঘোষ -লিখিত 'বাংলার ডোকরাশিল্প ও শিল্পীজীবন' প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত ডোকরাশিল্পনিদর্শনচিত্রাবলী অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ বোর্ডের কলিকাতাস্থিত রিজিওনাল ডিজাইন সেণ্টার -এর সংগ্রহভুক্ত। ডোকরাশিল্পীর চিত্র প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক গৃহীত।

হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল আজি মম পূর্ণ হল,
শুন সবে জগতজনে ॥
কী হেরিনু শোভা, নিখিলভুবননাথ
চিত্ত-মাঝে বসি স্থির আসনে ॥

স্বরলিপি : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সরা পা -া । -পমা -মা -া -া গা মমা -মগা -রগা I
হৃদ য় ০ ০০ ০ ০ ০ বা স০ ০০ ০০

I রসা -সা -া -া -ণ্ধ্া -া -া ধ্া । -া -া -ণ্া -া -ররা -সন্া -সা ণ্া ।
না০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ পূ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ র্ণ

। -া ণ্া ধ্া -া -ণ্ধ্া -ণ্প্া -া -া । ধ্া সা ন্া সা -া -া -া -ণ্া I
০ হ ল ০ ০০ ০০ ০ ০ আ জি ম ম ০ ০ ০ ০

I -ধ্া -া -া -া ধ্া -া -ণ্া -া । -া -ররা -সন্া সা -া ণ্া ধ্া -া ।
০ ০ ০ ০ পূ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ র্ণ ০ হ ল ০

। -ণ্া -প্া -া -া ধ্া সা সা সা । -া -া -রা সরা সরা -গমা গা -া I
০ ০ ০ ০ শু ন স বে ০ ০ ০ জ০ গ০ ০০ ত ০

I -া -া -মগা -মরা -া -া রা রগা । -মপা -ধধা -পমা -গগা -পপা -মগা -রগা -মমা ।
০ ০ ০০ ০০ ০ ০ জ নে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

। -গগা -র্সা -সা -া -া II
০০ ০০ ০ ০ ০

II গা -া -া -পপা । -মগা -রা -া -া গা মা পা পক্ষা I
কী ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ হে রি হু শো

I পা -া -া পা মা গা -া -মগা । -মরা রা রা গা রগা -মপা -পমা -মগা ।
ভা ০ ০ নি খি ল ০ ০০ ০০ ভু ব ন না০ ০০ ০০ ০০

। -গরা -সন্‌া -সা -া সা সা সা রা । -া -মমা -গরা -গা -া মা পা -া I
০০ ০০ থ ০ চি ত্ত মা ঝে ০ ০০ ০০ ০ ০ ব সি ০

I -া পা মা গা -া -মগা -মরা -া । রা রগা -মপা -ধধা -পমা -গগা -পপা -মগা ।
০ স্থি র আ ০ ০০ ০০ ০ স নে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

। -রগা -মমা -গগা -র্সা -সা II II[১]
০০ ০০ ০০ ০০ ০

[১] তাল মধ্যমান। স্বরলিপি হ্রস্বমাত্রায় লিখিত

সহ-সম্পাদক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬
২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক
৩. মুদ্রক : শ্রীরণজিৎ রায় (ভারতীয়)
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬
৪. প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ রায় (ভারতীয়)
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬
৫. সম্পাদক : শ্রীপুলিনবিহারী সেন (ভারতীয়)
৫৪বি হিন্দুস্থান পার্ক। কলিকাতা ২৯
৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পো : শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

৩ অক্টোবর ১৯৭২ স্বা: পুলিনবিহারী সেন

বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ২

কার্তিক-পৌষ ১৩৭৯

সম্পাদক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

Advt. No. 532/72-73

Guest Keen Williams Ltd

ক্যানভাস জুতো যে কত রকমের, বাটার জুতো না দেখলে
তা বিশ্বাস করা যায় না। এত নতুন নকশা, রকমারি রঙ,
ক্যানভাসের জুতোয় এর আগে আর দেখা যায়নি।
সব নকশাই এমনভাবে তৈরি, পরামাত্রেই পায়ের
আরাম ষোল আনা। হাঁটাচলা অবাধ সহজ।
আজই একজোড়া পরে দেখুন।
বাহার ১৮
৩.৯৫, ৪.২৫
সুপার স্পীডি ৬৫
সাইজ ১-২
৫.৯৫
টেনিস স্পেশাল ৯৫
সাইজ ৩-১১
১৩.৯৫
১২.৯৫
Bata

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৯ · ১৮৯৪ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

এইচ. পি. ব্রিগস্ -অঙ্কিত চিত্র হইতে
ব্রিস্টল মিউজিয়ম সংগ্রহ

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৯ · ১৮৯৪ শক

চিরস্মরণীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

১৩৪৭

'১১ মাঘ' প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে 'চিরস্মরণীয়' নামে ফাল্গুন ১৩৪৭ সালের প্রবাসী পত্রে প্রথম প্রকাশিত। দুইটি রচনা একই সময়ের বলিয়া অনুমিত; পরে 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' গ্রন্থের রবীন্দ্রশতবার্ষিক সংস্করণে (১৩৬৬) সংকলিত।

কবিতাটি জন্মদিনে (১ বৈশাখ ১৩৪৮) গ্রন্থে সংকলিত।

অগ্রপথিক রামমোহন

অন্নদাশঙ্কর রায়

রামমোহন রায়কে একজন অনুসন্ধিৎসু নাবিকের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যে নাবিক উজানে নৌকা বেয়ে একটির পর একটি তীর্থ অতিক্রম করে গঙ্গোত্রীর নিকটবর্তী হন। আবার ভাটিতে নৌকা বেয়ে মোহনা পেরিয়ে সমুদ্রে পড়ে সমুদ্রেরও এক পার থেকে অপর পারে পৌছন।

বারো শো বছর উজিয়ে গিয়ে তিনি ইসলামের আদি অন্বেষণ করেন। আরো ছ' শো বছর উজিয়ে গিয়ে খ্রীস্টধর্মের আদি। আরো কয়েক শো বছর উজিয়ে গিয়ে ইহুদীধর্মের আদি। আরো কয়েক শো বছর উজিয়ে গিয়ে হিন্দুধর্মের আদি। প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর, প্রাচীনতর থেকে প্রাচীনতম, এইভাবে তিনি কালস্রোতের উজানে যাত্রা করেন। প্রত্যেকটি ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে তিনি প্রাচীনতমকেই আপনার করে নেন। তার নাম রাখেন বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম।

একই সময়ে তিনি ইউরোপীয় ইতিহাস ভূগোল দর্শন রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করে তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় ও আমেরিকান চিন্তার স্রোতে আকণ্ঠ নিমগ্ন হন। আধুনিকদের মধ্যে তিনি আধুনিকতমকেই গ্রহণ করেন। স্বদেশের জন্যে চান আধুনিকতম শিক্ষা। ধর্মে যারা অতীতে ফিরে যাবে কর্মে তারা ভবিষ্যতের অভিমুখে এগিয়ে যাবে। চিন্তায় তারা ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের থেকে ভিন্ন হবে না। তারা হবে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। সে মানুষের বাস যে দেশেই হোক-না কেন সে তার যুগের সন্তান। স্বযুগের যা শ্রেষ্ঠ তা যদি বিদেশে বিবর্তিত হয়ে থাকে তা হলেও তাকে স্বদেশে প্রবর্তিত করতে হবে।

রামমোহন এদেশের রেফরমেশন তথা রেনেসাঁসের অগ্রদূত। ইউরোপের রেফরমেশন যেমন বাইবেলের জার্মান অনুবাদ থেকে শুরু হয়, ভারতের রেফরমেশন তেমনি বেদ-বেদান্তের বাংলা অনুবাদ থেকে। ইউরোপের সাধারণ লোককে জানতে দেওয়া হত না মূল বাইবেলে কী আছে। মূল বাইবেল পড়ে মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় তার তর্জমা করেন। তেমনি বেদ ছিল কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারের কণ্ঠেই নিবদ্ধ। বৈদিক সংস্কৃত ব্রাহ্মণদেরও দুর্বোধ্য। বেদকে লিপিবদ্ধ করাই হত না, যদি বিদেশী পণ্ডিতরা উদ্যোগী না হতেন। শূদ্রের পক্ষে যা কানে শোনাও পাপ তাই হল ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের চক্ষুগোচর, যখন রামমোহন বাংলাভাষায় উপনিষৎ প্রভৃতি প্রকাশ করলেন। হাজার হাজার বছরের নিষিদ্ধ দুয়ার খুলে গেল।

তেমনি আরো একটি দুয়ার ছিল, সেটি নিষিদ্ধ না হলেও কার্যত বন্ধ। কেউ কেউ হয়তো নিজের চেষ্টায় দুপাতা ইংরেজি পড়তেন, কিন্তু ইউরোপীয় বিদ্যা এদেশে অপ্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগে সেই বিদ্যাই বিশ্ববিদ্যা। তার সম্বন্ধে উদাসীন হলে অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যেত না, কয়েক শত বছরের পুরাতন বিদ্যার রোমন্থন করেই দিন কটত। রামমোহন যেমন ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃপ্রবর্তন চেয়েছিলেন তেমনি চেয়েছিলেন আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যার প্রথম প্রবর্তন। একমাত্র সেই পথেই এদেশের রেনেসাঁস আসত। এলও সেই পথে। রামমোহন আমাদের রেনেসাঁসের দুয়ার খুলে দেন।

হিউমানিজম বা মানবিকবাদ আমাদের দেশে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু রেনেসাঁসের সঙ্গে পশ্চিম থেকে

যা এল তা মানুষমাত্রের ও মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সম্ভাবনায় বিশ্বাস। সে বিকাশ ইহলোকেই ও ইহকালেই। তার জন্যে পরকাল বা পরলোক অবধি অপেক্ষা করতে হবে না। অথবা জন্মান্তর অবধি। রামমোহনও এই অর্থে মানবিকবাদী ছিলেন। তাঁর মানবপ্রেম কেবলমাত্র স্বজাতীয় মানবপ্রেমে নিবদ্ধ ছিল না। বিশ্বমানবের প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতি ছিল। তিনি জাতি বর্ণ ও ধর্মমতের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এর জন্যে তাঁকে তৈরি করেছিল।

যে উপাসকমণ্ডলীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সে মণ্ডলীর শিকড় যদিও উপনিষদের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত তবু তার ডালপালা সারা দুনিয়ার আলো-বাতাসের দিকে প্রসারিত। কোরান ও বাইবেল তো রামমোহনের প্রিয় পাঠ্য ছিলই, তাঁর উপাসনা-প্রণালীর উপরেও প্রভাবপাত করেছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ আরো বেশি সংগ্রহশীল হয়। যেখানে যা-কিছু গ্রহণযোগ্য পায় তা স্বাঙ্গীকৃত করে। কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তাঁর আগে কোনো মুসলমানও তা করতে সাহস পান নি। বেদ ও বাইবেলের মতো কোরানের অনুবাদও নিষিদ্ধ ছিল। রামমোহন স্বয়ং ইংরেজিতে যীশুখ্রীস্টের উপদেশ লিখেছিলেন। সর্বধর্মসমন্বয় বলে একটি কথা পরবর্তীকালে শোনা যায়। কিন্তু সেরকম কোনো অন্বিষ্ট রামমোহনের বা তাঁর উপাসকমণ্ডলীর ছিল না। যেখানে যেটুকু আলো পেয়েছেন সেখান থেকে তাঁরা তা নিয়েছেন। এর নাম সমন্বয় নয়।

ইউরোপের রেফরমেশনের সঙ্গে এদেশের রেফরমেশন পুরোপুরি মেলে না। সেইজন্যে ওটাকে রেফরমেশন না বলে রিফর্ম মুভমেণ্ট বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যে শব্দই ব্যবহার করি না কেন আমরা যেন মনে রাখি যে রামমোহন কোনো শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত বলে মানতেন না। বেদ-বেদান্তকেও না। অভ্রান্ত কেউই নয়, কিছুই নয়। মানুষকে তার জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারের দৃষ্টিতে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে হবে। অভ্রান্ততাবাদী হিন্দু ও খ্রীস্টানদের সঙ্গে তর্ক করতে তাঁর বহু শক্তি ও সময় ব্যয় হত। এটা যে আদৌ সম্ভব হয়েছিল এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় উনবিংশ শতাব্দীর নতুন আবহাওয়াকে।

নতুন আবহাওয়াটা এসেছিল ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। সেখানে তাকে বলা হত এনলাইটেন-মেণ্ট। সারা শতাব্দী ধরে সেখানকার দার্শনিক ও সাহিত্যিকরা অভ্রান্ততাবাদী ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্টদের সমালোচনা করেছিলেন ও তাঁদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তে অপর সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব শুধুমাত্র আর্থিক বা রাজনৈতিক কারণে ঘটে নি। তার পেছনে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন পরীক্ষানিরীক্ষা, স্বাধীন সিদ্ধান্তও ছিল। এই-যে স্বাধীনতা এটি রামমোহনেরও মূলমন্ত্র। স্বাধীনভাবে চিন্তা না করতে পেলে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করতে পেলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পেলে তিনি বাঁচতেই চাইতেন না। অনায়াসেই তাঁকে একজন ফরাসী দার্শনিকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেণ্ট তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। সেইজন্যে ফ্রান্সের প্রতি, ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর একটা টান ছিল। এখানে আবার তিনি ধর্মের ধারক ছিলেন না। ফরাসী দার্শনিকরাও কেউ ধর্মের ধারক ছিলেন না। তাঁর জীবনের এটাও একটা দিক। এর পেছনে রয়েছে মানবিকবাদ। মানবমুক্তি। মানুষকে যাঁরা মুক্তি দিয়েছেন, লিবারেটর যাঁরা, তিনি তাঁদের একজন।

আমাদের রেফরমেশন এসেছে প্রাচীন ভারতের পুনরাবিষ্কার থেকে। আমাদের রেনেসাঁস এসেছে আধুনিক পশ্চিমের আবিষ্কার থেকে। পুনরাবিষ্কারক তথা আবিষ্কারক হচ্ছেন রামমোহন রায়। কলম্বস

ভারত আবিষ্কার করতে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তার পর ভারত আবিষ্কার করেন ভাস্কো দা-গামা। অতঃপর পালটা আবিষ্কারের প্রয়োজন ছিল। সেই কাজটি করেন রামমোহন। তিনি ইউরোপ আবিষ্কার করেন। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়। তাঁর আগেও অযোধ্যা রাজ্যের এক বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী ইউরোপে যান ও বছর-কয়েক থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। নাম যতদূর মনে পড়ে আবু তালেব। ভাস্কো দা-গামার আগেও যে কেউ ভারতে আসেন নি তা নয়। সত্যিকার আবিষ্কার তাকে বলে না। সত্যিকার আবিষ্কার হচ্ছে উৎসাহ সঞ্চার। তখন থেকেই আমরা ইউরোপযাত্রার জন্যে আকুল। ধন আহরণের জন্যে নয়, জ্ঞান আহরণের জন্যে। কিছু দিয়ে আসার জন্যেও। রামমোহনও কিছু দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বরাবরের জন্য রয়ে গেলেন। সাগরপারে সমাধিস্থ।

একদা গ্রীস ও রোমের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু মাঝখানে ঘটে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদকে মিলনে পরিণত করা কখনো সম্ভব হত না, যদি কেবল বিদেশীরা এদেশে আসত, যদি এদেশ থেকে কেউ ওদেশে না যেত। রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাস্ত্রশাসন অগ্রাহ্য করে সমুদ্রযাত্রা সেই যে শুরু হয়, তার পর থেকে সেইটেই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপে গিয়ে সদ্‌ব্যবহার পেয়ে মুগ্ধ হন অনেকেই। তখন তাঁরা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন। বিধাতার অভিপ্রায়ে সেটা ঘটবে। ব্রিটিশ শাসন তাঁদের মতে বিধাতার লিখন।

রামমোহনের ধ্যানেও মিলনের আভাস ছিল। ভারতকে তিনি ইউরোপের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারতেন না। তেমনি ইউরোপকে ভারতের থেকে। কিন্তু বিচ্ছেদ দূর হলেই যে মিলন হয় তা তো নয়। একসঙ্গে থেকে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর আধিপত্য করতেও তো পারে। তখন আধিপত্যের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে বিচ্ছেদও তো কাম্য হতে পারে। রামমোহন বোধহয় কল্পনাও করতে পারেন নি যে শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাব প্রবল হবে। না হবেই বা কেন? ইংরেজদের তখন সাম্রাজ্যমদমত্ত অবস্থা। কবি কিপলিং তো সুর ধরিয়ে দিয়েছেন, "ওহে, পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম, কোনোকালেই দু দিকের মিলন হবে না।" ঠিক সেই কথারই প্রতিধ্বনি ওঠে এদেশের কারো কারো কণ্ঠে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা কোনো পক্ষের ছিল না। অনেকেই ভাবতেন যে পূর্ব নেবে পশ্চিমের বিজ্ঞান তথা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র, আর পশ্চিম নেবে পূর্বের আধ্যাত্মিকতা তথা প্রাচীন বিদ্যা। কিন্তু পশ্চিম তখন ঘোরতর শাক্ত ও ভোগী। তার দিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। তখন ভারতের দিক থেকে অভিমান জন্মাল। চরমপন্থীরা মানতেই চাইলেন না যে পশ্চিমের কাছ থেকে কিছু শেখবার আছে। কেন, আমাদেরও কি বিজ্ঞান ছিল না? পুষ্পক বিমান তবে কাদের উদ্ভাবন? পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র কিসে কম?

দেশে রিভাইভালিজমের জোয়ার আসে। পূর্ব-পশ্চিম মিলনের স্বপ্ন ভেসে যায়। কিন্তু ভেসে গেলেও তা ডুবে যায় না। রামমোহনের উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সুধীদের চিত্তে আশ্রয় পায়। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সমন্বয় কেমন করে ঘটানো যায় এই হয় তাঁদের সমস্যা। সেইজন্যে গান্ধীজীর অসহযোগ নীতি তাঁদের মর্মাহত করে। ওটা রামমোহনের নীতির বিপরীত।

পূর্ব একটি দিক্‌সূচক শব্দ। পশ্চিমও তাই। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম বলতে আসলে যা বোঝাত তা যুগসূচক।

প্রাচী বললেই মনে আসে একটা প্রাচীন ভাব। প্রাচীন প্রাচী। আর প্রতীচী বললেই একটা আধুনিক ভাব। আধুনিক প্রতীচী। তাই মিলনটা নামে পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের, আসলে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার। আমরা আমাদের পাঁচ হাজার বছর জোড়া ঐতিহ্যের সমস্তটাই যদি অতি যত্নে সংরক্ষণ করতে চাই তবে আধুনিক কালের জন্যে কোথাও কি এতটুকু ফাঁক থাকে? সে হয়তো বাহ্যবস্তুতে কোনোমতে একটু ঠাঁই করে নিতে পারে, যেমন ইমারতে বা আসবাবে বা জামাজুতোয়। কিন্তু মনের অন্দরে তার প্রবেশ মানা। সেখানে গুরু পুরোহিত পাঁজি পুঁথি ঠিকুজি শাস্ত্র ও মেয়েলি শাস্তর। সংরক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

পশ্চিমের সঙ্গে বোঝাপড়া তেমন কঠিন নয়, পূর্বও যখন সমান স্বাধীন। কবি কিপলিংও বলেছিলেন যে যখন দুই শক্তিশালী পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়াবে তখন তাদের মিলন হতে পারে। কিন্তু ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মিলন বা বোঝাপড়া হবে কী করে? হবে কতখানি? রামমোহনের সময় থেকেই এ প্রশ্ন আমাদের চিন্তানায়কদের চিন্তাকুল করে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতাও তার উত্তর নয়। পাঁচ হাজার বছর যার বয়স স্বাধীনতা তার নবকলেবর নয়, তা তো আমরা প্রত্যক্ষ করছি। প্রত্যেকটি পুরনো অভ্যাস ফিরে আসছে। রিভাইভালিজমের অন্তঃস্রোত বয়ে চলেছে।

রামমোহনের সময় থেকে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার বোঝাপড়ার যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস লক্ষ করি তাতে ছেদ পড়তে যাচ্ছিল অসহযোগের দিনে। রবীন্দ্রনাথ যদি না জোরালো প্রতিবাদ জানাতেন। ইংরেজি শিক্ষা যাকে বলা হয় প্রকৃতপক্ষে তা আধুনিক বিদ্যা বা নিউ লার্নিং। তার গায়ে ইংরেজির গন্ধ আছে বলে তাকে বর্জন করলে সংস্কৃত শিক্ষা বা ওল্ড লার্নিং ফিরিয়ে আনতে হয়। অপরপক্ষে রামমোহনের প্রবর্তনায় একটা নবজাগরণ এসেছিল। যদিও সেটা গণজাগরণে পরিণতি পায় নি। গণ-জাগরণ পরে যখন আসে তখন মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় আসে। কিন্তু সেটা এত বেশি ঐতিহ্যাশ্রয়ী যে আধুনিকতার ভাগ তাতে কম। রামমোহন যাদের আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেলেন গান্ধীজী তাদের মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বলে আশঙ্কা হল। নবজাগরণের অগ্রদূত ও গণজাগরণের ভগীরথ এঁদের দুজনের কেউ কারো চেয়ে কম গুরুত্বসম্পন্ন নন, অথচ এঁদের মেলাতে পারা শক্ত। এই শক্ত কাজটি এঁরা আমাদের জন্যে রেখে গেছেন।

রাজা রামমোহন রায় ও ভারতীয় অর্থনীতি

ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনকে আখ্যা দিয়েছিলেন ভারতপথিক। যেরকম ভারতপথিক ছিলেন কবির বা দাদু সেরকম রামমোহনও ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তার পথ অবলম্বন করে সমসাময়িক দেশবাসীর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আস্বাদ তখনকার দিনে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এবং অল্প-সংখ্যক আরো কোনো কোনো শিক্ষার্থী পেতে আরম্ভ করেছে। এই নূতন আস্বাদের চমৎকারিতায় যারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছে ভারতীয় চিন্তাধারার সম্পদ আবার জোর দিয়ে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন ছিল। রামমোহন এই কাজের ভার নিয়েছিলেন নিজের অন্তরের আগ্রহে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সমাজসংস্কার ইত্যাদি নানা দিকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন শুধু ভারতবর্ষের শাশ্বত পথের পথিকই ছিলেন না— যে পথে নিজে চলেছেন সে পথে অন্যকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে পথ ছিল না সেখানে নূতন পথ খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতপথিক রামমোহন বহু বিষয়ে আমাদের পথিপ্রদর্শক, অনেক নূতন বিষয়ে আমাদের পথিকৃৎ।

স্বাভাবিক কারণেই দার্শনিক রামমোহন, আত্মীয় সভা, ইউনিটারিয়ান সোসাইটি, ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত কলেজের স্থাপয়িতা রামমোহন এবং সমাজ-সংস্কারক রামমোহনের দিকেই পরবর্তী কালের দৃষ্টি পড়েছে বেশি করে। স্কুলের ছাত্রও রামমোহনের নাম শুনলে ব্রাহ্মসমাজ ও সতীদাহ-নিবারণ-প্রচেষ্টার উল্লেখ করতে পারে। রামমোহনের রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি সম্বন্ধে চিন্তাধারার সঙ্গে শিক্ষিত জনসাধারণের পরিচয় কম। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের বৃত্তি ইত্যাদির জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদনের জন্য রামমোহন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তাও অনেকেই জানেন। কিন্তু দুবছর ইংলণ্ডে থাকার সময়ে ভারতবর্ষের— বিশেষত পূর্বাঞ্চলের— অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন নিবন্ধ রচনা করেছিলেন তা অনেক সময় আমাদের বর্তমান যুগের আলোচনাতে অবহেলিত হয়।

অথচ, রামমোহনের রচনাবলী পড়লে এটা সহজেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণে এই ভারতপথিক অবিসম্বাদিত পথিকৃৎ। তথ্য সন্ধান ও বিশ্লেষণের যে দরজা তিনি খুলে দিয়েছিলেন, সে দরজা দিয়ে তাঁর পরে বহুদিন কেউ প্রবেশ করেন নি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে যখন নওরোজি, রমেশ দত্ত ও রানাডের হাতে ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা নূতন জীবন লাভ করল তখন দেখা গেল যে রামমোহনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পঞ্চাশ বছর পরের চিন্তাধারার সাদৃশ্য অনেকখানি। দীর্ঘ ব্যবধানে চিন্তাধারার ইতিহাসে ধারাবাহিকতা অনায়াসেই ব্যাহত হতে পারত, আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করতে হয় যে রামমোহন থেকে দাদাভাই নওরোজির বিবর্তন কোথাও বেশি অসংগত মনে হয় না।

রামমোহনের আগে কোনো ভারতীয় পণ্ডিত আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কিছু রচনা করেছিলেন বলে জানা নেই। প্রথম যুগের সংবাদপত্রে, বিশেষত 'সমাচার দর্পণে', অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকত। আর্থিক বিষয়ে বহু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত বিশেষ প্রবন্ধ— 'কৃষিকর্মের বৃদ্ধি', 'এতদ্দেশের বাণিজ্য',

'ক্লোনাইজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজ লোকের এদেশে চাসবাস বিষয়ক', 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'চরকাকাটুনির দরখাস্ত' ইত্যাদি নামাঙ্কিত প্রবন্ধের অনেকগুলিই রামমোহনের নিবন্ধগুলির আগেই প্রকাশিত হয়েছিল— কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনো সুসম্বদ্ধ তাত্ত্বিক বা বিশ্লেষণী আলোচনা ছিল না। পরবর্তী যুগে ১৮৫০-এর কাছাকাছি সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে যে কয়েকটি অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, কিংবা তারও পরে 'সোমপ্রকাশে'র অসংখ্য আলোচনাতে যে সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, রামমোহনের যুগে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় রামমোহনের কোনো ভারতীয় পূর্বসূরী ছিলেন না, এবং তাঁর উত্তরসূরীরা আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর মৃত্যুর প্রায় চার দশক পরে। পথিক ও পথিকৃৎ রামমোহন তাঁর নিজের যুগে একাকীত্বে বিশিষ্ট।

অর্থনীতি বিষয়ে রামমোহনের যে রচনাগুলি আমরা পাই সেগুলি সবই ১৮৩১ সালের অগস্ট মাস থেকে ১৮৩২-এর জুলাই মাস, এই এক বৎসর সময়ের মধ্যে লেখা। তখনকার নিয়ম অনুসারে প্রতি কুড়ি বৎসর পরে পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ নূতন করে পার্লামেণ্টে পাস করিয়ে নিতে হত— যে আইন দিয়ে সনদ নূতন করা হত তার নাম ছিল 'চার্টার অ্যাক্ট'। ১৮৩৩ সালে নূতন চার্টার অ্যাক্ট পাস করাবার আগে পার্লামেণ্ট থেকে একটি 'সিলেক্ট কমিটি' নিযুক্ত হয়— গত কুড়ি বছরের কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সনদে কী কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে অভিমত দেবার জন্য। রামমোহন তখন লণ্ডনে উপস্থিত এবং তিনি সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য রামমোহন নিজে গিয়েছিলেন কি না সে সম্বন্ধে শ্রীমতী কলেট ও শ্রীমতী কার্পেণ্টার দুরকম মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অর্থনীতির গবেষকের সৌভাগ্যে রামমোহন কমিটির কাছে তাঁদের প্রেরিত দীর্ঘ প্রশ্নাবলীর লিখিত উত্তর পাঠিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন কয়েকটি পরিশিষ্ট প্রবন্ধ। এই প্রশ্নোত্তর ও নিবন্ধগুলি থেকেই আজকালকার পাঠক রামমোহনের অর্থনীতি-চিন্তার স্বরূপ পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

এই প্রশ্নোত্তর ও নিবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩২ সালেই। এর কোনো-কোনোটি পরে পত্রপত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়, যেমন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। ১৯৪৭-এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলী প্রকাশ করেন। আরো সাম্প্রতিক কালে, ১৯৬৫ সালে, কলকাতার 'সোশিয়ো-ইকনমিক রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট' এই-সব লেখা একত্র করে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সম্পাদনায় *Rammohun Roy on Indian Economy* প্রকাশ করেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই সংগ্রহটির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়েছে— এবং যে-সব উদ্ধৃতি বাংলা অনুবাদে দেওয়া হয়েছে তার মূল ইংরেজি এই সংগ্রহেই পাওয়া যাবে। এগুলি ছাড়া দু-একটি অন্য লেখারও খবর পাওয়া যায়— যেমন ১৮২৮ সালে জমিদারদের 'লাখেরাজ' সম্পত্তিগুলিকে কোম্পানির দখলে আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্রগুলি। রামমোহনের লেখার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি -সম্পাদিত সোফিয়া ডবসন কলেট -রচিত রামমোহনের জীবনীগ্রন্থের পরিশিষ্টে। এই দীর্ঘ তালিকাতে অর্থনীতি-সংক্রান্ত রচনার সংখ্যা খুব কম।

সিলেক্ট কমিটির কাছে যে প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য -সংবলিত পরিশিষ্ট পাঠানো হয়েছিল সেগুলি হল: ১. ভারতের রাজস্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর, ১৯ অগস্ট ১৮৩১; ২. রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিশিষ্ট, ১৯ অগস্ট ১৮৩১; ৩. বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১; ৪. ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে

প্রশ্নোত্তর, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১; ৫. বিচার ও রাজস্ব সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৮৩২; ৬. লবণের একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর, ১৯ মার্চ ১৮৩২; এবং ৭. ভারতে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে নিবন্ধ, ১৪ জুলাই, ১৮৩২। শ্রীমতী কার্পেন্টারের মতে রামমোহন সিলেক্ট কমিটিতে মৌখিক সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন, কিন্তু তার কোনো মুদ্রিত বা লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নূতন চার্টার অ্যাক্ট আইনে পরিণত হয় ১৮৩৩-এর ২০ অগস্ট। এই নূতন আইনের অনেক ব্যবস্থাই রামমোহনের মনঃপূত হয় নি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য লিখে যাবার সময় তিনি পেলেন না। অল্পদিন পরেই, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা রামমোহনের অর্থনৈতিক মতামতের মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমেই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও সমকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর জন্ম-বৎসর সম্বন্ধে মতভেদের মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি ১৭৭২ সালটিকেই গ্রহণ করি (১৭৭৪ হলে, সব হিসাব দু'বছর কম হবে), তা হলে দেখি যে আমাদের দেশে রাজস্বব্যবস্থা নিয়ে যখন নানা রকমের পরীক্ষা চলেছে, তখন রামমোহন কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হচ্ছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রান্তকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ফলাফল যখন দেখা যাচ্ছিল, রামমোহন তখন তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বৃদ্ধি করছেন। ১৭৭০ সালের (বাংলা সন ১১৭৬) 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' অসংখ্য শিশুমৃত্যুর ফলে কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে পূর্বভারতে পূর্ণবয়স্ক কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে জমিদারদের দেয় রাজস্ব হিসাবে যে টাকা স্থায়ীভাবে স্থির করে দিলেন, সেটা তখনকার প্রজার দেয় মোট খাজনার প্রায় দশভাগের নয় ভাগ। কর্নওয়ালিসের আশা ছিল যে জমির জন্য চাহিদা বৃদ্ধির ফলে জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা এবং নীট লাভ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেখা গেল যে জমিদাররা প্রজা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, খাজনা আদায় হচ্ছে না, বাকি রাজস্বের দায়ে জমিদারি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ১৭৯৯ সালে 'সপ্তম' ('হফ্‌তম') আইন তৈরি করে জমিদারদের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হল যাতে তাঁরা সহজে প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারেন।

এই অবস্থাটা ছিল সাময়িক। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার ফলে চাষ-আবাদের প্রসারের ফলে জমিদাররা খাজনা বাড়াবার সুযোগ পেলেন। ১৮১২ সালে 'পঞ্চম' আইন পাস করে জমিদারদের ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করা হল এবং দশ বছর পরে, ১৮২২এ, কোম্পানির সরকার রায়তদের সংগত খাজনা স্থির করে দেবার অধিকার গ্রহণ করলেন। কিন্তু, রায়তের উপরে চাপ বেড়ে চলল বছরের পর বছর।

রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূমিরাজস্ব বিভাগে কাজ করেন প্রায় দশ বছর। যতদূর জানা যায়, ডিগবি নামক একজন কালেক্টরের অধীনে তিনি কাজ আরম্ভ করেন হাজারিবাগ জেলার সদর রামগড়ে ১৮০৫ সালে— এবং পরে ডিগবির সঙ্গেই ভাগলপুর ও রংপুরে কাজ করেন ১৮১৫ পর্যন্ত। প্রথমে ছিলেন মুনসি, পরে সেরেস্তাদার এবং তারও পরে দেওয়ান— এবং দেওয়ানের কাজে রংপুর জেলাতেই তাঁর দীর্ঘতম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ডিগবির কাছে রামমোহন ইংরেজি শেখেন এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বিদেশী ভাষাতে এবং এই ভাষার মাধ্যমে নানা বিষয়ে পারংগম হয়ে ওঠেন। ১৮১৬ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত কলকাতা শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক হিসাবে সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষা-প্রসারে, ভারতীয় দর্শন -চর্চায়, নূতন ধর্ম -সংস্থাপনে তাঁর

কৃতিত্ব অসামান্য হয়ে উঠল। এ-সবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিচর্চা তিনি কিভাবে করেছিলেন তার কোনো নিদর্শন নেই, কিন্তু দু-একটি অনুমান বোধহয় অসংগত হবে না।

রাজা রামমোহন যখন ডিগবির কাছে ইংরেজি শিখতেন তখন অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)-এর 'ওয়েলথ অফ্ নেশনস্' প্রায় ত্রিশ বছরের পুরানো বই, কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের অবশ্যপাঠ্য। মলথস (১৭৬৬-১৮৩৪) এবং রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) ছিলেন রামমোহনের সমসাময়িক। মলথসের জনসংখ্যা সম্বন্ধে বই প্রকাশিত হয় ১৭৯৮তে এবং অর্থনীতির উপরে বইটি বেরোয় ১৮২০তে; রিকার্ডোর প্রধান বই প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। এ-সব লেখার সঙ্গে রামমোহন পরিচিত ছিলেন কি না তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই— কারণ গবেষকের পাদটীকা-কণ্টকিত রচনা তাঁকে করতে হয় নি এবং তাই অন্য কোনো লেখার উল্লেখও করতে হয় নি। কিন্তু, করনীতি বা মূলধন সঞ্চয় সম্বন্ধে যে দু-একটি মন্তব্য তিনি করেছেন এবং ইংলণ্ডের শিল্পজ্ঞান ও মূলধনের অংশভাগী হয়ে উত্তর-আমেরিকার উন্নতি সম্বন্ধে যে কথাগুলি মাঝে মাঝে বলেছেন তাতে মনে হয় স্মিথ ও রিকার্ডোর লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এটাও উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ এবং সামাজিক রীতিনীতি -সম্ভূত জনসংখ্যা-বৃদ্ধি এবং মহামারী ইত্যাদি কারণে সংখ্যাহ্রাস সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তিনি করেছিলেন সেটা মলথসেরই প্রতিধ্বনি।

১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ নূতন করে মঞ্জুর করার আগে ইংলণ্ডে একটি তথ্যানুসন্ধানী কমিটি নিয়োগ করা হয়— এই কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে (১৮১২) ভারতের ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্ট রামমোহন নিশ্চয় সযত্নে পড়েছিলেন। ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহন যে-সব মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে মনে হয় ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত কোলব্রুকের 'হাজব্যান্ড্রি ইন বেঙ্গল' বইটিও তিনি পড়েছিলেন। ইংলণ্ডে বাসকালে জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২)-এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়েছিল এবং সম্ভবত সাক্ষাৎ-আলোচনাও হয়েছিল। বেন্থামের লেখা চিঠিতে জেম্স্ মিল (১৭৭৩-১৮৩৬)-এর উল্লেখ আছে— মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তাঁর অর্থনীতি সম্বন্ধে বই রামমোহন পড়েছিলেন এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ী ও শিল্প-মালিকদের স্থায়ী বসবাস সম্বন্ধে রামমোহনের মতবাদে দ্বারকানাথ ঠাকুরের কিছু প্রভাব থাকতে পারে। এ বিষয়ে ১৮২৯এ দ্বারকানাথ যা লিখেছিলেন তার সঙ্গে ১৮৩১এর রামমোহনের নিবন্ধের সাদৃশ্য অনেকখানি।

যে অর্থনৈতিক পটভূমিকাতে রামমোহনের মতবাদ গঠিত হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় দিক ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা -সম্পর্কিত। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ১৮৩০ সালে ভারতের কুটিরশিল্প অবনতির পথে, কিন্তু আধুনিক শিল্প তখনো আরম্ভ হয় নি। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ততদিনে প্রায় ষাট বছর ধরে চলেছে এবং বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ডের অগ্রগতি তখন চমকপ্রদ। ভারতবর্ষের কুটিরশিল্পজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির আমদানি ইংরেজ সরকার তখন বন্ধ করেছেন উঁচু হারে শুল্ক বসিয়ে— অন্য দিকে ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় তখন আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। রেলপথ তখনো বহুদূরে— স্টীমার আসতেও কয়েক বছর দেরি। বহির্বাণিজ্য অবশ্য বাড়ছিল— বছরে পাঁচ বা ছয় কোটি টাকার রপ্তানি বা আমদানি তখনকার দিনের পক্ষে খুব কম ছিল না। আমদানি-রপ্তানির কাজে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়েরাও লিপ্ত হয়ে উঠলেন— কেউ বিদেশী বণিকের মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ন রূপে, কেউ বা সরাসরি। দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দর পর্যন্ত এবং বন্দর থেকে বিদেশে চালান পর্যন্ত জিনিসের চলাচল সহজ করবার জন্য প্রয়োজন হল ব্যাঙ্কের এবং এজেন্সি

হাউসের। বিদেশী ব্যাঙ্কের ধরনে দেশি ব্যাঙ্কও স্থাপিত হল, যেমন ১৮২৯এ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বেশি দিন চলে নি, কিন্তু ১৮০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' এখনো জীবিত আছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মধ্যে— ১৯২১এ তিনটি 'প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক'কে যুক্ত করে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠিত হয় এবং ১৯৫৫-তে সেই ব্যাঙ্কেরই নূতন নামকরণ হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।

সহরাঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতায়, যে নবজাগ্রত শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠল তারা হল কোম্পানির সরকারের চাকুরিয়া, নূতন ধরনের ব্যবসায়ী এবং গ্রামের জমিদারির 'অনুপস্থিত' সহর-বাসী মালিক। রামমোহন এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যেই পড়েছিলেন, অন্ততঃ ১৮১৬ সালের পর থেকে— যখন তিনি জমিদারি সম্পত্তি ক্রয় করে, রংপুরের চাকরি ছেড়ে কলকাতাতে বসবাস আরম্ভ করলেন। তাঁর লেখাতে আমদানি রপ্তানি, সরকারি ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা উল্লেখ থাকলেও, প্রধানত তিনি ভূমি ও কৃষির সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল যে, এই আলোচনাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কৃষক-প্রজার অনুকূলে, জমিদারদের নানা প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জমিদারের দেয় রাজস্ব কমাবার প্রস্তাব তিনি অবশ্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সহানুভূতি কোন্ দিকে ছিল সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর প্রতিবেদনে রামমোহন তখনকার দিনের শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন, অনেক খুঁটিনাটি সহ। তাঁর দেওয়া হিসাব অনুসারে, কলকাতাতে তখন মিস্ত্রি-জাতীয় শ্রমিকের আয় ছিল মাসে দশ টাকা থেকে বারো টাকা, এবং সাধারণ শ্রমিকের সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা। অন্য সহরে এর চেয়ে কম, এবং গ্রামাঞ্চলে আরো অনেক কম। জিনিসপত্র অবশ্য শস্তা ছিল, কিন্তু রামমোহনের অভিজ্ঞতায় বঙ্গদেশের দরিদ্র শ্রেণী ভাত আর নুন ছাড়া আর কোনো আহার্য প্রায় পেতই না। একটি পূর্ণবয়স্ক লোকের দিনে প্রায় আধসের থেকে তিন পোয়া চাল প্রয়োজন হত। বাড়ি ছিল মাটি, খড় এবং নলখাগড়া দিয়ে তৈরি। পরিধেয় বস্ত্র ছিল নামমাত্র। শিক্ষা ধনীশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার থাকা সত্ত্বেও তারা সরল ও নীতিপরায়ণ ছিল।

এই বর্ণনার পটভূমিকায় রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তের দুর্গতির চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। জমিদারেরা তখন প্রজার খাজনা বাড়াতে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং কৃষকদের যে-সব অধিকার ১৭৯৩ সালের আগে সর্বত্র মেনে চলা হত সেগুলিও খর্ব করেছিলেন। যে-সব চাষী নিজের গ্রামের জমি চিরাচরিত ভাবে চাষ করত সেই-সব "খুদ্‌কাশ্‌ত্‌" চাষীর অধিকার সংরক্ষণের আশা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে দেওয়া হয়েছিল— কিন্তু জমিদারেরা সে আশা সফল করেন নি। রায়ত খাজনা দিতে দেরি করলে কিভাবে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা হত তার বর্ণনা রামমোহন দিয়েছিলেন। আর বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে জমিদারেরা চাষীর উৎপন্ন ফসলের দামের অর্ধেক নিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন, বাকি অর্ধেক থেকে চাষীকে বীজ ও কৃষির অন্য সব ব্যয় নির্বাহ করে জীবনযাত্রার সম্বল খুঁজতে হত। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য-নির্ধারণে চাষী সুবিচার পেত না। এই ব্যবস্থায় চাষীর পক্ষে জীবন ধারণই শক্ত ছিল, সঞ্চয়ের তো কথাই ওঠে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করবার সময়ে আশা করা হয়েছিল যে, প্রথমত, জমিদারেরা পতিত জমিতে কৃষি সম্প্রসারণ করে উৎপাদন বাড়াবেন এবং নিজেরাও লাভবান হবেন; দ্বিতীয়ত, যে-সব জমিতে চাষ হচ্ছিল,

সেগুলিরও উন্নতি করা হবে ; তৃতীয়ত, জমিদারেরা রাজস্বের পরিমাণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হবেন ; এবং চতুর্থত, কোম্পানি সরকারও রাজস্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকবেন। রামমোহন দেখালেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্য যদিও সফল হয়েছিল, প্রথম দুইটি উদ্দেশ্য চার দশকের মধ্যেই বিফল প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি আরও বললেন যে কৃষির যেটুকু উন্নতি ও সম্প্রসারণ হয়েছিল তার কৃতিত্ব জমিদারের নয়, কিন্তু তার থেকে লাভটা পুরোপুরি ভাবেই জমিদারের ভোগে এসেছিল— কৃষক বা সরকার এই লাভের অংশ পান নি।

এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে রামমোহনের মত ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁর মতে ভূমিব্যবস্থায় তিনটি পক্ষেরই অধিকার সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন—শান্তিরক্ষা ইত্যাদির বিনিময়ে রাজস্ব-প্রাপ্তিতে সরকারের অধিকার ; স্থিরীকৃত রাজস্ব দেবার বিনিময়ে জমিদারের খাজনা আদায়ের অধিকার ; এবং জমি চাষ করে উৎপন্ন আয়ের পর্যাপ্ত অংশ লাভে চাষীর অধিকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই তৃতীয় অধিকারটি স্বীকৃত হয় নি। রামমোহন তীব্র ভাষায় বলেছিলেন—"আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, যে অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল, সে রকম অধিকার প্রজারা কেন পাবে না, তাদের দেয় খাজনা স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হবে না কেন, কেনই বা সহৃদয় সরকার এখনো রায়তের খাজনা বর্তমানে প্রদত্ত পরিমাণ অনুসারে স্থির করে দেবেন না, কেন ভবিষ্যতে খাজনা-বৃদ্ধি শক্তহাতে নিষিদ্ধ করা হবে না।"

রামমোহন যা চেয়েছিলেন তা অবশ্য তখন করা হয় নি—এবং কখনোই করা হয় নি। খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথম কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় রামমোহনের মৃত্যুর ছাব্বিশ বছর পরে ১৮৫৯এ—এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস করা হয় তারও প্রায় ৩৬ বছর পরে। রায়তের খাজনা বৃদ্ধির হার কমানোর চেষ্টা অবশ্য অনেক হয়েছিল, কিন্তু জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো প্রজার সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবার প্রস্তাব পরে কেউ গ্রহণ করেন নি। উনিশ শতকের শেষ দিকে গ্রন্থকারের নামহীন একটি বড় বই বেরোয় বঙ্গদেশের জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে। এই বইটিতে রামমোহনের প্রস্তাব সমর্থন করা হয়েছিল কিন্তু এ-প্রস্তাব নিয়ে আর বেশি অগ্রসর কেউ হয় নি। এর একটা সংগত কারণ ছিল, যেটা রামমোহনের সময়ে ঠিক পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি। রায়তকে কোনো রকমের স্থায়ী স্বত্ব দিলে পরিণামে অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে আইন অনুসারে যিনি রায়ত, তিনি আবার তাঁর নীচে অন্য রায়ত সৃষ্টি করেছেন এবং কখনো কখনো এই ভাবে ধাপে ধাপে বহু স্তরের প্রজার সৃষ্টি হয়েছে (উনিশ শতকের শেষে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রায় পঞ্চাশ ধরনের রায়ত বা প্রজা ছিল)। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত জমি যে চাষ করে সেই সর্বনিম্নস্তরের চাষীকে রামমোহন-প্রস্তাবিত স্থায়ী খাজনার সুবিধা যদি দিতে হয় তা হলে প্রত্যেক স্তরেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এর প্রশাসনিক জটিলতা যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। তাই পরবর্তী কালের ভূমিনীতি-নির্ধারকেরা প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে আরো অনেক ধাপের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যোগ না করে, কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থাটাকে তুলে দেওয়াই সহজ ও সংগত মনে করলেন। এতে রামমোহনের কৃতিত্ব কমে নি— যুক্তির দিক থেকে তাঁর বক্তব্যে কোনো ফাঁক নেই ; আর ১৮৩১ সালে বসে ভবিষ্যতের ভূমিব্যবস্থা কী রূপ নেবে তা বুঝতে না পারাও অস্বাভাবিক নয়। রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব তদানীন্তন অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে।

প্রজার দেয় খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন এ প্রস্তাবও করেছিলেন যে জমিদারদের দেয় রাজস্বও অনেক ক্ষেত্রে কমানো উচিত, এবং পূর্বাঞ্চলের বাইরে যে-সব এলাকায় প্রজারা সরকারকে সরাসরি খাজনা দিত তাদের দেয় টাকাও কমানো সংগত। জমিদারদের উপরে রাজস্বের বোঝা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি ছিল তার প্রমাণ হিসাবে বর্ধমানের জমিদারির উল্লেখ করেছিলেন— ১৮৩০ সালেও বর্ধমান-রাজের আদায়ী খাজনার পরিমাণ ছিল ৪৮ লক্ষ টাকার অনধিক এবং সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। বর্ধমানের নজির অবশ্য অন্যত্র প্রযোজ্য ছিল না— যখন এটা জানাই ছিল যে নানা কারণে কোম্পানির দেওয়ান এই জমিদারির রাজস্ব একটু বেশি করেই ধার্য করেছিলেন।

রায়তের দেয় খাজনা যদি আর না বাড়ানো হয় এবং জমিদারের দেয় রাজস্ব যদি কিছুটা কমানো হয়, তা হলে কোম্পানি-সরকারের আয়-ব্যয়ে ঘাটতি পড়তে পারে এ কথা রামমোহন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানির সনদ কুড়ি বছরের জন্য নূতন করে মঞ্জুর করা হল তখন কোম্পানির ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির প্রশাসনিক ('টেরিটোরিয়াল') আয়-ব্যয় ও ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পূর্ণ পৃথক করতে বলা হয়েছিল। রামমোহন যখন সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর বক্তব্য পাঠাচ্ছেন, তখন কোম্পানি-সরকারের দেশ-শাসনের ব্যয় বছরে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা এবং তার মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ভূমি-রাজস্ব থেকে পাওয়া। ভূমি-রাজস্ব কমানো হলে মোট সরকারি আয়ে ঘাটতি পড়ত সরাসরি।

রামমোহন প্রস্তাব করলেন যে সরকার আয় বাড়াতে পারবেন বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য 'অপ্রয়োজনীয়' জিনিসের উপরে শুল্ক বসিয়ে এবং ব্যয় কমাতে পারবেন ইংরেজ কর্মচারীর জায়গায় ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করে। তখনকার দিনে শুল্ক বসানো হত সাধারণত লবণ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপরে— বেশি রাজস্বের আশায়। রামমোহনই সম্ভবত আমাদের দেশে প্রথম প্রস্তাব করলেন যে বিলাস-দ্রব্যের উপরে কর বসানো হোক। বিলাসদ্রব্যের ব্যবহারীর সংখ্যা কম, কিন্তু তাঁদের আয় অনেক এবং শুল্ক-জনিত মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাঁদের ব্যয় না কমবারই সম্ভাবনা। আজকের দিনে অর্থনীতির ছাত্র লক্ষ্য করতে পারেন যে ভারতবর্ষে সরকারি আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ আসে নানাপ্রকার উৎপাদন ও বিক্রয় শুল্ক থেকে। এ ক্ষেত্রে রামমোহন-প্রদর্শিত পথে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি।

রামমোহন অবশ্য বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সরকারি ব্যয় কমানোর উপরে। তাঁর মতে ব্যয় কমানোর সহজতম এবং একান্তভাবে প্রয়োজনীয় উপায় ইংরেজ কর্মচারীর বদলে যথাসম্ভব ভারতীয় নিয়োগ। একটি পরিসংখ্যান তালিকা তৈরি করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ১৮২৭ সালে উঁচুপদের প্রশাসনিক, সামরিক ও চিকিৎসা-বিভাগীয় ১৩০৬ জন ইংরেজ কর্মচারীর জন্য মোট খরচ হয়েছিল দুই কোটি টাকার একটু বেশি— অর্থাৎ, গড়পড়তা প্রতি কর্মচারীর জন্য বার্ষিক ১৫,৫০০ টাকা। তখনকার দিনের মূল্যমানের তুলনায় একজন কালেক্টরের মাসিক এক হাজার থেকে পনেরো শত টাকা বেতন খুবই বেশি। পূর্বে উল্লেখিত শ্রমিকের মাসিক সাড়ে তিন টাকা বেতনের সঙ্গে তুলনা না করলেও বলা যায় যে সমান স্তরের ভারতীয়দের থেকে ইংরেজ কর্মচারীর আয় অনেক বেশি ছিল এবং সমান স্তরের ইংরেজ কর্মচারীরাও তাঁদের স্বদেশে এর চেয়ে অনেক কম টাকা পেতেন।

কালেক্টররা যে কাজের জন্য বেতন পেতেন, রামমোহনের অভিজ্ঞতায় তার প্রায় সবটাই অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়ে করানো হত। তাঁর মতে মাসিক তিন শো থেকে চার শো টাকা বেতনের সুযোগ্য ভারতীয় কর্মচারীদের হাতে এই-সব কাজের ভার দিলে কাজ ভালো হবে এবং ব্যয়ও শতকরা আশি ভাগ কমে যাবে। অবশ্য সামরিক বিভাগে বা খুব উঁচু পদগুলিতে ইংরেজ নিয়োগ কমানো সম্ভব হত না, কিন্তু রামমোহন জোর দিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন যে কালেক্টরের কাজ আর বিচারকের কাজ ভারতীয়দের হাতেই দেওয়া উচিত এবং কালেক্টরদের হাত থেকে বিচারের ক্ষমতা তুলে নেওয়া উচিত।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস রামমোহন-প্রস্তাবিত 'ভারতীয়করণ' তদানীন্তন আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি বলে গ্রহণ করেন—এবং অতি সম্প্রতিকালে প্রশাসন ও বিচার -কে আলাদা করবার কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করেছি। ইংরেজ কর্মচারীর পেনসন ইত্যাদির আলোচনা করতে গিয়ে রামমোহন এমন আর-একটি বিষয়েও আলোকপাত করেন, যেটি পরবর্তী যুগের আলোচনাতে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। রামমোহন তখনকার একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল ও একজন অডিটর-জেনারেলের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে দেখান যে কোম্পানির ভারতীয় রাজস্ব থেকে বছরে প্রায় তিন কোটি টাকা ইংলণ্ডে খরচ হত— বোর্ড অব কণ্ট্রোল আর ইণ্ডিয়া হাউসের ব্যয় নির্বাহে, ইংরেজ কর্মচারীর ছুটির বেতন, পেনসন ইত্যাদির খরচ মেটাতে, লণ্ডনে ধার-করা টাকার সুদ দিতে এবং সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। এ ছাড়া অন্য একটি হিসাব অনুসারে ভারতে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁদের পারিবারিক ব্যয়-নির্বাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে বছরে প্রায় দুই কোটি টাকা নিজেদের দেশে পাঠাতেন। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যে বিরাট লাভের টাকা দেশে পাঠাতেন কিংবা অবসর গ্রহণের সময় যে বিরাট সঞ্চয় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন তার হিসাব রামমোহন দেন নি।

পরবর্তী যুগে দাদাভাই নওরোজি প্রমুখ অনেকে এই জাতীয় 'ইকনমিক ড্রেন' বা আর্থিক বহিঃস্রোতের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। নওরোজির বিশ্লেষণ রামমোহনের বিশ্লেষণেরই পুনরুজ্জীবন। ড্রেন-সম্বন্ধীয় যুক্তিতে কিছু ফাঁক থাকলেও এটা রামমোহনের যুগ থেকে আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত ঠিকই বলা যেত যে আমাদের দেয় 'হোম্ চার্জ' এবং বিলাতের অন্যান্য খরচের মধ্যে অনেকটা অংশই পরাধীনতার দাম—নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করতে পারলে এই বহিঃস্রোত অনেকটা কম হতে পারত। অবশ্য, বহির্বাণিজ্যে সমতা রক্ষা বা টাকা ও পাউণ্ডের মধ্যে বিনিময়ের হার সম্বন্ধে আলোচনা রামমোহন করেন নি ; তাঁর যুক্তির সবটা জোরই দেওয়া হয়েছিল ব্যয়-সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপরে।

ভূমি-ব্যবস্থা, সরকারি আয়ব্যয়, অযৌক্তিক বিদেশী খরচ—এই-সব আলোচনার পরে রামমোহন প্রস্তাব করলেন যে, ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে বসবাস করবার সুবিধা করে দেওয়া হোক। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ আরো অনেকে তখন এই মতই প্রকাশ করেছিলেন। রামমোহনের যুক্তি ছিল যে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইংরেজ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত আধুনিক পন্থা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে ; আনবে তাদের মূলধন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ; সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করবে ; দরকার হলে সরকারকে সামরিক সাহায্য দেবে। এর অসুবিধার দিকটাও তাঁর নজর এড়ায় নি। ইয়োরোপীয় বাসিন্দারা একটা উঁচুস্তরের অধিকার দাবি করে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে, দরিদ্র জনসাধারণকে নানা ভাবে শোষণ করতে পারে এবং এ-সবের ফলে অনেক রকম

আর্থিক ও সামাজিক সংঘর্ষের উৎপত্তি হতে পারে। তিনি এও বলেছিলেন যে, হয়তো পরবর্তী কালে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী ভারতীয়েরা এই-সব ইয়োরোপীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা দাবি করতে পারে। অন্য অসুবিধাগুলিকে রামমোহন খুব বেশি গুরুত্ব দেন নি। স্বাধীনতার সম্ভাব্য দাবি সম্বন্ধে কানাডার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতে এরকম দাবি সম্ভবত উঠবে না; আর যদি ওঠে, তা হলেও এদেশে অনেক 'ইংরেজী ভাষা-ভাষী, খৃষ্টান ইউরোপীয়' থেকে যাবে। রামমোহনের এ সম্বন্ধে লেখা খুঁটিয়ে পড়লে সন্দেহ হয় যে তাঁর মনের অন্তস্তলে শিক্ষিত ভারতীয় ও স্থায়ী ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা অবাঞ্ছিত ছিল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই।

পরবর্তী যুগে ভারতীয় অর্থনীতিবিদেরা রামমোহনের অনেক প্রস্তাবই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ বসবাস -সম্বন্ধীয় প্রস্তাব কখনো উচ্চারণও করেন নি। তার প্রধান কারণ, উনিশ শতকের শেষে ইয়োরোপীয় 'কলোনাইজেশন'-এর ফলাফলের দৃষ্টান্ত ছিল উত্তর-আমেরিকা নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকা। বস্তুত, আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অনেকখানিই আফ্রিকার উপনিবেশ-সমস্যার প্রতিধ্বনি। রামমোহন ভেবেছিলেন, উত্তর-আমেরিকাতে ইংলণ্ডের মূলধন ও শ্রমশিল্প গিয়ে যেভাবে আর্থিক উন্নতি সম্ভব করেছিল এবং যেভাবে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব হয়েছিল সেভাবে ভারতেও দ্রুত উন্নতি আনা সম্ভব হবে। তাঁর আশা ছিল যে স্থায়ী ইয়োরোপীয় বাসিন্দা আর শিক্ষিত ভারতবাসী একজাতি হয়ে যাবে। এটা হয়তো তখনকার দিনের সমাজের উপর-তলার শ্রেণীর মনোভাব। আফ্রিকাতে পরে কী হবে সেটা রামমোহন অবশ্য অনুমান করতে পারেন নি, কিন্তু আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের স্থান তখন কোথায় ছিল সেটাও তাঁর নজরে পড়ে নি। সম্ভবত, তাঁর মনে হয়েছিল যে আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের চেয়ে শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরেজের সহযোগী হিসাবে সহজে গৃহীত হবে। এটাও আশ্চর্য যে স্থায়ী বসবাসকারী ইংরেজ ব্যবসায়ীর দ্বারা ভারতীয়দের শোষণের সম্ভাবনাকে তিনি গুরুত্ব দেন নি, যদিও নীলকরদের অনাচারের কাহিনী তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়।

রাজা রামমোহনের সমস্ত মতবাদ ও প্রস্তাব কালের বিচারে গ্রহণীয় হয় নি, কিন্তু এটা খুব বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর হাতে ভারতের অর্থনীতি-আলোচনা একটা বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করল। এও উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ যোগসূত্র ছিল— প্রত্যেকটি প্রস্তাব একসঙ্গে এক চিন্তাধারায় গ্রথিত ছিল। যদি জমিদারের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তা হলে চাষীর খাজনারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। যদি চাষীর খাজনা আর না বাড়ানো হয়, তা হলে জমিদারের দেয় রাজস্ব কিছু কমানো হোক। যদি এর ফলে সরকারি আয়-ব্যয়ে ঘাটতি পড়ে, তা হলে নতুন শুল্ক বসানো হোক এবং ভারতীয় কর্মচারী অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করে ব্যয় কমানো হোক। ব্যয় কমানো হোক দেশের প্রশাসনে, ব্যয় কমানো হোক বিদেশে পেনসন সুদ ইত্যাদির অপচয় হ্রাসে। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা হোক দ্রুত হারে এবং এর জন্যে ইংরেজদের এখানে আমন্ত্রণ করা হোক প্রশাসক রূপে নয়, আর্থিক উন্নতির পথিপ্রদর্শক স্থায়ী বাসিন্দা রূপে। যুক্তিধারা চলে এসেছে অবারিত ভাবে, এক ধাপ থেকে আর-এক ধাপে। এখানেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী মনের পরিচয়।

উপসংহারে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই আলোচনায় রামমোহনের যে লেখাগুলির উপরে নির্ভর করা হয়েছে সেগুলি একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু এগুলি আরো সহজপ্রাপ্য হওয়া উচিত। অধ্যাপক সুশোভন সরকার -সম্পাদিত রামমোহনের অর্থনীতি-সংক্রান্ত রচনা-সংগ্রহের সুলভ সংস্করণ আমাদের ছাত্র ও গবেষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। তা ছাড়া, হয়তো অনুসন্ধান করলে এই রচনা-গুলি ছাড়াও অন্য রচনা পাওয়া যেতে পারে। ১৮৩১ সালে সহসা প্রায় ষাট বৎসর বয়সে রামমোহন যে সুচিন্তিত ও সুসম্বদ্ধ রচনাগুলি লেখেন, তার আগে কোনো প্রস্তুতি ছিল না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। এবং লেখাতে যাঁর কার্পণ্য ছিল না, তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে আগেই লিখেছেন এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দেশের এবং ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায়, নানা পণ্ডিতজনের সঙ্গে চিঠিপত্রে, সরকারের কাছে আবেদন ও প্রতি-বেদনে রামমোহনের অর্থ নৈতিক মতবাদের প্রাক্-১৮৩১ সাক্ষ্য খুঁজলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। এ দিকে অনুসন্ধিৎসু গবেষক যাতে অগ্রসর হতে পারেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলি সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন এটা আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না। রামমোহনের জন্মের দ্বিশতবার্ষিকীতে তাঁর স্মরণে সবচেয়ে বড় কাজ হবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সব দিক নিয়ে গবেষণার পথ পূর্ণতর ও প্রশস্ততর করে তোলা ; এর মধ্যে বিশেষ করে প্রয়োজন অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে রামমোহনের দান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও আলোচনা।

রামমোহন ও খ্রীস্টধর্ম

শিশিরকুমার দাশ

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের সঙ্গে যখন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের ধর্মপ্রচারকদের সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল তখন তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে রামমোহন যীশুখ্রীস্টের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন কিন্তু খ্রীস্টীয় তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করেন নি। ইউস্টাস কেরীর বাড়িতে রামমোহন গেছেন, পারিবারিক প্রার্থনায় যোগ দিয়েছেন। ইউস্টাস তাঁকে ডঃ ওয়াট-এর ধর্মসংগীতের এক সংকলন উপহার দিয়েছিলেন, রামমোহন তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।[১] ১৮১৭ সাল নাগাদ রামমোহন জন ডিগবি-কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার সুদীর্ঘ এবং নিরবচ্ছিন্ন ধর্মচর্চার মধ্যে আমি যত ধর্ম সম্বন্ধে পরিচিত হয়েছি তাদের মধ্যে যুক্তিশীল মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী এবং নৈতিক দিক থেকে উন্নততম চিন্তাধারা লক্ষ্য করেছি খ্রীস্টের নীতিতে।"[২] খ্রীস্ট সম্বন্ধে রামমোহনের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ লক্ষ্য করে যখন খ্রীস্টীয় মিশনারীরা পুলকিত বোধ করছিলেন তখন তাঁরা লক্ষ্য করেন নি যে খ্রীস্টধর্মের প্রতি রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি নিষ্ঠাবান খ্রীস্টানের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রামমোহন খ্রীস্টধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন নীতিপ্রিয় এবং যুক্তিশীল মানুষ হিসেবে, যিনি পৃথিবীর আরো কয়েকটি প্রধান ধর্মের মূলতত্ত্ব ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ডিইস্ট' এবং অনুরূপ যুক্তিবাদী ধর্মালোচকদের রচনার দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত। অন্যপক্ষে মিশনারীরা খ্রীস্টধর্মকে গ্রহণ করেছেন তার সামগ্রিকতায়— তার ঐতিহাসিক বিকাশ, তত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং কয়েকটি বিশেষ তত্ত্বকে অবলম্বন করে যে জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল তাকে অখণ্ডরূপে গ্রহণ করে। এই ভিন্নমুখী দৃষ্টির প্রকাশ ১৮২০ সালে প্রকাশিত রামমোহনের *The Precepts of Jesus/The Guide to Peace and Happiness*[৩] গ্রন্থে এবং তাকে অবলম্বন করে তর্কবিতর্কে।

রামমোহনের গ্রন্থটি নিউ টেস্টামেন্টের ম্যাথু, মার্ক, ল্যুক এবং জন -লিখিত গস্‌পেলগুলির অংশবিশেষের সংকলন। সংকলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রামমোহন ভূমিকায় লিখেছেন—

> "ঈশ্বরের প্রকৃতি ও বিশেষ বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার এবং আত্মার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে সন্দিহানতার অবকাশ আছে। আমাদের অর্জিত জ্ঞান এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার ফলে ঐ ব্যাপারগুলি স্পষ্ট করে জানি না। অথচ আকাশ পৃথিবী -ব্যাপ্ত সুশৃঙ্খলিত বস্তুপুঞ্জের এক নিয়ন্তা, এক বিশ্বরচয়িতা, এক বিশ্বত্রাতা, একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা, এবং প্রতিমানুষের প্রতি মানুষের প্রীতিবোধ— মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, আমাদের জীবনের পক্ষে, সমস্ত মানবসমাজের পক্ষে শুভ। প্রথম ধারণাটি, অর্থাৎ ঈশ্বরবোধ, একটি সাধারণ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আমরা পাই ঐতিহ্যসূত্রে, শিক্ষার মাধ্যমে, কিংবা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক গঠনপ্রতিভা ও আশ্চর্য নৈপুণ্যের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ থেকে। আর দ্বিতীয় ধারণাটি, যদিও আমার

---

১ দ্রষ্টব্য Collet, S. D., *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy,* ed. D. K. Biswas and P. C Ganguli, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1962, p. 114.

২ Collet, p. 71। এখানে এবং অন্যত্র রামমোহনের ইংরেজি রচনার অনুবাদ বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের।

৩ রামমোহনের ইচ্ছা ছিল গ্রন্থটির সংস্কৃত এবং বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি পূরণ করতে পারেন নি।

পরিচিত সব ধর্মেরই শিক্ষণীয় বিষয়, তবু বিশেষভাবে তা খ্রীস্টধর্মের। খ্রীস্টীয় লেখকেরা, এবং আমি যে-সব খ্রীস্টীয় ধর্মবেত্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়েছি, তাঁরা যে-সব তত্ত্বের উপর জোর দেন, সেই তত্ত্ব থেকে খ্রীস্টধর্মের মূল প্রকৃতি আমি অনেকদিন বুঝতে পারি নি। তাঁদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে প্রধান হল যে যাঁরা খ্রীস্ট, পবিত্র আত্মা এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবের 'পিতা'-র ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের খ্রীস্টান আখ্যা দেওয়া চলে না। কেউ কেউ অবশ্য 'খ্রীস্টান' আখ্যা ব্যবহারে আর একটু উদার: যাঁরাই বাইবেলে বিশ্বাসী এবং বাইবেলকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ বলে স্বীকার করেন তাঁদেরই খ্রীস্টান বলা চলে, যদিও বাইবেলের অংশবিশেষের ব্যাখ্যায় তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। কেউ কেউ অবশ্য যাঁরাই খ্রীস্টের নীতি— খ্রীস্ট যে নীতি প্রচার করেছেন— মেনে চলেন তাঁদের খ্রীস্টান বলে স্বীকার করেন, অ্যাপোস্‌ল্‌দের (অর্থাৎ প্রথম প্রধান খ্রীস্টশিষ্যদের) সব কথাই মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা তাঁরা স্বীকার করেন না। খ্রীস্টশিষ্যরা গভীর প্রেরণায় অনেক কথা বলেছেন সত্য, সে-সব কথা ছেড়ে দিলে, তাঁরাও অন্য পাঁচজনের মতো ভুল ত্রুটি করতে পারেন, এবং তাঁরা যে সে রকম ভুল করতে পারেন তার প্রমাণ বাইবেলের 'অ্যাক্ট' এবং 'এপিস্‌ল্'গুলিতে তাঁদের মতপার্থক্য।[৪]

"বিভিন্ন গোষ্ঠীর পণ্ডিতেরা তাঁদের বিশেষ বিশেষ দলের মতের সত্য, যুক্তিশৃঙ্খলা, প্রাচীনত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিপুলাকার বই লিখেছেন, এত যুক্তি বিস্তার করেছেন যে, সে-সব ব্যাপারে নতুন কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন। ধর্মের ব্যাপারে সাধারণত লোকে নিজের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাতিত্বে এবং সংস্কারের ফলে, বিরোধী মতামতে, তা সে যত যুক্তিযুক্ত হোক-না কেন, সামান্য দৃষ্টি দেয় বা সম্পূর্ণ অবহেলা করে; যে-সব ধারণা প্রাকৃতিক নিয়ম, মানুষের যুক্তিবোধ এবং ঐশ্বরিক 'প্রকাশের' ধারণার দ্বারাও সমর্থিত— সে সম্বন্ধেও উদাসীন থাকে। যাঁরা সংস্কারাচ্ছন্ন নয়, ঈশ্বরের কৃপায় যাঁদের মন মুক্ত, বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মতামতের একটি বর্ণনা পেলেই তাঁরা স্বচ্ছন্দে ধর্মীয় ঐতিহ্যনিষ্ঠ এবং মানুষের বুদ্ধির কাছে সব চেয়ে বেশি গ্রাহ্য মতটি খুঁজে নিতে পারবেন। এই-সব কারণে, আমি গোষ্ঠীয় মতামতের আলোচনা করতে চাই না···আমি মনে করি নিউ টেস্টামেণ্টের নীতিবিষয়ক উক্তিগুলি অন্যান্য বিষয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখলে মানুষের হৃদয়মনের এবং পরস্পরের সম্পর্কের উন্নতির পক্ষে শুভ হবে। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং অন্য কোনো কোনো অংশ সম্বন্ধে 'মুক্তচিন্তাশীলেরা এবং খ্রীস্টানবিরোধীরা নানারকম সন্দেহ ও বিতর্ক তুলতে পারেন, বিশেষত অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে। আর এসিয়াবাসীদের অতিপল্লবিত অলৌকিক কাহিনীগুলির পাশে বাইবেলের ঘটনাগুলি নিতান্তই বর্ণহীন, ফলে আকর্ষণহীন। অন্যপক্ষে, নীতি-উপদেশগুলি সমগ্র মানবসমাজের সম্প্রীতি ও শান্তির সহায়ক, আধ্যাত্মিক জটিলতার দ্বারা নিষ্পিষ্ট নয়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই কাছে অবারিত।' "

উদ্ধৃতি কিছুটা দীর্ঘ হল, কিন্তু এই উদ্ধৃতির মধ্যে রামমোহনের নিজস্ব ধর্মবোধের বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে এবং খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর মনোভাব সূক্ষ্মভাবে আভাসিত হয়েছে। প্রথম অংশে রামমোহন ধর্মের ব্যাপারে দুটি ধারণার উপর জোর দিয়েছেন: জগতের স্রষ্টা ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্ক। এই ধারণা রামমোহনের পক্ষে নতুন নয়। তাঁর প্রথম-প্রকাশিত রচনা তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুওয়াহ্‌হিদিন' (১৮০৩-০৪)

৪ রামমোহন পাদটীকায় এই স্থানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: *Acts* 9 : 2-3, 15 : 2, 7 ; *I Corinthians* 1 : 12, *Galatians* 2 : 11-13.

প্রবন্ধে এই ধারণার সূত্রপাত। অনেকে এই রচনাটিকে অপরিণত মনে করলেও, প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে এইটি প্রথম উল্লেখযোগ্য যুক্তিবাদী চিন্তার নিদর্শন। এই প্রবন্ধে রামমোহন ঈশ্বর-বিশ্বাসকে সার্বজনীন, এবং সার্বজনীন বলেই স্বাভাবিক বলেছিলেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস সার্বজনীন এবং স্বাভাবিক বলেই রামমোহন তাকে ধর্মের প্রথম এবং অন্যতম উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি, স্বরূপ, উপাসনাবিধি এবং ধর্মীয় আচারবিচার প্রভৃতিকে মনে করেছেন আরোপিত, কারণ মানুষে মানুষে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ঐ-সব ব্যাপারে মতভিন্নতা, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে তার উদ্‌ভব। বহুক্ষেত্রেই পুরোহিতশ্রেণী নিজেদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ঐগুলি গড়ে তুলেছেন, তার পর ধর্মের নামে সেগুলি কাল থেকে কালে সঞ্চারিত হয়েছে এবং ক্রমশই লোকচক্ষে সেগুলি হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধেয়। তরুণ রামমোহন ধর্মের এই বাহ্যিক দিককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চেয়েছেন। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর ডিইস্টদের সঙ্গে, বিশেষ করে হার্বার্ট অব শেরবারীর (১৫৮৩-১৬৮৪) বহু চিন্তার সঙ্গে রামমোহনের চিন্তাধারার সাধর্ম্য সহজেই চোখে পড়বে।

তুহ্‌ফাৎ-এর মধ্যে রামমোহন বলেছিলেন যে সমাজবন্ধনের জন্য প্রয়োজন ভাষা, আইন এবং ধর্ম। ভাষা চিন্তা-বিনিময়ের সূত্র। প্রাণ ও সম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য, নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন আইন। ভাষা ও আইনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে সামাজিক সংহতি। ধর্মের প্রয়োজন আরো বৃহত্তর সংহতির জন্য, যার ভিত্তিভূমি হল নৈতিক। এই কথা স্মরণ করে যে ধর্মীয় নীতির কথা রামমোহন উল্লেখ করেছিলেন তা হল মানুষে মানুষে সম্প্রীতির অনুশীলন। মনে রাখতে হবে যে রামমোহন ধর্মের উৎপত্তির পেছনে কোনো আধিভৌতিক 'অথরিটি'-র কথা স্বীকার করেন নি এবং কোনো ঐশ্বরিক প্রকাশেও বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। তাঁর মতে সামাজিক প্রয়োজনেই ধর্মের উৎপত্তি। এ কথা রামমোহনের পরবর্তী চিন্তাতেও সমর্থিত হয়েছে। The Precepts of Jesus-এর ভূমিকায় ঈশ্বরবিশ্বাস এবং মানবপ্রীতির কথা রামমোহন পুনরায় উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের আট বছর পরে ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮) পুস্তিকায় রামমোহন আবার বলেছেন, "মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।"[৫]

রামমোহন যে ধর্মের কথা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলেছেন তা প্রকৃতপক্ষে কোনো বিশেষ তত্ত্বাশ্রিত নয়, তা পরিপূর্ণভাবে তত্ত্ব বা সব রকম 'ডগ্‌মা'-বিরোধী। অথবা বলা ভালো, তাঁর ধর্মচিন্তায় ডগ্‌মা'র স্থান নেই। সেই কারণে মনে হয় কোনো বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থের দৈবী প্রামাণিকতাও তাঁর কাছে অবান্তর।[৬] অবান্তর বলেই তিনি খ্রীস্টীয় অ্যাপোসল্‌দের অভ্রান্ত বলে মানতে পারেন নি। আর যেহেতু তাঁরা অভ্রান্ত নন, সেহেতু তিনি সমাজের প্রয়োজনে যে-সব তত্ত্বকে শুভ মনে করেন নি সেগুলির

৫ রামমোহন-গ্রন্থাবলী-৪, পৃ. ৫১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৬ অবশ্যই এ কথা বলা চলে যে তিনি বেদান্ত অনুবাদ করেছেন, পাঁচটি উপনিষদ অনুবাদ করেছেন এবং তার থেকে স্পষ্ট মনে করা যায় যে তিনি শাস্ত্রের প্রামাণ্যেও বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ে আমার নিজের ধারণা যে রামমোহনের বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে প্রমাণ করা যায় না যে তিনি প্রথমত ঐ-সব গ্রন্থের দৈবী-প্রামাণিকতা মানতেন। দ্বিতীয়ত যে কালে মানুষের শাস্ত্রানুগত্য তার বুদ্ধিবিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, শাস্ত্রের অনুশাসন ছাড়া সত্যের স্বীকৃতি যখন ছিল অসম্ভব, তখন রামমোহন শাস্ত্রকে অবলম্বন করেছিলেন, সত্যানুসন্ধানের জন্য নয়, তাঁর যুক্তি ও উপলব্ধি-জাত সত্যকে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। তিনি শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়ে তার মধ্যে সত্যানুসন্ধান করেন নি। যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমকালীন সমাজ সত্য প্রতিষ্ঠার দাবি করত, সেই শাস্ত্রের সাহায্যেই সমাজের অজ্ঞতা ও বুদ্ধিভ্রান্তিকে

প্রচার চান নি। The Precepts of Jesus-এর সংকলনের পিছনে এই মনোভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে।

দ্বিতীয়ত রামমোহনের ধর্মচিন্তার আর-একটি দিক হল ধর্মের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অপ্রাকৃত ঘটনা ও পুরাণ-কথা— myth ও miracle— ধর্মের এই যমজ সন্তানদের সম্পূর্ণ অস্বীকার। হিন্দু, ইসলাম এবং খ্রীস্টান— কোনো ধর্মেরই কোনো অলৌকিক ঘটনাকে তিনি স্বীকার করেন নি এবং তাদের যে-সব আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ধর্মবেত্তারা ব্যাখ্যা করে থাকেন রামমোহন সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। সেইজন্য রামমোহন বাইবেলের, এ ক্ষেত্রে শুধু নিউ টেস্টামেন্টের, চারটি গস্‌পেল-এর অন্তর্গত সমস্ত অলৌকিক ঘটনা, ঐশ্বরিক প্রকাশতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা এবং খ্রীস্টীয়তত্ত্বের প্রধান উপাদানগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু খ্রীস্ট-কথিত নীতি-উপদেশ সংকলন করেছেন। একটু উদাহরণ নিলে বোঝা যাবে তিনি কীভাবে এই সংকলন করেছিলেন। প্রথম গস্‌পেল (ম্যাথুর)-এর তিনি কতটা বাদ দিয়েছেন এবং কতটা নিয়েছেন তার বর্ণনা দেওয়া যাক :

বাদ দিয়েছেন : ১-৪ এবং ৮ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ; ৯ : ১-৯, ১৮-২৬ ; ১০ : ১-১৫ ; ১১ : ১-২৪ ; ১২ : ১৪-২৯, ৩৮-৪৫ ; ১৩ : ৪৪-৫৮ ; ১৪ সম্পূর্ণ ; ১৫ : ২১-৩৯ ; ১৬ : ১-৪, ৯-১০, ১৭ সম্পূর্ণ ; ১৯ : ১-২ ; ২০ : ২৯-৩৪ ; ২১ : ১-২২, ৪৫-৪৬ ; ২২ : ১ ; ২৪ : ১-৪১ ; ২৬-২৮ সম্পূর্ণ।

গ্রহণ করেছেন : ৫-৭ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ; ৯ : ১০-১৭ ; ১০ : ১৬-৪২ ; ১১ : ২৫-৩০ ; ১২ : ১-১৩, ৩০-৩৭, ৪৬-৫০ ; ১৩ : ১-৪৩ ; ১৫ : ১-২০ ; ১৬ : ৫-৮, ১১-২৮ ; ১৮ সম্পূর্ণ ; ১৯ : ৩-৩০ ; ২০ : ১-২৮ ; ২১ : ২৩-৪৪ ; ২২ : ২-৪৬ (১-সংখ্যক অংশটি শুধু বাদ দিয়েছেন, পরিচ্ছেদের বাকি অংশ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন) ; ২৩ সম্পূর্ণ ; ২৪ : ৪২-৫১ এবং ২৫ সম্পূর্ণ।

রামমোহন প্রথম যে চারটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, বাইবেল-পাঠকদের কাছে তার বিষয়বস্তু অজ্ঞাত নয়। যীশুখ্রীস্টের পূর্বপুরুষদের নাম তিনি বাদ দিয়েছেন হয়তো এই কারণে যে, যীশুখ্রীস্টের জীবনী রচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। রামমোহন যীশুর মৃত্যুর কথাও উল্লেখ করেন নি। কিন্তু প্রথম চার পরিচ্ছেদে আরো কিছু আছে— আছে যীশুর জন্মের অলৌকিক বিবরণ। যীশুর জন্মের পর রাজা হেরোডের সভায় ইহুদী ধর্মবেত্তাদের আগমন এবং প্রাচীন টেস্টামেণ্ট-এ (Micah ৫ : ২) পরিত্রাতার আগমন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল তার পূর্ণতার কথা ; হেরোডের শিশুহত্যা এবং তার মধ্যেও আর-একটি ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা (Jeremiah ৩১ : ১৫) ; জোসেফের স্বপ্ন, যীশুকে পবিত্র জলে ব্যাপ্‌টাইজ করা,

আঘাত করেছেন। একেশ্বরবাদ বা পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তাঁর নিজস্ব অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা এবং যুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সমকালীন সমাজনায়কদের কাছে তাঁর যুক্তি ও বিশ্লেষণ নিরর্থক, যতক্ষণ না শাস্ত্রে তার সমর্থন আছে। রামমোহন বেদান্তের প্রতিপাদ্য অনেক কিছুই মানেন নি, বৈদান্তিক মায়াবাদ সম্পর্কে তাঁর তীব্র ধিক্কার তাঁর চিন্তাধারার অনিবার্য ফলশ্রুতি। কিন্তু বেদান্ত অবলম্বন করেছিলেন এইটুকু বোঝাবার জন্য যে সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে নিরাকার উপাসনার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রাচীন হিন্দুরা স্বীকার করতেন এবং ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুদের কী ধারণা ছিল। প্রাচীনানুগত নবীন হিন্দুদের এই সহজ ঐতিহাসিক তথ্য বোঝানো সহজ ছিল না। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর, যিনি ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না, বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বহু যুক্তি ও অনুভূতির সঙ্গেও প্রাচীন ঋষিদের সম্মতি লাভের জন্য পরিশ্রম করা প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। সতীদাহ-প্রথা সুপ্রথা কি কুপ্রথা, রামমোহন তা শাস্ত্র পড়ে শেখেন নি, কিন্তু তাঁর দেশবাসী এই বিষয়ে শাস্ত্রনির্দেশ ছাড়া মনস্থির করতে রাজি ছিলেন না। এইজন্যই রামমোহন তাঁর সমাজসংস্কারে (তাঁর ধর্মসংস্কার প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমাজসংস্কারের অন্তর্গত) শাস্ত্রকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কোনো শাস্ত্রকেই তিনি অভ্রান্ত মনে করেন নি। বেদান্তকেও না।

কপোতের রূপে স্বর্গীয় আত্মার আবির্ভাব, ঈশ্বরের আকাশবাণী ; আর চতুর্থ পরিচ্ছেদে শয়তান-কর্তৃক যীশুর পরীক্ষা, চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি অরণ্যে একাকী যীশু, ও শয়তানের প্রলোভন। রামমোহন সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন অষ্টম পরিচ্ছেদ, যাকে বলা চলে অলৌকিক ঘটনার শোভাযাত্রা। যীশু অলৌকিক শক্তিতে সুস্থ করেছেন এক কুষ্ঠরোগীকে, এক রোমান ক্যাপ্টেনের অসুস্থ বালক ভৃত্যকে, ভূতাবিষ্ট কয়েকটি লোককে। ম্যাথু এই-সব কাজের মধ্যে আবার ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা দেখেছেন : "তিনি আমাদের দুঃখ, আমাদের শোক বহন করেছেন" (Isaiah ৫৩ : ৪)। যীশুর নৌকা যখন প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে মগ্নপ্রায়, ভীত শিষ্যরা সুখসুপ্ত যীশুকে ডেকে তুলেছেন, মৃদুভর্ৎসনায় যীশু তাঁদের আশ্বস্ত করে ঝড়কে শান্ত হতে আদেশ করেছেন এবং ঝড় থেমে গেছে। নবম পরিচ্ছেদে আঘাতগ্রস্ত বালককে যীশু দৈবীশক্তিতে সুস্থ করেছেন, মৃত বালিকার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

প্রত্যেকটি অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। রামমোহন তিনটি জিনিস সন্তর্পণে পরিহার করেছেন : ক. অলৌকিক ঘটনা খ. খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিকতার দাবি করা হয়— যে ঈশ্বর ইতিহাসের চালক, ইতিহাসে তিনি প্রকাশিত এবং প্রাচীন টেস্টামেণ্ট-এ যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে নবীন টেস্টামেণ্টে খ্রীস্টের জীবনে তার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে যে খ্রীস্টীয় ধারণা এবং গ. খ্রীস্ট ঈশ্বরের সন্তান এবং ঈশ্বর, তাঁর আবির্ভাব মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা তিনি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এবং তাঁর পুনর্জন্মের দ্বারা মানুষের উদ্ধারের সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— এই-সব ধারণা।

অলৌকিক ঘটনার সংখ্যা (যীশু-কর্তৃক সংঘটিত) গস্‌পেল-এর মধ্যে ৩৮ ; অন্যান্য অংশ নিলে আরো ৩৩টি। রামমোহন বলেছিলেন যে হিন্দু পুরাণে এত বেশি অলৌকিক ঘটনা আছে, সেগুলি এত মোহময় এবং কাহিনী হিসেবে তৃপ্তিকর যে খ্রীস্টীয় অলৌকিক কাহিনীর কোনো আকর্ষণ হিন্দুদের কাছে নেই। কিন্তু শুধু এই তুলনামূলক আকর্ষণ-হীনতাই অলৌকিক ঘটনা বাদ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। রাম-মোহনের কাছে অলৌকিক ঘটনাগুলি ধর্মে অপ্রয়োজনীয়, অপরপক্ষে খ্রীস্টানের কাছে ঐ ঘটনাগুলিই যীশুখ্রীস্টের ঈশ্বরত্বের প্রমাণগুলির মধ্যে অন্যতম। যে-সব তত্ত্বের দ্বারা খ্রীস্টধর্ম গত প্রায় দু হাজার বছর ধরে চিহ্নিত তার কোনোটিকে রামমোহন মানতে চান নি এবং সেই কারণেই জন-এর গস্‌পেল-এর প্রতি রামমোহন সবচেয়ে অকরুণ। পরিচ্ছেদ-সংখ্যার দিক থেকে জন-এর গস্‌পেল চারটি গস্‌পেল-এর মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী : ম্যাথু (২৮), ল্যুক (২৪), জন (২১) এবং মার্ক (১৬)। এই একুশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে রামমোহন বাদ দিয়েছেন এই-সব অংশ : ১-২ ; ৩ : ২২-৩৬ ; ৪ : ১-২২, ২৫-৫৪ ; ৫ : ১-৪৭ ; ৬ : ১-২৬, ২৮-৭১ ; সম্পূর্ণ ৭ ; ৮ : ১-২, ১২-৫৯ ; ৯ : ১-৩৮ ; ১০-১৪ ; ১৫ : ১৮-২৭ ; ১৬-২১ অর্থাৎ জন থেকে রামমোহন নিয়েছেন সবচেয়ে কম। এর কারণ এই নয় যে, ম্যাথু, লুক ও মার্ক থেকে সংকলন করেই রামমোহনের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; এর আসল কারণ খ্রীস্টীয় তত্ত্বের প্রতি রামমোহনের বীতরাগ এবং খ্রীস্টীয় তত্ত্বের যে রূপ রামমোহনকে সবচেয়ে অখুশি করেছিল সেই তত্ত্বই এখানে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, সবচেয়ে তত্ত্বাকারে প্রকাশিত।

২

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি রামমোহনের বীতরাগের একটা প্রধান কারণ, রামমোহনের মতে তা প্রকৃত হিন্দুধর্ম নয়। খ্রীস্টধর্মের যে রূপ রামমোহন প্রত্যক্ষ করেছিলেন সে সম্বন্ধেও রামমোহনের প্রধান বক্তব্য ছিল যে তা আদি খ্রীস্টধর্ম নয়, অর্থাৎ যে-সব তত্ত্ব নিয়ে খ্রীস্টধর্ম গড়ে উঠেছে তার সমর্থন বাইবেলে নেই। বলাই বাহুল্য, মিশনারীরা সে কথা মানেন নি এবং The Precepts of Jesus-এর প্রতিবাদ হতে বিলম্ব হয় নি। রামমোহনও ঐ উপলক্ষে আরো তিনটি বই রচনা করেন।[৭]

যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর অনেকদিন পরেও তাঁর শিষ্যরা এ কথা বলেন নি যে যীশু কোনো নতুন ধর্ম প্রচার করেছেন। ইহুদী ধর্মের থেকে খ্রীস্টধর্মের উদ্ভব, একেশ্বরবাদে বিশ্বাস এবং উভয়ের নীতির একাত্মতা, খ্রীস্টীয় চার্চ কর্তৃক ইহুদী ধর্মগ্রন্থকে স্বীকৃতি— এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে যদি ইহুদী আচারগুলিও খ্রীস্টানরা রক্ষা করত তা হলে খ্রীস্টধর্ম আরো দীর্ঘকাল ইহুদীধর্মেরই একটি শাখারূপে বিরাজ করত। খ্রীস্টের চিন্তা যখন অ-ইহুদীদের মধ্যে গিয়ে পৌঁচেছিল এবং যাঁরা খ্রীস্টের চিন্তা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু তা গ্রহণ করেছিলেন ইহুদীধর্মের শাখা হিসেবে নয়, বরং নতুন একটি ধর্ম হিসেবে। তাঁদের পক্ষে খ্রীস্টকে গ্রহণ করার জন্য ইহুদীধর্মকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভয় ছিল যে খ্রীস্টীয় চিন্তা প্যাগান চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তার প্রতিষেধক ছিল প্রাচীন টেস্টামেণ্ট-কে খ্রীস্টীয় চিন্তার অন্তর্ভুক্ত করা। তখন প্রশ্ন উঠেছিল যে প্রাচীন টেস্টামেণ্ট-এর Law-এর উদ্দেশ্য কী, অর্থ কী এবং খ্রীস্টান সমাজের সঙ্গে ইসরায়েল-এর যোগই বা কী? সেণ্ট পল -এর মনেও এই প্রশ্ন উঠেছিল। Law স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বা law-তেই law-এর শেষ নয়; law শুধু এক মহাপরিণতির ইঙ্গিত মাত্র। তাঁর ভাষায় "Wherefore the law was our School master *to bring us* into Christ, that we might be justified by faiths. But after the faith is come, we are no longer under a School master" (Galatians 3 : 24-25)। রামমোহন শুধু নীতিকেই প্রাধান্য দেওয়ায় মার্শম্যান ঈষৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন, "যদি যীশুকে শুধু একজন ধর্মশিক্ষক হিসেবেই গণ্য করতে হয় তা হলে মোজেস-কে আরো বেশি সম্মান দেওয়া উচিত, কারণ যীশু তো মোজেস-এরই বিধি ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" রামমোহন তার উত্তরে বলেছিলেন, "একেশ্বরবাদ, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশের আনুগত্যের ভিত্তিতে মোজেসই সত্যি সত্যি যথার্থধর্মের অবিনশ্বর মন্দির গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই গঠন সমাপ্ত করলেন, তাঁর বিধিকে নিখুঁত করলেন যীশু।"[৮] রামমোহন এই পর্যন্ত বিশ্বাস করেন কিন্তু খ্রীস্টের মধ্যে law-এর পরিণতিকে বিশ্বাস করেন না।

---

৭ রেভারেণ্ড স্মিড (Schmidt) **"A Christian Missionary"** ছদ্মনামে *Friend of India* **(Feb. 1820)**-তে প্রথম সমালোচনা করেন। মার্শম্যান স্বয়ং কিছু তীব্র মন্তব্য করেন। তার উত্তরে রামমোহন লেখেন *An Appeal to the Christian Public in defence of the Precepts of Jesus* (১৮২০)। মে মাসের *Friend of India*-য় মার্শম্যান রামমোহনের সমালোচনা করেন। তার উত্তরে প্রকাশিত হয় রামমোহনের *Second Appeal to the Christian Public* (১৮২১)। ১৮২১এর জুন মাসে রামমোহনের গ্রন্থের উত্তরে মার্শম্যান আবার শতাধিক পৃষ্ঠার উত্তর দেন। রামমোহন ১৮২৩এ এর জবাব দেন, গ্রন্থের নাম দেন *Final Appeal to the Christian Public*।

৮ **'Second Appeal to the Christian Public'.** *The English Works of Raja Rammohun Roy*, **part VI, ed., K. Nag and D. Burman, Sadharan Brahmo Samaj. Calcutta, 1951, p. 35.**

পলের চিন্তার মধ্যেই প্রাথমিক খ্রীস্টতত্ত্ব সংবদ্ধভাবে গড়ে উঠতে থাকে। সেই খ্রীস্টতত্ত্বের প্রধান সূত্র তিনটি। প্রথমত মুক্তি বা redemption : এই মুক্তি পাপের থেকে। পাপের ফলেই মানুষের পতন কিন্তু এই পতন থেকে উদ্ধার সম্ভব, আর উদ্ধার সম্ভব খ্রীস্টকে স্বীকার করায়। দ্বিতীয়ত, ঐশ্বরিক সমর্থন বা justification : মানুষের বিচার হবে, ঈশ্বর বিচার করে পাপমুক্ত বলে মানুষকে ঘোষণা করবেন। এ বিচার সাধারণ আইনের বিচার নয়, এ বিচার বিশ্বাসের, সর্বসমর্পণের। তৃতীয়ত, খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত বা atonement শুধু পাপমুক্তি নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদের অবসান। তবে মানুষ ক্রীতদাস থেকে সন্তানের স্তরে উন্নীত হবে। পুরনো থেকে সম্পূর্ণ নূতন হবে। খ্রীস্টের মৃত্যু ও খ্রীস্টের পুনরুজ্জীবন তারই অর্থবহ। রামমোহন খ্রীস্টীয় চিন্তার কোনোটিকেই গ্রহণ করেন নি। The Precepts of Jesus-এ ম্যাথুর শেষ তিন পরিচ্ছেদ (২৬-২৮) রামমোহন বর্জন করেছেন। ঐ শেষ তিন পরিচ্ছেদের নাটকীয়তার সঙ্গে মিশে আছে খ্রীস্টীয় আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে রহস্যময় তত্ত্ব— মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব। যীশুর জীবনের সেই শেষ মুহূর্তগুলি, তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও গভীর বিশ্বাস, একদিকে অন্তরালে পুরোহিতদের বিদ্বেষকুটিল চোখের দৃষ্টি, অন্যদিকে শেষ নৈশভোজের স্তিমিত প্রদীপশিখায় প্রজ্ঞায়-উজ্জ্বল যীশুর করুণাঘন মূর্তি, পাইলেটের সভায় বিচার, পুরোহিতদের রক্তলোলুপ চোখ ও জনতার কোলাহল, কাঁটার-মুকুট-পরা যীশু এবং শেষ পর্যন্ত গলগথা-র প্রান্তরে ক্রুশে শায়িত মানবসন্তান— সব মিলিয়ে এই শেষ তিনটি পরিচ্ছেদ ধর্মগ্রন্থের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্বের একটি প্রধান স্তম্ভ। খ্রীস্টের মৃত্যু খ্রীস্টধর্মের প্রাণকেন্দ্র রামমোহন সেই মৃত্যুর ঘটনাটিকে সযত্নে পরিহার করলেন, কারণ খ্রীস্টের দেবত্ব এবং খ্রীস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কাহিনীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য মেনে নিলে তাঁর ধর্মচিন্তার ভিত্তি স্থির থাকতে পারে না। খ্রীস্টীয় মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্কের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল এটি। রামমোহন বলছেন, তাঁর দৃষ্টি হল যীশু খ্রীস্টের বক্তব্যের উপর ; মিশনারীদের দৃষ্টি হল যীশু খ্রীস্টের অস্তিত্বের স্বরূপের উপর। কিন্তু রামমোহন খ্রীস্টের বক্তব্যের উপর যখন জোর দিচ্ছেন তখন তিনি নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তি অবলম্বনে গস্‌পেল-এর অংশবিশেষ গ্রহণ বা বর্জন করছেন ; সেই যুক্তি ছিল মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে যা বোধগম্য তাই গ্রহণীয়, যা রহস্যময় এবং যুক্তিতে বিশ্লেষণ করা যায় না তা বর্জনীয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মবেত্তারা নতুনভাবে বাইবেল ব্যাখ্যা করতে চাইছিলেন : লক-এর *The Reasonableness of Chistianity* (১৬৯৫), *A Discourse of Miracles* (১৭০৬), বাটলার-এর *Analogy of Religion* (১৭৩৬), হিউম-এর *Dialogues Concerning Natural Religion* প্রভৃতি রচনায় ধর্মব্যাখ্যায় নতুন চিন্তা আসছিল, যে চিন্তা রক্ষণশীল খ্রীস্টানদের দীর্ঘলালিত চিন্তাধারায় ধাক্কা দিয়েছিল। লকের *The Reasonableness of Christianity*, উইলিয়াম উলস্টোন-এর *Discourses on Miracles* (১৭২৭-২৯) কিংবা টমাস চাব-এর *The True Gospel of Jesus Christ* (১৭৩৮) ইত্যাদি গ্রন্থে খ্রীস্টধর্মকে তার অলৌকিকতা-মুক্ত করে, খ্রীস্টকে ঈশ্বর স্বীকার না করে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছিল। রামমোহন এই-সব রচনার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন এ-কথা জোর করে বলা যাবে না। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন ধর্মচিন্তার ধারায় যে-সব রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল রামমোহন তাদের খবর রাখতেন সন্দেহ নেই। Unitarian খ্রীস্টানদের সঙ্গে তাঁর সাহচর্যও এ ব্যাপারে লাভজনক হয়েছিল বলে মনে করি। রামমোহনের নিজস্ব ধর্মচিন্তা এবং তাঁর সমকালীন খ্রীস্টধর্ম-সমালোচকদের

পটভূমিকায় The Precepts of Jesus-কে বিচার করলে খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের মনোভাব যেমন বোঝা যায় এবং সমর্থনযোগ্য মনে হয়, তেমনই খ্রীস্টীয় তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক দিক থেকে দেখলে খ্রীস্টীয় মিশনারীদের আক্রমণের কারণ ও উদ্দেশ্যও স্পষ্ট এবং সমর্থনযোগ্য মনে হতে পারে। আধুনিক একজন খ্রীস্টধর্মবেত্তা রামমোহনের মতবাদকে "non-Christian Christianity" বলেছেন এবং এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্যই শুধু নয়, রামমোহনের মতবাদের যথার্থ নাম।

রামমোহন কিভাবে খ্রীস্টীয় তত্ত্বের প্রধান ধারণাগুলির বিরোধিতা করেছেন তা লক্ষ করলে রামমোহনের আক্রমণরীতির কৌশল এবং রামমোহনের নিজস্ব ধর্মচিন্তার স্বরূপ স্পষ্ট হবে। প্রথমেই নেওয়া যাক খ্রীস্টের ঈশ্বরত্ব প্রসঙ্গ। রামমোহনের First Appeal-এর বিরুদ্ধে মার্শম্যান যে সমালোচনা লেখেন তাতে তিনি সাতটি যুক্তি দিয়েছিলেন। যুক্তিগুলি সবই বাইবেল-নির্ভর। রামমোহনও তার যে উত্তর দিলেন সে উত্তরে বাইবেলই তাঁর একমাত্র নির্ভর। অর্থাৎ রামমোহন তাঁর পুরনো রণনীতিই গ্রহণ করেছেন। রামমোহন বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সর্বত্রই খ্রীস্ট বলেছেন যে তাঁর সমস্ত শক্তি ঈশ্বর থেকে পাওয়া। তার ফলে এটুকু প্রমাণিত হয় যে খ্রীস্ট ঈশ্বরের থেকে নিম্নবর্তী এবং খ্রীস্ট ও ঈশ্বরকে অভেদ বলা চলে না। অথচ এই অবস্থায় খ্রীস্টকে যদি আর-একটি ঈশ্বর বলে মানা হয় তা হলে খ্রীস্টধর্মের একেশ্বরবাদ অস্বীকৃত হয়। এই বহুদেববাদ-এর ধারণার অবসানের জন্যই খ্রীস্টধর্মের প্রধান তত্ত্ব হল 'ত্রয়ীবাদ' বা Trinity। রামমোহনের বক্তব্য হল 'ত্রয়ীবাদ' বাইবেল-বিরোধী এবং তা পরবর্তীকালে আরোপিত। রামমোহন খ্রীস্টের ঈশ্বরত্ব-অপ্রমাণে বাইবেলের উদ্ধৃতির সাহায্য যেমন নিয়েছেন, তেমনই নিয়েছেন তার ভাষা-বিশ্লেষণের সুযোগ।[৯] কখনো অন্যধর্মের জ্ঞানের আশ্রয়ও তিনি নিয়েছেন।[১০] 'ত্রয়ী-বাদ'-এর বিরুদ্ধে রামমোহনের আপত্তির মধ্যে, তাঁর আক্রমণরীতির মধ্যে, এক স্বতোবিরোধিতা দেখা গেছে। তিনি জানতেন যে তিনি যদি বাইবেল অবলম্বন করেই 'ত্রয়ীবাদ'-এর বিরুদ্ধে বলেন, তা হলে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবেন না, সেণ্ট পল -এর চিঠিপত্র এবং চতুর্থ গস্‌পেল-ই তাঁর যুক্তির বিরোধিতা করবে। অথচ তিনি খ্রীস্টীয় চার্চের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট জানতেন এবং জানতেন যে 'ত্রয়ীবাদ' নিয়ে খ্রীস্টীয় সমাজেও দীর্ঘকাল বিচারবিতর্ক হয়েছে। 'ত্রয়ীবাদ' সম্পর্কে তাই রামমোহনের আলোচনার ধারা বাইবেল, খ্রীস্টীয় চার্চের ইতিহাস এবং যুক্তিবাদ এই তিনটি অবলম্বন করেই এগিয়েছে।

খ্রীস্ট ও ঈশ্বরের সম্পর্ক সম্বন্ধে সেণ্ট পল তাঁর চিঠিপত্রে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, খ্রীস্টকে ঐশ্বরিক গুণ ও প্রকৃতি -সম্পন্ন বলেই বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বর ও যীশুর সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে পল প্রাচীন ইহুদী-চিন্তায় ঈশ্বর ও জগতের সৃষ্টির মধ্যবর্তীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার ব্যবহার করেছেন। ১ করিনথিয়ান

---

৯ গ্রীক ও হিব্রু উভয় ভাষায় অধিকারের ফলে রামমোহন textual খুঁটিনাটির উপর জোর দিতে পেরেছেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি: মার্শম্যান-কথিত খ্রীস্টের ubiquity-র আলোচনার সময় John এর (৩ : ১৩) একটি পদগুচ্ছ 'who is in heaven' প্রসঙ্গে রামমোহন বলছেন যে মূল গ্রীকে 'is'-এর আকাঙ্ক্ষিত প্রতিশব্দ হল "esti"; কিন্তু মূল গ্রীকে আছে on অর্থাৎ মানে দাঁড়ায় 'he being in heaven'। মার্শম্যান ইংরেজি পদগুচ্ছ থেকে প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে খ্রীস্ট একই সঙ্গে স্বর্গে এবং মর্তে অবস্থান করছেন। রামমোহনের ব্যাখ্যা অনুসারে সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত।

১০ মার্শম্যান খ্রীস্টের ঈশ্বরত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন যে ব্যাপটিজম-এর অনুষ্ঠানে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার কথা উচ্চারিত হয়। রামমোহন ইহুদী ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম উভয় ধর্ম থেকেই দেখালেন যে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম ঈশ্বরের নামের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে কিন্তু সেজন্য মোজেস বা মহম্মদ-কে তাঁদের অনুগামীরা কেউ ঈশ্বর বলে ভুল করেন নি। অপিচ দ্র. *Second Appeal*, পৃ. ২৯-৩০

(১, ২৪, ৩০)-এ পল পরিষ্কার বলেছেন যে খ্রীস্ট ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের মনীষা বা জ্ঞান (Christ is the power of God, and the wisdom of God)। প্রাচীন টেস্টামেন্ট-এ wisdom-কে একটি অন্তর্বর্তী শক্তি কল্পনা করা হয়েছে। আর-একটি অন্তর্বর্তী হল ঐশ্বরিক বাক্, গ্রীকরা যাকে বলেছেন *logos*। ২৩-সংখ্যক সাম-এ আছে "By the word of the Lord were the heaven made"। পল অবশ্য যীশু ও ঐশ্বরিক বাক্-এর অভেদত্ব প্রতিপাদন করেন নি। পলের লেখায় নির্ভর না করেই The Epistles to the Hebrews-এর লেখকও ঈশ্বর-সৃষ্টি ও খ্রীস্টের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এদেরই সুসংবদ্ধ রূপ জন-লিখিত গস্‌পেল।[১১] স্টোয়িক দার্শনিক ফিলো-কথিত logos তত্ত্বের সঙ্গে খ্রীস্টকে একাত্ম করে দেখলেন জন। ডড্ বলছেন যে অন্তর্বর্তিতা সম্বন্ধে সমস্ত গ্রীক মতের (ফিলো-র মতেরও) দুর্বলতা হল যে বাস্তব জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে যথার্থ সেতুবন্ধন সেখানে হয় নি। সেটি সম্ভব হয়েছে চতুর্থ গস্‌পেল-এ: "The Word became Flesh"। চতুর্থ গস্‌পেলে বলা হয়েছে logos ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং logos-ই মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত। যীশু একাধারে মানব এবং দেবতা। খ্রীস্ট যেহেতু ঈশ্বরের পুত্র, মানুষের কোনো দুর্বলতাই তার মধ্যে নেই; এমন-কি, যীশুর যে শেষ আর্তস্বর শুনেছি ম্যাথু মার্ক ও ল্যুক -এর গস্‌পেল-এ, জনের গস্‌পেল-এ তার স্থান নেই, সেখানে যীশুর শেষ কথা: কাজ পূর্ণ হল, It is accomplished। ডড্ লিখেছেন, "...we are disposed to conclude that the Fourth Evangelist, who of all its (of New Testament) major writers stands farthest in time from the life and teaching of Jesus, has understood more clearly, and expressed more powerfully than any one of them, the Central purport of His teaching and the meaning of His life and death।"[১২] কিন্তু রামমোহনের কাছে চতুর্থ গস্‌পেলই সবচেয়ে আপত্তিকর। চতুর্থ গস্‌পেল প্রসঙ্গেই তিনি 'ত্রয়ীবাদ' সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য করেছেন "এক ঈশ্বরে তিন ঈশ্বরের রহস্যময় তত্ত্ব" (the mysterious doctrine of three-Gods in one God head) এবং গস্‌পেল-এর প্রথম বাক্যকে বলেছেন প্রায় ধাঁধা: ক=খ, এবং ক খ-এর সঙ্গে স্থিত।

চতুর্থ গস্‌পেল-এ যাই বলা হোক-না কেন রামমোহন জানতেন খ্রীস্টীয় চার্চের প্রথম যুগে ত্রয়ীবাদ নিয়ে নানা বিতর্ক উঠেছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মতাত্ত্বিক ওরিগেন (? ১৮৫-২৫৫) ঈশ্বরকে বলেছিলেন *monás* বা *enas*, এক এবং দ্বিতীয়রহিত; খ্রীস্টকে তিনি পিতার অধীন মনে করেছেন, যদিও খ্রীস্ট সৃষ্ট জীব নন। ঈশ্বরের অধীনত্ব স্বীকার করলে একেশ্বরবাদ শিথিল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে সাবেলিয়াস-এর দল পিতা ও পুত্রকে একই সত্তার দুটি ভিন্নরূপ বা *Prosōpa* (personae) বলে ঘোষণা করলেন। ওরিগেন তাঁর মতবাদের জন্য চার্চ-কর্তৃক ধিক্কৃত হয়েছিলেন। আলেকজান্দ্রিক অপর এক ধর্মতাত্ত্বিক আরিয়াস বললেন ঈশ্বরের লক্ষণ হল তিনি স্বয়ংভূ। পুত্র পিতার কাছে অস্তিত্বের জন্য ঋণী, অতএব তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না। আরিয়াসও চার্চের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু বিতর্ক চলল দীর্ঘকাল। কন্‌স্টান্টিন এই বিতর্কের

১১ দ্রষ্টব্য Dodd, C.H., 'The History and Doctrine of the Apostolic Age', *A Companion to the Bible*, ed. T. W. Manson, Edinburgh, 1939, pp. 411-17, এবং Moore, G.F., *History of Religions*, ii, New York, 1949, pp. 138-43

১২ Dodd (1939), p. 416

অবসানের জন্য ৩২৫ অব্দে নিসিয়াতে একটি ধর্মসভা ডাকলেন, এই সভায় যে মতবাদ রচিত হল তাকে Nicene Creed বলা হয়ে থাকে ; সেখানে খ্রীস্ট সম্বন্ধে বলা হল "Son of God, begotten of the Father" এবং "begotten, not made" এবং "of the same essence with the father।" খ্রীস্ট ও ঈশ্বরের ঐক্য হল প্রকৃতির— (গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে *ousia* অর্থাৎ essence) পিতা-পুত্রের সম্পর্কে বলা হয়েছে *phōs ek phōtos* অর্থাৎ 'আলো থেকে জাত আলো'। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে শুধু বলা হল 'আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাসী'। ৩৮১তে সম্রাট থিওডোসিয়াস-এর ধর্মসভায় এই creed নতুন করে রচিত হল। তাতে বলা হল পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা তিনটি স্বতন্ত্র উপ-অস্তিত্ব, কিন্তু তাদের প্রকৃতি (ousia) এক, পিতা স্বয়ং-ভূ, পুত্র কালাতীত অবস্থায় "জাত" এবং আত্মা পিতা থেকে "উৎসারিত" (proceeds)। স্বর্গীয় আত্মা এবার ত্রয়ীবাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হলেন। ডেভিস লিখেছেন "The doctrine of Trinity is indeed an attempt to correlate and safeguard the truths of the Christian experience of God. It involves no rationalist claim to explain everything, for it is based upon analogy which must not be pressed in detail, since man cannot convey a complete account of what God is in his own perfect nature।"[১৩] রামমোহন শেষ কথাটির সঙ্গে একমত। তিনি বারবার বলেছেন যে ঈশ্বরের প্রকৃতির সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব এবং সেই কারণেই তাত্ত্বিক জটিলতার দ্বারা সেই প্রকৃতি ব্যাখ্যা করাও তাঁর কাছে অবান্তর মনে হয়েছে। তাঁর একটি গানে আছে

> নিরুপমের উপমা, সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি হয় সম্ভাবনা।
> অচিন্ত্য উপাধিহীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে, যত সব অর্বাচীনে করয়ে কল্পনা।

এই কারণে 'ত্রয়ীবাদ' অবান্তর। এবং এই ত্রয়ীবাদের উদ্ভবের ইতিহাস জানেন বলেই তাঁর বক্তব্য হল 'ত্রয়ীবাদ' খ্রীস্টের বাণী থেকে জাত নয়, তা পরবর্তী দার্শনিকদের ব্যাখ্যা। ডেভিস সাহেব বলেছেন শুধু যদি অঙ্ক শাস্ত্রের দিক থেকে দেখা যায় তা হলে ত্রয়ীবাদ বহুদেববাদ কারণ অঙ্ক শাস্ত্রে বহুর অনুপস্থিতিই একের অস্তিত্বের প্রমাণ, এবং এক যুক্ত এক যুক্ত এক তিন হতে বাধ্য।[১৪] কিন্তু শুধু আঙ্কিক ঐক্যই একমাত্র ঐক্য নয়। মানবদেহের ঐক্য অ্যামিবার ঐক্যের চেয়েও জটিল। সেইরকম খ্রীস্টীয় ত্রয়ীবাদে তিন ঈশ্বর হয়েও এক ঈশ্বর।

•

রামমোহনের খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে মতামত এবং মিশনারীদের প্রতিবাদ যেভাবে সাজিয়েছি তাতে ধারণা হতে পারে যে এই আলোচনা মূলত তত্ত্বগত, যেন দুজন ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্মতাত্ত্বিক জটিল ও গূঢ় বিষয়ে অনন্যমনা হয়ে আলোচনা করছেন, যেন এর পিছনে অন্য কোনো অব্যবহিত সামাজিক কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনার স্থান ও কাল সম্বন্ধে সচেতন হলেই এই তর্কের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যাবে। The Precepts

১৩ Daires, J.G., 'Christianity : the Early Church', *The Concise Encyclopaedia of Living Faiths*, ed. R.C. Zaehner, London, 1949, p. 72

১৪ রামমোহন এই আঙ্কিক যুক্তির প্রয়োগ করেছেন তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনায় : 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' (মে ১৮২৩)

of Jesus প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত রামমোহনের সঙ্গে খ্রীস্টীয় মিশনারীদের সৌহার্দ্য ছিল উল্লেখ করেছি। হিন্দু সমাজ ও ধর্ম -সংস্কার আন্দোলনে রামমোহন মিশনারীদের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন পেয়েছেন। কিন্তু খ্রীস্টীয় মিশনারীদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের সংস্কার নয়, হিন্দুধর্মের অবসান এবং খ্রীস্টধর্মের প্রসার। অপর পক্ষে রামমোহনের মূল উদ্দেশ্য সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার উপলক্ষ মাত্র। ধর্মসংস্কার প্রয়োজন, কারণ তার মধ্য দিয়েই সামাজিক উন্নতি সম্ভব। ১৮ জানুয়ারি ১৮২৮এ লেখা এক চিঠিতে রামমোহন স্পষ্টই বলেছেন, "the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest…I think it is necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort।" ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে এই চিন্তা এবং সেইসঙ্গে তাত্ত্বিক জটিলতাহীন নীতিনির্ভর সহজ ধর্মবিশ্বাস— এই দুইয়ের সম্মিলন হয়েছিল রামমোহনের মনে। খ্রীস্টধর্মের তত্ত্ব বাদ দিয়ে সমাজের পক্ষে হিতকারী যে সার্বজনীন মৈত্রীর কথা শুধু সেইটুকুই দেশের পক্ষে প্রয়োজন। রামমোহন The Precepts of Jesus রচনার সময় তাঁর সমকালীন সমাজের কথা বিশেষভাবে ভেবেছিলেন। কিন্তু খ্রীস্টধর্মের এইপ্রকার রূপের প্রচার মিশনারীদের পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ রামমোহনের গ্রন্থে নীতি আছে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব নেই, অতএব খ্রীস্টধর্ম সেখানে শুধু খণ্ডিত নয়, বিকৃত। মিশনারীরা লক্ষ করেছিলেন যে রামমোহনের খ্রীস্টধর্ম যদি দেশ গ্রহণ করে, তা হলে খ্রীস্টধর্মের প্রচার ব্যাহত হবে এবং রামমোহনের এই প্রচারের অর্থই পরোক্ষভাবে খ্রীস্টধর্মকে আক্রমণ। মার্শম্যান তাই শুরু থেকেই রামমোহনকে এবং হিন্দুধর্মকে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা হলে হিন্দুধর্মের কথা উঠত না। কিন্তু এমন একটি সংকটজনক সামাজিক অবস্থায় রামমোহন এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন যখন হিন্দুসমাজ, কখনো কখনো মুসলমান সমাজের কথাও উঠল। এবং তার ফলে রামমোহনের কোনো কোনো বক্তব্য থেকে মনে হবে তিনি এ সময়ে হিন্দুধর্ম ও সমাজের পক্ষে সবলতম সৈনিক। খ্রীস্টীয় মতের সমালোচনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দুমতের বা বিশ্বাসের কথা উঠেছে এবং রামমোহন বলেছেন যদি খ্রীস্টীয় মত গ্রহণযোগ্য হয়, তা হলে অনুরূপ হিন্দুমত বা বিশ্বাস খ্রীস্টানের চোখে নিন্দনীয় হওয়া অযৌক্তিক। যদি পবিত্র আত্মা কপোতের বেশে আবির্ভূত হতে পারেন, হিন্দুর দেবতা মাছ রূপে অবতীর্ণ হতে পারেন না কেন? যদি ত্রয়ীবাদ সত্ত্বেও খ্রীস্টানেরা একেশ্বরবাদী, তেত্রিশ কোটি দেবতা সত্ত্বেও হিন্দুরা একেশ্বরবাদী, কারণ হিন্দুরাও বিশ্বাস করেন সব দেব-দেবীই এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। খ্রীস্টানেরা বলেন যে, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপন মতাবলম্বিদের উপর অতিশয় প্রভুতা রাখেন"; রামমোহন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "কিন্তু ইহা তাঁহারা [খ্রীস্টানেরা] বিস্মৃত হয়েন যে আপনারা কিরূপে আপন পাদরিদের প্রাবল্যের মধ্যে আছেন"।[১৫]

শ্রীরামপুর মিশনারীরা সমাচার দর্পণে এই সময়েই বিভিন্ন হিন্দুমতের সমালোচনা শুরু করেন। রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মা নামে ব্রাহ্মণ সেবধি বা *Brahmunical Magazine* প্রকাশ করেন সেই সমালোচনার উত্তর দেবার জন্য। অর্থাৎ রামমোহনের খ্রীস্টধর্ম-আলোচনার পশ্চাদ্‌ভূমিতে দুই ধর্মের তাত্ত্বিক বিতর্ক জড়িত আছে। 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথম সংখ্যায় (১৮২১) রামমোহন যে উক্তি করেন তা

১৫ ব্রাহ্মণ সেবধি, 'রামমোহন গ্রন্থাবলী', ৫ম ভাগ, পৃ. ২৩

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজরা তাঁদের শাসনের প্রথম কয়েক বছর[১৬] হিন্দুধর্ম ও ইসলাম সম্বন্ধে কোনো প্রতিবন্ধকতা করেন নি। কিন্তু সম্প্রতি মিশনারীরা খ্রীস্টান করার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করছেন, প্রথমত নানারকম পুস্তক প্রকাশ "যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়"। দ্বিতীয়ত অর্থলোভ বা অন্য কোনো লোভ দেখিয়ে লোককে আকর্ষণ করা। রামমোহন বলেছেন যে বাংলাদেশে যেখানে "ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয়" সেখানে ধর্মের উপর মিশনারীদের এই দৌরাত্ম্য শোভন নয়। যে সব দেশ স্বাধীন সেখানে মিশনারীরা কি অনুরূপ ভয়হীনতার সঙ্গে তাঁদের ধর্ম প্রচার করতে পারবেন? এই লেখাতে রামমোহন বললেন, বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির ধর্মকে 'উপহাস' করে থাকে এটাই স্বাভাবিক, এমন-কি, বিজয়ী জাতির ধর্ম যদি নিকৃষ্ট হয় তা হলেও বিজিত জাতির ধর্মের সূক্ষ্মতা ও মহত্ত্ব তার যথার্থ সম্মান পায় না। কিন্তু ইংরেজেরা "সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন", অতএব রামমোহন চান যুক্তি দ্বারা তাঁরা খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুন— "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চপদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে।" খ্রীস্টীয় মিশনারীরা এই বিজয়ী জাতির সঙ্গে যুক্ত, রামমোহন বিজিত জাতির প্রতিনিধি— রামমোহনের অভিমান-আহত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে এই কথাটিতে। স্পষ্টভাবে, ভারতবর্ষ বা ভারতীয়ত্ব এই ধরনের ধারণা তখনও দেখা দেয় নি, কিন্তু ফারকুহার সাহেব যাকে 'religious nationalism' বলেছেন তার প্রত্যূষকাল রামমোহন ও মিশনারীদের তর্কবিতর্কের মধ্যেই। রামমোহন হিন্দুধর্মের বড়ো শত্রু বলে পরিচিত ছিলেন সমকালীন রক্ষণশীলদের কাছে; রামমোহন হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক একথা জানতেন মিশনারীরা। কোনো কোনো পরবর্তী লেখক বলেছেন, রামমোহন না থাকলে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হত। কিন্তু মূলকথা হল রামমোহনের কাজ দ্বিমুখী: ভাঙা এবং গড়া। হিন্দু সমাজ ও ধর্মের কোনো কোনো দিক সমালোচনা করেছেন; কারণ, তার সামাজিক অবনতি, রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও নৈতিক গ্লানির জন্য ধর্মের কোনো কোনো ব্যাপার দায়ী। অন্যপক্ষে বিদেশী মিশনারীদের হিন্দুধর্মের আলোচনা তিনি সমর্থন করতে রাজী নন, কারণ তাঁদের ধর্মে হিন্দুধর্মের দোষগুলি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এখানে সামাজিক আত্মাভিমানের প্রশ্ন কিছুটা জড়িত। এই সামাজিক আত্মাভিমান থেকেই জাতিগত অভিমানের জন্ম হতে পারে। টিটলার নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রামমোহন যখন তর্কযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়লেন তখন টিটলার একজন 'এসিয়াবাসীর' ঔদ্ধত্যে বিস্মিত হয়েছিলেন; পবিত্র খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের তুলনা করার চেষ্টাই ঔদ্ধত্য। টিটলার তাঁর সহযোগী খ্রীস্টান দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখলেন "are you so far degraded by Asiatic effeminacy as to behold with indifference your holy and immaculate religion thus degraded by having it planted on an equality with Hinduism with rank idolatry, disgraceful ignorance and shameful superstition."[১৭] টিটলার একজন প্রভাবশালী

১৬ ১৮১৩ পর্যন্ত

১৭ 'A Vindication of the Incarnation of Deity as the Common basis of Hindooism and Christianity', *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Panini office, Allahabad, 1906, p. 404.

ব্যক্তি ছিলেন না, ধর্মতত্ত্বেও তাঁর কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু তাঁর রচনা থেকে এইটুকু স্পষ্ট হচ্ছিল যে খ্রীস্টধর্ম ইউরোপের ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে খ্রীস্টধর্ম ইউরোপের ধর্ম হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি খ্রীস্টানদের ইউরোপীকৃত করার চেষ্টাও হয়েছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে দেখা যাবে মনের অগোচরে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠতার ধারণা স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ খ্রীস্টধর্ম বাংলা বা ভারতবর্ষের শাসক গোষ্ঠীর ধর্ম। রামমোহন টিটলারের ঐ বক্তব্যের উত্তরে লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষের কাছে (রামমোহনের ভাষায় 'to our ancestors') পৃথিবী তার প্রথম জ্ঞানের মুহূর্তের জন্য ঋণী (রামমোহনের ভাষায় 'indebted…for the first dawn of knowledge'), এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম প্রভাত-উদয় তব গগনে'-র পূর্বরূপ। রামমোহন আরো স্মরণ করিয়ে দিলেন "all the ancient prophets and patriarchs venerated by Christians, nay, even Jesus Christ himself…were ASIATICS." ধর্মীয় শ্রেষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত শ্রেষ্ঠতার দাবি, অন্তত ধর্মীয় শ্রেষ্ঠতার দাবি করে জাতীয় হীনতার গ্লানি অবসানের কিছু চেষ্টা, পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মান্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার সূচনা ক্ষীণভাবে দেখা গেছে রামমোহন ও খ্রীস্টমিশনারীদের তর্কবিতর্কের মাধ্যমে। রামমোহন খ্রীস্টকে গ্রহণ করলেন, খ্রীস্টধর্মকে নয়; যেমনভাবে ভারতীয় অবৌদ্ধরা বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করেছেন, বৌদ্ধধর্মকে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্মান্দোলনের পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যাবে, খ্রীস্টীয় চিন্তা নানা ভাবে হিন্দুধর্মান্দোলনকে নিয়মিত করেছে— হয় স্পষ্টভাবে হিন্দু নেতারা খ্রীস্টধর্মের বিরোধিতা করেছেন, অথবা খ্রীস্টধর্ম থেকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করেছেন। রামমোহনের The Precepts of Jesus সেই গ্রহণবর্জনের ইতিহাসে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দলিল।

রামমোহনের সমাধিমন্দির

আর্নোস্ ভেল্। ব্রিস্টল

রামমোহন রায় ও বেদান্ত

দিলীপকুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষে উদ্‌ভাবিত দর্শনপ্রস্থানসমূহের মধ্যে বেদান্ত এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে সাধারণভাবে অবশ্য এ কথা বলা যায়, তা কেবলমাত্র বুদ্ধি-আশ্রয়ী বিচার-বিতর্কের পথে বিকশিত হয় নি। এক হিসাবে প্রতিটি ভারতীয় দর্শনই মোক্ষশাস্ত্র; তার তত্ত্বগুলি যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেই সে দর্শন অনুশীলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেগুলিকে সাধনার দ্বারা জীবনে প্রতিফলিত করে তার নির্দেশে পরম পুরুষার্থলাভ শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এর মধ্যেও বেদান্তদর্শন কিছু বিশেষ অর্থে মোক্ষশাস্ত্র। বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে এর যোগ অতি নিবিড়। ভারতবর্ষীয় ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংগঠনের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, যখনই যে সম্প্রদায় প্রভাবশালী হয়েছে তখনই তা প্রয়োজনমত বেদান্তমতকেই সাম্প্রদায়িক রঙে রঞ্জিত করে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে ও প্রতিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিয়েছে। ঐ-সকল ক্ষেত্রে সাধারণত যে প্রণালী অবলম্বন করা হত তা হল সম্প্রদায়ের বিশেষপূজ্য দেবতার সঙ্গে বেদান্তের মূল তত্ত্ব পরব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন। বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়দ্বয়ের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বেদান্তদর্শনের প্রধান গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের যে-সব সাম্প্রদায়িক ভাষ্য রচিত হয়েছিল সেগুলিকে এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন গণ্য করা যেতে পারে।[১] আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পর্কেও সেই একই কথা। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি ও অবলম্বন কোনো-না-কোনো আকারে বৈদান্তিক চিন্তা। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেই জনৈক বিদেশী ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জে. টাইস্‌সুল ডেভিস বলেছিলেন : "...no great soul has appeared in India during the last 3000 years that has not accepted the call of the teaching of the Vedānta, the spirit of the oldest and the most enduring religious philosophy based not on speculation but on real experience and summed up in three words—*Tat tvam asi,* Thou art Brahman!"[২] এই উক্তির মধ্যে হয়তো কিছুটা অতিসরল একদেশদর্শিতা আছে, কিন্তু এর মূল বক্তব্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আধুনিক যুগের সূচনায় যখন ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল তখন স্বভাবত ভারতবর্ষীয় ধর্মজগতের এই চিরাচরিত ঐতিহ্য উপেক্ষিত হয় নি। ধর্মপ্রবক্তারূপে রামমোহন রায় যে মুখ্যত বেদান্তকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছিলেন তার নিগূঢ় অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। বর্তমান নিবন্ধ সমকালীন দেশকালগত পটভূমিকায় তাঁর বেদান্ত-অনুশীলন ও সমগ্র চিন্তাধারায় বৈদান্তিক আদর্শের স্থান ও প্রভাব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের প্রয়াস।

বেদান্তশাস্ত্রের মূল বৈদিক সাহিত্যের উপনিষদ্‌ভাগ যা শ্রুতির মধ্যে গণ্য। এর অপর দুখানি চিরস্মরণীয় গ্রন্থ ভগবদ্গীতা ও বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্র যেগুলি স্মৃতিপর্যায়ভুক্ত হলেও ঔপনিষদতত্ত্বের ধারক-বাহকরূপে শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে অত্যুচ্চস্থানের অধিকারী। এই তিন অঙ্গ একত্র মোক্ষশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয় নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণ্যদর্শনের আত্মজ্ঞানতত্ত্ব প্রধানত এগুলিকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল। এই

আত্মতত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে রামমোহন যে হিন্দুদের পৃথিবীর সর্বাধিক অগ্রসর জাতি মনে করতেন এ বিষয়ে অন্তত দুটি সুনিশ্চিত সাক্ষ্য আছে। ফ্রান্সের অন্তর্গত ব্লোয়ার বিশপ আব্বে গ্রেগোয়ারের নিকট তিনি এক সময়ে বলেন, হিন্দু তত্ত্ববিদ্যার সমতুল্য কোনো কিছু তিনি ইউরোপীয় দর্শনে দেখতে পান নি (he has found nothing in Europen books equal to the scholastic philosophy of the Hindus)।[৩] দ্বিতীয়ত, রামমোহনের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের মৃত্যুর পর যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে দেখা যায়, হিন্দু ও খ্রীস্টীয় ধর্মদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর, একদা চন্দ্রশেখরের এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন তাঁকে বলেন : "The Hindus seem to have made greater progress in sacred learning than the Jews, at least when the Upanishads were written···If religion consists of the blessings of self-knowledge and improved notions of God and his attributes and a system of morality holds a subordinate place, I certainly prefer the Vedas।"[৪] মনে রাখতে হবে 'বেদ' অর্থে রামমোহন তাঁর রচনার সর্বত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্‌ভাগকে বুঝেছেন— যা বেদান্তদর্শনের প্রতিষ্ঠাভূমি। সুতরাং বিবিধ-ধর্মশাস্ত্রদর্শী রামমোহনের মনে যে বৈদান্তিক তত্ত্ববিদ্যার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রত্যয় ছিল ও তার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এ কথা স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক তাঁর সুবিখ্যাত পত্রে বেদান্তদর্শন সম্পর্কে রামমোহন যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্বভাবত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। উক্ত পত্রের একস্থানে তিনি বলেছেন : "Neither can such improvement arise from such speculations as the following, which are themes suggested by the Vedant : In what manner is the soul absorbed into the deity ? What relation does it bear to the divine essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence : that as father, brother, etc. have no real entity they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better।"[৫] রামমোহনের এই বিখ্যাত উক্তিটিকে সম্ভবত ভুল বুঝে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন রামমোহন বেদান্ত সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এবং এই দর্শনপ্রস্থানকে আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রমে স্থান পাবার অনুপযুক্ত মনে করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রাংশটি উদ্‌ধৃত করে মন্তব্য করেছেন : "বেদান্ত সম্বন্ধে রামমোহনের এই মতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। একেশ্বরবাদ ও নিরাকার উপাসনার পরিপোষক বলিয়াই তিনি বেদান্তপ্রচারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই পত্রে উল্লিখিত বেদান্তদর্শনের আলোচিত বিষয়গুলি তাঁহার রচিত বেদান্তসার পুস্তকে স্থান পায় নাই।"[৬] বেদান্ত সম্পর্কে রামমোহনের পূর্বাপর সকল উক্তি ও চিন্তার সাধারণ পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে ঐ পত্রাংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, এমন-কি, সমগ্র পত্রখানি থেকে উক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তিকে পৃথক করে বিচার করলে আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। দুঃখের বিষয় ব্রজেন্দ্রনাথ এখানে পত্রখানির সমগ্র বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে রামমোহনের বিশেষ উক্তির

বিচার করেন নি অথবা বেদান্ত সম্পর্কে রামমোহনের আনুপূর্বিক সমগ্র চিন্তাধারার সঙ্গে সেটিকে মিলিয়ে নেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে আমহার্স্টকে লিখিত পত্রে রামমোহন মধ্যযুগের ভারতীয় ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য— এই দুটি পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষাপদ্ধতির তুলনাপ্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য প্রচলনের অনুপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ উক্ত পদ্ধতিগত সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং বেদান্ত, মীমাংসা ও ন্যায়দর্শন শিক্ষার উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল— প্রাচীন টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর রূপায়ণের জন্য সরকারি অনুমোদন ও অর্থানুকূল্যে কলিকাতায় সরকার-প্রস্তাবিত নূতন সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করবার কোনো আবশ্যকতা নেই, কেননা এই জাতীয় দেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যায়তন দেশে যথেষ্ট রয়েছে; আর আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শ ব্যতীত নিছক প্রাচীন পদ্ধতিগত শিক্ষা দেশকে প্রগতির পথে চালিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সংঘটিত শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিক রূপান্তরের তুলনা দিয়ে উক্ত পত্রে এই মর্মে তিনি বলেছেন: "If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sangscrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British Legislature।"[৭] এখানে স্পষ্টত একটি নূতন যুগোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেটির পাঠক্রম কোন্ কোন্ বিষয়ে রচিত হলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে রামমোহন পত্রে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন: "But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus।"[৮] সুতরাং প্রস্তাবিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা-দানের উপযোগী অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার -সংবলিত একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই নূতন 'কলেজ' স্থাপনের মাধ্যমে প্রাচীন, প্রথাবদ্ধ, আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগতিহীন শিক্ষা-পদ্ধতির পুনঃসম্প্রসারণ ঘটুক, সেটা তিনি চান নি। মনে রাখতে হবে তিনি যার বিরোধিতা করেছেন তা হল তাঁর ভাষায় 'the Sangscrit system of education' বা টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত সনাতন রীতি -সম্মত সংস্কৃত শিক্ষা-প্রণালী যেখানে কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কাল নির্দিষ্ট ছিল দ্বাদশ বৎসর এবং বেদান্তাদি দর্শন শিক্ষা দেওয়া হত আধুনিক জীবনের নূতন প্রয়োজন ও মূল্যজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রেখে। তাঁর সমালোচনা যে মুখ্যত পদ্ধতির, বিষয়বস্তুর নয়, তা প্রমাণিত হয় ঐ পত্রেরই অংশ-

বিশেষ থেকে যেখানে তিনি আমহার্স্ট‌কে জানিয়েছেন, সংস্কৃত ভাষা ও সে-ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের উপযুক্ত সংরক্ষণ ও প্রসার হতে পারবে— নূতন সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নয়— দেশের অসংখ্য টোল-চতুষ্পাঠীগুলিকে ও সেখানে অধ্যাপনারত প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যার ধারক-বাহক বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুক্ত হস্তে সরকারি অর্থসাহায্যদানের মাধ্যমে ("But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the valuable information it contains, this might be much more easily accomplished by other means than the establishment of a new Sangscrit College; for there have been always and are now numerous professors of Sangscrit in the different parts of the country, engaged in teaching this language as well as the other branches of literature, which are to be the object of the new Seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to the most eminent Professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertions")।* সংস্কৃতবিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে ও তার সংরক্ষণ ও অনুশীলনকে প্রয়োজনীয় মনে না করলে এমন প্রস্তাব করা রামমোহনের পক্ষে সম্ভব হত না। অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষাবিষয়ে রাষ্ট্রশক্তির নিকট তাঁর প্রত্যাশা ছিল দুটি: সরকারি সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও সেইসঙ্গে দেশের প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতিকে তার নিজস্ব কেন্দ্রসমূহে প্রাণবন্ত রাখবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। তিনি মনে করেছিলেন, এই দ্বিমুখী উদ্যমের ফলে প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধ ও মূল্যজ্ঞানের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে। দ্বিতীয়ত, বেদান্তদর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলি রামমোহন তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে আলোচনা করেন নি, তাঁর মন্তব্যের এই অংশের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রমাণ করতে চেয়েছেন, রামমোহন সেগুলি অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে বর্জন করেছিলেন। ইঙ্গিতটি কিছু আশ্চর্য লাগে, কারণ রামমোহনের সংস্কৃত-বাংলা গ্রন্থাবলীর (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) অন্যতম সম্পাদক হিসাবে তাঁর না জানবার কথা নয় যে 'বেদান্তসার' রামমোহনের বৃহত্তর ও বিস্তীর্ণতর পূর্বরচনা 'বেদান্তগ্রন্থে'র সংক্ষিপ্তসার মাত্র, তাতে সাধারণের জন্য বেদান্তের কয়েকটি নির্বাচিত ও সরল প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এ-গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস ও আলোচনা পূর্ণাঙ্গ বা বিস্তারিত নয়, তা হবার কথাও নয়। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত পত্রোল্লিখিত বিষয়গুলি যথা, পরমাত্মা-জীবাত্মার পরস্পর-সম্পর্ক, মায়াতত্ত্ব ইত্যাদি রামমোহনের বেদান্তবিষয়ক মূল পূর্ণাঙ্গ রচনা 'বেদান্তগ্রন্থে' যথোচিত গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারেই আলোচিত হয়েছে— অনাবশ্যক বা অশ্রদ্ধেয় বলে বর্জিত হয় নি। উপনিষৎ-পঞ্চকের অনুবাদে ও 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (ও তার ইংরেজি সংস্করণ *Brahmunical Magazine*) পত্রেও স্থানে স্থানে প্রসঙ্গগুলি উত্থাপিত ও আলোচিত হতে দেখা যায়। বর্তমান নিবন্ধে যথাস্থানে সে-সবের বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হবে। সুতরাং রামমোহনের 'বেদান্তসার' পুস্তকে বেদান্তের কয়েকটি প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত, এই যুক্তিতে রামমোহন বেদান্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এমন প্রমাণ করা অসম্ভব।

স্বয়ং গ্রন্থরচনার মাধ্যমে বেদান্তমতের প্রচার ও প্রসার ভিন্ন রামমোহন যে নিজব্যয়ে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করে বেদান্তশিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিও স্মরণে রাখা কর্তব্য। রামমোহনের পত্রে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কলিকাতায় সরকারি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে। সম্ভবত এর অল্পকাল পরেই, তিনি নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটি বেদান্ত-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। রামমোহনের ইংরেজ জীবনীকার এই সম্পর্কে রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্য পাদ্‌রী উইলিয়ম অ্যাডামের ২৭ জুলাই, ১৮২৬ তারিখে লিখিত এক পত্রের অংশ উদ্‌ধৃত করেছেন: "Rammohun Roy has lately built a small but very neat and handsome college which he calls the Vedanta College, in which a few youths are at present instructed by a very eminent Pandit, in Sanskrit literature with a view to the propagation and defence of *Hindu* Unitarianism. With the institution he is also willing to connect instructions in European science and learning and in Christian Unitarianism, provided the instructions are conveyed in the Bengali or Sanskrit language!"[১৫] অ্যাডাম-প্রদত্ত এই সংবাদটি একাধিক কারণে বিশেষ মূল্যবান। প্রথমত এটি এক হিসাবে আমহার্স্টকে লিখিত পত্রের অন্তর্ভুক্ত বেদান্তশিক্ষাবিষয়ক রামমোহনের মতের পরিপূরক। এই বেদান্তবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাই প্রমাণ করে রামমোহন বেদান্তদর্শন সম্পর্কে অশ্রদ্ধাযুক্ত তো ছিলেনই না বরং বেদান্তের অনুশীলন ও প্রচারে তাঁর এতদূর আগ্রহ ছিল যে তার চর্চার জন্য তিনি একক উদ্যমে ও অর্থব্যয়ে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে পর্যন্ত অগ্রণী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত অ্যাডামের বর্ণনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ শিক্ষাদানের একটি নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। এর সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা যুক্ত করতে চেয়েছিলেন; অধিকন্তু তাঁর এ ইচ্ছাও ছিল যে এই সমগ্র শিক্ষার বাহন হবে সংস্কৃত অথবা বাংলা ভাষা। সরকারি কর্তৃপক্ষকে লিখিত পত্রে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার দ্বিধারার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত যে অনুরোধ তিনি করেছেন— তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠান বেদান্ত-বিদ্যালয়ের পাঠক্রমনিরূপণের মধ্যে সেই সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অ্যাডামের পত্রে প্রকাশিত তথ্যটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে সরকারি সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে বিবরিত প্রাচীন পদ্ধতিগত সংস্কৃত-শিক্ষা ও রামমোহন-পরিকল্পিত আধুনিক যুগোপযোগী শাস্ত্রানুশীলন-পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্যটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও প্রাচীন পদ্ধতির কেন্দ্রস্বরূপ সরকারি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতি রামমোহনের বিরূপতার কারণটিও স্পষ্ট হয়। সুতরাং আনুপূর্বিক আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত করতে বাধা নেই, বেদান্ত সম্পর্কে উচ্চ ও সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করেই রামমোহন এই শাস্ত্রের অনুশীলনে ব্রতী হন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের বেশ কিছুকাল পূর্ব হতেই নিশ্চয় তাঁর বেদান্তচর্চা আরম্ভ হয়েছিল; কেননা কলিকাতা থেকে ঐ বৎসরই তাঁর বেদান্তবিষয়ক প্রথম ও প্রধান কীর্তি 'বেদান্তগ্রন্থ' ও সম্ভবত এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'বেদান্তসার'ও প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে বেদান্তচর্চা ও বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের প্রসার সম্পর্কে তাঁর যে এক সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল, বেদান্তবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এর বিশিষ্ট পাঠক্রম-নির্মাণ-প্রয়াস তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রামমোহন তাঁর প্রকাশ্য বেদান্তচর্চা আরম্ভ করেন। তার পূর্বে বাংলা

দেশের সারস্বত সমাজে বেদান্তের অনুশীলন বা অধ্যাপনার প্রসার কতদূর ছিল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এক সময়ে এমন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রাক্-রামমোহন কালের বঙ্গীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণের প্রতিভা প্রধানত ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রদ্বয়কে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল— বেদান্তশাস্ত্রে তাঁরা যে কেবল অনধিকারী ছিলেন তা নয়, এ শাস্ত্র তাঁদের অনেকের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন-কি, অশ্রুতপূর্ব। রামমোহন সম্পর্কে তাঁর এক ভাষণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত করেছেন: "যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্‌ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন-সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্‌কে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন…।"[১১] রামমোহনের সমকালীন প্রতিপক্ষগণের গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করলে কিন্তু মনে হয় না বেদান্ত সম্পর্কে তাঁদের সকলের অজ্ঞতা সর্বদা এতদূর গভীর ছিল। তাই এই বিষয়ে সমসাময়িক তথ্যপ্রমাণগুলি একবার যাচিয়ে দেখা আবশ্যক। শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের পাদ্‌রী উইলিয়ম কেরী ও যোশুয়া মার্শম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী ওয়ার্ড্ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুদের শাস্ত্র, ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কে যে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন তাতে তিনি তৎকালীন বাংলার টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতে প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার একটি চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বেদান্তের প্রকৃত চর্চা ও অধ্যাপনা হত কাশীতে— বঙ্গীয় পণ্ডিতদের বেদান্ত-জ্ঞান ছিল সামান্য (At Benares, the meemangsu, shankhyu, vādantu patunjulu voishashiku shastrus and the Vadus are taught more or less, but the Bengal pundits know only scraps of these things.)।[১২] টোলের পাঠক্রমের মধ্যে বেদান্ত-শিক্ষার্থীদের আনুপাতিক সংখ্যানিরূপণের কিছু চেষ্টাও ওয়ার্ড্ করেছিলেন এবং অনুসন্ধানের ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা এই: "Amongst one hundred thousand bramhuns there may be one thousand or thereabouts who learn the grammar of the Sungskritu. Of this one thousand bramhuns who have learnt the Sungskritu language, four hundred or five hundred may read some parts of the Kavyu shastrus, and fifty some parts of the ulunkaru shastrus. Four hundred of this thousand may read some of the smritees. Of this one thousand persons ten persons may read parts of the tuntrus. Three hundred out of this one thousand brahmuns may read parts of the nyayu shastrus. Out of one thousand persons who learn the Sungskritu, five or six may read parts of the meemangsu, shankyu, vādantu, patunjulu, voishashiku shastrus and the vadus।"[১৩] অর্থাৎ এক হাজার সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়পড়তায় যেখানে কাব্যের ছাত্র ৪০০।৫০০, অলংকারের ছাত্র ৫০, স্মৃতির ৪০০, তন্ত্রের ১০, ন্যায়ের ৩০০, সেখানে বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা-সাংখ্য-পাতঞ্জল(যোগ)-বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রগুলি মিলিয়ে ছাত্রের সংখ্যা পাঁচ অথবা ছয়। তদানীন্তন বাংলার টোলগুলিতে বেদান্তের এই স্বল্পসংখ্যক ছাত্রকে কোন্ কোন্ গ্রন্থ অধ্যয়ন করানো হত সে প্রসঙ্গে ওয়ার্ড্ বলছেন: "The original work of Vadu-vyasu is called Sareeriku-sootru. The other works at present read in Bengal are the

following viz. Sareerika-bhashyu, Bachusputee, Kulputuroo, Purimulu, Bibburunu, Vartiku, Vadantu-puribhasha, Siddhantu lasu, Siddhantu-vindoo and Punchudushee. The second and the sixth of the above books are commentaries on the work of Vadu-vyasu. The rest are compilations from the Vadantu।"[১৪] সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বেদান্ত-অধ্যাপনার বিষয় ছিল বাদরায়ণ (বা ব্যাস) -কৃত ব্রহ্মসূত্র যার অপর নাম শারীরকসূত্র; শংকর-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (বা শারীরক-ভাষ্য); উক্ত ভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্র রচিত 'ভামতী' টীকা; অমলানন্দ রচিত ভামতীর টীকা 'কল্পতরু'; অপ্যয়দীক্ষিত রচিত কল্পতরুর টীকা 'পরিমল'; সম্ভবত প্রকাশাত্মন্ রচিত পদ্মপাদাচার্যের 'পঞ্চপাদিকা'র টীকা 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণ' অথবা তদবলম্বনে বিদ্যারণ্য রচিত 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ'[১৫]; শংকরাচার্যের বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্-ভাষ্যের উপর সুরেশ্বর রচিত 'বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্-ভাষ্য-বার্তিক'; ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের 'বেদান্তপরিভাষা'; অপ্যয়-দীক্ষিত রচিত 'সিদ্ধান্তলেশ'; মধুসূদন সরস্বতী রচিত 'সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দু' বা 'সিদ্ধান্তবিন্দু'; ও বিদ্যারণ্য-কৃত 'পঞ্চদশী'। লক্ষ করবার বিষয় অধ্যেতব্য গ্রন্থনিচয়ের সব কখানিই শংকরাচার্য-ব্যাখ্যাত নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের পরিপোষক। এর মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের শাংকর ভাষ্য (তালিকাভুক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ) ও সুরেশ্বর-প্রণীত বৃহদারণ্যকোপনিষদের শাংকর ভাষ্যের বার্তিক (তালিকাভুক্ত ষষ্ঠ গ্রন্থ)কে যথাক্রমে ব্যাসের নামে প্রচলিত মূল বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনা বলা চলে। অপর গ্রন্থগুলিতে (এমন-কি ভামতী, কল্পতরু, পরিমল প্রভৃতি টীকাজাতীয় রচনাতেও) নির্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্ব অনেকটা স্বাধীন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ওয়ার্ড্ পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্তিত নামে প্রকাশ করেন ১৮১৫-১৮ খ্রীস্টাব্দে। এই সংস্করণে তৎকালীন বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র অবস্থিত সংস্কৃতশিক্ষার প্রধান কেন্দ্রসমূহের এক তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং বাংলার নবদ্বীপ, কলিকাতা, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল, বালী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত চতুষ্পাঠীসমূহের অনেকগুলির পাঠক্রমেরও উল্লেখ আছে। তদনুসারে দেখা যায়, নবদ্বীপে অধ্যয়নের বিষয়— ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ; কলিকাতার সর্বসমেত আটাশটি শিক্ষাকেন্দ্রে ন্যায় ও স্মৃতি; বাঁশবেড়িয়া, গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে— ন্যায়। অন্যান্য স্থানের বিষয়ের উল্লেখ নেই। সমকালীন বাঙালী পণ্ডিতগণের মধ্যে ওয়ার্ডের মতে একমাত্র ত্রিবেণীর স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই কিছুটা বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। অপর পক্ষে ওয়ার্ডের সাক্ষ্য অনুযায়ী সেই সময়ে কাশীতে ও অন্ধ্রদেশে বেদ-বেদান্তের বিশেষ চর্চা ছিল; কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট ও হনুমন্ত ঘাটে বেদান্ত ও মীমাংসা বিশেষরূপে অধ্যয়নের জন্য দুটি কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়।[১৬] ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গ-বিহারের তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে উইলিয়ম অ্যাডাম কর্তৃক সংকলিত তিনটি বিবরণে বাঙ্লার টোল-চতুষ্পাঠীগুলির যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ওয়ার্ডের বর্ণনা থেকে কোনো অংশে পৃথক নয়।[১৭] বেদান্ত সম্পর্কে কৌতূহল ও এর ছাত্রের সংখ্যা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় তখনো নগণ্য; পাঠ্যতালিকায় কোনো পরিবর্তন নেই; এবং পূর্বের ন্যায় বেদান্তচর্চার মুখ্য কেন্দ্র তখনো কাশী। রাজশাহী জেলার এক বেদান্তের টোল সম্পর্কে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে অ্যাডামের মন্তব্য: "The Vedantic school No. 70 of Table III can scarcely be said yet to exist. The Pundit after completing the usual course of study in his native district Rajsahi,

to extend his acquirements went to Benares whence he had returned a month before I saw him…He had no pupils at the time of my visit to his village."।[১৮] ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে প্রকাশিত মন্টগোমারী মার্টিন -কৃত পূর্বভারতের সুবিখ্যাত সমীক্ষার সাক্ষ্যও এর সঙ্গে মেলে। দিনাজপুর জেলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মার্টিন বলছেন: "There is no Pedanto Pandit in Dinajpoor. It is indeed alleged that there was none in Bengal until of late, when some learned men were brought from Benares by a rich Kayostho of Calcutta (Nobokrishno or Nobokissen) who had acquired a large fortune in the service of Lord Clive।"[১৯] রংপুর ও বাংলার প্রান্তবর্তী পুর্ণিয়া জেলা সম্পর্কেও মার্টিনের সিদ্ধান্ত অনুরূপ।[২০] কলিকাতায় ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্কৃত কলেজে প্রথম থেকেই একটি বেদান্ত-শ্রেণীর প্রবর্তন করা হয়েছিল; কিন্তু ছাত্রাভাবে ১৮৪২ সালে কর্তৃপক্ষ সেটি উঠিয়ে দিতে বাধ্য হন।[২১] অতএব দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাবলী একটি সাধারণ সিদ্ধান্তকেই নির্দেশ করছে যা এই: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার পণ্ডিতসমাজে বেদান্তের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ অপ্রচলিত না থাকলেও ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চার তুলনায় এর পরিমাণ ছিল নগণ্য; বেদান্ত সম্পর্কে কৌতূহল বা বেদান্ত পাঠে আগ্রহ সংস্কৃতশিক্ষার্থীগণের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যেত; উত্তর-ভারতে বেদান্ত-শিক্ষার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল কাশী; বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত ক্ষীণ বেদান্তচর্চা ও বেদান্তাধ্যাপনা মুখ্যত শাংকর অদ্বৈতবাদকেই অবলম্বন করেছিল; এবং মোক্ষশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে টোল-চতুষ্পাঠীতে এক ব্রহ্মসূত্রই টীকা-ভাষ্য সমেত পড়ানো হত। সভাষ্য উপনিষদ্-গীতা পাঠ্যতালিকার প্রায় বহির্ভূত ছিল।

পূর্বোক্ত প্রচলিত ধারণার সঙ্গে এই চিত্রের সামঞ্জস্য কতখানি? দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের সমকালীন বাংলার প্রথাগত সংস্কৃত পাণ্ডিত্য মুখ্যত বিকাশ লাভ করেছিল কাব্য, অলংকার, ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রকে অবলম্বন করে; বেদান্তপাঠে ছাত্রসমাজের আগ্রহ ও ঐ শাস্ত্রের অনুশীলন এবং অধ্যাপনার পরিমাণ ছিল সে তুলনায় অতি সামান্য; টোল-চতুষ্পাঠীতে তার যেটুকু ক্ষীণ অস্তিত্ব ওয়ার্ড, অ্যাডাম বা মার্টিনের বর্ণনা থেকে অনুভব করা যায় তাও ছিল এক বিশেষ ধারাশ্রয়ী। অপরপক্ষে এমন উক্তি নিঃসংশয়ে অতিরঞ্জন যে শাস্ত্রবিচারের ক্ষেত্রে রামমোহনের সমস্ত প্রতিপক্ষই বেদান্তশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে, গভীরভাবে না হলেও, বেদান্তসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে রামমোহন-রচিত 'বেদান্তগ্রন্থ'এর উত্তরস্বরূপ প্রকাশিত তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র পৃষ্ঠায়।[২২] আদৌ রামমোহনের প্রতিপক্ষ, উত্তরকালে তাঁর মতানুবর্তী শিষ্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদ্ পাঠ করতেন। রামমোহন স্বয়ং 'কবিতাকারের সহিত বিচার' গ্রন্থে বলেছেন: "আমরা ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য ঐ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঁচ উপনিষদের ভাষাবিবরণ করিয়াছি… সেই সকল ভাষাবিবরণের পুস্তক শত শত এই নগরে এবং এতদ্দেশে পাওয়া যাইবেক এবং ঐ সকল মূল উপনিষদ্ ও আচার্যের ভাষ্য এবং বেদান্তদর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের বাটিতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞলোক জানিতে পারিবেন বেদের স্থান স্থানের বিপরীত অর্থকে ও বেদান্তদর্শনের বিপরীত সূত্রকে ভাষায় বিবরণ

করা গিয়াছে কিম্বা সম্পূর্ণ উপনিষদ্ সকলের ও বেদান্তদর্শনের অর্থ করা গিয়াছে।"[২৩] রামমোহনের সমকালে বাংলাদেশে বেদান্তচর্চার যে অস্তিত্ব ছিল এই উক্তিই তার প্রমাণ। তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। 'কবিতাকার'এর প্রতি প্রদত্ত রামমোহনের উত্তরের শেষাংশ থেকে মনে হয় কবিতাকার এমন একটা অভিযোগ তুলেছিলেন যে রামমোহন উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের নাম করে যে প্রচার করেছেন তা প্রকৃত উপনিষদ্ বা বেদান্ত নয়— অনেকাংশে কল্পিত বা কৃত্রিম শাস্ত্র। দুর্ভাগ্যবশত 'কবিতাকার'এর পরিচয় জানা যায় নি বা রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রকাশিত তাঁর মূল পুস্তকের সন্ধানও মেলে নি। তা ছাড়া 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের অভিযোগ ছিল রামমোহন-প্রচারিত শাস্ত্রসমূহ 'স্বকপোলকল্পিত'; যার উত্তরে রামমোহনকে বলতে হয়েছিল: "প্রণব কি স্বকপোলকল্পিত হয়েন? কি গায়ত্রী ও দশোপনিষৎ, বেদান্ত, যাহা আমাদের উপাসনীয় হইয়াছেন, তাহা স্বকপোলকল্পিত হয়েন? ও বেদান্তদর্শন ও মনুস্মৃতি ও ভগবদ্গীতা ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারধৃত বচন সকল, যাহা ব্যতিরেক অন্য কোন বচন কোন স্থানে আমরা লিখি না, সেই সকল শাস্ত্র কি স্বকপোলকল্পিত হয়েন?[২৩ক]

সে-যুগে যে অল্প পরিমাণ বেদান্তচর্চার অস্তিত্ব ছিল সেটুকুও এর ধারক-বাহক পণ্ডিতবর্গের রক্ষণশীল গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জাতির কোনো বৃহৎ কল্যাণসাধনে ব্যবহৃত হতে পারে নি। এই পণ্ডিতগণ বেদান্তকে সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় গণ্ডিবদ্ধ করে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন; বাঙ্‌লা প্রভৃতি প্রচলিত লৌকিক ভাষায় এই মোক্ষশাস্ত্রের অনুবাদ বা সাধারণের মধ্যে তার প্রচারের তাঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী। রামমোহন কর্তৃক বাঙ্‌লা, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে বেদান্ত-প্রচারকে বিদ্রূপ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'তে বলেছেন: "তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ন্যায় যে অসদুপদেশ তাহাতে আস্থা করিয়া অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ে নষ্ট হইবে না।"[২৪] অন্যত্র তাঁর উক্তি আরও স্পষ্ট: "...শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরী ফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।"[২৫] রামমোহন-প্রতিপক্ষ 'কবিতাকার' এমন হাস্যকর অভিযোগও করেছিলেন যে রামমোহন কর্তৃক বেদান্ত-উপনিষদ্ বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশের ফলে দেশে ব্যাপকভাবে অমঙ্গল, মন্বন্তর ও মারীভয় উপস্থিত হয়েছে![২৬] পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও খ্রীস্টধর্মতত্ত্বের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃত ও বাঙ্‌লার মাধ্যমে বেদান্তশিক্ষার যে ব্যবস্থা রামমোহন তাঁর বেদান্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে করেছিলেন এবং বাঙ্‌লা ও হিন্দুস্থানী অনুবাদের মাধ্যমে ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ ও গীতার তত্ত্ব যেভাবে সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন সেই নির্ভীক, মুক্ত, উদার দৃষ্টির সঙ্গে পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণের রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের কী দুস্তর প্রভেদ! এই কারণেই রামমোহনের দ্বারা আধুনিক যুগে জাতির ভাবজীবনে বেদান্তের সময়োপযোগী নবজন্ম সম্ভবপর হয়েছিল আর তাঁর সমকালীন বিরুদ্ধপক্ষীয় পণ্ডিতগণের বেদান্তজ্ঞান আপনাকে প্রমাণ করেছিল বন্ধ্যা।

উত্তর-ভারতের তৎকালীন বেদান্তচর্চার প্রধানতম কেন্দ্র কাশীতে যে রামমোহনের বেদান্তচর্চার সূত্রপাত এই প্রচলিত ধারণায় সন্দেহ করবার বিশেষ কোনো কারণ দেখা যায় না। তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ একেশ্বরবাদী (unitarian) পাদ্রী অ্যাডাম ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে মন্তব্য করেছিলেন, রামমোহন সর্বসাকুল্যে দশ বা বারো

বৎসর কাশীতে অবস্থান করেন।[২৭] এই ধারণা ভ্রান্ত। রামমোহনের বিষয়-সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলার নথিপত্র থেকে প্রমাণিত হয়, সম্ভবত ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাটনা, কাশী প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলে যাবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন। ১৮০০ বা ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি একবার ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে কাশীতে কর্মরত ছিলেন কিছু সমসাময়িক স্থানীয় নথিপত্রের সাহায্যে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।[২৮] রামমোহনের কাশী-প্রবাস অ্যাডামের অনুমান অনুযায়ী দশ বা বারো বৎসর দীর্ঘ হলে তাঁর জীবনের এই পর্বভুক্ত অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য করা যায় না। কিন্তু সম্ভবত ১৭৯৯ থেকে ১৮০৩-০৫ এর মধ্যে রামমোহন বেশ কিছুকাল কাশীতে কাটিয়েছিলেন, যদিও এই কাশীবাসে মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়েছিল; কেননা ঐ ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দেই তিনি ঢাকা-জালালপুরে ও মুর্শিদাবাদেও অল্পকালের জন্য সিভিলিয়ান টমাস উড্‌ফোর্ডের অধীনে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন এমন প্রমাণ আছে। সে-সময়ে কলিকাতা বা বাঙলাদেশের অন্যত্র বেদান্তচর্চার বিশেষ সুবিধা না থাকায় কাশীবাসকালে সেখানে এই শাস্ত্র অনুশীলনের প্রাপ্ত সুযোগ যে রামমোহন গ্রহণ করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। উত্তরকালে জীবনের রংপুর-পর্বে (১৮০৯-১৮১৫) তিনি উপনিষদ্-বেদান্তে তাঁর ব্যুৎপত্তি নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা গভীরতর করেছিলেন নিশ্চয়, কেননা, দেখা যায় ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'বেদান্তগ্রন্থ' শীর্ষক তাঁর সুদীর্ঘ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রাথমিক রচনাপর্ব অবশ্যই রংপুরে সমাপ্ত হয়েছিল।

বৈদান্তিক ও বেদান্ত-ব্যাখ্যাতা রূপে রামমোহনের আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর জীবনের কলিকাতা-পর্বে (১৮১৫-১৮৩০)। হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বিচার -সম্পর্কিত তাঁর সবগুলি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছিল এই সময়সীমার মধ্যে। তার মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থনিচয়ের একটি তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে:

বাঙলা: (১) বেদান্তগ্রন্থ (কলিকাতা, ১৮১৫); (২) বেদান্তসার (কলিকাতা, ১৮১৫ বা ১৮১৬); (৩) তলবকারোপনিষৎ (কেনোপনিষৎ), মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৬); (৪) ঈশোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৬); (৫) কঠোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৭); (৬) মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৭); (৭) মুণ্ডকোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৯); (৮) শংকরাচার্য কর্তৃক রচিত বলে অনুমিত আত্মানাত্মবিবেক, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৯)।

হিন্দুস্থানী: (১) বেদান্তগ্রন্থ (এই নামের পূর্বোক্ত বাঙলা গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদ) (কলিকাতা, ১৮১৫); (২) বেদান্তসার (ঐ নামের পূর্বোক্ত বাঙলা গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদ) (কলিকাতা, ১৮১৫ বা ১৮১৬)।

ইংরেজি: (১) Translation of an Abridgment of the Vedant ('বেদান্তসার' এর ইংরেজি অনুবাদ) (Calcutta, 1816); (২) Translation of the Kenopanishad (Calcutta, 1816); (৩) Translation of the Ishopanishad (Calcutta, 1816); (৪) Translation of the Mundukopanishad (Calcutta, 1819); (৫) Translation of the Kathopanishad (Calcutta, 1819)।

জার্মান: (১) Auflosung des Wedant ('বেদান্তসার'-এর জার্মান অনুবাদ) (Jena, 1817)।

ডাচ্: (১) Vertaling Van Verscheidene voorname Boeken Pladtsen en Teksten van de Veddas (Kampen, 1840); ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিচারমূলক রামমোহনের তেরোখানি পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি একত্র সংস্করণ 'Translation of Several Principal Books, Passages and Texts of the Veds, and of some Controversial Works in Brahmunical Theology' আখ্যায় লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সেটিরই ডাচ্ অনুবাদ রামমোহনের মৃত্যুর পরে উপরি-উক্ত নামে কাম্পেন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রদত্ত তালিকায় এ পর্যন্ত রামমোহনের শাস্ত্রানুবাদ ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রেণীর গ্রন্থগুলির নামই করা হয়েছে। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে তাঁর অধুনালুপ্ত ভগবদ্গীতার বাঙলা পদ্যানুবাদের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। গীতা তাঁর নিজের অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল।[২৯] তা ছাড়া তিনি বেদান্তশাস্ত্রপ্রচারের উদ্দেশ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদের সংস্কৃত বৃত্তিসমেত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন; ব্রহ্মসূত্রের সমগ্র শাংকর ভাষ্যও তিনি পৃথকভাবে মুদ্রিত করেন (কলিকাতা, ১৮১৮)।[৩০] রামমোহনের বাঙলা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উল্লেখ করেছেন, তিনি 'ছান্দোগ্য' ও 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্দ্বয়ও (সংস্কৃত মূল অথবা অন্যগুলির ন্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) প্রকাশ করেছিলেন,[৩১] কিন্তু এগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি। উপরি-উক্ত রচনাসমূহের মধ্যে প্রধানত বেদান্তের তত্ত্বব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তাঁকে বিভিন্ন প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। সেই বিচারগ্রন্থগুলিতে রামমোহনের তর্কপ্রতিভা বিশেষরূপে পরিস্ফুট। এগুলি যেন তাঁর সমগ্র বেদান্ত-আলোচনার তর্কপাদ। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে বাংলায় অন্তত চারটি উল্লেখের দাবি রাখে, যথা ১. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮১৬-১৭); ২. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮১৭); ৩. গোস্বামীর সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮১৮); ও ৪. কবিতাকারের সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮২০)। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর প্রধান দুখানি গ্রন্থ ১. A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for Idolatry, at Madras (কলিকাতা, ১৮১৭); ও ২. A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship (কলিকাতা, ১৮১৭)। এই গোত্রভুক্ত আরো কয়েকখানি বাঙলা-ইংরেজি পুস্তক-পুস্তিকা আছে, তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে সেগুলির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রয়োজনমত যথাস্থানে উল্লিখিত হবে। কিন্তু রামমোহন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বা তার্কিক ছিলেন না; বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদকে জীবনে রূপায়িত করবার প্রয়োজন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। সুতরাং ধর্মজীবন সংগঠনের জন্য তাঁকে একটি উপাসনা-প্রণালী উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। ব্রহ্মবাদের এই ব্যবহারিক দিকটি তাঁর অপর কতিপয় রচনার বিষয়, যথা, ১. প্রার্থনাপত্র (কলিকাতা, ১৮২৩); ২. ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (কলিকাতা, ১৮২৬); ৩. গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্ (কলিকাতা, ১৮২৭); ৪. ব্রহ্মোপাসনা (কলিকাতা, ১৮২৮); ৫. অনুষ্ঠান (কলিকাতা, ১৮২৯); ও ৬. ক্ষুদ্রপত্রী (কলিকাতা, ?)। এগুলির অনুরূপ কিছু রচনা

ইংরেজিতেও আছে, যেমন ১. Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God (কলিকাতা, ১৮২৩); ২. Translation of a Sanscrit Tract on different modes of Worship (কলিকাতা, ১৮২৫); ৩. A Translation into English of a Sanskrit Tract inculcating the Divine Worship; esteemed by those who believe in the revelation of the Veds as most appropriate to the nature of the Supreme Being (কলিকাতা, ১৮২৭); ও ৪. The Universal Religion: Religious Instructions founded on Sacred Authorities (কলিকাতা, ১৮২৯)। দেখা যাচ্ছে, তত্ত্বব্যাখ্যা, তর্কবিচার ও সাধন— মুখ্যত এই তিন ভূমিকে আশ্রয় করে রামমোহনের বেদান্ত-আলোচনা বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের যথাক্রমে এগুলির আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে।

রামমোহন বেদান্ত-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন শংকর, রামানুজ প্রমুখ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বেদান্তাচার্যগণের প্রদর্শিত পথ ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। এই চিরাচরিত ধারার সম্ভবত তিনিই শেষ বেদান্তভাষ্যকার। শ্রুতিপ্রামাণ্যের সম্পূর্ণ স্বীকৃতির উপরই এই ধারা প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়ে জনৈক আধুনিক মনস্বী সমালোচক যথার্থ বলেছেন: "…মহাত্মা রামমোহন রায়…একজন শাস্ত্রের অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন।…তিনি বেদ ও অন্যান্য সমুদায় শাস্ত্রের যথাযোগ্য মান্য রাখিয়া শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা আমারদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণে ইওরোপীয় দর্শনকারদিগের শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার এ দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু রামমোহন রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয় শাস্ত্রপ্রিয় ভারত-রাজ্য তাঁহার অর্ণবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে চিরকালের নিমিত্তে বঞ্চিত হইয়াছেন।"[৩২] এই বেদ-প্রামাণ্য ও আনুষঙ্গিক শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য রামমোহন কী অর্থে কতদূর স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা কিঞ্চিৎ বিচার করে দেখা আবশ্যক, কেননা বেদান্তমত স্থাপনে তাঁর সুবিখ্যাত পূর্বসূরিগণের মতোই তিনি শ্রুতিকে অন্যতম প্রমাণ হিসাবে বার বার উল্লেখ করেছেন।

তাঁর প্রথম জানিত রচনা আরবী-ফার্সীতে লিখিত 'তুহ্ফাৎ-উল্ মুওয়া্হিদিন্' এ (রচনাকাল আনুমানিক ১৮০৩-০৪) রামমোহন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কঠোর যুক্তিবাদীরূপে। ইসলামের যুক্তিবাদী মুতাজিলা ও মুওয়া্হিদিন্ সম্প্রদায়দ্বয়ের দ্বারা প্রভাবিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যদিও তিনি এক সার্বভৌম একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তবু কোনো প্রচলিত ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মগুরুকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন নি; অধিকন্তু প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্মের মূল সত্যের সঙ্গে কালক্রমে যে বহুল পরিমাণে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অলৌকিক গাল-গল্প ও পুরোহিততন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে ও ফলে ধর্মবিশ্বাসীদের ভাগ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জুটেছে প্রবঞ্চনা, নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা তা দেখিয়েছেন। কিন্তু উত্তর জীবনে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রের, বিশেষত উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা-বেদান্তের এই প্রস্থানত্রয়ের, গভীরতর আলোচনার ফলে তিনি ক্রমশ উপলব্ধি করেন বিভিন্ন দেশকালে বিভিন্ন ঋষি ও দ্রষ্টাদের প্রজ্ঞালব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যসকল ধর্মশাস্ত্রগুলিতে সঞ্চিত হয়ে আছে; অনুভূতিমূলক এই সত্য নিছক যুক্তির অগম্য। শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই রত্নের পাশে অবশ্য যুগে যুগে বহু আবর্জনাও জমা হয়েছে যেগুলি সর্বথা বর্জনীয়; কিন্তু রত্নগুলিকে অবহেলা করলে চলবে না। ধর্মের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হলে শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক সত্য ও যুক্তি, দুইয়েরই সমান প্রয়োজন— একটিকেও বাদ দেবার উপায় নেই। তাই প্রমাণ

হিসাবে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তিকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। বিচার প্রসঙ্গে নিছক শাস্ত্রনির্ভর মনোভাবের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদনপূর্বক তাঁকে নিম্নলিখিত বৃহস্পতি-বচন উদ্ধৃত করতে দেখা যায়[৩৩] :

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অপর পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিতর্কের পথেও যে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করা যায় না সে সম্পর্কেও তাঁর মনে পরবর্তীকালে কোনো সন্দেহ ছিল না। এর প্রমাণ রয়েছে কেনোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তাঁর এবংবিধ উক্তিতে: "When we look to the traditions of ancient nations we often find them at variance with each other; and when discouraged by this circumstance, we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is, alone, to conduct us to the object of our pursuit. We often find that, instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities, it only serves to generate a universal doubt incompatible with the principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is, neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other; but by a proper use of the lights furnished by both, endeavour to improve our intellectual and moral faculties, relying on the goodness of the Almighty Power, which alone enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for।"[৩৪] সুতরাং রামমোহনের পরিণত মতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যের স্বীকৃতি আছে— কিন্তু সে শাস্ত্রপ্রামাণ্য হবে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। এর সঙ্গে তিনি আর-একটি প্রমাণ স্বীকার করতেন যেটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন common sense বা সহজজ্ঞান বলে। শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মসাধনার পথে তিনি এই তিনের উপযুক্ত সংমিশ্রণকেই আদর্শ মেনেছেন! ইংলণ্ডে ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সম্বর্ধনার উত্তরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এই মত স্পষ্ট ব্যক্ত করেন: "There is a battle going on between reason, scripture and common sense, and wealth, power and prejudice. These three have been struggling with the other three; but I am convinced that your success, sooner or later, is certain।"[৩৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে রামমোহন উত্তরকালে তাঁর প্রথম জীবনের নিছক যুক্তিবাদ পরিত্যাগ করে শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ এককভাবে তাকে যথেষ্ট মনে করেন নি, যুক্তি ও সহজজ্ঞানের সঙ্গে শ্রুতিলব্ধ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যকে সমন্বিত করে নেবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আর-এক বিষয়েও এক্ষেত্রে রামমোহনের দৃষ্টি ভারতবর্ষীয় পূর্বাচার্যগণের অপেক্ষা উদার ও যুগোপযোগী ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বেদান্তাচার্যরা শাস্ত্র বলতে বুঝতেন মুখ্যত বেদকে ও গৌণত বৈদিক ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদিকে। তাঁদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের এই ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলকে কদাচ অতিক্রম করে নি। অপর পক্ষে রামমোহন অনুভব করেছিলেন, প্রজ্ঞালব্ধ আধ্যাত্মিক সত্য কখনো কোনো বিশেষ দেশ, কাল, জাতি বা গোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি হতে পারে

না; সর্বদেশে সর্বকালে এই সত্যদ্রষ্টাগণের আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কেবলমাত্র বৈদিক ঋষিগণেরই ছিল এমন কথা বলা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ও অযৌক্তিক সংকীর্ণ-দৃষ্টির পরিচায়ক; পৃথিবীর সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই এই সত্যোপলব্ধির পরিচয় আছে। তাঁর মুসলিম ও খ্রীস্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে আলোচনা-কালে তিনি ঐ সম্প্রদায়দ্বয়ের ধর্মশাস্ত্রগুলিকেও সমুচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, যেমন শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করেছেন বেদান্ত-আলোচনার বেলায়। এই অসাম্প্রদায়িক বিশ্বদৃষ্টি রামমোহনের শাস্ত্রপ্রামাণ্য-স্বীকারের বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, সর্বশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই তিনি শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানকে যুক্তি ও সহজবুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা ও মার্জনা করে নেবার উপদেশ দিয়েছেন।

রামমোহনের সুবিস্তীর্ণ রচনার মধ্যে শাস্ত্রপ্রামাণ্যকে যে ভাবে এবং যে পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে স্পষ্টত একটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রমনির্দেশের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ ভাবে ভারতের পূর্বতন বেদান্তাচার্যগণের অনুসরণ করলেও কোনো কোনো দিকে স্বকীয়তার পরিচয়ও দিয়েছেন। শাস্ত্র-প্রামাণ্য বিচারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব অনুসারে যে ভাবে ভাগ করা যেতে পারে তা সম্ভবত এই :

১. বেদই সর্বাধিক প্রামাণিক এবং শাস্ত্রাদির মধ্যে যা বেদবিরুদ্ধ বা বেদার্থপ্রতিস্পর্ধী তা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। দ্বিতীয় সংখ্যা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রে (১৮২১) তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই, যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ অর্থ কহে তাহা অপ্রমাণ।…হিন্দুদের পুরাণতন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন; বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়।" অতঃপর তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে স্মার্ত (রঘুনন্দন)-ধৃত নিম্নলিখিত বচন উদ্ধার করেছেন :

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্যং স্মার্তং বৈদিকবৎ সতা॥[৩৬]

২. রামমোহন-অবলম্বিত শাস্ত্রবিচারের দ্বিতীয় সূত্র হল, শ্রুতি বা বেদ শাস্ত্রহিসাবে সর্বাধিক প্রামাণিক হলেও বেদের জ্ঞানকাণ্ড (অর্থাৎ উপনিষদ) তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে তিনি মুণ্ডকোপনিষদ (১.১.৫) উদ্ধৃত করেছেন: "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ; তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি; অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"— বিদ্যা দুই প্রকার হয় জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন; এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয়; তাহার মধ্যে ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয়; আর অপরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর, অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানা যায় সে কেবল বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ হয়েন।"[৩৭] এখানে শ্রুতিপ্রমাণের সাহায্যে তিনি বলতে চেয়েছেন, বেদের যাগযজ্ঞাদি বাহ্য অনুষ্ঠান বিষয়ক ও স্বর্গাদি ফললাভ বিষয়ক উপদেশসম্পন্ন অংশগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট; এগুলি শ্রুতির ভাষায় অপরা বিদ্যা মাত্র। সেই বিদ্যাই পরা বা শ্রেষ্ঠ যার দ্বারা অক্ষর পুরুষ বা ব্রহ্মকে জানা যায়। পরা বিদ্যা বলতে উপনিষদকে বুঝতে হবে; সুতরাং শ্রুতির অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষদই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মান্য। রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বিশেষভাবে শংকরমতের দ্বারা প্রভাবিত এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। শংকর বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও তাঁর বেদান্তভাষ্যের মুখ-

বন্ধে তাকে অবিদ্যাধীন, অধ্যাসমূলক ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী রূপে বর্ণনা করেছেন।[৩৮] উপরন্তু শংকর শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণের উপর নির্ভর করে এমনও বলেছেন যে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কোনো একটি বিশেষ আশ্রম যিনি অবলম্বন নাও করেছেন এমন ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে রামমোহনকেও শংকরের প্রতিধ্বনি করতে দেখা যায়।[৩৯] মুখ্যত এই সমস্যা নিয়েই দক্ষিণী পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের শাস্ত্রার্থ হয়েছিল। শাস্ত্রীর বক্তব্য ছিল, বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হতে পারে না। উত্তরে রামমোহন শাস্ত্রপ্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন, "ইহা সর্বথা অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রমকর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।"[৪০] সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান যে শ্রৌতকর্মনিরপেক্ষ হতে পারে এ বিষয়ে রামমোহন সুনিশ্চিত ছিলেন এবং শংকরের মতো এই জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠতায় দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন।

৩. রামমোহন বেদান্তব্যাখ্যায় শ্রুতিপ্রমাণপ্রয়োগপ্রসঙ্গে তৃতীয় যে সূত্র স্বীকার করেছেন তাকে শংকর-রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের অনুসরণে বলা যেতে পারে শ্রুতির একবাক্যতা। উপনিষদ্‌গুলি বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার মূলাধার হলেও ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে আপাতদৃষ্টিতে কিছু কিছু পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তও বর্তমান। কোথাও বা সগুণ উপাসনা, কোথাও বা নির্গুণ উপাসনা ব্যাখ্যাত হয়েছে। কোথাও বা সৃষ্ট বস্তু বা দেবতাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র শ্রুতিকে তর্কাতীত প্রমাণ গণ্য করতে হলে এই-সব আপাত-অন্তর্বিরোধের নিরসন হওয়া আবশ্যক। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই আসে শ্রুতির একবাক্যতা স্বীকার। এই দৃষ্টিতে তত্ত্বগত ভাবে সমগ্র বেদ এক অখণ্ড ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্ত্র। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে সংগতি রক্ষা করাই এই মতাবলম্বীগণ কর্তব্য মনে করেন। শংকর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রায় সর্বত্র নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের সমর্থনে বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রভূত যত্ন করেছেন। এ ক্ষেত্রে রামমোহনের বক্তব্য ছিল, সকল বেদের প্রতিপাদ্য একমাত্র পরব্রহ্ম; শ্রুতিবাক্যের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নির্বাচন করে প্রাধান্য দিলে সেগুলির তাৎপর্যের সঙ্গে শ্রুতিবাক্যের সামগ্রিক তাৎপর্যের অসংগতি ঘটতে পারে। শ্রুতিসাক্ষ্যের মধ্যে এই স্ববিরোধ এড়াবার উদ্দেশ্যে রামমোহন একাধিক স্থলে বলেছেন, শ্রুতিতে যেখানে আপাতবিচারে সগুণ বা সাকার উপাসনার কথা বলা হয়েছে বলে ধারণা হয়, সেই সকল অংশ প্রকৃতপক্ষে বহুদেবোপাসনাবাচক নয়; ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যেই সেখানে সীমিত বস্তুকে ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে; যেমন, "বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হয়েন।··· যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হয়েন ইহার উত্তর এই: অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক যে এমত কথনের দ্বারা ওই দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই, যেহেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বকথন দেখিতেছি সেইরূপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে স্থানে বেদে ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন আছে; এ সকলকে ব্রহ্মকথনের তাৎপর্য বেদের এই হয় যে ব্রহ্ম সর্বময় হয়েন, তাহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায়; পৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য নহে এই মত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন···।"[৪১] সুতরাং দেখা গেল শংকর যেমন উপনিষদ্-সমূহের একবাক্যতা প্রতিপাদনকল্পে যুক্তিসহকারে প্রমাণ করবার

চেষ্টা করেছেন, উপনিষদ্‌সিদ্ধান্তমাত্রই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের পরিপোষক, রামমোহনও অনুরূপভাবে স্থাপন করবার প্রয়াস পেয়েছেন শ্রুতিবাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সর্বত্র পরব্রহ্মের অখণ্ডত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার। মুখ্যত প্রচলিত প্রতিমাপূজার সমর্থকগণের সঙ্গে তাঁকে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল বলেই তাঁর উক্তিতে একতত্ত্ব-বাদ অপেক্ষা স্থানে স্থানে একেশ্বরবাদের উপর ঝোঁক কিছু বেশি পড়েছে; কিন্তু মূলত তিনি যে একতত্ত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তার প্রমাণ 'তাহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায়' তাঁর পূর্বোদ্ধৃত এই উক্তির মধ্যেই আছে।

৪. রামমোহন-নির্দিষ্ট শাস্ত্রবিচারের পরবর্তী সূত্রটি পুরাণতন্ত্রাদি বেদোত্তরকালে রচিত গ্রন্থসমূহের প্রামাণ্যবিষয়ক। এই ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন পুরাণ ও তন্ত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে দুটি ভাগ আছে। এক অংশে এগুলিতে উপনিষদের মতোই ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে; অন্যত্র অবশ্যই সাকার দেবতার ও সাকারোপাসনার সুবিস্তীর্ণ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বর্তমান। কিন্তু এই-সকল গ্রন্থেই আবার বার বার বলা হয়েছে যে দ্বিতীয়োক্ত স্থূল বর্ণনা কেবল তাঁদেরই জন্য যাঁরা চিত্তের দুর্বলতাহেতু নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করতে অশক্ত। শ্রুতিবিরুদ্ধ না হলে তন্ত্রপুরাণের উক্ত প্রথম অংশ অবশ্য মান্য; এবং শাস্ত্রবাক্যসমূহের সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য মনে করতে হবে দ্বিতীয় অংশে প্রদত্ত সাকারোপাসনার বিধান কেবলমাত্র নিম্নাধিকারীগণের জন্য। এ সম্পর্কে 'ঈশোপনিষদ'এর ভূমিকায় রামমোহনের উক্তি অতি স্পষ্ট: "যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদির উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন। তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন; তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক; পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।...অতএব বেদপুরাণতন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্বলাধি-কারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এইরূপ শত শত বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন।"[৪২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রুতিসম্মত হলে পুরাণতন্ত্রের প্রামাণ্য মানতেও রামমোহনের আপত্তি ছিল না; অধিকন্তু তিনি অধিকারীভেদের তত্ত্বও স্বীকার করেছেন। উক্ত দুই বিষয়েই তাঁর দৃষ্টি ভারতবর্ষের পূর্বতন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা আচার্যগণেরই অনুরূপ। কিন্তু শাস্ত্র হিসাবে পুরাণতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাতে বিপদ আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত অনেক গ্রন্থ পুরাণ ও তন্ত্রের ছাপ নিয়ে ঐ দুই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। নির্ভরযোগ্য প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এই প্রামাণ্যবিহীন অর্বাচীন গ্রন্থ-সমূহকে পৃথক করবার উপায় কী? রামমোহনের প্রখর ও সতর্ক মনীষা সেই নিমিত্ত কোনো পুরাণ বা তন্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্যবিচারের যে দুটি মানদণ্ড নির্ণয় করেছিল তা এই: ১. গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্যের প্রথম লক্ষণ, তার টীকা থাকবে; ২ দ্বিতীয় লক্ষণ, তার বচন নিবন্ধাদি সংগ্রহগ্রন্থে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত থাকবে। তাঁর উক্তি অনুসারে: "...ইহা বিশেষরূপে জানা কর্তব্য যে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই; সেইরূপ মহাপুরাণ, পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার; এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির

টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনাদির ধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য ; অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমৎ নহে ; অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা আছে ; কোনো কোনো পুরাণতন্ত্রাদি একদেশে চলিত আছে অন্যদেশীয়রা তাহাকে কাল্পনিক কহেন, বরঞ্চ একদেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন কতক লোক নবীনকৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব সটীক কিম্বা মহাজনধৃত পুরাণতন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন।[৪৩] যে গ্রন্থের টীকা রচিত হয়েছে অথবা স্মৃতিকারগণ যার বচনকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন তার গুরুত্ব ও প্রামাণ্য ঐ টীকা বা উদ্ধৃতির মাধ্যমে তর্কাতীতরূপেই বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃত হয়েছে— এ কথাই এখানে রামমোহনের বলবার উদ্দেশ্য। শাস্ত্রপ্রামাণ্য-বিচারের এই মানদণ্ড আধুনিক বিচারশীল মনের সৃষ্টি। শাস্ত্রের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও শাস্ত্রগ্রন্থ নির্বাচনে রামমোহন কী পরিমাণ স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তাঁর এই আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগই এর প্রমাণ। এই সতর্কতা পূর্বতন আচার্যগণের সকলের মধ্যে সর্বদা লক্ষ্য করা যায় না।

৫. রামমোহন শাস্ত্রবিচারের অপর এক সূত্ররূপে স্বীকার করেছেন, স্মৃতিসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতির প্রামাণ্যই সর্বাধিক কেননা মনু বেদার্থের সংগ্রহকর্তা। এই প্রসঙ্গে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি বলেন: "বেদদ্বেষকারি জৈন ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত ভারতবর্ষে নানা শাখাবিশিষ্ট বেদের সমুদায় প্রাপ্তি হইতেছে না ; কিন্তু এই দৌর্ভাগ্য প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে-যদ্বৈ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং— 'যাহা কিছু মনু কহিলেন তাহাই পথ্য হয়', অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয়প্রকার বেদার্থ মনুগ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে অনুষ্ঠানে বেদবিহিত অনুষ্ঠানের সিদ্ধি হয়।"[৪৪] অন্যত্রও এ বিষয়ে তাঁর উক্তি অতি স্পষ্ট: "বেদার্থবিবরণকর্তা যত মুনি তাঁহাদের মধ্যে ভগবান মনু সকলের প্রধান ; তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয়, যেহেতু বৃহস্পতি কহেন: 'মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ণপ্রশস্যতে'—মনু অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে…।"[৪৫] মনুস্মৃতিকে এই বিশেষ মর্যাদা-প্রদানের ব্যাপারেও রামমোহন সাধারণভাবে পূর্বতন আচার্যদেরই অনুগামী ছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রামমোহন শাস্ত্রপ্রমাণের সঙ্গে সত্যস্থাপনের আর দুটি যে উপায় স্বীকার করেছেন তা হল যুক্তি (reason) ও সহজ বুদ্ধি (common sense)। এ ক্ষেত্রে সর্বত্র তিনি প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্যগণ -অবলম্বিত পরিভাষা ব্যবহার করেন নি। শংকর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সিদ্ধান্তে পরস্পরবিরোধী হলেও তাঁরা মূলত যে প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন সেগুলি ছিল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি।[৪৬] এর মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণের স্থান সর্বোচ্চ। শংকর স্পষ্টই বলেছেন, শ্রুতিসাক্ষ্যই ব্রহ্মের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ, তর্ক বা অপর কিছু নয়।[৪৭] তথাপি উক্ত আচার্যগণ যুক্তিতর্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি। তাঁদের দৃষ্টিতে সমস্ত প্রমাণই তর্কসাহায্যনির্ভর। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শ্রুতির বৈশিষ্ট্য আছে ; শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ ; সুতরাং যুক্তিতর্ক হবে শ্রুতির অধীন। শ্রুতির পক্ষে যুক্তির সাহায্য সর্বদা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু যুক্তি কখনো শ্রুতিকে অতিক্রম করতে পারবে না ; শ্রুতির সহায়করূপে শ্রুতির অধীন থেকে তাকে চলতে হবে। রামানুজের মতে সকল প্রমাণের পক্ষেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক ; যদিও শ্রুতিপ্রমাণ অপর কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় এবং এর বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়জগতের অতীত, তথাপি এর পক্ষে সর্বদা তর্কের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।[৪৮] দেখা যাচ্ছে, আচার্যগণ প্রমাণ ও তর্কের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করলেও, স্বতন্ত্রভাবে এদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; শ্রুতিপ্রমাণকে শ্রেষ্ঠ ও স্বতঃসিদ্ধ গণ্য করেছেন; এবং তর্ককে প্রণালীহিসাবে সবকটি প্রমাণের একান্ত সহায়ক বলে নির্দিষ্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শ্রুতির অধীনরূপে সীমিত করতেও দ্বিধা করেন নি। বেদান্ত-সম্পর্কিত রামমোহনের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনিও প্রাচীন আচার্যগণের মতো শ্রুতি ভিন্ন প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে দুটি অতিরিক্ত প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।[৪৯] কিন্তু উক্ত প্রমাণদ্বয় সম্পর্কে কোথাও তিনি স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে যান নি। অপর পক্ষে সত্যস্থাপনে যুক্তিতর্কের আবশ্যিকতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় শাস্ত্রবিচারে যুক্তিতর্কের অবতারণা ও জীবনের নানা লৌকিক সমস্যার সমাধানকল্পে সমগ্রভাবে যুক্তির প্রয়োগ— এই দুইয়ের মধ্যে রামমোহন স্পষ্টত প্রভেদ করেছেন। প্রাচীন আচার্যগণের মতোই তিনি মানতেন আধ্যাত্মিক জীবনে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মূল্যই সর্বাধিক; শ্রুতি সেই অভিজ্ঞতার আধার হিসাবে সর্বাগ্রে ও সর্বতোভাবে গ্রাহ্য; সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য তর্কের ব্যবহার সেখানে স্বভাবত হবে সীমিত ও শ্রুতির অনুগত। স্বরচিত বেদান্তভাষ্যে তিনি এই হেতু বলেছেন: "তর্ক কেবল বুদ্ধিসাধ্য এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই, অর্থাৎ স্থৈর্য নাই; অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে নাই; যদি তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক··· অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই।"[৫০] অন্যত্র এ বিষয়ে তাঁর উক্তি: "যেখানে যেখানে তর্কের নিষেধ আছে সে বেদবিরুদ্ধ তর্ক জানিবে; কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্বথা নির্ণয় করা কর্তব্য···।"[৫১] কিন্তু এ তো গেল আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা যেখানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই জিজ্ঞাসু মানুষের আরোহণের শেষ ভূমি। লৌকিক জীবনের শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কিত দুরূহ সমস্যাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণেরও কি একই মানদণ্ড? সেখানেও কি শ্রুতিপ্রমাণকে সর্বাগ্রে স্থাপন করে যুক্তিকে তার পশ্চাদনুসরণ করানোই হবে বিধি? এই প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে পূর্বতন ভারতীয় আচার্যগণের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল। শংকর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের জগৎ ছিল সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জগৎ। মানুষের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভিন্ন অন্য কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁরা অন্বেষণ করেন নি। অপর পক্ষে রামমোহনের মানস ছিল নবযুগের নূতন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকস্নাত; তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা ছিল নিছক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অপেক্ষা শতগুণে ব্যাপকতর— যার মধ্যে তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তি ও ইহলৌকিক কল্যাণকে তুল্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। এ হল রেনেশাঁস বা নবজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক যুগোপযোগী জীবনাদর্শ, মধ্যযুগের ভারতবর্ষীয় বেদান্তাচার্যগণের কল্পনায় যা আসে নি। সেই কারণে তিনি শেষোক্তগণের নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অনুসন্ধানপ্রণালী লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে কখনো প্রয়োগ করেন নি। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতির সহিত জড়িত সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও সমাধানের প্রসঙ্গে তাঁকে কোথাও শাস্ত্রপ্রমাণের দোহাই দিতে দেখা যায় না। এখানে তিনি পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী। এই যুক্তিবাদে তাঁর প্রথম দীক্ষা ইসলামের মুতাজিলা ও মুওয়াহিদিন্ সম্প্রদায়দ্বয়ের শাস্ত্র থেকে। উত্তরকালে এই মনোভাব পুষ্ট ও সম্প্রসারিত হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবন তাঁর নিকট ছিল দুই স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। অবশ্য যৌবনে রচিত 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন্' গ্রন্থে তিনি যুক্তিবাদের প্রয়োগকালে এই দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা টানেন নি— নির্বিচারে শাস্ত্রপ্রমাণকে অস্বীকার করে নিছক যুক্তির সাহায্যে জীবনের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় দিকেরই বিচার করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে আধ্যাত্মিক

অভিজ্ঞতা ও অনুভবের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণকে প্রধান ও যুক্তিকে তার সহায়ক গণ্য করেন ; কিন্তু লৌকিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পূর্বের ন্যায়ই যুক্তির সার্বভৌমত্বে তাঁর আস্থা অটুট ছিল। সেখানে শাস্ত্রপ্রমাণের কোনো স্থান ছিল না। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জিজ্ঞাসাদ্বয়ের প্রকৃতিগত প্রভেদ ও উভয়ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রণালীদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তাঁর এই সচেতন মনোভাবের উৎস নিঃসন্দেহে তাঁর স্বীকৃত তৃতীয় উপায়— যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'সহজ বুদ্ধি' বা common sense। একে স্বতন্ত্র প্রমাণ বা তর্ককৌশল হিসাবে পূর্ববর্তী ভাষ্যকারেরা কোনো স্থান দেন নি। এর স্বীকৃতি রামমোহনের আধুনিক যুগোপযোগী পরিপূর্ণ জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মুখ্যত যে গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে রামমোহন বৈদান্তিক তত্ত্বব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন— তা হল পাঁচখানি উপনিষদের ভূমিকাসহ অনুবাদ ; ব্রহ্মসূত্রের 'বেদান্তগ্রন্থ' শীর্ষক ভাষ্য ও 'বেদান্তসার' নামধেয় তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ; ও ভগবদ্‌গীতার ছন্দোবদ্ধ বঙ্গানুবাদ। এর মধ্যে গীতার অনুবাদখানি পাওয়া যায় নি। সুতরাং তত্ত্বব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনের মূল্যায়ন তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও অনূদিত উপনিষদ্‌গুলির সাহায্যেই করতে হবে ; অবশ্য প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচারমূলক তাঁর গ্রন্থগুলি থেকেও এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাবে। পূর্বেই নানা সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রামমোহন যখন বেদান্তের ব্যাখ্যা ও প্রচারে প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজে বেদান্তের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হলেও তার ধারা ছিল অতি ক্ষীণ। প্রকাশ্য বেদান্ত আলোচনায় বা বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে রচনা প্রকাশে, পণ্ডিতগণের মধ্যে অত্যল্পসংখ্যক যাঁরা উক্ত শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন— তাঁরাও ছিলেন স্পষ্টত অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে ইয়োরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌মহলেও তখন পর্যন্ত ব্যাপক উদ্যম দেখা যায় না। উপনিষদ্‌কে বেদান্তশাস্ত্রের শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়। রামমোহন কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বে— অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে— সার উইলিয়ম জোন্‌স ঈশোপনিষদের একখানি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।[৫২] এর কিছুকাল পরে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক উইলিয়ম কেরী তাঁর ইংরেজিতে রচিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে সংস্কৃত পদবিন্যাসপ্রকরণের অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজি অনুবাদসহ ঈশোপনিষদ্‌খানি মুদ্রিত করেন।[৫৩] একখানিমাত্র উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করে এই দুটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে রামমোহনের পূর্বে এ দেশে উপনিষদ্ প্রচারের অপর কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। এ কথাও স্মরণীয়, জোন্‌স বা কেরী উপনিষদ্‌তত্ত্বের কোনো ব্যাখ্যা বা আধুনিক যুগপরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা তাঁদের অনুবাদের সঙ্গে যোগ করেন নি। ভারতে উপনিষদ্‌চর্চার যে ধারা শংকর প্রমুখ বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের মাধ্যমে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রবাহিত তার সঙ্গেও এঁদের পরিচয়ের কোনো প্রমাণ নেই। কোনো ভাষ্যেরই তাঁরা উল্লেখ করেন নি। অন্য পক্ষে রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল উপনিষদ্-প্রোক্ত ব্রহ্মবাদকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রভাবে জাতির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন সাধন। 'ঈশোপনিষৎ'এর বঙ্গানুবাদের মুখবন্ধে তিনি স্পষ্ট বলেছেন: "এই সকল উপনিষদ্‌কে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া তাহার অর্থকে পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে ইহার তাৎপর্য বোধ হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ অর্থবোধ হইতে পারে না ; অতএব নিবেদন ইহার অর্থে যথার্থ মনোযোগ করিবেন।"[৫৪] বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থানরূপে পরিচিত ভগবদ্‌গীতা রামমোহনের কালে উপনিষদ্ অপেক্ষা

কিছু অধিক পরিমাণে অনুশীলিত হত যদিও টোল চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত বেদান্তের পাঠক্রমে যে এর বিশেষ কোনো স্থান ছিল না তা আমরা পূর্বে দেখেছি। পাশ্চাত্ত্য প্রাচ্যবিদ্‌গণের মধ্যে চার্লস উইলকিন্স ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে গীতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া রামমোহনের উক্তি থেকেই জানা যায়, তাঁর সময়ে তাঁর নিজের অধুনালুপ্ত অনুবাদ ভিন্ন এর কয়েকটি বাংলা ও হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রচলিত ছিল।[৫৫] কিন্তু আধুনিক যুগে ব্রহ্মবাদের স্থাপনে ও সামাজিক প্রশ্নের বিচারে বেদান্তের অঙ্গরূপে রামমোহন তাঁর অন্যান্য বিচারগ্রন্থসমূহে গীতার তত্ত্ব যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন সে প্রণালী এক দিকে পূর্ববর্তী শংকর রামানুজ প্রভৃতি বিখ্যাত আচার্যগণকে ও অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র অরবিন্দ টিলক প্রভৃতি উত্তরকালীন মনস্বী গীতাভাষ্যকারগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাদরায়ণ-রচিত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তশাস্ত্রের ন্যায়প্রস্থানরূপে প্রসিদ্ধ। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে রামমোহনই ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ভাষ্যকার। তাঁর পূর্বে প্রাচীন ধারায় ব্রহ্মসূত্রের শেষ ভাষ্য রচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওড়িশাবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বা সিদ্ধান্তের দিক থেকে বলদেব ছিলেন সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয়—তাঁর সঙ্গে রামমোহনের দূরতম সাদৃশ্যও ছিল না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করেন রামমোহনের অনেক পরে। বস্তুত সব দিক বিচার করলে স্বীকার করতে হয় বেদান্ত অধ্যয়ন ও এর তত্ত্বব্যাখ্যার পথে রামমোহনকে পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে প্রায় একক প্রচেষ্টায় অগ্রসর হতে হয়েছিল। দেশীয় বা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতসমাজে তখন পর্যন্ত প্রকাশ্য বেদান্তচর্চার এক স্বাভাবিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং এই সহায়ক পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান থাকলে এই ক্ষেত্রে তাঁর অধ্যয়ন, অনুশীলন, মনন, চিন্তন ও প্রচার যত স্বচ্ছন্দ হতে পারত, তা হয় নি। এই কারণেই বেদান্তশাস্ত্রে যে সুবিস্তীর্ণ অধ্যয়ন, অনায়াস অধিকার ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁর গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় তা অতি বিস্ময়কর মনে হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে বেদান্তের যুগোপযোগী নূতন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন অতি গভীরভাবে অনুভব করলেও রামমোহন এই ব্যাখ্যার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে বেদান্তের প্রাক্তন আচার্যগণের নির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসারী। শেষোক্তগণের মধ্যে শংকরের প্রভাবই তাঁর উপর সর্বাধিক। কি উপনিষদের অনুবাদে, কি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে শংকরের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করেছেন, যদিও শংকরের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যও লক্ষণীয়। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ও কেন, ঈশ, কঠ ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত শংকরের নামোল্লেখ করতে দেখা যায়।[৫৬] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক রামমোহন ব্রহ্মসূত্রের যে পাঠ গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে শংকর-অবলম্বিত পাঠের ঈষৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত সূত্রগুলির সংখ্যা সম্পর্কে ভাষ্যকারগণ অবশ্য একমত নন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই সূত্রসংখ্যা পাঁচশো পঞ্চাশ। রামমোহনও সে কথা জানতেন এবং অন্তত দুই স্থানে এই প্রথাগত ধারণার উল্লেখ করেছেন।[৫৭] কিন্তু কার্যত ভাষ্যরচনাকালে তিনি সূত্রসংখ্যা ধরেছেন পাঁচশো আটান্ন। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা এক নিম্বার্ক ভিন্ন কোনো ভাষ্যকারই সূত্রের সংখ্যা পাঁচশো পঞ্চাশ ধরেন নি, কেউ নিয়েছেন বেশি, কেউ কম।[৫৮] শংকরের হিসাবে সূত্রসংখ্যা পাঁচশো পঞ্চান্ন। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এই পাঠভেদ অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কখনো দেখা যায় কোনো ভাষ্যকার একটি সূত্রকে দুই ভাগে

বিভক্ত করে দুটি পৃথক সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন ; কোথাও বা একটি বিশেষ সূত্রের শেষ শব্দটি পরবর্তী সূত্রের প্রথমে যুক্ত হওয়ায় দুটি সূত্রের পাঠই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। এতে মাঝে মাঝে ভাষ্যকারগণের মধ্যে নিজ নিজ মতানুযায়ী ব্যাখ্যার তারতম্যও ঘটেছে। শংকর তাঁর ভাষ্যে সম্ভবত এই কথা মনে রেখেই বলেছেন, এক ভাষ্যকারের মতে যেটি সিদ্ধান্ত, অপরগণের মতে সেইটিই পূর্বপক্ষ।[৫৯] ব্রহ্মসূত্রের শংকর-অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে রামমোহন-গৃহীত পাঠের পার্থক্য নিম্নরূপ :

১. রামমোহন-ভাষ্য : ২. ৩. ১৯ : 'যুক্তেশ্চ' ; শাংকর-ভাষ্যে এই সূত্র নেই।

২. শাংকর-ভাষ্য : ২. ৪. ৩ : 'তৎ প্রাক্ শ্রুতেশ্চ' ; রামমোহন-ভাষ্যে এই সূত্র নেই।

৩. রামমোহন-ভাষ্য : ৩. ২. ২৫ : 'প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্' ; ৩. ২. ২৬ : 'প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ' ; শাংকর-ভাষ্য : ৩ ২. ২৫এ এই দুটি সূত্রকে একত্রে করে একটি সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে : 'প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ' ; সুতরাং রামমোহনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ২৬ -সংখ্যক সূত্রটি অতিরিক্ত দাঁড়াচ্ছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য দ্বৈতবাদী আচার্য মধ্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণকেও ৩. ২. ২৫ -সংখ্যক সূত্রটিকে অনুরূপ ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করতে দেখা যায়। রামমোহন এই পাঠ অনুসরণ করেছিলেন।

৪. রামমোহন-ভাষ্য : ৩. ২. ৪৩. 'মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং' ; শাংকর-ভাষ্যে এই সূত্র নেই।

৫. রামমোহন-ভাষ্য : ৩. ৩. ৩ : 'স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ' ; ৩. ৩. ৪ : 'শরবচ্চ তন্নিয়মঃ॥ সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' ; শাংকর-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের রামমোহন-প্রদত্ত চতুর্থ সূত্রটি স্বতন্ত্রভাবে ধরা হয় নি। শংকর এই পাদের তৃতীয় সূত্রের যে পাঠ দিয়েছেন তা এই : 'স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ।' এই সূত্রটির পাঠ সম্পর্কে ভাষ্যকারগণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। রামানুজধৃত পাঠ শংকরের সঙ্গে মেলে। অপর পক্ষে ভেদাভেদবাদী ভাষ্যকার ভাস্কর 'সববচ্চ তন্নিয়মঃ' অংশের স্থলে পড়েছেন 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ'। দ্বৈতবাদী মধ্ব 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' অংশটিকে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ সূত্ররূপে উল্লেখ করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যায় 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' এই পাঠান্তরের ঐতিহ্য যথেষ্ট প্রাচীন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী বলদেব বিদ্যাভূষণ শংকর অবলম্বিত ৩. ৩. ৩. সংখ্যক সূত্রটিকে বিভক্ত করে দুটি সূত্রে পরিণত করেছেন, যথা : 'স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ' (৩. ৩. ৩.) ; ও 'সববচ্চ তন্নিয়মঃ' (৩. ৩. ৪), যার সঙ্গে রামমোহন-কৃত উক্ত সূত্রবিভাগের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রামমোহন অবলম্বিত পাঠ বিচার করলে দেখা যায় তিনি শংকর প্রদত্ত সূত্রটিকে (৩. ৩. ৩.) দ্বিখণ্ডিত করে তার শেষাংশ (শরবচ্চ তন্নিয়মঃ) পরবর্তী চতুর্থ সূত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং চতুর্থ সূত্রের শেষাংশরূপে গ্রহণ করেছেন ভাস্কর ও মধ্ব প্রদত্ত অপর একটি সূত্র বা সূত্রাংশ (সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ)। সুতরাং তাঁর ভাষ্যে সমগ্রটি একটি অতিরিক্ত সূত্র হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে হয়, রামমোহন-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ সূত্রের প্রথমাংশ রূপে তাঁর গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে যা মুদ্রিত হয়েছে তা স্পষ্টত মুদ্রণ-প্রমাদ। অংশটির প্রকৃত পাঠ 'শরবচ্চ তন্নিয়মঃ' নয়, 'সববচ্চ তন্নিয়মঃ'। 'সব' শব্দটি এখানে অথর্ববেদাধ্যায়ীগণ অনুষ্ঠিত সৌর্য হতে শতৌদন অবধি সাতটি হোমক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সকল ভাষ্যকারই এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। রামমোহনও যে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নন তা তাঁর এই

সূত্রাংশের বাংলা ভাষ্য থেকেই প্রমাণিত হয়[৬০] : 'শর [?] অর্থাৎ সপ্ত হোম যেমন আথর্বণিকদের নিয়ম সেইরূপ মুণ্ডকাধ্যয়নেতে শিরোঙ্গারব্রতের নিয়ম হয়।' 'শর' শব্দটি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অর্থহীন। মূল পাণ্ডুলিপিতে যে সংস্কৃতে বাংলায় উভয়ত্র 'সব' শব্দ ছিল অর্থব্যাখ্যার সঙ্গে সূত্রাংশটি মিলিয়ে পড়লে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দুঃখের বিষয় রামমোহন-গ্রন্থাবলীর কোনো সম্পাদকই মুদ্রিত গ্রন্থে মূল ও ভাষ্যের এই বিরোধ লক্ষ্য করেন নি এবং তদনুযায়ী প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের প্রয়াস পান নি।

৬. এ ভিন্ন আরো কয়েকটি সূত্রে শংকর ও রামমোহনের মধ্যে পাঠের সামান্য তারতম্য লক্ষিত হয় যেমন, শংকর (৩. ২. ১৮) : 'অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ'; রামমোহন (৩ ২. ১৮) : 'অত এবোপমা সূর্যকাদিবৎ'; শংকর (৩. ৩. ৮) : 'সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তদপি'; রামমোহন-ভাষ্যে এটি পরবর্তী সূত্র (৩. ৩. ৯) : 'সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি'; শংকর (৩. ৩. ৬৬) : 'দর্শনাৎ'; রামমোহন-ভাষ্যে এটি পরবর্তী সূত্র (৩. ৩. ৬৭) : 'দর্শনাচ্চ'; ইত্যাদি। এগুলি 'চ-বা-তু'র গুরুত্বশূন্য অকিঞ্চিৎকর পার্থক্যমাত্র।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী বেদান্তভাষ্যকারগণের মধ্যে আচার্য শংকরকে সর্বাধিক মান্য করলেও, রামমোহন ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশকালে ব্রহ্মসূত্রের যে পাঠ অবলম্বন করেছিলেন তা সর্বাংশে শংকর-প্রদত্ত পাঠ নয়। কোনো কোনো স্থলে তাঁর পাঠ বা সূত্রবিভাগ ভাস্কর মধ্ব ও বলদেব বিদ্যাভূষণের সঙ্গেও মিলছে। এটি অবশ্য আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মধ্ব-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং ওড়িশার অধিবাসী বলদেব তো স্বয়ং ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই ভাষ্যকার। রামমোহন যেখানে বেদান্তচর্চা করেছিলেন, সেই পূর্বভারতে, এই দুই আচার্য সম্যক্ পরিচিত ছিলেন, ও অনুমান করতে বাধা নেই তাঁদের ভাষ্যদ্বয়েরও— অন্তত পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে— বহুল প্রচলন ছিল। সেহেতু তাঁদের অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান রামমোহনের পরিচয় থাকবে এটা স্বাভাবিক, যদিচ ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের রামমোহন ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মনে হয়, মূলত এ বিষয়ে রামমোহনের মনে কিছু অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল এবং শংকর-অবলম্বিত ব্রহ্মসূত্রের বিশুদ্ধ পাঠের অন্বেষণে তিনি তাঁর স্বীয় বেদান্তভাষ্য প্রকাশের (১৮১৫) পরেও বিরত হন নি। এই প্রচেষ্টাই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বহু অনুসন্ধানে ও যত্নে সমগ্র শাংকর-ভাষ্য সমেত ব্রহ্মসূত্রের একটি সুবৃহৎ সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করতে। দেখা যায়, এই গ্রন্থে তিনি আদ্যোপান্ত শংকর-অবলম্বিত ব্রহ্মসূত্রের পাঠই অবলম্বন করেছেন এবং এখানে সূত্রসংখ্যাও স্বভাবত পাঁচশো পঞ্চান্ন। যতদূর জানা যাচ্ছে ব্রহ্মসূত্রের শংকর-কৃত সুবিখ্যাত ভাষ্যের এটিই সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ এবং এর সম্পাদনা ও প্রকাশ রামমোহনের এক অক্ষয় কীর্তি।[৬১] মনে রাখতে হবে, ব্রহ্মসূত্রের পাঠ সম্পর্কে শংকর ও রামমোহনের পারস্পরিক পার্থক্যের সবগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভাষ্যকারগণের মধ্যে এই জাতীয় পাঠভেদ অভূতপূর্বও নয়। তবে সমগ্র বিচারে রামমোহন-অবলম্বিত 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' (৩. ৩. ৪) পাঠের যে তাঁর নিজস্ব তত্ত্বসিদ্ধান্তের দিক দিয়ে কিছু গুরুত্ব ছিল, আলোচনা-প্রসঙ্গে তা দেখা যাবে।

তত্ত্বব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনকে বিচার করতে অগ্রসর হলে প্রথমেই আচার্য শংকরের প্রতি তাঁর অতি সশ্রদ্ধ মনোভাব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার প্রথম কারণ নিশ্চয় এই যে প্রাক্তন বেদান্তাচার্যগণের

ধধৃতস্বভাবানামযথাবধৃতস্বভাবত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং জীবাদিষু পদার্থেষ্বেকস্মিন্ ধর্ম্মি
ণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োর্বিরুদ্ধয়োরসম্ভবাৎ সত্ত্বে চৈকস্মিন্ ধর্ম্মেঽসত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরস্যাসম্ভবা
দসত্ত্বে চৈবং সত্ত্বস্যাসম্ভবাদসঙ্গতমিদমার্হতং মতং । এতেনৈকানেকনিত্যা
নিত্যব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তাদ্যনেকান্তাভ্যুপগমা নিরাকৃতা মন্তব্যাঃ । যত্তু পুদ্গল
সংজ্ঞকেভ্যোঽণুভ্যঃ সঙ্ঘাতাঃ সম্ভবন্তীতি কল্পয়ন্তি তৎপূর্ব্বেণৈবাণুবাদনিরাকরণেন
নিরাকৃতং ভবতীত্যতো ন পৃথক্তন্নিরাকরণায় প্রযত্যতে ॥ ● ॥ এবং চাত্মাকার্ৎস্ন্যং
॥ ● ॥ ৩৪ ॥ যথৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবো দোষঃ স্যাদ্বাদে প্রসক্তঃ এবমা
ত্মনোঽপি জীবস্যাকার্ৎস্ন্যমপরো দোষঃ প্রসজ্যতে । কথং শরীরপরিমাণো হি জী
ব ইত্যার্হতা মন্যন্তে । শরীরপরিমাণতায়াঞ্চ সত্যামকৃৎস্নোঽসর্ব্বগতঃ পরিচ্ছিন্ন
আত্মেত্যতো ঘটাদিবদনিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত । শরীরাণাঞ্চানবস্থিতপরিমা
ণত্বান্মনুষ্যজীবো মনুষ্যশরীরপরিমাণো ভূত্বা পুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন হস্তিজন্ম
প্রাপ্নুবন্ন কৃৎস্নং হস্তিশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ পুত্তিকাজন্ম চ প্রাপ্নুবন্ন কৃৎস্নঃ পুত্তিকাশরী
রে সংমীয়েত । সমান এষ একস্মিন্নপি জন্মনি কৌমারযৌবনস্থাবিরেষু দোষঃ । স্যাদে
তৎ অনন্তাবয়বো জীবঃ তস্য ত এবাবয়বা অল্পে শরীরে সঙ্কুচেয়ুর্মহতি বিকসেয়ুরিতি
। তেষাং পুনরনন্তানাং জীবাবয়বানাং সমানদেশত্বং প্রতিহন্যতে বা ন বেতি বক্তব্যং
। প্রতিঘাতে তাবন্নানন্তাবয়বাঃ পরিচ্ছিন্নে দেশে সংমীয়েরন্ । অপ্রতিঘাতেঽপ্যেকাবয়
বদেশত্বোপপত্তেঃ সর্ব্বেষামবয়বানাং প্রথিমানুপপত্তের্জীবস্যাণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ স্যা
ৎ। অপি চ শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নানাং জীবাবয়বানামানন্ত্যং নোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যং
। অথ পর্য্যায়েণ বৃহচ্ছরীরপ্রতিপত্তৌ কেচিজ্জীবাবয়বা উপগচ্ছন্তি তনুশরীরপ্রতিপ
ত্তৌ চ কেচিদপগচ্ছন্তীত্যুচ্যেত তত্রাপ্যুচ্যতে ॥ ● ॥ ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বি
কারাদিভ্যঃ ॥ ● ॥ ৩৫ ॥ ন চ পর্য্যায়েণাপ্যবয়বোপগমাপগমাভ্যামেতদ্দে
হপরিমাণত্বং জীবস্যাবিরোধেনোপপাদয়িতুং শক্যতে কুতঃ বিকারাদিদোষপ্রস
ঙ্গাৎ । অবয়বোপগমাপগমাভ্যাং হ্যনিশমাপূর্য্য[illegible]স্যাপক্ষীয়মাণস্য চ জীব
স্য বিক্রিয়াবত্ত্বং তাবদপরিহার্য্যং বিক্রিয়াবত্ত্বে চর্ম্মাদিবদনিত্যত্বং প্রসজ্যেত ত
তশ্চ বন্ধমোক্ষাভ্যুপগমো বাধ্যেত কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিতস্য জীবস্যালাবুবৎ সংসার
সাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাদূর্দ্ধ্বগামিত্বং ভবতীতি ॥ কিঞ্চান্যৎ আগচ্ছতামপগচ্ছ

রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্র-শাংকর-ভাষ্যের এক পৃষ্ঠা

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রহ।

মধ্যে শংকর বেদান্তশাস্ত্রের সম্পূর্ণ ব্রহ্মপর ব্যাখ্যাই করেছিলেন। তিনি একটি মাত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তা নিগুর্ণ অদ্বৈত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে তিনি কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্য বা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সীমিত করেন নি। তাঁর মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্ত দেবদেবী মিথ্যা ; ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত যাগযজ্ঞপূজার্চনা প্রভৃতি সর্ববিধ শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম ও বিধিনিষেধাদি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। অপর পক্ষে শংকরোত্তর অধিকাংশ ভাষ্যকারই বেদান্তের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও বিষ্ণু অভিন্ন ; দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কও বেদান্তের ব্রহ্ম ও ভক্তগণের উপাস্য বিষ্ণুর মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখেন নি ; রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উপাস্য ; দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য বলেন যিনি ব্রহ্ম তিনিই বৈকুণ্ঠ-লোকবাসী বিষ্ণু বা হরি ; শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভ ব্রহ্মের সঙ্গে গোলকাধিপতি কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করেছেন ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষ্যকার অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেবও তাই ; অপর পক্ষে শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যানুসারে শিবই পরব্রহ্ম। তদুপরি উক্ত সাম্প্রদায়িক ভাষ্যসমূহে, বিশেষত বৈষ্ণব ভাষ্যগুলির মধ্যে, সাকার উপাসনা অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও সাকার উপাসনার ঘোর বিরোধী আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন রামমোহনের নিকট তাই এগুলির যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। অপর পক্ষে শংকরের অপেক্ষাকৃত মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি তাঁর সঙ্গে চিত্তের নিবিড় যোগস্থাপনের পক্ষে রামমোহনের সহায়ক হয়েছিল।

শাংকর-ভাষ্যের প্রতি রামমোহনের আকৃষ্ট হবার দ্বিতীয় কারণ নিঃসন্দেহে এই যে পূর্বতন ভাষ্যকার-গণের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র শংকরই বহুল পরিমাণে পৌরাণিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের স্থাপনে তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে যে-সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে প্রচলিত পুরাণগুলি প্রায় অনুল্লিখিত। এমন-কি, বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ভুক্ত চতুর্থ (পুরুষবিধ) ব্রাহ্মণের এক অংশে উল্লিখিত 'পুরাণ' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত করেছেন পুরাণ অর্থে 'পুরাবৃত্ত-প্রকাশক বিবরণ' এবং নিজসমর্থনে দৃষ্টান্তরূপে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখমাত্র না করে তৈত্তিরীয় উপনিষদ (দ্বিতীয় বল্লী, সপ্তম অনুবাক)এর বচন উদ্ধৃত করেছেন : 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' (এই জগৎ আদৌ অসৎ ছিল)।[৬২] শংকরের সমগ্র শাস্ত্রবিচার মুখ্যত শ্রুতিনির্ভর, এবং সে ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ড। তাঁর উদ্ধৃত প্রায় সকল শাস্ত্রবাক্যই চয়ন করা হয়েছে শ্রুতি থেকে। রাধাকৃষ্ণন তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন : "He tried to bring back the age from the brilliant luxury of the Puranas to the mystic truth of the Upanisads।"[৬৩] অপর পক্ষে শংকর-পরবর্তী বেদান্তা-চার্যগণ যথা রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষু, বল্লভ, জীব গোস্বামী, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, রাধাদামোদর, বলদেব প্রভৃতি— তাঁদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রচুর পুরাণবচন উদ্ধার করেছেন। পুরাণের এই বহুল প্রয়োগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার্যের সাম্প্রদায়িক মনোভাবও সুপরিস্ফুট। মধ্বের মতে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ও বৈষ্ণব পুরাণগুলির প্রামাণ্য চতুর্বেদের তুল্য এবং শৈব শাস্ত্র বিষ্ণুর আদেশে অসুরগণকে বিমূঢ় করবার জন্যই রচিত হয়েছে! বিজ্ঞানভিক্ষু কূর্মপুরাণের অন্তর্গত 'ঈশ্বরগীতা'র এক স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করেছেন।[৬৪] তেমনি পাওয়া যাচ্ছে বল্লভাচার্য রচিত ভাগবত পুরাণের টীকা সুবোধিনী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তো প্রথমে ভাগবত পুরাণকেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য গণ্য করেছিলেন এবং বৃন্দাবনের সুপণ্ডিত গোস্বামীগণ সেই কারণে কোনো স্বতন্ত্র বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য রচনা করে বলদেব বিদ্যাভূষণ

এই অভাব দূর করেন। জীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' প্রকৃতপক্ষে ভাগবতপুরাণেরই বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা। জীব গোস্বামী, রাধাদামোদর প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ পুরাণগুলির সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক শ্রেণীবিভাগ করে বৈষ্ণব পুরাণগুলিকেই সাত্ত্বিক গণ্য করেছিলেন এবং এই শ্রেণীর মধ্যেও ভাগবত পুরাণকে সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতির ঊর্ধ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন। শ্রীকণ্ঠ তাঁর শৈবভাষ্যে শিব-পুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতার প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন,[৬৫] এবং এই শৈব সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায় বীরশৈব ভাষ্যকার শ্রীপতি-কৃত শ্রীকর-ভাষ্যে, যেখানে গ্রন্থকার বলছেন, বেদ রচিত হবার পূর্বেই স্বয়ং শিব কর্তৃক পুরাণ রচিত হয়; প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে শিবপুরাণই শ্রেষ্ঠ; এবং বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক অপরাপর পুরাণগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট।[৬৬] আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্বেই দেখা গিয়েছে রামমোহন শাস্ত্রপ্রামাণ্য-বিচারকালে শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। পুরাণ ও তন্ত্রকে তিনি শাস্ত্র বলে গণ্য করলেও প্রামাণ্য ও গুরুত্বের দিক থেকে এই শাস্ত্রদ্বয়কে তিনি শ্রুতি অপেক্ষা অনেক নিম্নমর্যাদাসম্পন্ন মনে করতেন। তাঁর স্বকৃত বেদান্তভাষ্যে ও উপনিষদের অনুবাদে ভূমিকাগুলির আলোচনাভাগ ব্যতীত তিনি কোথাও পুরাণতন্ত্রাদির কোনো বচন প্রমাণস্বরূপ দাখিল করেন নি। পুরাণতন্ত্রাদির প্রচুর ব্যবহার তাঁকে করতে দেখা যায় প্রধানত তাঁর বিচারগ্রন্থগুলিতে প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তর্কপ্রসঙ্গে। অধিকন্তু যে-কোনো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল বিরাগ ও শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল আধুনিক ও বিচারশীল। সুতরাং তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক দিক থেকে শংকরোত্তর বৈদান্তিকগণের পুরাণ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মান্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচারকালে ভাগবত পুরাণকে কেন বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপে গণ্য করা হবে না— এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর তীক্ষ্ণ বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি স্মরণীয়।[৬৭] বিভিন্ন বিচারগ্রন্থে অমোঘ যুক্তিপ্রয়োগ করে তিনি আরো দেখিয়েছেন: সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির সাক্ষ্য যুক্তিহীন ও পরস্পরবিরোধী; বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক পুরাণ-সমূহ যেমন অন্যান্য দেবতাকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিষ্ণুমাহাত্ম্য স্থাপনে তৎপর, শৈব পুরাণসমূহ শিবপক্ষে ও তন্ত্রাদি গ্রন্থ শক্তিপক্ষে অবিকল সেইরূপ;[৬৮] সুতরাং এই-সকল গ্রন্থোক্ত পরস্পরপ্রতিস্পর্ধী সাম্প্রদায়িক বচনগুলি প্রমাণ হিসাবে নির্ভরের অযোগ্য। এখানে বক্তব্য, মূলত প্রমাণ হিসাবে পুরাণতন্ত্র অপেক্ষা শ্রুতির শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে রামমোহনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শংকরমতের সাদৃশ্য থাকলেও রামমোহন এই যুক্তির বিস্তারে শংকরকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। পৌরাণিক সাক্ষ্যের অন্তর্বিরোধ ও দুর্বলতা বিষয়ে এমন নিপুণ বিশ্লেষণ শংকর বা অন্য কোনো প্রাচীন ভাষ্যকারের রচনায় দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে রামমোহনের দৃষ্টি সম্পূর্ণ আধুনিক।

শংকরের প্রতি রামমোহনের অসীম শ্রদ্ধার অপর কারণ নিশ্চয় ছিল শংকরের আপসহীন নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ। এই একতত্ত্ববাদ রামমোহন স্বয়ং যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর রচনায় এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল, একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনো কিছুরই পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই; জীব ও জগৎসংসার মিথ্যা; মায়াপ্রসূত অলীক ধারণাবশত আমরা এই বস্তুজগৎকে সত্য মনে করি; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র এই ভ্রম স্বপ্নবৎ দূর হয়ে যায়। রামমোহনের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক— এই উভয় প্রসঙ্গেই তিনি শাংকর-বেদান্তের এই মূল তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিশেষ তৎপর। তাঁর এই বিষয়ক বিবিধ উক্তি থেকে কিছু কিছু চয়ন করে নিয়ে দেওয়া গেল:

১. ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; যেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।[৬৯]

২. জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন এবং উপাধি জন্য সুখদুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই।[৭০]

৩. যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্তুত সে রজ্জুই সর্প হয় এমৎ নহে সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তেহোঁ মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক না হয়েন এই হেতু বেদান্তে পুনঃ ২ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন।[৭১]

৪. ···জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক যে এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে···।[৭২]

৫. ···যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল।[৭৩]

৬. একত্বমনুপশ্যতামস্মাকং আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তানি যাবন্তি নামরূপাণি মায়াকার্যাণি দিক্কালাকাশবৃত্তীনি পরিমিতানি সত্যাশ্রিতানি ভবন্তি কেবলং সদধ্যাসেন সত্যমিব প্রতীয়ন্তে, অতোঽধ্যাসবলাৎ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।[৭৪]

৭. ···পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা···কেবল এক ব্রহ্মমাত্র সত্য আর নামরূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন···।[৭৫]

৮. দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়।[৭৬]

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দার্শনিক সিদ্ধান্তে রামমোহন শংকরের ন্যায় নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী। তাঁর নিকট এই একতত্ত্ববাদের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ এই ছিল যে এর স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর আজীবন পোষিত একেশ্বরবাদী ধর্মমতকে প্রতিপক্ষগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক একতত্ত্ববাদ তাঁর বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদের প্রধান পোষক হয়েছিল। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় প্রতিপক্ষগণের সহিত বিচার বিষয়ক তাঁর গ্রন্থগুলির প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। বেদান্তের শাংকর-ভাষ্য ভিন্ন অন্য কোনো ভাষ্যের নিকট হতে এই সাহায্য পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে সেগুলি ছিল সাম্প্রদায়িক ও সাকার দেবোপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপর পক্ষে শংকর-কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েই রামমোহন তাঁর প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট বলতে পেরেছেন: "ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমেশ্বরের বোধ করিবেক না যে হেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না।"[৭৭]

রামমোহনের উপর শংকরের গভীর প্রভাবের কারণগুলি অনুসন্ধান প্রসঙ্গে উভয় মনীষীর চিন্তাধারায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, স্বরূপলক্ষণ এবং কর্মকাণ্ডের

নিকৃষ্টতা সম্পর্কে রামমোহন শংকরের সঙ্গে একমত। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য নেই। মুক্তি সম্পর্কে রামমোহন বলেন: "...এই ভাবে মন অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্বব্যাপী অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না হইয়া উপাধি হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।"[৭৮] এ উক্তি সম্পূর্ণ নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ-সম্মত। কিন্তু শংকরের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাবান হয়েও বেদান্তব্যাখ্যাতারূপে রামমোহন কয়েকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে সেগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাক্তন বেদান্তাচার্যগণ, বিশেষত শংকর, বেদান্তকে ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রধানত যতির ধর্ম ও দর্শনরূপে। শংকর কর্ম স্বীকার করেন নি, তাঁর মতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য কর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; আর এই সর্বোচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র সন্ন্যাসীরই লভ্য। ব্রহ্মসূত্র ৩. ৪. ২০ 'বিধির্বা ধারণবৎ'এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্রহ্মসংস্থ অবস্থা একমাত্র সন্ন্যাস আশ্রমেই সম্ভবপর; এই স্তরে উপনীত হবার নিমিত্ত যে ব্রহ্মনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা অর্জন করা গৃহস্থের সাধ্য নয়।[৭৯] সন্ন্যাস প্রাচীন ভারতের জীবনচর্যায় জীবনের চতুর্থ বা শেষ পর্ব রূপে অনুমোদিত; কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ বিধি প্রচলিত হয়েছিল, মনে বৈরাগ্যের উদয় হলেই চতুরাশ্রমপারম্পর্য উপেক্ষা করে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করতে হবে (যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ)। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানসমৃদ্ধ আধুনিক জীবন এই একদেশদর্শিতার বিরোধী, কারণ এই জীবনদর্শনে মানুষের ঐহিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক মুক্তি তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন। ব্রহ্মজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীর সম্পত্তি জ্ঞান করা আধুনিক বিচারশীল মনের পক্ষে সম্ভব নয়। রামমোহন তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাই নির্ভীক ভাবে ঘোষণা করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র অধিকার নেই; যোগ্য আধার হলে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সকলের পক্ষেই এই মহাসম্পদ সমানভাবে লভ্য। 'ঈশোপনিষদ'এর ভূমিকায় তাঁর উক্তি: "যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো কর্তব্য হয়; তাহার উত্তর; এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে।...কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমং নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়।"[৮০] কোনো অদ্বৈত-বেদান্তীর পক্ষে এই মত সম্পূর্ণ বিপ্লবী। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহাসম্পদ জাতিধর্মগোষ্ঠী-আশ্রমনিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের প্রাপ্য ও লভ্য ঘোষিত হওয়া বেদান্তদর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম। নবযুগের সর্বতোমুখী জীবনদৃষ্টির সঙ্গে এই ব্রহ্মতত্ত্বব্যাখ্যার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। আধুনিককালে অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যা ও প্রচারে রামমোহনের পরে যে মনীষী জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের মত এ বিষয়ে কিন্তু রামমোহনের ঠিক বিপরীত। বিবাহ ও গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রতি স্বামীজির প্রবল বিরাগ ছিল। তিনি স্পষ্টই বলেছেন গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অলভ্য: "যারা বলে— এ সংসারও করব ব্রহ্মজ্ঞও হবো— তাদের কথা আদপেই শুনবি নি। ও-সব প্রচ্ছন্ন ভোগীদের স্তোক বাক্য।...ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয়, অবৈদিক মত।...সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নেই।"[৮১] আধুনিক যুগের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের মৌলিক বিরোধ সহজেই লক্ষণীয়।

বেদান্তভাষ্যকাররূপে রামমোহনের মৌলিকতার দ্বিতীয় পরিচয় মায়াতত্ত্ব ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাঁর ভাবনায়। অদ্বৈত-বেদান্ত-মতানুসারে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ মিথ্যা। বস্তু-জগৎ সম্পর্কে যে প্রতীতি আমাদের আছে তা মায়াপ্রসূত। অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র এই মায়া বা অজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে এবং মায়াজনিত জগৎ-প্রতীতিও লোপ পায়। সে অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইয়ের পার্থক্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, একমাত্র নিগুর্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই থাকেন— ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। এই মায়ার স্বরূপ নিয়ে আবহমানকাল থেকে বৈদান্তিকগণ অনেক আলোচনা করেছেন। বিস্তারিতভাবে সে সবের অবতারণা না করে সংক্ষেপে বলা যায় অদ্বৈত-বেদান্ত-মতে মায়া সৎও নয় অসৎও নয়— এর স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; সুতরাং বর্ণনা করতে গেলে একে বলতে হয় অনির্বচনীয়।[৮২] মায়া-প্রসূত দেশকালকার্যকারণগত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি অনিত্য ও অলীক প্রবাহমাত্র যা পূর্বেও ছিল না পরেও থাকবে না, কেবল মধ্যে কিছুকালের জন্য ব্যবহারের গোচর হয়েছে।[৮৩] কিন্তু জগতের এই সাময়িক গোচরীভূতত্বও ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই এই ভ্রম নিরাশ করতে সমর্থ। ব্রহ্মকে অবলম্বন করে এই যে মায়াময় জগৎ-কল্পনা সাময়িকভাবে সত্যরূপে প্রতিভাত হয় এই প্রক্রিয়া ব্রহ্মস্বরূপের কোনো বিকার ঘটায় না। ব্রহ্মকে এক, অদ্বিতীয় তত্ত্ব রূপে স্বীকার করলে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা-স্বরূপ মায়ার ন্যায় কোনো একটি ধারণাকেও স্বীকার করা প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। অদ্বৈত-বেদান্তী হিসাবে রামমোহনকেও তাই মায়া-প্রত্যয়ে বিশ্বাসী হতে হয়েছে।[৮৪] কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এতে একটু অসুবিধা আছে। মায়িক বস্তুজগৎকে মিথ্যা ঘোষণা করে প্রাক্তন অদ্বৈতিগণ বেদান্তকে বহুল পরিমাণে সংসারবিমুখ বৈরাগ্যশাস্ত্রে পরিণত করেছিলেন। ব্রহ্ম যদি একমাত্র নিত্য বস্তু হন ও ব্যবহারিক জীবনের সুখ, দুঃখ, সমাজবন্ধন, কর্তব্যাকর্তব্য যদি সবই ভ্রমাত্মক ভেদজ্ঞানপ্রসূত হয়, তাহলে একমাত্র পুরুষার্থ দাঁড়ায় যথাশীঘ্র এই মিথ্যা জগৎসংসারপাশ থেকে মুক্তিলাভ করে ব্রহ্মে লীন হওয়া। অবশ্য অদ্বৈতদৃষ্টিতে এই মায়িক জগতেরও ব্যবহারিক যথার্থতা আছে। কিন্তু রামমোহনের পূর্বে কোনো অদ্বৈতিকেই সে যাথার্থ্যকে এতটুকু মর্যাদা দিতে দেখা যায় না— ব্রহ্মের সঙ্গে তাকে তুল্য জ্ঞান করা তো দূরের কথা। কিন্তু রামমোহন রেনেশাঁসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আধুনিক মানুষ, তাঁর দৃষ্টিতে জগৎসংসারের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। সুতরাং জগৎ-প্রতীতি মায়াজনিত হলেও একে অবজ্ঞা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। টোলচতুষ্পাঠীতে অনুসৃত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে অদ্বৈত-বেদান্তের অনুশীলন ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলে মায়াবাদ যে সমাজের উপর অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে আমহার্স্টকে লিখিত বিখ্যাত পত্রে এমন ইঙ্গিত তাঁকে করতে দেখা যায়। লোকশ্রেয়সাধন যাঁর জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র তাঁর পক্ষে এ আশঙ্কা বিচিত্র নয়। কোনো শাস্ত্রীয় সূত্রে তাঁর পক্ষে মায়াবাদের সঙ্গে সামাজিক প্রগতির সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছিল এ সম্ভাবনার কথা স্বভাবত মনে উদিত হয়। প্রবন্ধান্তরে বর্তমান লেখক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, ভারতীয় শাস্ত্রাদির মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব রামমোহনের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ধর্মমতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।[৮৫] তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত দুই ভাগ করা যায়: ১. দর্শন ও ২. ক্রিয়া। তান্ত্রিক পূজা ও সাধনপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কতগুলি অর্থহীন ও বিশুদ্ধ নীতিমার্গের পরিপন্থী আচার ও ক্রিয়ার সমষ্টি বলে মনে হলেও এগুলিই তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রধর্মের সব নয়। তন্ত্রের একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি আছে এবং সিদ্ধান্তগত ভাবে উক্ত দর্শনের সঙ্গে

অদ্বৈত-বেদান্তের কোনো প্রভেদ নেই। কুলার্ণব তন্ত্রের একটি উক্তিতেই তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে:

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাত্মচিন্তনম্।
স সর্বং পাতকং হন্যাত্তমঃ সূর্যোদয়ো যথা॥[৮৬]

তন্ত্রদর্শনের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন: "The monistic philosophy of the Vedanta forms its backbone and we see that ***Brahman*** is regarded as the only true Principle in the world।"[৮৭] কেবলমাত্র তত্ত্বসিদ্ধান্তই নয় তন্ত্রের পূজা-পদ্ধতি পর্যন্ত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। অপর এক বিশেষজ্ঞের মতে: "The Tantra form of worship also serves as a course of practical training for the realization of the Vedanta ideal of the identity of the finite with the Infinite।"[৮৮] সুতরাং দেখা যাচ্ছে বেদান্তের মতো তন্ত্রও একটি তত্ত্বকেই স্বীকার করেছে। বৈদান্তিক একতত্ত্ববাদী রামমোহনের নিকট তাই এ শাস্ত্র যে বিশেষ আদরণীয় হবে তা স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে যা বিশেষ পর্যালোচনার যোগ্য তা হল সৃষ্টির মূলে তন্ত্রদর্শনও মায়াশক্তির কার্যকারিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্ত-সম্মত মায়াবাদের সঙ্গে তন্ত্রব্যাখ্যাত মায়াভাবনার কিছু মৌলিক প্রভেদও লক্ষণীয়। প্রথমত অদ্বৈতিগণের ব্যাখ্যাত মায়া ব্রহ্মের রহস্যময়ী সৃজনীশক্তি হলেও তা সৎও নয় অসৎও নয়। কিন্তু তন্ত্রোক্ত মায়াশক্তি নিত্য, সৎ ও পরমাত্মস্বরূপেরই অংশবিশেষ। বেদান্তের মায়িক জগৎ যেখানে পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা, তন্ত্রব্যাখ্যাত মায়াশক্তিপ্রসূত জগৎ সেখানে নিত্য ও চিরন্তন। দ্বিতীয়ত বৈদান্তিক মায়া ব্রহ্মস্বরূপে আরোপিত শক্তিরূপে কল্পিত হলেও তা জড়শক্তি; কিন্তু তান্ত্রিক মায়া চিৎশক্তিরই রূপান্তর বা আবৃত চিৎশক্তি। বস্তুত তন্ত্রে ব্রহ্ম (শাক্ততন্ত্রের পরিভাষায় শিব) ও মায়াকে একই তত্ত্বের স্থির ও চঞ্চল দুই প্রকাশ রূপে গণ্য করা হয়েছে।[৮৯] মায়া-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্যের জন্য বেদান্ত ও তন্ত্রের মধ্যে বস্তুজগৎ সম্পর্কেও মনোভাবের পার্থক্য এসেছে। অদ্বৈত-বেদান্ত মায়িক জগৎকে অলীক জ্ঞান করে স্বভাবত বৈরাগ্যের উপর জোর দিয়েছে; তন্ত্র মায়াপ্রসূত জগৎকে নিত্য ও সত্য ধারণা করেছে ও সেই হেতু অনিবার্যভাবেই এই দর্শনে এসেছে এক বলিষ্ঠ জীবনস্বীকৃতি। জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিতের ভাষায়: "...বৈদিক সাধকের ন্যায় তান্ত্রিক সাধকের সংসারে নরক দর্শন করিতে হয় না। বৈদিক সাধকগণ স্ত্রী পুত্র, মিত্র, ভৃত্য, পরিজনময় সংসারের যে ঘৃণিত বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা শুনিলে স্বাভাবিক পুরুষেরও ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই ব্রহ্মানন্দ তরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্যকারণ প্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার সোপান পরম্পরা বলিয়া...দেখাইয়া দিতেছেন।"[৯০] অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক রূপে রামমোহন মায়াবাদকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করলেও আধুনিক যুগোপযোগী সমাজকল্যাণাদর্শের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করবার সমস্যা তাঁর ছিল। টোলচতুষ্পাঠীতে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির বেদান্তচর্চায় এর কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়াও সম্ভব ছিল না। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁর মতে অবশ্য সর্বোত্তম প্রতিষেধক। কিন্তু সে তো শাস্ত্রীয় সমাধান নয়। শাস্ত্রব্যাখ্যাতারূপে শাস্ত্রীয় সমন্বয়ের প্রয়োজনও তাঁর নিশ্চয় ছিল। তাঁর চিন্তায় তন্ত্রদর্শনের গভীর প্রভাবের কথা স্মরণ রাখলে এমন অনুমান অবশ্যই করা চলে যে তন্ত্রপ্রদত্ত মায়াবাদের অভিনব ব্যাখ্যা তাঁকে ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিরূপে মায়ার ঋণাত্মক মিথ্যাত্ব অপেক্ষা

তার সৃষ্টিশীলতার উপর অনেক বেশি পরিমাণে জোর দিতে প্রণোদিত করেছিল। বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদকে ত্যাগ না করেও তিনি তান্ত্রিক শক্তিবাদের দ্বারা তাকে বহুল পরিমাণে মার্জিত ও যুগোপযোগী করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অদ্বৈত-বেদান্তিরূপে রামমোহনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মোপাসনার প্রতি অসীম গুরুত্ব আরোপে। শংকরের মতে উপাস্য-উপাসকের পরস্পর-সম্বন্ধ ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।[২১] সুতরাং মায়িক ভেদ-জ্ঞানের জগৎ অতিক্রম করে জীব অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু রামমোহন শংকরের মতো অদ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক মুক্তিকে সাধনার চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিলেও খুব জোর দিয়েই বলেছেন যে ব্রহ্মোপাসনাই চরম মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় এবং মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাদশ সূত্র 'আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্'এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়: "মোক্ষ পর্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক, জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না যেহেতু বেদে মুক্তি পর্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি।"[২২] এই সূত্রভাষ্য ছাড়া তাঁর 'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮), 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩), 'গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্' (১৮২৭), 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৮২৮), 'অনুষ্ঠান' (১৮২৯), 'ক্ষুদ্রপত্রী' শীর্ষক পুস্তিকাগুলিতেও রামমোহন তাঁর উপাসনা সম্পর্কিত মতামত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন। এই-সব আলোচনা থেকে দেখা যায় তাঁর মতে উপাসনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুটি অঙ্গ আছে। ব্যক্তিগত উপাসনাতে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণই অবলম্বনীয়। স্বরূপচিন্তন সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ: "পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন।" এই সূত্রে আরো বলা হয়েছে, "ইন্দ্রিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়।"[২৩] এই উপাসনার লক্ষ্য নির্বিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ এবং এর জন্য প্রয়োজন শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধনসম্পদ্।[২৪] সমষ্টিগত বা সামাজিক উপাসনা সম্পন্ন করতে হবে সগুণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে: "পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার আয়ুর এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।"[২৫] ব্রহ্মোপাসকের লোকব্যবহারের মান কী হবে এ বিষয়েও রামমোহনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। আত্মোপাসক ও আত্মজ্ঞানী ভুলতে পারেন না তিনি সামাজিক জীব। সুতরাং যুক্তি ও ন্যায়সম্মত লোকব্যবহার তাঁর অবশ্য কর্তব্য: "বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা যোগবাশিষ্ঠ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জুনও ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন।"[২৬] অপর পক্ষে সামাজিক উপাসকগণের সম্পর্কে রামমোহনের দুটি অনুশাসন: ১. সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃভাবে প্রীতিপূর্ণ আচরণ কর্তব্য;[২৭] ২. "অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে

আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।"[৯৮] মনে রাখতে হবে রামমোহনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনা পরস্পরের পরিপূরক, একটিকে ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। সামাজিক উপাসনা দ্বৈতভূমির অন্তর্গত, এর মধ্যে ভক্তি ও অনুরাগের বিশিষ্ট স্থান আছে; কিন্তু ব্যক্তিগত আত্মোপাসনা বা সাধনের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান। এইভাবে রামমোহন তাঁর উপাসনার ধারণায় দ্বৈতাদ্বৈতক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাস্কর ও মধ্ব-প্রদত্ত ৩.৩.৪. সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' রামমোহন নিজ ভাষ্য-গ্রন্থে কেন গ্রহণ করেছিলেন তা হয়তো কিছুটা বোঝা যায়। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'সমুদ্রেতে যেমন সকল (জল) প্রবেশ করে সেইরূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য ঈশ্বরে হয়।'[৯৯] উপাসনার এই ক্রমদ্বয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যায় সূত্রটি তাঁর সহায়ক হয়েছিল। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা গেল উপাসনাতত্ত্বের ব্যাখ্যায় রামমোহন শংকরমত হতে বহু দূরে সরে এসেছেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার ক্রমদ্বয়কে মিলিয়ে তিনি জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়স্থাপনেরও প্রয়াস পেয়েছেন। এদেশের শংকরের পরবর্তী অদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে এমন সমন্বয়ের আভাস কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। শ্রীধর স্বামী তাঁর বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর সুবিখ্যাত টীকাত্রয়ে শংকরের সমস্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেও বলেছেন ভক্তিই অদ্বৈতমুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। স্বয়ং চৈতন্যদেবের গুরুপরম্পরায় মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী এবং কেশব ভারতীও এই প্রকার ভক্তিবাদী শংকরপন্থী ছিলেন এমন কথা মনে করবার কারণ আছে। এ ছাড়া চতুর্দশ শতকে বিদ্যারণ্য, ষোড়শ শতকে মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতিগণও উপাসনা ও ভক্তিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বিদ্যারণ্যের মত যেন রামমোহনেরই প্রতিধ্বনি: "উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; অতএব জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর উপায়ান্তর নেই, শাস্ত্রের এই উক্তির সঙ্গে উপাসনার কোনও বিরোধ নেই।"[১০০] রামমোহনের শাস্ত্রালোচনামূলক গ্রন্থগুলি অনুশীলন করলে আরো প্রতীতি জন্মায় যে তাঁকে এ বিষয়েও প্রভাবিত করেছিল ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র।[১০১] কিন্তু উপাসনা-তত্ত্বে রামমোহনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য সর্বপ্রকার প্রতীক-বর্জনে। প্রতীকে আত্মদৃষ্টি না করবার প্রেরণা তিনি শংকরের নিকট পেয়েছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অপর পক্ষে অদ্বৈতবেদান্তই হোক বা তন্ত্রই হোক, প্রচলিত প্রতিমাপূজাকে কেউ বর্জন করে নি। এমন-কি, একতত্ত্ববাদী শংকর পর্যন্ত এ জাতীয় পূজার্চনাকে গুরুত্ব না দিলেও, সেগুলির ব্যবহারিক যথার্থতা অস্বীকার করতে চান নি। রামমোহন কিন্তু এখানে অধিকতর একনিষ্ঠ। তর্কের খাতিরে পুরাণ-তন্ত্র-প্রোক্ত প্রতিমাপূজাকে নিম্নাধিকারিগণের জন্য প্রদত্ত বিধান বলে স্বীকার করে নিলেও তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন, প্রচলিত প্রতিমাবদ্ধ দেবোপাসনায় দেবদেবীতে ঈশ্বরভাব আরোপ করবার পরিবর্তে উপাসকগণ সর্বপ্রকার তামসিক মানুষীভাবের আরোপই সর্বত্র করে থাকেন। সুতরাং যা নামে প্রতীকোপাসনা তা পরিণামে হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থূল জড়োপাসনা। ঈশোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তিনি এর সামাজিক ও নৈতিক কুফল সম্পর্কে অতি নিপুণ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১০২] সুতরাং তাঁর পরিকল্পিত নির্গুণ আত্মোপাসনা ও সগুণ সামাজিক উপাসনা উভয়ই অনিবার্যভাবে এই জাতীয় প্রতীকের সর্বসংস্রববিবর্জিত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে বিচারে তাঁর অন্যতম বক্তব্য ছিল, সগুণ উপাসনার অর্থ সাকার উপাসনা নয়।[১০৩] সর্বশেষে বলা

যায় সামাজিক উপাসনার কেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভাকে তিনি যে সর্বসম্প্রদায়ের মিলনভূমিরূপে কল্পনা করেছিলেন এ ছিল তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টি। এমন স্বপ্ন দেখা প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণের সাধ্যাতীত ছিল।

বেদান্তব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনের চতুর্থ ও শেষ বৈশিষ্ট্য সমাজকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্যবিধান করা। এই সমাজমুখীন দৃষ্টি তিনি লাভ করেছিলেন মুখ্যত আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যমে এ কথা সর্বথা স্বীকার্য। খ্রীস্টধর্মের জনসেবা ও মানবপ্রীতির আদর্শও তাঁর সামনে সে যুগে খুব বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল। মরমী ফার্সী কবি সাদির যে বাণীটি তাঁর অতি প্রিয় ছিল তা এই: "মানবসেবাই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।" এই মানবতাবাদের মনোভাব তাঁর বেদান্তব্যাখ্যাতেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত 'পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ' (৩.৩.৫৩) সূত্রটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন: "পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যনুকূল ব্যাপার এই দুই মুখ্য উপাসনা হয়।"[১০৪] ঈশ্বরপ্রীতিকে ব্যক্তিস্তরে আবদ্ধ না রেখে তাঁর সৃষ্ট সর্বপ্রাণীর মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেওয়া এবং এই প্রেমের দ্বারা লোকব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার মধ্যেই লোকসেবার আদর্শটি রূপ পেয়েছে। সার্বভৌম প্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানবকল্যাণের এই আদর্শ নূতন যুগের নূতন মন্ত্র। এই উত্তরাধিকার রামমোহন রেখে গিয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের জন্য। পরবর্তী এক শতাব্দীরও অধিক কাল এই সেবাদর্শ নানা রূপে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রচিত ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" (ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনই তাঁর উপাসনা) বা স্বামী বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—উক্ত মূল বাণীরই বিভিন্ন রূপ। সাধারণ মানুষের প্রতি এই অনুরাগকে রামমোহন নানা স্থানে 'প্রীতি' 'স্নেহ'[১০৫] 'দয়া'[১০৬] ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে তিনি তাঁর শাস্ত্রবিচারমূলক প্রথম গ্রন্থেই (১৮১৫) এই প্রত্যয়টিকে তাঁর বৈদান্তিক তত্ত্বসিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। । ব্যাখ্যা অনন্য। এই উদার মানবপ্রীতির মন্ত্রে কোনো প্রাক্তন বেদান্তভাষ্যকারই দীক্ষিত ছিলেন না। শংকর বা অন্য কোনো ব্যাখ্যাতাই আলোচ্য সূত্রের এমন অর্থ করেন নি।

বেদান্তভাষ্যকার ও বৈদান্তিক রূপে রামমোহনকে মূল্যায়নের যে প্রচেষ্টা করা গেল তাতে সম্ভবত প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত ধারার শেষ বেদান্তভাষ্যকার ও সেই সঙ্গে আধুনিক কালে এদেশে বৈদান্তিক চিন্তাধারার যুগোপযোগী নবরূপায়ণের অগ্রদূত। পূর্বেকার অতি ক্ষীণ বেদান্ত-চর্চার ধারাকে গণ্ডিবদ্ধ রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি প্রবল স্রোতস্বিনীতে পরিণত করেন। আচার্য শংকরের পরম ভক্ত হয়েও তিনি তাঁর অন্ধ অনুসারী নন। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষায় এ তত্ত্ব যে সর্বদা সামাজিক প্রগতির উপযোগী হয় না এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাই নূতন পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সমন্বিত করে বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন নূতন শিক্ষায়তন। গৃহী, সন্ন্যাসী সকলের জন্য নির্বিচারে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার উন্মুক্ত করে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বেদান্তকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনিই অগ্রণী। বেদান্তের ব্রহ্মবাদকে আশ্রয় করে উদার অসাম্প্রদায়িক নিরাকার উপাসনাপদ্ধতির স্রষ্টাও রামমোহন যার মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় উপাসনারই ক্রমানুসারে স্থান আছে। সর্বোপরি

মানবপ্রেম ও সেবাধর্মকে ব্রহ্মবাদের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর নব মানবতাবাদের ভিত্তিও স্থাপন করেছেন বেদান্ত- দর্শনে যা কোনো প্রাক্তন আচার্যের দ্বারা সম্ভব হয় নি। বৈদান্তিক হিসাবে তাঁর এই কীর্তিসমূহের কথা স্মরণ রাখলে বোঝা সহজ হয় কেন তাঁর সমকালীন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন তাঁকে তাঁর সময়কার অদ্বিতীয় বেদান্তজ্ঞ জেনে শংকরাচার্যের কালনির্ণয়ের প্রশ্নে সমকালীন প্রাচীনপন্থী দেশীয় পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন; [১০৭] আর কেনই বা তাঁর মৃত্যুর পর, 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকা— যা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি সর্বদা প্রসন্ন ছিল না— ১লা মার্চ, ১৮৩৪ সংখ্যায় এক শোক-গাথা প্রকাশ করে লিখেছিল :

"বেদান্তশাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দশাস্ত্র করে হাহাকার॥"[১০৮]

প্রমাণপঞ্জী

১। বিভিন্ন যুগে রচিত এই সাম্প্রদায়িক বেদান্তভাষ্যগুলির তালিকা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য J. N. Farquhar, *An Outline of Religious Literature of India*, Oxford, 1920, p. 287; S. Radhakrishnan, *The Brahma Sūtra*, London, 1960, p. 27; যে ধর্মসম্প্রদায়গুলির নিজস্ব বেদান্তভাষ্য ছিল না তাঁরা ক্রমশঃ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন ও অবলুপ্তির পথে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যাঁরা বেদান্তভাষ্য রচনা করেন নি তাঁরাও প্রয়োজনমত নিজ নিজ মতের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা দিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এর অন্যতম উদাহরণ অধুনালুপ্ত সূর্যোপাসক সৌর সম্প্রদায়। এঁদের কোনো স্বতন্ত্র বেদান্তভাষ্য ছিল বলে জানা নেই কিন্তু আনন্দগিরি প্রণীত 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রকরণে বর্ণিত শঙ্করাচার্যের সঙ্গে সৌরগণের বিচারপ্রসঙ্গে সৌরগণকে বেদান্তমত প্রকাশ করতে দেখা যায়। পূর্বপক্ষে তাঁদের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে : "সূর্যই পরমাত্মা ও জগৎকারণ।... আমরা সূর্যের সর্বাত্মত্ব ও পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করে থাকি" ('সূর্য এব পরমাত্মা জগৎকারণং বর্ততে।... আভ্যাং হি সূর্যস্য সর্বাত্মত্বং অস্যৈব চ পরব্রহ্মত্বং প্রতিপাদিতং ভবতি'—শঙ্করবিজয়, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৬৮, পৃ. ৯৪)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিজস্ব বেদান্তভাষ্যের অভাবে দীর্ঘকাল সর্বভারতীয় বৈষ্ণবসমাজে পূর্ণ মর্যাদা পান নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য রচনা করে এই অভাব দূর করেন; দ্রষ্টব্য S. K. De, *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal* (1st ed.) Calcutta, 1942, p. 17

২। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক তাঁর 'Rabindranath as Vedantist' প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত; দ্রষ্টব্য *Visva-Bharati Quarterly*, Tagore Birthday Number, May-October, 1941, p. 31

৩। *The Father of Modern India*, Raja Rammohun Roy Centenary Commemoration Volume, Calcutta, 1935, Part II, p. 162

৪। চন্দ্রশেখর দেব, 'Reminiscences of Rammohun Roy', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃ. ১৩৯-৪০

৫। দ্রষ্টব্য S. D. Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, ed. Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli, Calcutta, 1962, Appendix II, p. 459; অতঃপর এই গ্রন্থ Collet বলে উল্লিখিত হবে।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ১৬), চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৯, পাদটীকা।

৭। Collet, p. 460

৮। *Ibid*

৯। *Ibid*, pp. 458-59; আমহার্স্ট কে লিখিত রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক পত্রখানি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সূচকরূপে কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই পত্রে দেশে সংস্কৃত-শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে তিনি ইঙ্গিতে যে সুচিন্তিত প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর শিক্ষা-চিন্তার আলোচনাপ্রসঙ্গে তা বিশেষ উল্লিখিত হতে দেখা যায় না। একসময়ে দেশের টোল-চতুষ্পাঠী-সমূহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা ভূস্বামী প্রভৃতি সমাজের বিত্তশালী সম্প্রদায়। আধুনিক যুগে ধীরে ধীরে এই সমর্থন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে শাসক-সম্প্রদায় যেটুকু সাহায্য দিতে অগ্রসর হলেন তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ফলে সংস্কৃতচর্চার এই প্রকৃত প্রাণকেন্দ্রগুলির শক্তি প্রায় নিঃশেষিত ও স্ব স্ব বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতসম্প্রদায়ও অবলুপ্তির পথে। রামমোহন-প্রস্তাবিত পথে যথাসময়ে সরকারের সংস্কৃত-শিক্ষানীতি নির্ধারিত হলে প্রাচীন সংস্কৃত-শিক্ষাপদ্ধতির ও সংস্কৃতচর্চার এ দুরবস্থা হত না। সাম্প্রতিক কালের সংস্কৃত-গবেষকগণের মধ্যে এ-সম্পর্কে রামমোহনকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেছেন সম্ভবত একমাত্র পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য; দ্রষ্টব্য "বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা", বাঙালীর সারস্বত অবদান, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ৩১৬, পাদটীকা ৭।

১০। Collet, p. 189; আশ্চর্যের বিষয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন রায়' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) গ্রন্থে কুত্রাপি রামমোহন কর্তৃক এই বেদান্ত-বিদ্যালয়-স্থাপন-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি। সাধারণভাবে বর্তমানে যাঁরা রামমোহনের শিক্ষাসংস্কারনীতির আলোচনা করে থাকেন তাঁদের অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তার-কল্পে রামমোহনের চিন্তা ও কার্যাবলীর উল্লেখ করলেও তাঁর বেদান্ত-বিদ্যালয় সম্পর্কে নীরব থাকেন।

১১। ভারতপথিক রামমোহন রায়, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৩৬৬, পৃ. ৭৪

১২। W. Ward, *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*, Baptist Mission Press, Serampore, 1811, p. 198

১৩। *Ibid*, p. 199

১৪। *Ibid*, p. 339

১৫। সংক্ষিপ্ত 'বিবরণ' নামটি থেকে সঠিক অনুমান করা কঠিন, কোন্ গ্রন্থটির উল্লেখ এখানে অভিপ্রেত। এই প্রসঙ্গে নৃসিংহাশ্রম মুনি প্রণীত 'পঞ্চপাদিকা'র টীকা 'বিবরণভাবপ্রকাশিকা' শীর্ষক গ্রন্থখানির নামও মনে পড়ে।

১৬। W. Ward, *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos* (Second Edition), Vol. I, Serampore, 1818, Chapter VI (Of the present State of Learning among the Hindoos), Section II (Colleges), pp. 588-94; দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের নামটি কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল।

১৭। William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal (1835 and 1838)* ed. A. Basu, University of Calcutta, 1941, pp. 16-23, 50-51, 57-58, 70-73, 75-82, 85-86, 92, 95-96, 103-04, 106-07, 112-14, 119-22, 166-84, 253-77

১৮। *Ibid*, pp. 180-81

১৯। Montgomery Martin, *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* Vol II (London, 1838) p. 718

২০। *Ibid*, Vol. III, London, 1838, pp. 138, 505

২১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড: ১৮২৪-১৮৫৮, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ২২-২৪, ৪০

২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাগবাজারে অবস্থিত তাঁর নিজস্ব চতুষ্পাঠীতে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন; দ্রষ্টব্য— 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৫২, পৃ. ২৬-২৭। কিন্তু সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জানা যায় মৃত্যুঞ্জয় চতুষ্পাঠীতে ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যাপনাই করতেন, বেদান্তের নয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরী ওয়ার্ড তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছেন কলিকাতার তদানীন্তন টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতে প্রধানত ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রদ্বয় পড়ানো হত এবং এই ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যাপকগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় অন্যতম ছিলেন। তাঁর বাগবাজারের চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করত ("The following among the colleges are found in Calcutta and in these

the nyayu and smritee shastrus are principally taught :··· Mrityunjuyu Vidyulunkaru of Bagbazar, fifteen ditto." W. Ward, *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos*, Second Ed., Vol I, Serampore, 1818, pp. 592-93)। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের যাজকগণ মৃত্যুঞ্জয়কে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন— তাই ওয়ার্ডের উক্তি মিথ্যা হবার কোনো কারণ নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুঞ্জয় সমকালীন কলিকাতার অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতো ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যাপনাই করেছেন ; বেদান্তের সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকলেও তিনি যে কদাচ বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন এ বিষয়ে প্রমাণাভাব।

২৩। 'কবিতাকারের সহিত বিচার'— রামমোহন-গ্রন্থাবলী-২ সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ৬৮ ; অন্য উল্লেখ না থাকলে 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী' বলতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ বুঝতে হবে। অতঃপর এই সংস্করণ 'গ্রন্থাবলী' বলে উল্লিখিত হবে। 'ঈশোপনিষৎ'এর ভূমিকার অনুষ্ঠান অংশেও রামমোহনকে এই বলে আক্ষেপ করতে দেখা যায়, বিরোধীপক্ষ তাঁর বেদান্তের বাংলা ভাষ্যকে অশাস্ত্রীয় আধুনিক মত আখ্যা দিয়ে পাঠকগণকে তার অনুশীলন থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছেন— দ্রষ্টব্য 'ঈশোপনিষৎ', গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২০৪

২৩ (ক)। 'পাষণ্ডপীড়ন'— গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ৫৬ ; 'পথ্যপ্রদান',—গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১৪১

২৪। 'বেদান্তচন্দ্রিকা', গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৩১

২৫। ঐ, পৃ. ১৫২

২৬। 'কবিতাকারের সহিত বিচার', গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৭১

২৭। Collet, pp. 8-9

২৮। Collet, pp. 14-15,412 ; এলাহাবাদ কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত 'বেনারস কমিশনার দফ্‌তর'এর Miscellaneous Revenue Records-এ ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই মাসের কর্মরত কর্মচারীগণের তালিকায় রামমোহন রায়ের নাম উল্লিখিত আছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীস্টিফেন. এন. হে. অনুগ্রহপূর্বক এই তথ্যটি বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন। অবশ্য এই উল্লেখ খুব স্পষ্ট নয়। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের কোনো সময়ে যে রামমোহন কাশীর সরকারি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন এতে এইমাত্র প্রমাণিত হয়। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন সিভিলিয়ান জন ডিগবির অধীনে কর্মগ্রহণ করেন ও যথাক্রমে তাঁর সঙ্গে রামগড়, যশোর, ভাগলপুর ও রংপুরে অবস্থান করেন। এর মধ্যে তাঁর রংপুর-প্রবাস (১৮০৯-১৮১৩) দীর্ঘতম। ১৮০৩ থেকে ১৮০৫ তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব স্পষ্ট নয়। এই সময়ের মধ্যে পুনর্বার কাশী-গতায়াতের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার বহুল পরিমাণে তাঁর গুরুস্থানীয় অন্তরঙ্গ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের নিকট প্রাপ্ত শিক্ষার ফল। চোদ্দ বৎসর বয়সে নিজগ্রাম রাধানগরে রামমোহন এঁর সঙ্গে পরিচিত হন (রামমোহন রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পৃ. ১৩)। আজীবন রামমোহন এঁকে অসীম শ্রদ্ধা ও এঁর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করে এসেছেন। সন্ন্যাসজীবনে হরিহরানন্দও কাশীবাসী হয়েছিলেন, যদিও রংপুরে ও কলিকাতায় ইনি রামমোহনের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। হরিহরানন্দের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল ন্যায় এবং তন্ত্রশাস্ত্রদ্বয়ে। রামমোহন তাঁর নিকট বিশেষভাবে তন্ত্রশাস্ত্রই অধ্যয়ন করেছিলেন। ইনি যে রামমোহনের বেদান্তের আচার্য ছিলেন এমন প্রমাণ নেই। (দ্রষ্টব্য Collet, pp. 101-02 ; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১০৬-০৮ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১-৩২)।

২৯। রামমোহন রচিত ও প্রকাশিত 'গীতা'র পদ্যানুবাদ বর্তমানে যে পাওয়া যায় না তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান 'গীতা'র মর্মার্থ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কী ছিল তা জানতে স্বভাবত কৌতূহল হয়। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'সহমরণ বিষয়' গ্রন্থে তিনি স্বকৃত গীতানুবাদের উল্লেখ করেছেন : "···সহমরণাদিরূপ কাম্য কর্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদগীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে···।" (রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৫৬)। মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ভাগবত পুরাণ, একাদশ স্কন্ধের এক বঙ্গানুবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে রামমোহন-কৃত গীতা-অনুবাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন (বিবিধার্থ-সংগ্রহ, আষাঢ় ১৭৮০ শক, পৃ. ৭২)। আরো দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৮৯-৯০। 'গীতা'কে

রামমোহন সর্বশাস্ত্রসার জ্ঞান করতেন (দ্রষ্টব্য "...এবং সকল স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসের সার যে ভগবদ্গীতা তাহাতে লিখিতেছেন...", সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, ১৮১৮, গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৭) ; এবং অনেক সময়ে বন্ধুদের বলতেন, "গীতার কথা শুনেনা যে, তার কথা শুনবে কে ?" (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯২৮, পৃ. ৩৪৬)। আমাদের নবজাগরণের চিন্তাধারার সঙ্গে ভগবদ্গীতার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ; বঙ্কিমচন্দ্র, টিলক, অরবিন্দ, গান্ধীজি প্রভৃতির গীতাভাষ্যই তার প্রমাণ। রামমোহন এঁদের পূর্বসূরী।

৩০। রামমোহন-প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্রের শাংকর ভাষ্যের সংস্করণ বর্তমানে অতি দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে এর দুইখানি আছে (Catalogue of Sanskrit Books in the Government Sanskrit College Library, Calcutta, *Vedānta* Nos. 239 and 240)।

৩১। রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৮৮০, পৃ. ৮১২

৩২। চন্দ্রশেখর বসু, বেদান্ত-প্রবেশ (কলিকাতা, ১২৮২), পৃ. ১৫০-৫১

৩৩। 'গোস্বামীর সহিত বিচার'—গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫৭ ; *The Rights of Hindus over Ancestral Property* (1830) গ্রন্থেও তিনি এই বচন উদ্ধৃত করেছেন ; সেখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষাংশের পাঠ—'ন কর্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ'। দ্রষ্টব্য *English Works of Raja Rammohun Roy*, ed. Nag and Burman, Pt. I, p. 20n

৩৪। *The English Translation of the Kenopanishad*— Introduction—The English Works of Raja Rammohun Roy edited by Nag and Burman, Part II, Calcutta, 1946, p. 15 ; এই সম্পর্কে মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উক্তি স্মরণীয় : "Simultaneously with the restoration of his theistic faith came a new view of the meaning and purpose of scriptural authority. He declared that the light of individual reason had to be reconciled with the authority of the scripture as repositories of the collective wisdom of the race. Neither reason nor authority is sufficient for the guidance of life, in the uncertainties and weaknesses of man's moral and intellectual equipment, and the reconciliation of the two can alone furnish such guidance as is available to man. *Rammohun the Universal Man*, p. 13

৩৫। Mary Carpenter, *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy* (Reprinted by the Rammohun Library, Calcutta 1915) p. 98

৩৬। ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২ : গ্রন্থাবলী ৫, পৃ. ১৫, ১৬ ; এ ক্ষেত্রে রামমোহনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শংকরাচার্যের মতের সম্পূর্ণ মিল। ব্রহ্মসূত্রের 'স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ' (২. ১. ১.) শীর্ষক সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শংকর বলেছেন, "বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে ; পুরুষবচসাংতু মূলান্তরাপেক্ষং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতঞ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ।" মর্মার্থ : 'সূর্যালোক যেমন রূপবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায় তেমনি বেদ স্বতঃপ্রমাণ ; কিন্তু পুরুষবাক্য (স্মৃতির বচন) মূলসাপেক্ষ (শ্রুতিনির্ভর) এবং (সেই হেতু) দূরাবস্থিত (অর্থাৎ পরোক্ষ) জ্ঞানের জনক'। অন্যত্র ব্রহ্মসূত্রের, 'অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্,' (৩. ২. ২৪.) শীর্ষক সূত্রের ব্যাখ্যায় শংকর 'প্রত্যক্ষ' অর্থে শ্রুতি এবং 'অনুমান' অর্থে স্মৃতি ধরেছেন (প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ)। এই সূত্রের নিজকৃত ভাষ্যে রামমোহনও শংকরকে অনুসরণ করে বলেছেন, "সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয় এইরূপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ স্মৃতিতে কহেন।"—বেদান্তগ্রন্থ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৭৩

৩৭। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ : ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৪৪ ; 'সে কেবল বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ হয়েন' উক্তি রামমোহনের নিজের ব্যাখ্যা, মূলে নেই। রামমোহন এর যথাযথ অনুবাদও অন্যত্র করেছেন, দ্রষ্টব্য, মুণ্ডকোপনিষৎ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৬০

৩৮। শংকর : অধ্যাস-ভাষ্য : "দেহেন্দ্রিয়াদিষহংমমাভিমানরহিতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ন হি ইন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদি-ব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্বস্মিন্নসতি অসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি॥ তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি।... শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্বকারী নাবিদিত্বাত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি, ন বেদান্তবেদ্যমশনায়াদ্যতী-

-তমপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিভেদমসংসার্যাত্মতত্ত্বমধিকারেঽপেক্ষ্যতে অনুপযোগাদধিকারবিরোধাচ্চ।" বৈদিক কর্মকাণ্ড-ভিত্তিক পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তাগণের সঙ্গে জ্ঞানমার্গাবলম্বী শংকর ও তাঁর অনুগামীগণের এই বিষয়ে দীর্ঘকাল তীব্র বাদানুবাদ চলেছিল। শংকর-শিষ্য সুরেশ্বর তাঁর 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে মীমাংসকগণের মত খণ্ডনপূর্বক জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনে প্রযত্ন করেছেন; উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।৫৪, ৯৯

৩৯। শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩. ৪. ৩৬. (অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ); ৩. ৪. ৩৭. (অপি চ স্মর্যতে); রামমোহন এই দুই সূত্রের ভাষ্যে শংকরকেই অনুসরণ করেছেন, যথা "…আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে; রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন বেদে আছে। স্মৃতিতেও আশ্রম বিনা জ্ঞান জন্মে এমত নিদর্শন আছে।"—বেদান্তগ্রন্থ: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৯৬

৪০। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার: গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৯৮

৪১। বেদান্তগ্রন্থ: ভূমিকা: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৩; আরো দ্রষ্টব্য কবিতাকারের সহিত বিচার: গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৮৯; *A Defence of Hindoo Theism in reply to the Attack of an Advocate for Idolatry at Madras*: The English Works of Raja Rammohun Roy, Pt. II, ed. K. D. Nag and D. Burman, Calcutta, 1946, p. 85; *English Translation of the Kenopanishad; Introduction, Ibid.* p. 14.

৪২। ঈশোপনিষৎ: ভূমিকা: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৯৫-৯৬; রামমোহন রায়, উপনিষদ্ (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৯৭০) পৃ. ২০, ২৩; আরো দ্রষ্টব্য, বেদান্তগ্রন্থ: ভূমিকা: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৬; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ: ভূমিকা: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৪৪-৪৫

৪৩। ব্রাহ্মণ সেবধি—সংখ্যা ২: গ্রন্থাবলী ৫, পৃ. ১৪-১৫; আরো দ্রষ্টব্য, গোস্বামীর সহিত বিচার: গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৪৯-৫০; পথ্যপ্রদান: গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১৩২-৩৩; কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার: গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১৮৪; বর্তমান লেখকের 'রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ২২৯-৪৮) নিবন্ধে এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪৪। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ: গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৩৩

৪৫। গোস্বামীর সহিত বিচার: গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫২; আরো দ্রষ্টব্য, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ: গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৫, ৮; সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ: গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৩১ ৩৩

৪৬। এই উক্তি সাধারণভাবে আদি ভাষ্যকারগণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। উত্তরকালে এঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত অনুবর্তীগণ কোনো কোনো স্থলে কিছু অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেছেন, যেমন অদ্বৈতবেদান্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি ছাড়াও স্বীকৃত হয়েছে অর্থাপত্তি, উপমান ও অনুপলব্ধি (দ্রষ্টব্য ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র কৃত বেদান্তপরিভাষা, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। তা ছাড়া রামানুজ তাঁর গীতাভাষ্যে (১৫. ১৫) ইঙ্গিত করেছেন, যোগলব্ধ আত্মানুভূতি জ্ঞানের অন্যতম আকর (…সর্বস্য ভূতজাতস্য চ সকলপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিমূলজ্ঞানোদয়দেশে হৃদি সর্বং মৎসংকল্পেন নিয়চ্ছন্ অহমাত্মতয়া সন্নিবিষ্টঃ। …অতো মত্তঃ এব সর্বেষাং স্মৃতিঃ জায়তে; স্মৃতিঃ পূর্বানুভূতবিষয়মনুভবসংস্কারমাত্রজং জ্ঞানম্। জ্ঞানমিন্দ্রিয়লিঙ্গাগমযোগজো বস্তুনিশ্চয়ঃ সোঽপি মত্তঃ। অপোহনং চ, অপোহনং জ্ঞাননিবৃত্তিঃ)। রামমোহন তাঁর বেদান্ত সম্পর্কিত রচনাসমূহে প্রমাণ নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে এই সব বিতর্কের মধ্যে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৪৭। শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ২. ১. ২৭.: "শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, তদ্‌যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্।… লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্যবিষয়া দৃশ্যন্তে তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে…কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত।" উক্ত সূত্রের ভাষ্যপ্রসঙ্গে রামানুজ বলেছেন, সাধারণ অভিজ্ঞতার রাজ্যের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে ব্রহ্মের পার্থক্য এই যে ব্রহ্মকে (তর্কের সাহায্যে) প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করা সম্ভব নয় ('ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দূষণং বাঽর্হতি ব্রহ্ম'—শ্রীভাষ্য: ২. ১. ২৭.)।

৪৮। শ্রীভাষ্য: ২. ১. ৬.: "অবশ্যং চ শাস্ত্রস্য অনন্যাপেক্ষস্যাতীন্দ্রিয়ার্থগোচরস্যাপি তর্কোঽনুসরণীয়ঃ। যতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং ক্বচিৎক্বচিদ্বিষয়ে তর্কানুগৃহীতানামেবার্থনিশ্চয়হেতুত্বম্। তর্কো হি নামার্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রীবিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থবিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ন্তুদিতিকর্তব্যতারূপমূহাপরপর্যায়ং জ্ঞানম্। তদপেক্ষা চ সর্বেষাং প্রমাণানাং সমানা। শাস্ত্রস্য তু বিশেষেণাকাঙ্ক্ষাসংনিধিযোগ্যতাজ্ঞানাধীনপ্রমাণভাবস্য সর্বত্রৈব তর্কানুগ্রহাপেক্ষা।"

৪৯। রামমোহন-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ১. ৩. ২৮; ৩. ২. ২৪; ৪. ৪. ২০, ইত্যাদি; দ্রষ্টব্য বেদান্তগ্রন্থ: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৮, ৭৩, ১১৩;

কিন্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমান বিষয়ে শংকর বা রামমোহন স্বতন্ত্র আলোচনাতে বড় একটা উৎসাহী-ছিলেন না। অবশ্য শংকর ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে শ্রুতিপ্রমাণ হতে ভিন্ন দুটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ যে না করেছেন তা নয়, যেমন, "ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেঽপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বম্।...ন চানুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যং যেনাত্মত্র দৃষ্টং নিদর্শনমপেক্ষতে'—শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ১. ১. ৪; কিন্তু তাঁর দৃষ্টি মুখ্যত শ্রুতিনিবদ্ধ ছিল বলেই তিনি তাঁর ভাষ্যের কোনো কোনো স্থলে সাধারণ অর্থে শ্রুতিপ্রমাণকে প্রত্যক্ষ (direct knowledge) আর স্মৃতিকে অনুমান (indirect knowledge) রূপে বর্ণনা করেছেন; দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ৩৬। রামমোহন এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী। শংকর-পরবর্তী অদ্বৈতবেদান্তীগণই বেদান্তের প্রমাণ-অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রত্যক্ষ (perception) ও অনুমান (inference)-কে বেদান্তদর্শনের দুই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের 'বেদান্তপরিভাষা' (রচনাকাল আনুমানিক খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) অদ্বৈত -বেদান্তের প্রমাণতত্ত্ব বিষয়ক এই শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। রামমোহন তাঁর ভাষ্যে বা অন্যত্র বেদান্তের এই প্রমাণতত্ত্বের দিকটি নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি, কেননা বিচারে তাঁর প্রতিপক্ষগণ কেউই এ-সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবতারণা করেন নি।

৫০। রামমোহন-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ২. ১. ১১; দ্রষ্টব্য : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৩৮। এ সিদ্ধান্ত শংকর-মতেরই প্রতিধ্বনি, দ্রষ্টব্য "ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্তি, উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ'—শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ২. ১. ১১

৫১। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫৭; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত সমালোচনার প্রত্যুত্তরস্বরূপ নিজের সম্পর্কে তাঁর উক্তিতেও অনুরূপ মনোভাব পরিস্ফুট : "আর একজন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে আপনার অনুভবের দ্বারা ও বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ...।"— 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৬৪

৫২। *Works of Sir William Jones*, Vol. VI (G. G. and J. Robinson, London, 1799) pp. 423-25; ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে জোন্সের গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হলেও এই অনুবাদ করা হয়েছিল আরো কয়েক বৎসর পূর্বে, ১৭৯৩ অথবা ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে; দ্রষ্টব্য : G. H. Cannon, Jr., *Sir William Jones, Orientalist, An Annotated Bibliography of His Works* (Honolulu, 1952) p. 58; পাশ্চাত্য জগৎকে হিন্দুদের বৈদিক সাহিত্যের কিছু নিদর্শন দেবার উদ্দেশ্যে জোন্স বেদের অন্য কয়েকটি অংশের সহিত এই উপনিষদখানির অনুবাদ করেন।

৫৩। William Carey, *A Grammar of the Sungskrit Language* (Misson Press, Serampore, 1806) Book V. Chapter II. pp. 903-06; জোন্সের পূর্বপ্রকাশিত অনুবাদ কেরীকে বিষয়-নির্বাচনে অনেক পরিমাণে প্রণোদিত করেছিল সন্দেহ নেই। এখানে উল্লেখ্য কেরী তাঁর গ্রন্থে ইংরেজি অনুবাদসহ ভাগবত পুরাণের প্রথম অধ্যায় ও বাইবেল থেকে সন্ত ম্যাথিউ লিখিত গসপেলের প্রথম তিন অধ্যায়ের সংস্কৃত অনুবাদও ঈশোপনিষদের পাশাপাশি সংযোজিত করেছেন। এই তিনটি সংস্কৃত রচনা মুদ্রণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে এগুলি exercises in parsing বা সংস্কৃত পদের অন্বয় অভ্যাস করবার নিমিত্ত প্রদত্ত পাঠাবলী। ঈশোপনিষদের অনুবাদ ও মুদ্রণের পশ্চাতে তাঁর কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল না। শংকর বা অন্য কোনো ভাষ্যকারের উল্লেখ তিনি করেন নি।

৫৪। ঈশোপনিষৎ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২০৪

৫৫। ঐ: "...তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েকজন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে...ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়।"

৫৬। গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১১, ১৩, ১৮৭, ১৯৫, ২১২, ২৪৭; রামমোহনের বৈষ্ণব প্রতিপক্ষ তাঁকে শংকরপন্থী আখ্যা দিয়ে বিদ্রূপ করলে প্রত্যুত্তরে রামমোহন লেখেন, "আমাদের প্রতি আচার্যমতাবলম্বী বলিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব" 'গোস্বামীর সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫৫-৫৬

৫৭। 'বেদান্ত-গ্রন্থ' : ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৩; 'গোস্বামীর সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫০

৫৮। রামানুজ-ধৃত সূত্রসংখ্যা ৫৪৫; ভাস্করের ৫৪১; মধ্বের ৫৬৪; বল্লভের ৫৫৪; বিজ্ঞানভিক্ষুর ৫৫৫; এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের

৫৫৮। এর মধ্যে বলদেবের সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের কোনো মিল না থাকলেও তাঁর আলোচিত সূত্রগুলির মোট সংখ্যা রামমোহন-ভাষ্যের মোট সূত্রসংখ্যার সঙ্গে মেলে।

৫৯। শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৪. ৩. ১৪: "তাবেতৌ দ্বৌ পক্ষাবাচার্যেণ সূত্রিতৌ। গত্যুপপত্ত্যাদিভিরেকঃ মুখ্যত্বাদিভিরপরঃ। তত্র গত্যুপপত্ত্যাদয়ঃ প্রভবন্তি মুখ্যত্বাদীনাভাসয়িতুং, ন মুখ্যত্বাদয়ো গত্যুপপত্ত্যাদীন্ ইত্যাদ্য এব সিদ্ধান্তো ব্যাখ্যাতঃ। দ্বিতীয়স্তু পূর্বপক্ষঃ।...কেচিৎ পুনঃ পূর্বাণি পূর্বপক্ষসূত্রাণি ভবন্ত্যান্তরাণি সিদ্ধান্তসূত্রাণীত্যেতাং ব্যবস্থামনুরুধ্যমানাঃ পরবিষয়া এব গতিশ্রুতীঃ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি।"

৬০। বেদান্ত-গ্রন্থ: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৭৬; রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত 'রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী (কলিকাতা ১৮৮০)তেও (পৃ. ৭৭) এই মুদ্রণ-প্রমাদটি স্থান পেয়েছে। সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস নির্বিচারে সেই ভুলপাঠেরই পুনর্মুদ্রণ করেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'বেদান্ত-গ্রন্থ'এর দুষ্প্রাপ্য প্রথম সংস্করণেও আলোচ্য পাঠ 'শরবচ্চ তন্নিয়মঃ' (দ্রষ্টব্য 'বেদান্ত-গ্রন্থ', প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮১৫, পৃ. ১০৪); অর্থাৎ এই মুদ্রণ-প্রমাদ প্রথম সংস্করণ থেকেই চলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনো সম্পাদকই এ পর্যন্ত অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃত পাঠ নির্ধারণের চেষ্টা করেন নি। এস্থলে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত ও অনূদিত শাংকরভাষ্য ও বাচস্পতি মিশ্র কৃত ভামতী টীকা সমেত ব্রহ্মসূত্রের সুবিখ্যাত সংস্করণেও আলোচ্য সূত্রটিতে (৩. ৩. ৩.) 'সববচ্চ তন্নিয়মঃ'এর স্থলে ছাপা হয়েছে 'সরবচ্চ তন্নিয়মঃ'; দ্রষ্টব্য, কালীবর বেদান্তবাগীশ বেদান্তদর্শনম্, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৬০) পৃ. ১৭১; এই প্রমাদ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের ন্যায় বিচক্ষণ সম্পাদকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

৬১। আশ্চর্যের বিষয়, আচার্য শংকরের প্রতিভাকে বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত করবার রামমোহনের এই প্রয়াস আধুনিক কালে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায় নি। শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থের আলোচনা-পরিধি যদিও আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তথাপি রামমোহন-কৃত বেদান্ত-ভাষ্য (১৮১৫) ও রামমোহন সম্পাদিত ও প্রকাশিত শাংকর-ভাষ্যের সম্পূর্ণ সংস্করণ সেখানে অনুল্লিখিত; দ্রষ্টব্য 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথম ভাগ (কলিকাতা, ১৩৭২), পৃ. ২২৯-৩০; দ্বিতীয় ভাগ (কলিকাতা, ১৩৭৩), পৃ. ৫৫৭-৮০

৬২। শাংকরভাষ্য, বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২. ৪. ১০.

৬৩। *Indian Philosophy* (Indian Edition, 1940) Vol. II. p. 449; আপাতদৃষ্টিতে এর ব্যতিক্রম শংকরের নামে প্রচলিত 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য'। এই ভাষ্যে, বিশেষ করে এর ভূমিকায়, বিষ্ণু, বিষ্ণুধর্ম, ব্রহ্ম, লিঙ্গ, শিবধর্মোত্তর প্রভৃতি বহু পুরাণের বচন সবিস্তারে উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এই ভাষ্য প্রকৃতপক্ষে শংকরের রচনা বলে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন না। শংকরের দশোপনিষদভাষ্যের উপর যিনি টীকা রচনা করেছিলেন সেই আনন্দগিরির উক্ত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্যের উপর লিখিত কোনো টীকা পাওয়া যায় নি। এতেও এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ হয়।

৬৪। S. N. Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol. III. (Cambridge, 1940) p. 482

৬৫। Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol. V. (Cambridge 1955), p. 91

৬৬। *Ibid*, p. 181

৬৭। 'গোস্বামীর সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৪৯-৫১

৬৮। 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৪, ২০, ২৩, ৩৭ ইত্যাদি; 'গোস্বামীর সহিত বিচার', গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫১-৫২; 'চারিপ্রশ্নের উত্তর', গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১৪; 'পথ্যপ্রদান', গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ৯২ ইত্যাদি।

৬৯। 'বেদান্তগ্রন্থ', গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৩

৭০। ঐ, পৃ. ১৫-১৬

৭১। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৬৪

৭২। 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-ভূমিকা': গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২০৭

৭৩। ঐ, পৃ. ২৫৫

৭৪। 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৬

৭৫। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৭৪

৭৬। 'ব্রহ্মসংগীত' : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫৯

৭৭। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৭৯ : এই উপলক্ষে রামমোহন ব্রহ্মসূত্র ৪. ১. ৪.; 'ন প্রতীকেন হি সঃ' উল্লেখ করেছেন। শংকর এই সূত্রের ভাষ্যে বলেন : 'ন প্রতীকেষ্বাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ। ন হ্যুপাসকঃ প্রতীকানি ব্যস্তান্যাত্মত্বেনাকলয়েৎ।··· বিকারস্বরূপোপমর্দেন হি নামাদিজাতস্য ব্রহ্মত্বমেবাশ্রিতং ভবতি। স্বরূপোপমর্দে চ নামাদীনাং কুতঃ প্রতীকত্বমাত্মগ্রহো বা। ন চ ব্রহ্মণ আত্মত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেম্বাত্মদৃষ্টিঃ কল্প্যা কর্তৃত্বাদ্যনিরাকরণাৎ। কর্তৃত্বাদিসর্বসংসারধর্মনিরাকরণেন হি ব্রহ্মণ আত্মত্বোপদেশঃ তদনিরাকরণেন চোপাসনাবিধানম্। অতশ্চোপাসকস্য প্রতীকৈঃ সমত্বাদাত্মগ্রহো নোপপদ্যতে। ন হি রুচকস্বস্তিকয়োরিতরেতরাত্মত্বমস্তি সুবর্ণাত্মনৈব তু ব্রহ্মাত্মত্বেনৈকত্বে প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গমবোচাম। অতো ন প্রতীকেম্বাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে।"—শংকরের এই সূত্রটির ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে প্রতীকোপাসনা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। প্রতীকোপাসনা-বিরোধী রামমোহন যে শংকরের এবংবিধ সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন সে আর আশ্চর্য কী ?

৭৮। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ : ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২০৭

৭৯। শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩. ৪. ২০ : 'ব্রহ্মসংস্থ ইতি হি ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিরনন্যব্যাপারতারূপং তন্নিষ্ঠত্বমভিধীয়তে। তচ্চ ত্রয়াণামাশ্রমাণাং ন সম্ভবতি, স্বাশ্রমবিহিতকর্মানুষ্ঠানে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। পরিব্রাজকস্য তু প্রত্যবায়ো ন সম্ভবত্যনুষ্ঠাননিমিত্তঃ।'

৮০। ঈশোপনিষৎ : ভূমিকা, গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৯৮-৯৯

৮১। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড (শতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ৪৮, ৪৯, ৫০

৮২। 'অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি'—সদানন্দকৃত বেদান্তসার, ১৩ (কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৫-৪৭); শংকরাচার্যের নামে প্রচলিত 'সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ' গ্রন্থেও সংক্ষেপে মায়া বা অজ্ঞানের সুন্দর সংজ্ঞানির্ণয় করা হয়েছে :

সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যমজ্ঞানং ত্রিগুণাত্মকম্
বস্তুতত্ত্বাববোধৈকবাধ্যং তদ্ভাবলক্ষণম্। শ্লোক ৩০৪

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ : (প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত ও অনূদিত, কলিকাতা, ১৩৩৬), পৃ. ১২১

৮৩। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মায়াবাদ (বিশ্বভারতী, ১৩৫০) পৃ. ৩৩-৩৪

৮৪। এ বিষয়ে রামমোহনের কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে, দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩ ও ৭৪; এগুলি ছাড়া তিনি মায়াবাদ সম্পর্কে তাঁর রচনার অন্যত্র কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন; দ্রষ্টব্য 'ব্রাহ্মণ সেবধি', প্রথম সংখ্যা : গ্রন্থাবলী ৫, পৃ. ৬-১০; সম্প্রতি কেউ কেউ বলেছেন, রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে উক্ত মায়াবাদ-ব্যাখ্যা অদ্বৈত-বেদান্তসম্মত হলেও এ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত না হতেও পারে কেননা এখানে রামমোহন সাধারণভাবে খ্রীস্টীয় মিশনারীগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ হিন্দু দর্শনপ্রস্থান ও শাস্ত্রের স্বপক্ষে নিরপেক্ষভাবে তাঁর যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। এই সমালোচকগণ উদাহরণস্বরূপ সাধারণত লর্ড আমহার্স্ট কে লিখিত রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক পত্রে বৈদান্তিক মায়াবাদ সম্পর্কে রামমোহনের কিছু আপাত-বিরূপ মন্তব্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। কিন্তু তর্কের খাতিরে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র উক্তি সম্পর্কে এঁদের মত যদি মেনেও নেওয়া যায়, তা হলেও প্রশ্ন থাকে তাঁর উপনিষদ্-ভূমিকা, ব্রহ্মসংগীত ও বিচারগ্রন্থগুলিতেও কি রামমোহন ব্রহ্মতত্ত্ব ও মায়া সম্পর্কে তাঁর স্বীয় মত প্রকাশ করেন নি? এই কারণেই 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র উক্তি বাদ দিয়ে রামমোহনের অন্যান্য গ্রন্থ থেকেই তত্ত্বসিদ্ধান্তবিষয়ক তাঁর উক্তি নির্বাচন করা হয়েছে। আমহার্স্ট কে লিখিত তাঁর পত্রস্থ বেদান্তবিষয়ক উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য প্রবন্ধমধ্যে ইতিপূর্বে প্রসঙ্গত করেছি। রামমোহনের উক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে কোনো মত তাঁর উপরে আরোপ করাও এক ধরনের অধ্যাস!

৮৫। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৮৮২ শক) 'রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র', পৃ. ২২৫-৪৮; বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জীর জন্য এই রচনা দ্রষ্টব্য।

৮৬। কুলার্ণব তন্ত্র ৯. ৩২, Tantric Texts Series, Vol. V. London, 1917, p. 127

৮৭। Surendranath Dasgupta, "General Introduction to Tantra Philosophy", *Sir Ashutosh Mukerjee Silver Jubilee Volume*, Vol. III. Part I, p. 255

৮৮। Chintaharan Chakrabarty, 'Tantra and Vedanta', *Kalyāṇa-Kalpataru*, vol. III. No. 1, p. 176

৮৯। A. K. Raychoudhuri, *The Doctrine of Maya*, p. 180 ; তন্ত্রের মায়াভাবনা সম্পর্কে প্রামাণিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Sir John Woodroffe, *Shakti and Shakta*, London, 1918, pp. 53-109

৯০। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, তন্ত্রতত্ত্ব, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কাশী, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮১

৯১। শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ১. ২. ৪ : 'তথা উপাস্যোপাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব'।

৯২। রামমোহন-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৪. ১. ১২ : বেদান্তগ্রন্থ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১০১

৯৩। 'অনুষ্ঠান', গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৬৯

৯৪। 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ'-ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৩৯

৯৫। 'ব্রহ্মোপাসনা', গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫১

৯৬। 'ঈশোপনিষৎ'-ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২০১ ; 'বেদান্তগ্রন্থ' : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৫-৬

৯৭। 'প্রার্থনাপত্র' : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ২৭-২৮

৯৮। 'ব্রহ্মোপাসনা' : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫১

৯৯। বেদান্তগ্রন্থ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৬ ; এক্ষেত্রে মধ্ব অনেকটা একরকম কথা বললেও উপাসনার স্থলে বেদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বচন অর্থ করেছেন : 'যথা সর্বং সলিলং সমুদ্রং গচ্ছতি এবং সর্বাণি বচনানি ব্রহ্মজ্ঞানার্থানীতি নিয়মঃ'। রামমোহনের ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সরল ও উদার। মধ্ব এই প্রসঙ্গে বেদের শাখাসমূহ ও অগ্নিপুরাণের নজির যে ভাবে টেনে এনেছেন তা অনাবশ্যক ও কষ্টকল্পিত মনে হয় ; দ্রষ্টব্য, মধ্বভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩. ৩. ৪ ; ও তার উপর জয়তীর্থ রচিত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা।

১০০। 'উপাসনস্তু সা মর্থাৎ বিদ্যোদপত্তির্ভবেত্ততঃ।
নাস্যঃ পন্থা ইতি হেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে॥ পঞ্চদশী ৯. ১৪ (আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-কৃত সংস্করণ, পৃ. ৫৬৬-৬৭)

১০১। এ সম্পর্কে বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যাতে বর্তমান লেখকের বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১০২। *The English Works of Raja Rammohun Roy*, ed. K. D. Nag and D. Burman, Part II, pp. 44-47

১০৩। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৬৪-৬৫

১০৪। রামমোহন-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩. ৩. ৫১ : বেদান্তগ্রন্থ, গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৮৮-৮৯। এই সূত্রে খ্রীস্টের দুটি অমূল্য উপদেশ মনে পড়ে : Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbour as thyself. (Mathew, xxii. 37, 38, 39). রামমোহনের পূর্বোক্ত সূত্রব্যাখ্যার সঙ্গে এর ভাবসাদৃশ্য চমকপ্রদ। প্রসঙ্গত বলা যায় খ্রীস্টের এই উপদেশদ্বয় রামমোহনের অতি প্রিয় ছিল ; তিনি তাঁর খ্রীস্টবাণীসংগ্রহে এগুলি চয়ন করেছিলেন ও খ্রীস্টীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কে এগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছিলেন ; দ্রষ্টব্য 'The Precepts of Jesus' *English Works*, Part V, p. 38 ; 'Second Appeal to the Christian Public', *English Works*, Part VI, pp. 2-3

১০৫। 'ব্রহ্মোপাসনা' : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫১

১০৬। 'Brahmunical Magazine, No. IV, *English Works*, Part II, p. 189

১০৭। H. H. Wilson, *Dictionary Sanscrit and English*, Calcutta, 1819. Preface, pp. xv-xvi

১০৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৬, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ১২ শ্রাবণ ১২৭৯ । ২৬ জুলাই ১৮৭২

মৃত্যু : ২০ বৈশাখ ১৩৪৭ । ৩ মে ১৯৪০

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ করে ইদানীং আমরা একে একে আমাদের স্বর্গত মহাত্মাদের স্মরণ করছি। সন-তারিখ মিলিয়ে যদিচ এক-একজনকে আলাদা করে স্মরণ করা হচ্ছে তা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মধ্য দিয়ে আমরা দেশের একটি অতি মহিমান্বিত যুগকেই সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। শতাব্দীকাল পূর্বে জাতির প্রাণশক্তি সহসা উদ্‌বোধিত হয়ে একে একে বহু জ্যোতিঃশিখায় সমগ্র দেশকে উদ্‌ভাসিত করেছিল। সে জ্যোতির্ময় যুগ শেষ হয়েছে। বঙ্গদেশের আজ পঙ্গু দশা—"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই"। যে যুগ যায় সে আর ফিরে আসে না, ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটে না। এখন তার স্মৃতিটুকু শুধু সম্বল। অবশ্য সেটাও কিছু কম কথা নয়। ইতিহাসের প্রধান কাজ অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। জাতির সঞ্চিত ধনের ভাণ্ডার তার ইতিহাসে। সে কথাটি স্মরণ থাকলে আপদ্ধর্মে অতীতের ভাণ্ডার থেকে বর্তমানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হতে পারে। সে কর্তব্য আমরা সজ্ঞানে সাধ্যমত পালন করেছি এমন বলা চলে না। সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা এ কালের স্বভাবগত। অবস্থা বুঝে পুরোনো তহবিলও যে ঘাটতে হয় সে কথা মনে রাখি নি। অতীতের দিকে ফিরে তাকাই নি। নানা কারণে এখন আমরা অন্যমনা, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, না-হয় তো অন্যত্র নিবদ্ধ।

ইতিহাসের দৃষ্টিও সব সময়ে খুব স্বচ্ছ এমন বলা চলে না। অনেক সূক্ষ্ম জিনিস তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্লিওর স্বভাবে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা আছে। তিনি হাঁক ডাক জাঁক ভালোবাসেন। একটু আড়ম্বর চাই, সমারোহ চাই, নইলে তিনি সমাদর করেন না। যথেষ্ট পরিমাণে সোরগোল করতে না পারলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। ইংরেজ সাহিত্যিক ইতিহাসের এই স্বভাবের প্রতি লক্ষ রেখে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন—প্রচণ্ড ঝড় এসে যখন ডালপালা ভাঙে, গাছ ওপড়ায়, বাড়ির ছাত উড়িয়ে নেয়, প্রাণ নাশ করে, তখন সেটা ইতিহাসের সামগ্রী হয়; কিন্তু অত্যন্ত মৃদু যে দক্ষিণের বাতাস ফুলের রেণু ছড়িয়ে দেয়, নতুন সৃষ্টির বীজ বপন করে, কই তার কথা তো ইতিহাসে লেখা থাকে না। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন অন্য সূত্রে। বলেছেন, সংসারের পরম আশ্চর্য ব্যাপারগুলি পরম নিঃশব্দে ঘটে। খুব খাঁটি কথা। বৃহৎ এবং মহৎ সব সময়েই নম্র এবং বিনীত।

এ কথা মানতেই হবে যে ইতিহাস-প্রখ্যাত ব্যক্তিরা সকলেই নিজ নিজ কৃতিত্বের কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ লোকসমক্ষে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু আজ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে মানুষটিকে আমরা স্মরণ করছি—সেই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন কাটিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। লোকসমক্ষে নিজেকে কখনো জাহির করেন নি। আজকের বাংলাদেশ তাঁকে জানেও না, চেনেও না। তার প্রমাণ, দেশবাসীর তরফ থেকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালনের কোনো আয়োজন হয় নি। অথচ মানুষটি সর্বপ্রকারে এমন অনন্যসাধারণ যে ভিড়ের মধ্যেও কোনোমতেই হারিয়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমন মানুষকেও আমরা ভুলে

গিয়েছি। আমাদের গত এক শো বছরের ইতিহাস থেকে তিনি বাদ পড়ে গিয়েছেন। ইতিহাসের মতি-গতি একটু অতিমাত্রায় সাংসারিক। জীবনের চরিতার্থকে সে সাংসারিক success-এর দ্বারা যাচাই করে। কী করেছে, কী পেয়েছে তাই দিয়ে বিচার, মানুষটা কী হয়েছে তার বিচার নেই। সংসারে আমরা যাঁদের বলি কৃতকর্মা শ্রুতকীর্তি পুরুষ, সুরেন ঠাকুরকে ঠিক সে দলের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এ মানুষের মর্ম বুঝতে হলে বিশেষ রকমের মূল্যবোধের প্রয়োজন। ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। কল্পনার জগতে যত সহজে বিচরণ করেছেন, দৈনন্দিনের শক্ত ডাঙায় কর্মের রথটাকে তত জোর কদমে চালাতে পারেন নি। কল্পনা এবং পরিকল্পনায় যতখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কর্মতৎপরতায় ততখানি নয়। কর্মজীবনের ব্যাপকতা কিম্বা কৃতকার্যতা কোনোটাই ইংরেজিতে যাকে বলে spectacular তা বলা চলে না। সমস্তই এমন নিভৃতে নীরবে নির্বিকার চিত্তে করেছেন যে ফল লাভের আশা কখনো মনেই রাখেন নি। নগদ প্রাপ্যের দ্বারা কাজের মূল্য নিরূপিত হয় না, যথার্থ মূল্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মধ্যে নিহিত। কোমল স্বভাবের মানুষ, হাতের মুঠো শক্ত ছিল না। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে করায়ত্ত করবার প্রয়াস সব সময়ে সফল হয় নি। প্রতিভা ছিল বহুমুখী, বহু কাজে হাত লাগিয়েছেন। মাথা খেলেছে অনেক কিছুতে কিন্তু মন লাগে নি সব কিছুতে। আরম্ভ করেছেন, শেষ করেন নি। আবার যেখানে মন লেগেছে সেখানে কাজ করেছেন প্রাণ দিয়ে। এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যেটুকু করেছেন তারই মধ্যে তাঁর প্রতিভা এবং স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন। ইংরেজ কবি কোলরিজ সম্পর্কে একজন বলেছিলেন—What he wrote well could be bound up in just twenty pages but those twenty pages must be bound up in pure gold। সুরেন ঠাকুর সম্পর্কেও তেমনি বলা চলে যে দেশের জন্যে এবং দশের জন্যে যেটুকু তিনি করেছেন দেশ যদি তার মর্ম বুঝত তা হলে আমাদের ইতিহাসে তাঁর নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত।

সুরেন্দ্রনাথকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন, জেনেছেন, তাঁরা বলেন এমন সুডৌল নিটোল নির্ভেজাল নিষ্কলুষ চরিত্র সংসারে বিরল। 'অভিজাত' কথাটি আজকের দিনে বহুনিন্দিত। কিন্তু মনে মজ্জায় লাগলে এ জিনিস যে কী অনিন্দনীয় রূপ পরিগ্রহ করে সুরেন ঠাকুর তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। বংশগৌরবজাত সাবেকি আভিজাত্যের সঙ্গে মিশেছিল পদগৌরবজাত নয়া আভিজাত্য— একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, অপর দিকে ভারতবর্ষের প্রথম সিভিলিয়ান-এর একমাত্র পুত্র। অর্থগৌরব তো ছিলই; কিন্তু এত সব মিলেও অনর্থ ঘটাতে পারে নি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এরূপ ক্ষেত্রে 'স্নবারি' নামক একোহি দোষো গুণরাশিনাশী হতে পারত। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ আভিজাত্যের সঙ্গে মিশেছিল সুচারুতম শিক্ষা এবং রুচির আভিজাত্য। এটিই রক্ষাকবচ। ফলে এক অনন্যচরিত্র মানুষের সৃষ্টি হল।

এ মানুষ সব রকমে ব্যতিক্রম। আগেই বলেছি এঁকে বুঝতে হলে বিশেষ রকমের মূল্যবোধ চাই। প্রথম সিভিলিয়ানের একমাত্র পুত্র। মনে করা স্বাভাবিক যে, সে পুত্রটি একটি উৎকট রকমের সাহেব হবেন। কিন্তু কার্যত তিনি হলেন ভয়ংকর রকমের স্বদেশী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরিবার-পরিবেশের মধ্যেই স্বাদেশিকতার একটি উদ্যম নিত্য জাগরূক ছিল। হিন্দু মেলার যুগে পিতা সত্যেন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন আমাদের অন্যতম প্রথম স্বদেশী সংগীত— মিলে সবে ভারত সন্তান। এককালে এটি বলতে গেলে আমাদের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছিল। স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর। অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, সুরেন ছিল 'ডাকাবুকো' ছেলে, কোনো কিছুতে ভয় পেত না। অপর

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ

দিকে টিলক, লাজপৎ রায়, বিপিন পাল, কেলকার, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুরেন ঠাকুরের যে ছবিটি অনেকেই দেখেছেন তাতেই প্রমাণ যে কিছু কালের জন্যে হলেও তিনি কংগ্রেস আন্দোলনেরও পুরোভাগে ছিলেন। এক সময়ে স্বাদেশিকতার সদর রাস্তা ছেড়ে সুরেন ঠাকুর চলে গেলেন বিপ্লবের গোপন গহন কণ্টকাকীর্ণ পথে। সেকালের প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির তিনি হলেন কোষাধ্যক্ষ। বিপ্লবীদের সকল দুঃসাহসিক কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, আগ্নেয়াস্ত্র জুগিয়েছেন, অর্থদান করেছেন অকাতরে। দেশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, লোকে মনে করত জমিদারি পরিদর্শনে এসেছেন। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল কোথায় কোথায় বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা হতে পারে তার সন্ধান; কোথায় পাহাড়, কোথায় জঙ্গল, নদী নালা, খাল বিল—যেখানে আত্মগোপন করে বিপ্লবীরা প্রয়োজন হলে খণ্ডযুদ্ধও চালাতে পারেন। নানা দেশের বিপ্লবকাহিনী এবং বিপ্লবের নানা স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে ক্লাস করতেন। মনে হয় আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাতেই গেরিলা যুদ্ধের কথাও তাঁর মাথায় এসেছিল। এ কথা অনেকেরই জানা ছিল না যে বিপ্লবের আয়োজনে সর্বপ্রথম যে গুপ্ত সমিতিটি স্থাপিত হয়েছিল তার পঞ্চ-প্রধান ছিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন ঠাকুর ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে ইনি নিরালম্ব স্বামী নামে খ্যাত হয়েছিলেন)।

ভাবলে অবাক লাগে, অতি আদরের একমাত্র পুত্র, মাতা জ্ঞানদানন্দিনীর নয়নের মণি—চোখের আড়াল করতে চান নি। এমন-কি, বি.এ. পাস করবার পরে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যেতে দেন নি। কোন্ দুঃখে বিদেশে গিয়ে কষ্ট পাবে। কোথাও যেতে হবে না, ঘরের ছেলে ঘরেই থাকবে। সেই ছেলে কী ভয়ংকর বিপদের মুখে পা দিলেন মা কি সে খবর জানতেন? আগুন নিয়ে কারবার, যে-কোনো মুহূর্তে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারত। রডা কোম্পানির (বন্দুক-পিস্তল-আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসায়ী) গাড়ি-বোঝাই মাল জাহাজঘাট থেকে পাচার হয়ে গেল। সে যুগের বিষম চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিপ্লবীদের কাণ্ড। মাল পাচার তো হল কিন্তু সে জিনিস আগলাবে কে, রাখবে কোথায়? রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছি আগলেছিলেন সুরেন ঠাকুর, অন্তত কিছু দিনের জন্যে হলেও তাঁর হেপাজতে ছিল। সেই তখনকার দিনে এ কাজ যে কতখানি বিপজ্জনক ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। বলতে গেলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই এ-সব করতে হয়েছে। নিজ মুখে কখনো কিছু বলেন নি বলে সুরেন্দ্রনাথের বিপ্লবী জীবনের কাহিনী দেশবাসীর কাছে কিম্বদন্তী হয়েই রয়েছে। বিপ্লবের ইতিহাসেও তাঁর সম্বন্ধে সবিস্তারে কেউ লেখেন নি। প্রবীণ বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার বলেছেন, সুরেনবাবুকে অনেক সময় পুরোনো দিনের কথা জিজ্ঞেস করেছি। সব সময়ে এড়িয়ে যেতেন, কিছুই বলতেন না, একটু শুধু হাসতেন। আদি যুগের বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় দুঃখ করে বলেছিলেন, সুরেন ঠাকুর দেশের জন্যে এত করলেন, দেশের লোক তার কিছুই জানল না।

সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে সকল ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথকে প্রেরণা জুগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তা হলেও আরো দুজন মানুষ তাঁর জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছেন। এঁরা দুজনেই বিদেশী—এক-জন সিস্টার নিবেদিতা, অপর জন জাপানী মনীষী কাকুজো ওকাকুরা। প্রাচ্য সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি উভয়ের অসীম শ্রদ্ধা। পশ্চিমের মোহে এ দেশীয়রা পাছে আপন মহিমা ভুলে যায় সেজন্যে দুজনেই

মুক্তকণ্ঠে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের গুণকীর্তন করেছেন। ওকাকুরার মনে এই গভীর প্রত্যয় ছিল যে এই প্রাচ্য মহাদেশ বহু দেশ বহু জাতি বহু ধর্ম এবং বহু ভাষায় বিভক্ত হলেও মূলত সকলেই একই সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি *The Ideals of the East* নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা এ দেশেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সে গ্রন্থে তিনি ঘোষণা করেছিলেন— Asia is One. The Himalayas divide only to accentuate the unity of our civilization। নিবেদিতা এবং ওকাকুরা—এ দুই ভারতপ্রেমিক আমাদের বিপ্লব-আন্দোলনে শুধু পরোক্ষ ভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ভাবেও যথেষ্ট শক্তি এবং উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন। নিবেদিতাই ওকাকুরার সঙ্গে সুরেন ঠাকুরের যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। পরে দুয়ের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে যে ওকাকুরা দীর্ঘদিন সুরেন্দ্রনাথের গৃহেই অবস্থান করেছেন। নিবেদিতা এবং ওকাকুরা উভয়েই সুরেন্দ্রনাথকে গভীর প্রীতি এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন। ওকাকুরা বলতেন, Suren is a prince among men।

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় যখন দিশি মূলধনের স্বদেশী ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার কথা উঠল তখন সেখানে আবার সুরেন ঠাকুরের ডাক পড়ল। ব্যাবসা ব্যাপারে খুব একটা মন ছিল না। ইতিপূর্বে একবার ব্যবসায়ে নেমে লোকসান দিয়েছেন, সেজন্যে এবার দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু পরে অম্বিকা উকীল এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আগ্রহাতিশয্যে এসে যোগ দিলেন। উদ্যোগ আয়োজন শুরু হল। ইন্সিওরেন্স ব্যাবসার নতুনত্বটাই বোধকরি তাঁকে আকৃষ্ট করে থাকবে। তা ছাড়া সমবায় নীতিতে বরাবর তাঁর গভীর আস্থা। মুনাফালোভী মুষ্টিমেয় বিত্তবানের টাকায় ব্যাবসা পত্তনে তাঁর আগ্রহ ছিল না। হিন্দুস্থান জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সুরেন ঠাকুর বলেছেন— Capitalists were not wanting, prepared to provide the cash on condition that they were given a controlling hand। কিন্তু তিন প্রতিষ্ঠাতার কারোই সেটা অভিপ্রেত ছিল না। বলেছেন— The solution must come through a system and not by beneficient exploitation। সমবায় নীতিকেই তাঁরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটিকেই বলা যেতে পারে সমবায় ভিত্তিতে গঠিত সে যুগের বৃহত্তম স্বদেশী প্রতিষ্ঠান। সুরেন ঠাকুরকে এদেশে সমবায় আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক বললে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে শান্তিনিকেতনের সমবায় ভাণ্ডারটিও সুরেন ঠাকুরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকের শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরা অনেকেই সে কথাটি জানেন না।

একটি অতিশয় সুকুমার কবিসুলভ মগ্নস্বভাব নির্বিকার মন নিয়ে সংসারধর্ম পালন করেছেন। বিষয়কর্মে মন ছিল না তথাপি এক সময়ে জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন, ফলে জমিদারি হাতছাড়া হয়েছে; ব্যাবসাবুদ্ধি ছিল না কিন্তু ব্যাবসা করতে গিয়েছেন, লোকসান দিতে হয়েছে প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে জমিদারি তদারকে নিযুক্ত। বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ— দুই ভ্রাতুষ্পুত্র মিলে কুষ্টিয়ায় পাটের ব্যবসায়ে নাবলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদের টানে রবীন্দ্রনাথও এসে ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। যে কবি বলেন— লক্ষ্মীরে হারাবই যদি, অলক্ষ্মীরে পাবই— তাঁর যে বাণিজ্যেতে লক্ষ্মীলাভ হবে না সে তো এক রকম জানা কথা। এ ক্ষেত্রে কবি তো আছেনই, বাকি দুজন কবি না হলেও কবিস্বভাবের মানুষ। তার উপরে

আবার ব্যাবসা শুরু হতে না হতেই বলেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন, সুরেন্দ্রনাথ ভালো-মন্দে উদাসীন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকর্মে এবং জমিদারির কাজে ব্যস্ত। এরূপ ক্ষেত্রে ফল যা হবার তাই হল। দেখা গেল বলেন্দ্রনাথের অতি 'বিশ্বস্ত' কর্মচারী হিসাবপত্রে বিস্তর গোল পাকিয়ে রেখে বেশ কিছু টাকা সমেত উধাও হয়েছে। প্রচুর লোকসান দিয়ে ব্যাবসা গুটিয়ে নিতে হল। সেই সময়েই কবি পরিহাস করে ইন্দিরা-দেবীকে লিখেছিলেন— "থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু শা।" ব্যবসায়ের ঐ কৌতুককর অভিজ্ঞতাটি বহুকাল কবির মনে ছিল। বহু বৎসর পরে বোধকরি ঐ কথা স্মরণ করেই তাঁর আমেরিকান ভক্ত মিসেস ভন মোডিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন— The element of loss is the element of poetry in business. মিসেস মোডিও একটি বিরাট ব্যবসায়ের মালিক ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন কবি এবং তিনি নিজেও কাব্যসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগিণী। খুব আশ্চর্যের বিষয় যে ঐ চিঠির বহু বৎসর পরে ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তাঁর ব্যাবসাটিও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি সর্বস্বান্ত হন।

সুরেন্দ্রনাথ নিজের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন কিন্তু দশের অর্থে সমবায় রীতিতে যখন হিন্দুস্থান বীমা সমিতি স্থাপন করেন তখন অপত্য স্নেহে তাকে লালন করেছেন। নিজে সর্বস্বান্ত হয়েছেন কিন্তু সর্ব-সাধারণের সম্পত্তি বীমা কোম্পানিটিকে সকল বিপত্তি থেকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করেছেন। অবশ্য সেই অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠানটিও শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে কোনোপ্রকার তিক্ততা, কারো প্রতি কোনো অভিমান মনে রাখেন নি। নীরবে সরে দাঁড়িয়েছেন। আগেই বলেছি হাতের মুঠো শক্ত ছিল না। যা ধরেছেন তাই হাত থেকে খসে খসে পড়েছে। ব্যবসায়ীর মন নিয়ে তো ব্যাবসা করেন নি। সেই যে স্বদেশী যুগে লোকহিতের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন সেটি জীবনে ভোলেন নি। কলকাতায় রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে কত লোক রাত কাটায়। স্ত্রীকে বলতেন, আমার বড় সাধ প্রত্যেকটি মানুষের মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু থাকে। এ বিষয়ে কিছু পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন। জীবনের অনেক সাধই অপূর্ণ থেকেছে, এটিও কার্যে পরিণত হয় নি। কুলি মজুর গাড়োয়ানরা রাস্তার ধারে বসে চা খায়। বলতেন, আমার ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে বসে চা খাই, ওদের সুখদুঃখের কথা শুনি। বস্তিবাসী মুসলমানরা বলত, ঠাকুর সাহেব তো আমাদের পীর।

নিস্পৃহ নির্বিকার চিত্ত নিয়ে কাজ করেছেন, ফললাভের আশা মনেই রাখেন নি। কবিপ্রকৃতির মানুষ, ঠিক কী ধরনের কাজ হলে মনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যেত নিজেই তা বুঝতে পারেন নি। বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, সুরেনের উচিত ছিল আমার মতো সাহিত্যের কাজ নিয়ে থাকা। অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধিৎসা ছিল বহুবিস্তৃত। লেখার হাতও ছিল চমৎকার কিন্তু চর্চা তেমন করেন নি। 'সাধনা'য় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন— বেশির ভাগ বিজ্ঞান-বিষয়ক। পরবর্তীকালে আবার সবুজপত্রে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে-সব একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে তখন সুরেনবাবুকে বলেছিলেন ছেলেমেয়েদের জন্যে সহজ ভাষায় মহাভারতের মূল কাহিনীটি লিখে দিতে। রবীন্দ্রনাথের আজ্ঞা কখনো অমান্য করতেন না। মহাভারতের গল্প এক-এক অধ্যায় লিখে রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্যে শিলাইদহে আসতেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন, সুরেনদা এসে তাঁর মহাভারতের গল্প দিদিকে আর আমাকে পড়ে শোনাতেন। সে গল্প এতই আমাদের ভালো লেগেছিল যে তিনি আবার কবে আসবেন সে অপেক্ষায় আমরা অধীর আগ্রহে বসে

থাকতাম। ছোটদের জন্যে লেখা সুরেনবাবুর ঐ মহাভারত-কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ঐ কাহিনীটিই রবীন্দ্রনাথ একটু ছেঁটেকেটে বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্যে কুরুপাণ্ডব নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার দরুন সুরেনবাবুর সাহিত্যচর্চা খুব একটা আর হয়ে ওঠে নি। শেষ জীবনে 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' নাম দিয়ে নব্য রাশিয়ার সাম্যবাদী সমাজের একটি চিত্র অতিশয় চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখেছিলেন। এটিও ছেলেমেয়েদের জন্যেই লেখা। এক সময়ে একটি জাপানী গল্পের বই অনুবাদ করে স্ত্রীকে উৎসর্গ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় দখল ছিল অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। সে-সব অনুবাদের উৎকর্ষ ইংরেজ মহলেও সমাদৃত হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসবাস করেন নি কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক বরাবরই রক্ষা করেছেন। সেই প্রথম যুগেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে লিখছেন, সুরেনকে সব বলে এসেছি। কোনো অসুবিধা দেখা দিলে তাঁকে বলবেন, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। রবীন্দ্রনাথের খুব ইচ্ছে ছিল সুরেন্দ্রনাথ এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। দুঃখ করে বলেছেন, বিরুদ্ধ ভাগ্য কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। অবশ্য বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অন্যতম লাইফ ট্রাস্টি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদও গ্রহণ করেছিলেন। উপাচার্য বলতে তখন বোঝাত ভাইস প্রেসিডেণ্ট। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, সুরেন্দ্রনাথ উপাচার্য। বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তার সম্পাদনাভার তাঁর উপরেই অর্পণ করা হয়েছিল। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল। কিন্তু পরবর্তী সংখ্যা থেকেই সম্পাদকরূপে সুরেন্দ্রনাথের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় আট বৎসরকাল অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তিনি ঐ কাজটি সম্পাদন করেছেন। ঐ সময়কার কোয়ার্টার্লিতে তাঁর বেশ কিছু ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

এক সময়ে শান্তিনিকেতনে এসে বসবাস করবার ইচ্ছা বোধকরি তাঁর মনে ছিল। সে উদ্দেশ্যে এখানে একটি গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। নিজ নামানুসারে গৃহটির নাম হয়েছিল সুরপুরী। ইংলিশ কান্ট্রি হাউস্-এর ধরনে তৈরি ঐ সুরম্য গৃহটি বহুকাল শান্তিনিকেতনের একটি দর্শনীয় জিনিস ছিল। এখন তার জীর্ণ দশা। বলা বাহুল্য শেষ পর্যন্ত এখানে এসে বসবাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো ঐ গৃহটিও তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এরূপ একজন মানুষ শান্তিনিকেতনে অবস্থান করলে বিদ্যালয়ের পক্ষে একটা মস্ত বড় লাভ হত— প্রকৃত শিক্ষার একটি জীবন্ত আদর্শ সকলের চোখের সুমুখে উপস্থিত থাকত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন— 'ওর মধ্যে একটা সহজ সরল মহত্ত্ব আছে যা সকলের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আকর্ষণ করবে,···ও সকলের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে শত কথা বলেছেন। সে আদর্শের নিকটতম বাস্তব রূপ যদি কোনো মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে তো সেই মানুষটি হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যায় বুদ্ধিতে রুচিতে চরিত্র-মাধুর্যে চিত্তের ঔদার্যে শিক্ষার এমন শোভন এবং প্রসন্ন রূপ সচরাচর দেখা যায় না। সর্বতোভাবে একটি বিদগ্ধ মন— একটি অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সৌরভ চতুর্দিকে বিস্তারিত হত। নানা গুণে গুণান্বিত মানুষ। সাহিত্য-প্রেমিক— ভালো লিখতেন ; শিল্পরসিক— ছবি আঁকতেন ; সংগীতানুরাগী— বাদ্যযন্ত্রে হাত ছিল।

ইন্দিরা দেবী বলেছেন, গানের গলা তেমন ছিল না, কিন্তু এসরাজ বাজাতেন, পিয়ানো বাজাতেন। রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখেছেন। অনেক বিদ্যার চর্চা ছিল কিন্তু বলতেই হয় শ্রমসাধ্য অনুশীলন ছিল না।

সুরেন ঠাকুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছেন এমন আর কারো সম্পর্কে নয়। বলেছেন, সুরেন যদি জীবনে কিছু নাও করে তা হলেও তাকে চমৎকার মানিয়ে যাবে অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন যে এমন একটি পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি হওয়ার মধ্যেই একটা চরিতার্থতা আছে, সাংসারিক কৃতকার্যতার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ তাকে দিতে হয় না। বলেছেন, 'যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে।'

এমন মানুষকেও জীবনে অশেষ দুঃখ পেতে হল। প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও শেষ জীবনে অভাবের তাড়না সহ্য করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন, সুরেনের মতো মানুষ এত দুঃখ পাবে ভাবলে বিশ্ববিধানের উপরে ধিক্কার জন্মায়। বলা বাহুল্য মাত্র, এটি স্নেহকাতর মনের একটি দুর্বল মুহূর্তের উক্তি। নইলে রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন যে, যে মানুষ যত মহৎ, তাঁর দুঃখ তত বৃহৎ। বহু ছলনা প্রবঞ্চনা দ্বারা জীবনদেবতা তাঁকে পরীক্ষা করে নেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো জীবনের শেষ কবিতায়, শেষ বাক্যে বলেছেন, 'এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত।' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই চিহ্নিত ব্যক্তি। আসল কথা বিশ্ববিধানে যে ত্রুটি তার চাইতে ঢের বড় ত্রুটি মনুষ্যচরিত্রে। তার প্রমাণ, এমন মানুষকেও আমরা ভুলে গিয়েছি। এমনি আমাদের শিক্ষা এবং রুচি যে এরূপ দুর্লভ চরিত্রের মানুষকে আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্থান দিই নি। সেদিন শান্তিনিকেতনে যখন তাঁর স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন ছেলেমেয়েরা গান করেছিলেন— আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি / তোমায় দেখতে আমি পাই নি। এই কথাটি বাংলা দেশকে একদিন বলতে হবে— একদিন তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলে, ভালোবেসে আমার জন্যে অনেক কিছু করেওছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাই নি, চিনতেও পারি নি।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সংশোধন

বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১ ॥ পৃ ৯১ ছত্র ২ ॥ ট্রিনিটি স্থলে কিংস পড়িতে হইবে

স্বরলিপি

ইমন। তেওট

ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে ॥
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে ॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥

রচনা : রামমোহন রায়

স্বরলিপি : কাঙ্গালীচরণ সেন

II পপা -র্সর্সা -ধপা । পহ্মা -ধপপা হ্মা -গা I
ভা০ ০০ ০০ ব০ ০০০ সে ই

I গপা গা -া । -রা -গা -রা -া । -ন্‌রসসা -া -া । সসা -া -ধ্‌া সরা I
এ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০০০০ ০ ০ জলে ০ ০ স্থলে

I রপা গা -া । -রা রপপা গা -া । -রা ররা গপা । -হ্মপধা -া -া -পধর্সা I
শূ ন্যে ০ ০ যে০ স ০ ০ মান ভাবে ০০০ ০ ০ ০০০

I র্সা -না -ধা । -হ্মধা পা -হ্মা -গহ্মা II
থা ০ ০ ০০ কে ০ ০০

। া গগা পহ্মা -ধপা II { র্সা র্সা -া । -পধা -র্সনা র্সা -া । -া র্সধা র্সা । র্রা -া -া -র্সর্রগা I
যে,র চি০ ০ল এ সং ০ ০০ ০০ সা ০ র্, আদি অ ন্ত ০ ০ ০০০

I র্গা -া -র্রা । নর্রা র্সা -র্সর্সা -ধা । -পধপা -া -া । (-গা গগা পহ্মা -ধপা)} I
না ০ ০ হি০ যাঁ ০০ ০ ০০০ ০ ০ র্, যে,র চি০ ০ল

। -া পপা পধপা -ক্ষাগা I গপপা গা -া । -রা রপপা গা -া । -রাররা গপা ।
র্, সে,জা নে০০ ০স ক০ ল ০ ০ কে০ হ ০ ০ নাহি জানে

। -ক্ষাপধা -া -া -পধর্সা I সা -না -ধা । -ক্ষাধা পা -ক্ষা -গক্ষা II
০০০ ০ ০ ০০০ তাঁ ০ ০ ০০ কে ০ ০০

। {-া সসা -সরা -সরগা II গগা -া গা । -া গরা গা -পা । ধর্সা -া -ধা । -া -পা পধপা -া I
০ তমী ০০ ০০০ শ্বরা ০ণাং ০পর মং ০ মহে ০ ০ ০ ০ শ্বরং ০

I -গা গা -া । -রা গাঃ -রঃ রপা । গা -া -া । -রা রগা -রা -সা I
০ তং ০ ০ দে ০ ব তা ০ ০ ০ নাং ০ ০

I -া সধ্‌া সা । -রসরা পা -গা -রা । -সরা -সরগা গগা } । -া গগা -পক্ষা -ধপা I
০ পর ম ০০ঞ্চ দৈ ০ ০ ০০ ০০০ বতং ০ পতিং ০০ ০০

I র্সর্সা -া -া । -া -ান র্রর্সা -া । -া র্সধা র্সা । -া র্সর্রা -া -র্সর্রর্গা I
পতি ০ ০ ০ ০ নাং ০ ০ পর মং ০ পর ০ ০০০

I র্গা -া -র্রা । -র্সর্রর্সা -ধা পপধপা -ক্ষাগা । গপা গা -া । -রা ররা গপা -পধর্সা I
স্তা ০ ০ ০০০ ৎ বিদা০০ ০ম দে বং ০ ০ ভুব নে০ ০০০

I র্সর্রর্সা -া -নধা । -ক্ষাধা পা -ক্ষা -গক্ষা II II
শমী ০ ০০ ০০ ড্যং ০ ০০

স্বীকৃতি

বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির চিত্রের ব্লক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৌজন্যে এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোকচিত্রের ব্লক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিক সমিতির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক : শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

বর্ষ ২৮ · সংখ্যা ৪

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০

সম্পাদক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
মীমাংসা-দর্শন — এক টাকা

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা — বার টাকা

প্রবোধচন্দ্র বাগচী -সম্পাদিত
সাহিত্যপ্রকাশিকা : ১ম খণ্ড — দশ টাকা

পঞ্চানন মণ্ডল -সম্পাদিত
পুঁথিপরিচয় : ২য় খণ্ড — পনের টাকা
পুঁথিপরিচয় : ৩য় খণ্ড — সতের টাকা
সাহিত্যপ্রকাশিকা : ২য় খণ্ড — ছয় টাকা
সাহিত্যপ্রকাশিকা : ৩য় খণ্ড — আট টাকা
সাহিত্যপ্রকাশিকা : ৪র্থ খণ্ড — পনের টাকা
সাহিত্যপ্রকাশিকা : ৫ম খণ্ড (দ্বাদশ মঙ্গল) — বার টাকা
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র : ১ম খণ্ড ১ম পর্ব — চোদ্দ টাকা
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র : ২য় খণ্ড — পনের টাকা

দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত
সাহিত্যপ্রকাশিকা : ৬ষ্ঠ খণ্ড (গোপালবিজয়) — কুড়ি টাকা

চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি -সম্পাদিত
রবীন্দ্র-রচনা-কোষ : ১ম খণ্ড—১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব — সাড়ে ছয় টাকা, সাত টাকা, আট টাকা

অশোকবিজয় রাহা -সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য এবং জাতীয় চেতনা — পাঁচ টাকা

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার — আড়াই টাকা

অমিতাভ চৌধুরী
মাধব সংগীত — পনের টাকা

উপেন্দ্রকুমার দাস
শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা — পঞ্চাশ টাকা

শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী
রসচন্দ্রিকা : ১ম খণ্ড — ছাব্বিশ টাকা
রসচন্দ্রিকা : ২য় খণ্ড — সাড়ে ষোলো টাকা

পশুপতি শাশমল
স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য — চৌত্রিশ টাকা

প্রকাশন বিভাগ

বিশ্বভারতী । শান্তিনিকেতন

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে

মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে।

বসন্ত সমীরে তোমার ফুল ফুটানো বাণী

দিক পরানে আনি,

ডাকো তোমার নিখিল উৎসবে। জাগাও জাগাও

মিলন শতদলে

তোমার প্রেমের অরূপ মূর্তি দেখাও ভুবন তলে।

সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও আমির,

ঘুচাও দ্বন্দ্ব দ্বার,—

পূর্ণ করো প্রণতি গৌরবে। জাগাও —

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪ . বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০ · ১৮৯৫ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

ভূদৃশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০ · ১৮৯৫ শক

'চিত্রলিপি'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাহা-খুশি তাই করে বিশ্বশিল্পী সকালে বিকালে
রঙের খেয়ালে।
সেই নেশা লেখনীতে এসে
মনেরে উদাসী করে রঙিনের দেশে ॥

২

ছবির জগতে যেথা কোনো ভাষা নেই
সেথায় তোমার স্থির দৃষ্টি
যে কাহিনী করিতেছে সৃষ্টি
ঘটনাবিহীন তার বোবা ইতিহাস
কালো মেঘে ছেয়ে ফেলে চিত্ত-আকাশ—
বিষাদ-বাদল করে বৃষ্টি ॥

৩

প্রিয়ার দৌত্যের পথে ছন্দে এঁকে চলেছিল কবি
নদী-গিরি-কাননের ছবি।
জীবনের মর্মে আছে কোন্ চিরবিচ্ছেদবেদনা,
সুন্দরের দৌত্যে তাই কত ছবি আঁকে অন্যমনা ॥

৪

শৈশবে ছাদের কোণে গোপনে ছুটিত মায়ারথ
যেথা মরীচিকাপুরী, যেথা ছিল অদেখা পর্বত।
হারায়েছি সহজ সে পথ।
আজিকে তুলির মুখে আনি
ছুটি-লোকে অভিনব ভূগোল-সৃষ্টির মন্ত্রখানি ॥

৫

যাহারা মুখ ফিরায়েছিল তুমি তাদের পানে
চাহ না ফিরে, কথাও নাহি বলো,
উপেক্ষারে উপেক্ষিয়া চলো ॥

৬

নির্মম মহিমা তব আপনার কাঠিন্যে স্বাধীন,
দুর্গম দূরত্বে সমাসীন ॥

৭

কোথা আছ অন্যমনা ছেলে—
দুই চক্ষু পাখি-সম দূর শূন্যে ওড়ে পাখা মেলে।
অদৃশ্য দেশের হাওয়া কেন জানি তোমারে ভুলায়,
অকূল সমুদ্র -পারে স্বপ্ন দিয়ে বাঁধিছ কুলায় ॥

৮

দিনান্তে ধরণী যথা চেয়ে থাকে স্তব্ধ নির্নিমিখে
নিশীথের সপ্তর্ষির দিকে,
জীবনের প্রান্ত হতে তেমনি কি শান্ত তব চোখ
দেখিতেছে সুদূর আলোক ?।

৯

হে বিজ্ঞানী, দেখিছ কি রহস্যের দুর্গদ্বার ভেদি
দুর্গম মন্দির-মাঝে সত্যের গোপনতম বেদী ?
সন্ধানের সুকঠিন আনন্দেই
আপনার যত্ন মনে নেই ॥

১০

বহিয়া হাল্‌কা বোঝা
চলে যায় দিন তার।
অবকাশ দেয় না সে
কোনো দুশ্চিন্তার।
সম্বল কম বটে,
আছে বটে ঋণ-দায়—
অনুরাগ নেই তবু
ভাগ্যের নিন্দায়।
পাড়া-প্রতিবেশীদের
কটুতম ভাষ্যে
নীরব জবাব তার
স্মিত ঔদাস্যে।
জন্ম নেবার কালে
পেয়েছিল যৌতুক—
ভাঙাচোরা জীবনের
বিদ্রূপে কৌতুক ॥

১১

শুধু দোষ, ঘনীভূত দোষ
কাহারে পরালো এই আঁধার-মুখোষ।
সৃষ্টিকর্তা বিধাতার পরিতাপ আছে তার তলে,

আপনার সুকঠোর বলে
দিনরাত
সে শক্তি শ্রীহীনতারে করিছে আঘাত ॥

১২

সুন্দরের অশ্রুজল দেখা দেয় যেই
করুণা জাগায় সহজেই।
উপেক্ষিত অসুন্দর যে বেদনা বহে
কোনো ব্যথা তার তুল্য নহে ॥

১৩

ছবির আসরে এল
কত রাজা কত মহারাজা
নানা অলঙ্কারে সাজা।
অকুণ্ঠিত এলে দ্বারী-সাজে
সে সবার মাঝে
তুমি প্রাণবান—
তাদের সবার চেয়ে তোমার সম্মান ॥

১৪

আঁধারে ডুবিয়া ছিল যে জগৎ
আলোতে উঠিল ভেসে,
অনাদি কালের তীর্থসলিলে
প্রাতঃস্নানের বেশে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

মুখচ্ছবি

১৫

বাস্তবের হাট থেকে শুধু নিয়ে এলে দেহরূপ
নামহারা রেখাপথ বেয়ে,
করে আছ চুপ
চক্ষু করে নিচু—
খুঁজিছ কোথাও যদি পরিচয় পাও কোনো-কিছু ॥

১৬

আলো-অন্ধকারে মিলে জীবনেরে করেছে আবিল,
আপনার মাঝে তাই আপনার ঘটে নাই মিল।
সুগভীর অসন্তোষ
চোখে মুখে রচিল প্রদোষ ॥

চিত্রলিপি প্রথম খণ্ড বহু পরে প্রকাশিত হইলেও (সেপ্টেম্বর ১৯৪০) তাহার পরিকল্পনা বহুপূর্বের ; ছবিগুলি প্রসঙ্গে কবিতাবলী রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ১৩৪৩ সনের আষাঢ়-শ্রাবণে [১৯৩৬]। বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত, নিজের অঙ্কিত চিত্রপ্রসঙ্গে এই কবিতাগুচ্ছ (১৬টি) লিখিত হয় ১৪ মার্চ ১৯৩৮ বা ৩০ ফাল্গুন ১৩৪৪ তারিখে। ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করেন বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির নবপর্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ হইতে। তবে অনেকগুলি ছবিই রবীন্দ্রনাথের পূর্বপ্রকাশিত কোনো কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল। এখানে চিত্রগুলির অন্যত্র প্রকাশ ও অন্যান্য বিবরণ দেওয়া গেল।

১. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, মে ১৯৩৬, মুখপাত। ভূদৃশ্য। চিত্রলিপি দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৫১) শেষ ছবি। (দ্বিতীয় খণ্ডে 'কবি-ভাষ্য' নাই।)
২. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, অগস্ট ১৯৩৬, মুখপাত। নারীমুখ। প্রথম-খণ্ড (১৯৬২) চিত্রলিপির একাদশ চিত্র।
৩. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, নভেম্বর ১৯৩৬, মুখপাত। ভূদৃশ্য। প্রথম-খণ্ড চিত্রলিপির ষোড়শ চিত্র। সে স্থলে পৃথক কবিতা-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৪. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, ২৪ পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র। ভূদৃশ্য। প্রথম-খণ্ড চিত্রলিপির তৃতীয় চিত্র। পৃথক কবিতা-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৫. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, ৮৮ পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র। নারীমুখ। 'খাপছাড়া' (প্রকাশ মাঘ ১৩৪৩)-ধৃত, সে স্থলে ৭৭-সংখ্যক কবিতায় পৃথক কবি-ভাষ্য।

৬. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, মে ১৯৩৭, ২০ পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র। নারীমুখচ্ছবি।

৭. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, মে ১৯৩৭, ২৮ পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র। পুরুষমুখ। 'সে' গ্রন্থের (প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪৪) অঙ্গীভূত, বর্তমানে (১৩৬৮ হইতে) পৃ ৮০-সম্মুখীন।

৮. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, মে ১৯৩৭, ৩৬ পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র। 'খাপছাড়া', মুখপাত। সম্ভবত 'ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ি' বলা যায়। প্রথম ছড়া দ্রষ্টব্য।

৯. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, মে ১৯৩৭, ৭২ পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র। 'খাপছাড়া' গ্রন্থে ৬০-সংখ্যায় কবিতা ও চিত্র দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ, চিত্র অভিন্ন, কবিতা-ভাষ্য দুইটি—খাপছাড়া অনুযায়ী 'বড়ো এন্‌জিনিয়ার'।

১০. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, মে ১৯৩৭, ৮২ পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র। 'খাপছাড়া', ১৪-সংখ্যক চিত্র ও কবিতা দ্রষ্টব্য। খাপছাড়া-অনুসারে 'অতুলখুড়ো'।

১১. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, অগস্ট ১৯৩৭, ১১৮ পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র। পুরুষমুখ। 'সে' ১১৪ পৃষ্ঠার সম্মুখীন। প্রচল গ্রন্থে (১৩৬৮) পৃ ১০৪-সম্মুখীন।

১২. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, অগস্ট ১৯৩৭, ১৬৪ পৃষ্ঠার সম্মুখীন। মুখচ্ছবি। 'সে', মুখপাত। প্রচল গ্রন্থে মলাটেও এই ছবি।

১৩. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, অগস্ট ১৯৩৭, ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্মুখীন। 'সে' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাল্লারাম' নামটি ছবিতেই লেখা। প্রচল গ্রন্থে পৃ ৩৬-সম্মুখীন।

১৪. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, নভেম্বর ১৯৩৭, মুখপাত। ভূদৃশ্য। বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির সম্পাদক বলেন, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ তারিখে দীর্ঘমোহাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে সংজ্ঞালাভ করিবার পর কবি রোগশয্যার পাশে রাখা এক টেবিলের ভেনেস্তা টপ-এর উপরে এই ছবি আঁকেন।

১৫. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, নভেম্বর ১৯৩৭, ২৭২ পৃষ্ঠার সম্মুখীন। 'সে'; প্রচল গ্রন্থে পৃ১১৬ -সম্মুখীন, 'বরিশালের দাদামহাশয়'।

১৬. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, মুখপাত। নারীমুখচ্ছবি। প্রথম-খণ্ড (সেপ্টেম্বর ১৯৪০) চিত্রলিপির দ্বিতীয় আলেখ্য। সে স্থলে পৃথক্ কবি-ভাষ্য সংকলিত।

এই ষোলোটি কবিতার আধার বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদন-ভুক্ত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ২৪০। তাহারই সমকালীন অনুলিপি, পাণ্ডুলিপি ২০৬; এই অনুলিপি কবি-কর্তৃক সংশোধিত। স্থানে স্থানে তিনি পাঠ-পরিবর্তন করেন, সেই শেষ পাঠ এ স্থলে সংকলিত। নির্দেশবচন (রেফারেন্স), তারিখ প্রভৃতি এই শেষোক্ত পাণ্ডুলিপিতে লিপিকার লিখিয়া রাখেন।

ছবির বাঙ্‌ময় প্রতিরূপ কবি পূর্বে যাহা লিখিয়াছিলেন (যে যে ক্ষেত্রে লেখেন), তাহার তুলনায় বর্তমান গুচ্ছের রচনায় কবিদৃষ্টির অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে। প্রায়শই সে দৃষ্টি প্রীতিস্নিগ্ধ; তাহাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা পরিহাসের আভাস নাই। কিন্তু সংগত কারণেই 'সে' বা 'খাপছাড়া'য় অন্য রূপ না হইয়া যায় নাই।

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াস্থ,

আমাদের শাস্ত্রে আছে এক বল্‌লেন বহু হব, তার থেকেই হল সৃষ্টি। কিন্তু সেই বলার মধ্যেই আছেন দুই, যিনি বল্‌লেন আর যিনি শুন্‌লেন। এই দুপারে দুজনের মাঝখানে চলেচে নিরন্তর বিশ্বরচনা।

আমাদের লেখার মধ্যেও সেই একই কথা। চিত্তসভায় বসে আছে দু'জনে; একজন বলে, একজন শোনে। যে শোনে সে কোন্ পাড়ার লোক তার উপরে বলার আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে। যদি কৃষাণের ডিঙি এসে ঘাটে দাঁড়ায় তাহলে ব্যবসাদার জাহাজে মাল বোঝাইয়ের কথা ভাবতেই পারে না, তখন সে যে-ঝুড়ি ভরে সেটা সমুদ্রপারে পৌছবার নয়। সকল দেশের সাহিত্যই সেই শোনবার লোকের আসনটি বড় করবার কাজে আছে, নইলে লেখবার লোকের কাজ ছোটো হয়ে যায়, আর তাহলেই তার শক্তি খাটো হতে থাকে।

যে সব সাহিত্য বনেদী সাহিত্য তারা বহুকাল আর বহু মানুষের কানে কথা কয়েচে। তাদের কথা "দিন-আনি-দিন-খাই" তহবিলের মাপে নয়। বনেদী সাহিত্যে সেই শোনবার কান তৈরি করে দেয়। যে-দেশে অনেক পাঠকের সেই শোনবার কান তৈরি হয়েচে সে দেশে বড়ো করে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়। সে দেশে কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যবসা চলে না। সেখানকার বড়ো মহাজনদের কারবার আধা নিয়ে নয়, পূরো নিয়ে। তাদের আধা-র ব্যাপারী বলব না, সুতরাং তারা সর্ব্বদাই জাহাজের খবর নিয়ে থাকে, তাতে কারো হাসবার অধিকার নেই।

বাংলা দেশে যখন প্রথম ইংরেজি শিক্ষা সুরু হ'ল তখন এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা হ'তে লাগ্‌ল যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। তাদের বলবার বিষয়গুলো আমাদের পক্ষে জাতীয় কি বিজাতীয় সে তর্কটা গুরুতর নয় কিন্তু তাদের বলবার আদর্শটা সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বজনীন কিনা এইটেই আসল কথা। ন্যাশনালিজমের গোঁড়ামির ঝাঁজে কেউবা বল্‌তে পারেন যে, না, তা নয়, যেহেতু আমরা ভারতীয় সেইজন্যে ও সাহিত্যটার আদর্শ আমাদের হতেই পারেনা। তাই যদি সত্যি হবে তাহলে অত বেশি উগ্র হয়ে ওঠবার দরকার নেই, যা "নয়" তা কখনো "হয়" না। কিছুকাল থেকে শুনে আসচি বিদেশীয়দের কাল্‌চার আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক যেহেতু অসঙ্গত। যেটা অসঙ্গত তাকে সঙ্গত করতে পারে কে, সে তো নিজেই নিজেকে নির্ব্বাসিত করে।

আসল কথা হচ্চে, সাহিত্যের বিষয় নিয়ে সাহিত্যের আদর্শ নয়। বিষয়টা স্থানিক হতে পারে কিন্তু আদর্শটা সার্ব্বভৌমিক। যে জিনিষের আধারটা বিশেষ কোনো স্থানের, সেই জিনিষেরাদ অর্শটা যদি সর্ব্বজনের হয় তবেই বিশ্বসাহিত্যে সে টিকে গেল। শরৎ চাটুজ্জের গল্পের কথাটা বিশেষভাবে বাঙালীর হতে পারে কিন্তু তার গল্পের বলাটা বিশেষভাবে বাঙালীর নয়,— সেই জন্যে তাঁর গল্প জগন্নাথ ক্ষেত্রের,— ভোজে জাত বিচার করবার কোনো দরকার নেই।

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী যখন য়ুরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় পেলে তখন তার মধ্যে যেটা সর্ব্বজনের সেইটেই গ্রহণ করবার মানসিক চর্চ্চা তার সুরু হল। বিশ্বদরবারের শ্রোতার যে কান সেই কানটা তার তৈরি হতে লাগল। আমাদের সাহিত্যসভায় এই শ্রোতার চিত্ত যদি পাকা হয়ে তৈরি হয়ে ওঠে তাহলে সাহিত্যসভার বক্তা আপনিই সাহিত্যে বড়ো মূল্যের কারবার করতে থাকবে। কেননা পূর্ব্বেই বলেচি সাহিত্যসৃষ্টিতে লেখকের মনে দু'জন মানুষ আছে, একজন সরব, একজন নীরব। যে-নীরব সে বড়ো কম নয়। গাড়িঘোড়াটা আড়ম্বর করে চল্‌চে বলেই যে তারই গৌরব সব চেয়ে বেশি তা বল্‌তে পারিনে, পাকা রাস্তাটা চুপ করে অচল হয়ে পড়ে থাকে তবু চলা ফেরার ব্যাপারে তাকে বাজে জিনিষ বলে উড়িয়ে দেবার জো নেই। সে যদি নেহাৎ কাঁচা রাস্তা হয় তা হলে সংসারে গাড়ির উদ্ভাবনাটা গোরুর গাড়ির বেশি আর এগোতে পারে না। তাই বল্‌চি, যে মানুষ শ্রোতা, যে মানুষ চুপ ক'রে থাকে, সাহিত্যের কথা বলাবলিতে সে একজন বড়ো সরিক।

কিন্তু মানুষের কানের কাছে সর্ব্বদাই যে শ্রোতারা থাকে তারাই যে প্রধান শ্রোতা আর চিরকালের শ্রোতা তা বল্‌তে পারিনে। অথচ তাদেরই আওয়াজ সবচেয়ে বেশি। এই আওয়াজের ঘূর্ণিপাক থেকে মনকে বাঁচানো চাই। কানের কাছের আবদারটা সব চেয়ে প্রবল ব'লেই সেইটেকেই সব চেয়ে প্রামাণ্য মনে করবার বিপদ আছে।

এইজন্যে সাহিত্যিকের দরকার নিজের মনের মধ্যেই বিশ্বশ্রোতার প্রতিনিধিকে খাড়া করা। বাইরে সেই শ্রোতার দিকে কান পাততে গেলেই নগদ মজুরির প্রতিই লোভ বেড়ে চলে। স্বভাবত যে-মানুষ ওস্তাদ, টানাটানিতে প'ড়ে সে যদি মজুর হয়ে উঠ্‌তে ঘৃণা না করে তাহলে তার জাত গেল। সেইজন্যে সাহিত্যিকের মনের ভিতরে যে-শ্রোতাটি বসে থাকে বিশ্বের হয়ে শোনবার অধিকার যেন তার থাকে। যে-সাহিত্যিক আপন মনের মধ্যে বড়ো দরবারের শ্রোতাটিকে অধিকার করতে পেরেছে সেই বেঁচে গেল। মহানীরব যদি তাকে বরণমালা দেয় তাহলে তার আর ভাবনা নেই।

লিখ্‌তে যখন বসেছিলুম তখন এ কথাগুলো লিখব বলে ভাবি নি। বিদেশে এসে অবধি বাড়ির চিঠি একখানাও পাইনি এইটিই ছিল আমার আলোচ্য বিষয়। চিঠি জিনিষটা দুই জনের সৃষ্টি, এই কথাটা তোমাদের মনে করিয়ে দেবার সঙ্কল্প ছিল। লিখ্‌তে বসে মনে পড়ে গেল সব লেখাই দুই জনের সৃষ্টি, একজন প্রকাশ্যে, একজন নেপথ্যে। একজন বক্তা, একজন শ্রোতা, সে শ্রোতা বাইরেই থাক আর অন্তরেই থাক্।

চিঠি লেখাতেও দুজনের হাত আছে বটে কিন্তু দুজনেই বক্তা। সাধারণত সাহিত্যে কথা দিই, তার বদলে শোনা চাই। চিঠিতে কথা দিই তার বদলে কথা চাই। জবাবে অন্যের কথার যদি অপেক্ষা না থাকে তাহলে সেটা রীতিমত চিঠিই হয় না। এতদিন তোমাকে যে-চিঠিগুলো লিখ্‌ছিলুম তার মধ্যে জবাব পাবার কোনো জায়গা রাখি নি। তবে ওগুলো কী যদি জিজ্ঞাসা করো তাহলে একটু বুঝিয়ে বল্‌তে হবে।

দেশে জীবনটা থাকে স্থাবর অবস্থায়। ঠাঁই নাড়া তো হয়ইনা, মোটের উপর আশপাশের মানুষেরও বদল নেই। তাদের সঙ্গে যে সব ব্যবহারের যোগ তার মধ্যে বৈচিত্র্য নেই বল্লেই হয়। পরস্পরের নিত্য পরিচয়ে মনকে বিশেষ কিছু ভাবতে হয় না, মনটা খুব অল্প চেষ্টাতেই দিন কাটিয়ে দেয়। অথচ মনের অবকাশ কম— চারদিকে ঘেঁষা-ঘেঁষি— প্রতিদিনের ছোটখাটো আলাপ আলোচনায়, লোকলৌকিকতায়

মনকে আপন ঝোঁকে ভাবতে না দেয় সময় না দেয় উপলক্ষ্য, একটা খাঁচায় বিশ পঁচিশটা পাখী থাকলে যা হয়, মনের সেই দশা ঘটে। অর্থাৎ সে লাফালাফি করে, উড়তে পারেনা— কিচিমিচি করে, তার গান-গাওয়া হয় না।

বাইরে যেমনি এসেচি ভিড় ফাঁক হয়ে গেচে। ভিড় নেই বল্‌তে যে মানুষ নেই তা নয় কিন্তু যে-সব মানুষ নিয়তই আমার মনোযোগ দাবী করতে পারে তারা নেই। বাইরে যাদের ঠেলাঠেলি, মনের মধ্যে তাদের আসন শূন্য। জাহাজে লোক যথেষ্ট, অভ্যস্ত সংসারে প্রত্যহ যত লোকের সঙ্গে দেখা হয় তাদের চেয়ে বেশি বই কম নয়— কিন্তু এরা জায়গা জোড়ে, ভাবনা জোড়েনা।

এই তো গেল একদিকে, অন্যদিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নতুন কিছুর সঙ্গে দেখা ;— মনকে পদে পদে নড়িয়ে দিচ্চে, মন তাই কেবলি চল্‌চে। মনের চলাই হচ্চে ভাবা। অথচ এই ভাবা ফরমাসে ভাবা নয়। পাঠক অনেক দূরে, তারা কি চায় না চায় নিজের অগোচরেও তা মনের মধ্যে পৌঁছয় না। মন ভেবে চলতে থাকে কেবলমাত্র স্বধর্ম্মের তাগিদে।

ডাঙা থেকে বেরিয়ে এসেই জাহাজে যেই লিখ্‌তে বস্‌লুম সেই ভাবনাগুলো সব ঝুঁকে পড়ল ভাষা পাবার জন্যে। এর থেকে একটা পুরোনো কথা নতুন করে ভাবতে পারলুম,— বদ্ধ অভ্যাস থেকে বের করে আন্‌লে মন আপনিই সচেষ্ট হয়ে ওঠে— অর্থাৎ মন আপন স্বভাবকে পায়।

অভ্যাসের ধর্ম্ম মনের বিপরীত ধর্ম্ম। অভ্যাসে আমাদের কর্ম্মকে যান্ত্রিক করে তোলে। তখন গাড়োয়ান ঘুমোতে থাকে, গোরুটা জানা রাস্তায় নির্ব্বিচারে চলে। সুতোর বাজার নেমে গেলে যখন অধিকাংশ সুতো-কাটা কল চলবার দরকার হয় না তখন ধনী যেমন অধিকাংশ মজুরকে বরখাস্ত করে দেয় অভ্যাস তেমনি দিন চালাবার জন্যে অনাবশ্যক বোধে বারো আনা মনের মাইনে বন্ধ করে। অভ্যাসের দেশে মন থাকে বেকার হয়ে, ক্রমে তার ভাববার শক্তিটাই হয় আড়ষ্ট,— তখন হঠাৎ অনভ্যস্ত কিছু একটা ঘটলে আমার বালেশ্বর-বাসী নীলমণির মতো মনটা করুণ চক্ষে অভ্যস্ত সংসারের কোনো একটা খুঁটোর জন্যে হাৎড়াতে থাকে। অভ্যাসের মানুষ আপন অচল ডাঙায় শাস্ত্র মিলিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত, নতুনকাল হঠাৎ তাকে সচল সমুদ্রে দিলে টান ; আমার বালেশ্বরবাসীর মতোই তার দুই চক্ষু ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল ; লাগল শ্লোক খুঁজতে ; পরাশরে যদি না জোটে তো মনুতে, মনুতে না হয় তো যাজ্ঞবল্ক্যে হাৎড়ে বেড়ায় ;— ভাবতেও পারেনা একবার মনটাকে তলব দিয়ে দেখি। অভ্যাসের দেশে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়ে বাঁচতে পারে যতদিন সেখানে পুরাতনের একাধিপত্য। হঠাৎ যদি এসে পড়ে নতুন, তখন যেখানে মন ব'লে বালাই নেই, সেখানে কে তার সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করবে ? তখন হতভাগা কেবলমাত্র ভাবতে না পেরেই মরে।

পৃথিবীতে মস্ত মস্ত জন্তুগুলো জন্মেছিল অনেকদিন পূর্ব্বে। তাদের মন ছিল অল্প তাই তাদের বর্ম্ম ছিল শক্ত, তাদের ল্যাজ গলা ছিল লম্বা, জোর ছিল ভীষণ, ওজন ছিল ভারী। অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন হলেও ভূরি ভূরি বর্ম্ম চর্ম্মের জোরেই তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারত। কিন্তু তবুও চল্‌ল না ; যুগের পর যুগান্তর নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে হাজির, জবাব দিতে পারলে না ; তাদের অভ্যাস আছে, মন নেই ; তাই কাল এসে বর্ম্মচর্ম্ম সমেত তাদের কোথায় দিলে ঝেঁটিয়ে তার ঠিকানা পাওয়া গেলনা। ছোট্ট একটুখানি মানুষ, বাইরের দিকে তার কোনো শক্তি নেই, কেবলমাত্র সে আপন মনটাকে নিয়ে নতুন নতুন কালের সঙ্গে আপোষ করে চল্‌চে। মহাকাল যে-তালেই তাঁর ডম্বরু বাজান মানুষের মন ছন্দ মিলিয়ে পা ফেলে— নট-

রাজের সঙ্গে সমান লয়ে নাচতে পারলেই আর ভাবনা থাকে না। যারা অভ্যাসের ছন্দে নাচে তাদের মেয়াদ কিছু দিনের জন্যে।— কেননা মহাকাল কেবলি তাল বদলান্, তখন অভ্যাস থই পায় না; তখন বাঁচায় মন, নতুনের সঙ্গে সে সন্ধি করতে পারে। জন্তুর জোর অভ্যাসের, মানুষের জোর মনের।

প্রকৃতি মানবশিশুকে যখন শিক্ষা দেবার ভার নেয় তখন তাকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে অস্থির করে রাখে। দেহের চলার সঙ্গেই তার মন চলে, চলে বলেই সে দেখে, সে পায়, সে ধরে, সে জানে, সে ভাবে। মন ভালোমানুষটি হয়ে বসে থাকলেই তার আগ্রহ চলে যায়। আমরা মাস্টারের আসনে চড়ে ব'সে শিশুকে বলি, "চুপ করো, স্থির হয়ে বোসো, হাত নেড়ো না, পা নেড়ো না।" ঠিক সেই সময়েই প্রকৃতি তার কানে উল্‌টো মন্ত্র দিতে থাকে, বলে, "আর যাই করো চুপ ক'রে থেকো না, খুব কষে নড়ে চড়ে বেড়াও।" প্রকৃতি এই যে কাণ্ডটি করে এ কি সয়তানী ক'রে শিশুর শিক্ষা মাটি ক'রে দেবার জন্যে? তা নয়। তাকে ক্রমাগতই নতুন নতুন ধাক্কায় শিক্ষায় এগিয়ে দেবার জন্যে। প্রকৃতি পাখীকে উড়িয়ে নিয়ে খাওয়ায়; মানুষ পাখীকে খাঁচায় বেঁধে খেতে দেয়, আর কানের কাছে আওড়াতে থাকে, "পড়ো, বাবা, আত্মারাম।" নিজের বাঁধি বুলি তাকে দিয়ে বলাবার জন্যেই প্রাণীটাকে জড়ভরত ক'রে রাখে।

এ কথা মান্‌তেই হবে যে, অতি প্রভূত পরিমাণে মানুষের জ্ঞান তার ভাণ্ডারে জমা হোলো, অগত্যা তাকে বুলি আকারে তাল পাকিয়েই স্তূপাকার করে রাখ্‌তে হয়েচে, আর তাকে বুলি আকারেই তাল-তাল আয়ত্ত না করলে উপায় নেই। অতএব পিঁজ্‌রে বানানো চাই, খাড়া দেয়ালের মধ্যে আট্‌কে ধরে শিশুর মনটাকে শিকল না পরালে তাকে বলা মিথ্যে, "পড়ো, বাবা আত্মারাম।"

গরজ মানুষের কিন্তু ব্যবস্থা প্রকৃতির। অত্যন্ত তাড়া; বাঁধা সময়ের মধ্যে বাঁধা বরাদ্দমতো খাওয়া খাইয়ে গাড়িধরা চাই। রসনা তখন নীরস, পাকযন্ত্র তখনো জাগে নি, পিণ্ড পিণ্ড অন্ন পাকিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তাড়নায় শিশুর কণ্ঠনলীর ভিতর দিয়ে সেটাকে চালনা করা দরকার। হুকুমটা বাইরের, তাই ভিতরের হুকুমটাকে অমান্য করতে হবে। কিন্তু তাই বলে জরিমানা বন্ধ থাকে না।

ইস্কুলের ব্যবস্থা হচ্চে অভ্যাসের ব্যবস্থা। অভ্যাসের কাজই হচ্চে মনকে বেকার রাখা। ইস্কুলমাষ্টার বলে, শেখাতে গেলে মনকে থামাতেও হবে, মনকে চালাতেও হবে, এই দুই উল্‌টো প্রক্রিয়া একই সঙ্গে। এই অসাধ্য সাধন করতে হয় বলেই শিশুর মনকে থামিয়ে রাখতেও জবরদস্তি, চালাতেও মারধোর চোখ-রাঙানী। ডাইনে বাঁয়ে দুই উল্‌টো দিক থেকে অশ্রান্ত উৎপাতে লাখো লাখো বুদ্ধির কলের ইস্ক্রু আলগা হয়ে যায় এ কথা গোড়াতেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। জুতোটা পায়ের বহরের মাপে না হয়ে বাইরের লোকের গায়ের জোরের মাপে হলে যে একেবারে চলে না তা নয় কিন্তু পাটা যায় তেড়ে বেঁকে।

বস্তুত, অপরাধীর জন্যে, শত্রুর জন্যে মানুষ যখন শাস্তির প্রণালী উদ্ভাবন করে তখন সেটা করে এই রাস্তাতেই। প্রকৃতি যাকে বলে চল্‌তে, মানুষ তাকে রাখে বেঁধে, একেই বলে জেলখানা। খাবার জিনিষে যে রসনা প্রকৃতির নিয়মে রসের বৈচিত্র্য চায় মানুষ তাকে দেয় একঘেয়ে নীরস খাদ্য, এ'কে বলে জেল-খানার খোরাক। যে মন প্রকৃতির প্রবর্ত্তনায় দরদ চায় তাকে দেওয়া হয় দুঃখ, শ্রদ্ধা চায় তাকে পদে পদে করা হয় অপমান, এ'কে বলে জেলখানার ব্যবহারবিধি। জীবনটাকে প্রকৃতির উজান পথে হিঁচ্‌ড়ে টেনে চালানোর প্রণালীকেই বলে শাস্তির প্রণালী। এ'তে দেহমনের ক্ষতি করা হয় ব'লেই এ'কে দণ্ড বলা হয়।

শিশু আমাদের শত্রু নয়, আর অজ্ঞান নিয়ে সে যে এই পৃথিবীতে জন্মায় সেটাকে তার অপরাধ বলা চলে না। অথচ শিক্ষাপ্রণালী সকল দিক থেকেই তার শাস্তির প্রণালী। জেলের কয়েদীকে যে-অপমান যে-দুঃখ দেওয়া হয় সেটার সম্বন্ধে প্রকৃতির প্রেরণায় বন্দী অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলে তার শাস্তি বাড়িয়ে দেওয়ার নিয়ম। শিশু শিক্ষাব্যবস্থাতেও সেই বিধি। এটাকে অনিবার্য্য বলে গ্রহণ করতেই হবে এমন কথা যখন বলি তখনো তাতে প্রমাণ হয় অভ্যাসে আমাদের মনকে জড় করে। যে প্রণালীতে আমরা অভ্যস্ত তার নড়চড় করার দরকার ও সম্ভাবনা আছে এ কথা স্বীকার করতে হলেই মনকে ভাবতে হয়। কিন্তু অভ্যাস মনের মুখচাপা দিয়ে রেখে দিয়েচে— মন এ সম্বন্ধে কথা কইতে ভুলে গেছে। মানুষের প্রতি নিত্য অপমান বেদনার প্রয়োগে মনুষ্যত্বে কড়া পড়ে গেছে যে দারোগার, তার মতোই কর্ত্তারা সকলেই নিশ্চিন্ত মনে একবাক্যে বলে থাকেন এ ছাড়া আর উপায় নেই।

উপায় নেই ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গলায় শিকল প'রে ল্যাজের মধ্যে মুখ গুটিয়ে থাকে জন্তু, মানুষ না। এই জন্যেই আজকের দিনে য়ুরোপে আমেরিকায় মানুষ নানারকম করে ভাবতে বসেচে শিক্ষাকে জেলখানা থেকে কি ক'রে উদ্ধার করা যায়। যেখানে মনের জায়গায় অভ্যাসের রাজত্ব সেখানে এ ভাবনার দেরি আছে।

আমার মতে শিশুশিক্ষার আদর্শ হচ্চে চল্‌তে চল্‌তে শেখানো। ক্লাসে বেঁধে শেখানো নয়। আমার যদি যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সামর্থ্য থাকতো, তাহলে অন্তত জন পঁচিশেক ছেলে মেয়ে নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে করতে তাদের শেখাতুম। ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে জানাটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য নয় কিন্তু শিক্ষার পক্ষে মনের সচলতাটা যে একটা বড়ো শক্তি সেই শক্তিটি দেওয়া তার লক্ষ্য। বিশ্বকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার যে-মানসিক চর্চ্চা মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক তারই ব্যবস্থা করে দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে বই থেকে জানার অভ্যাস গৌণভাবে করাতে চাই। আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তির সঙ্গে বিশ্বসংসারের অব্যবহিত ও সত্যকার সম্বন্ধটা নির্জ্জীব হয়ে যায় কেবলমাত্র পুঁথি পড়ে পড়ে; সেই দুর্ঘটনা থেকে মানবসন্তানকে রক্ষা করা চাই, বিশেষভাবে ভারতসন্তানকে। কেননা আমাদের মতো অভ্যাসগ্রস্ত পুঁথিগত জাত জগতে অল্পই আছে। বিশ্ব সম্বন্ধে যত কম দেখে ও কম ভেবে চলা সম্ভব আমরা তা আবিষ্কার করেচি। দৈন্যে দুঃখে রোগে বুদ্ধির অন্ধতায় নানা প্রকারে তার শাস্তি পাচ্চি। ঔদাসীন্যের দ্বারা বিশ্বকে বলেচি তোমাকে আমরা চাইনে, বিশ্ব তার জবাবে বলেচে, তোমাদের আমি চাইনে। প্রতিদিন মরচি তাই।

এ কথা অনেক দিন ভেবেচি, অনেককে বলেচি। আজ দেশ থেকে দেশান্তরে চল্‌তে চল্‌তে মনের নানা ভাবনা ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌চে। এই কথাটাও জেগে উঠ্‌ল। সেইজন্যেই চিঠিতে বলে রাখ্‌লুম।

সেদিন জাহাজে আস্‌তে আস্‌তে একটা কবিতা[১] লিখেচি। সুনীতিকে[২] শোনাতে সুনীতি প্রশ্ন করলেন

১ কবিতাটি 'নূতন শ্রোতা'র প্রথমাংশরূপে পরিশেষ (১৩৩৯) গ্রন্থে সংকলিত। দ্বিতীয়াংশ রচিত হয় এই বিদেশ-পরিভ্রমণের শেষ দিনে, জাহাজ হইতে অবতরণের পূর্বে, গঙ্গাবক্ষে— ২৭ অক্টোবর [১৯২৭]। 'নূতন শ্রোতা'র প্রথমাংশ রচনার চার দিন পরে রচিত যে কবিতাটি জাভা-যাত্রীর পত্রে ৩০ অগস্ট ১৯২৭ তারিখের পত্রশেষে (নবম পত্র) মুদ্রিত ও পরে 'নূতন কাল' নামে পরিশেষ গ্রন্থের সংযোজন অংশে সংকলিত তাহাও কতকটা এই ভাবেরই পরিপূরক।

২ অন্যতম ভ্রমণ-সঙ্গী ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিষয়টা কিসের থেকে আমার মনে এল। ঠিক বলা শক্ত। কিন্তু আমার মনে হয় যে চিন্তাটা আজকের চিঠিতে প্রকাশ পেয়েচে তারই সঙ্গে ওর যোগ আছে। শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয় মানুষের ইতিহাসও কেবলই চল্‌তে চল্‌তে ভাববে এইটেই হচ্চে স্বভাবের বিধান। নইলে মনের প্রয়োজনটা চলে যায়। এক যুগের চিন্তার দ্বারা অন্যযুগের মানুষকে সম্পূর্ণ বেঁধে ফেল্‌লে তার চেয়ে বন্ধন আর নেই। সাবেক কালকে মানুষ সম্মান করতে চায় করুক কিন্তু তারই আসনটা বড়ো করে নতুন কালের বায়ো আনা জায়গা মেরে দিলে নিজের কালকে অসম্মান করা হয়। এই অসম্মানে অক্ষমতার চর্চ্চা। মানুষের গানের বিষয়টা প্রায় এক। আজ যাতে আনন্দ মোটের উপরে কালও তাতেই তার আনন্দ। তবুও নতুন যুগের কবি নতুন যুগের বায়না নিয়ে আসে। পুরোনো আনন্দকে নতুন গানে প্রকাশ না করলে মন সম্পূর্ণ করে জাগতে চায় না। কালিদাসকে আজ বাদ দিতে পারিনে কিন্তু তবু কালিদাস পর্দ্দার আড়ালে। সাম্‌নের দিকের নাট্যমঞ্চে নতুন যুগের কবিরা যদি আলো জ্বালিয়ে না রাখে তাহলে কালিদাসকেও চেনা যাবেনা। ইতি ২৩ অগস্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে লিখিত তাঁহার অধিকাংশ পত্র তৎকালে 'বিচিত্রা'য় এবং একখানি পত্র 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়; পরে ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠে 'যাত্রী' গ্রন্থের জাভা-যাত্রীর পত্র অংশে এই পত্রাবলী প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য পর্বে লিখিত এই পত্রখানি জাভা-যাত্রীর পত্রে সংকলিত হয় নাই। ইহা কাহার উদ্দেশে লিখিত তাহা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের প্রবাসী পত্রে 'যাত্রীর ডায়ারি: সাহিত্যে নবত্ব' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহার প্রথমাংশের সহিত এই পত্রের প্রথমাংশের মিল লক্ষ্য করা যায়; প্রবন্ধটির পরিমার্জিত রূপ 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে ১৩৪৩ আশ্বিনে প্রকাশিত 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে। আলোচ্য পত্রের শেষাংশে শিক্ষার আদর্শ ও প্রণালী সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র তাহা বলিয়াছেন, পত্রে তাহারও উল্লেখ দেখা যায়। এ সম্পর্কে নির্দেশ করা যায়—'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের অঙ্গীভূত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ তারিখে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ এবং 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ৭ অক্টোবর ১৯৩০ তারিখের পত্রাংশ (পত্র-সংখ্যা ১০)। রবীন্দ্র-রচনার অন্য নানা স্থানেও বিচ্ছিন্নভাবে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

মেঘনাদবধকাব্যে চিত্রকল্প

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মেঘনাদবধকাব্যের সবচেয়ে নাটকীয় সর্গ ষষ্ঠ সর্গ এবং এখানেই মহাকাব্যের নাটকীয় ক্লাইম্যাক্স। ষষ্ঠ সর্গ শুধু মধুসূদনের কবিপ্রতিভার নয়, তাঁর দেশাভিমানেরও শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। সিপাহীবিদ্রোহী শতকের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি মাইকেল মধুসূদন। তাঁর শ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য মেঘনাধবধ, এবং সেই কাব্যের দেশদন্তী আত্মা ষষ্ঠ সর্গ। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ঘোষণা করেছিলেন : "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ, শ্রীমধুসূদন।" এই ঘোষণা সার্থক। মধুসূদন আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রথম সারথি। অবরুদ্ধ উপনিবেশিত জাতির মুখপাত্র হিসাবে মাইকেল যে পৌরাণিক নাম গ্রহণ করেছিলেন তা হচ্ছে মেঘনাদ। প্রাচীন আদি মহাকাব্যগুলি সবই নৃগোষ্ঠী বা ট্রাইবের বীর কাহিনী। জাতীয়তা সেখানে অনুপস্থিত, কারণ আধুনিক জাতীয়তাবোধের প্রকৃত উন্মেষ য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের পূর্বে কোথাও ঘটে নি। মাইকেল আধুনিক মহাকবি, জাতীয়তাবোধের তূর্যধ্বনিতে তাঁর মহাকাব্য মুখরিত। অবশ্য তূর্যধ্বনির অন্তরালে পরাভূত জাতির বাস্তব মর্মবেদনাও করুণ সুরে ধ্বনিত এবং এই করুণ সুর মহাকাব্যের স্থায়ী ট্র্যাজিক রসকে ঘনীভূত করেছে। সিপাহীবিদ্রোহে সিপাহীদের পরাজয় যেমন পরাজয় নয়, ভারতীয় মানসে তা জাতীয়তাবোধের প্রথম বিড়ম্বিত বিজয়, মাইকেলের মহাকাব্যেও তেমনি মেঘনাদবধ মেঘনাদের বধমাত্র নয়, দেশাভিমানী মেঘনাদ-আত্মার বিজয়ও। এই বিজয় বাস্তব বিজয় না হলেও আত্মিক বিজয়। রামায়ণের লক্ষ্মণ ন্যায়পরায়ণ, বীর এবং জয়ী ; কিন্তু মধুসূদনের মহাকাব্যে লক্ষ্মণ কাপুরুষ, কপট আততায়ী, বিদেশী হানাদার মাত্র। এই সর্গ রচনায় মধুসূদন অসাধ্য সাধন করেছেন এবং এজন্য মেঘনাদ যেমন লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন মাইকেলকেও তেমনি শিল্পী হিসাবে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ঘটনা হিসাবে উভয় মহাকাব্যেই মেঘনাদ বিজিত ও নিহত, কিন্তু মাইকেল যে নূতন মূল্যবোধ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ সে-মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ জয়ী ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে তিনি রামায়ণের কাঠামো সম্পূর্ণ রক্ষা করেও লক্ষ্মণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন এবং নব্য জাতীয়তাবাদের নীতি ও ন্যায়ের মানদণ্ডে তাঁর পুনর্বিচার প্রার্থনা করেছেন। বিজয়ী ওয়ারেন হেস্টিংসকেও একদা তাঁর অমানবিক কার্যকলাপের জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ লুণ্ঠক সাম্রাজ্যশাহী দৃষ্টিতে যা বিজয়, মুক্তিপ্রেমী গণতন্ত্রী দৃষ্টিতে তাই দস্যুতা। লক্ষ্মণকে অন্যায়কারী তস্কর বা দস্যুর ভূমিকায় দাঁড় করাতে গিয়ে মধুসূদন যথেষ্ট সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

শেক্‌সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে দেখি সিজার-হত্যার পর মার্ক অ্যানটনি জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়েছেন। জনসাধারণের মনে তখন পর্যন্ত ব্রুটাস সম্বন্ধে ধারণা যে তিনি হচ্ছেন এক মহানুভব দেশপ্রেমিক। বাগ্মী অ্যানটনি শ্রোতাদের মন থেকে ব্রুটাসের এই প্রতিষ্ঠিত নিষ্কলঙ্ক মূর্তিটি ভাঙবার জন্য এক বিচিত্র বাক্‌শৈলী গ্রহণ করেন, যার নাম 'আয়রনি' বা শ্লেষোক্তি। তিনি বিপরীত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করবার সময়ও ব্রুটাসের নামোল্লেখ করতে গিয়ে বারবার 'ব্রুটাস একজন মাননীয় ব্যক্তি' (Brutus

is an honourable man) এই বলে শ্রোতাদের মনে ব্রুটাস সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে এক প্রতিকূল ধারণাই সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা দেখব মাইকেল মধুসূদনও ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ সম্পর্কে সুচতুরভাবে অনুরূপ 'আয়রনি' প্রয়োগ করেছেন। বাল্মীকি-কৃত্তিবাস-পুষ্ট বাঙালি পাঠকের মনে লক্ষ্মণের যে মানী মহিমময় মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করবার জন্যই এই শ্লেষোক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছে। আয়রনির সাহায্যে পুরাতন মূল্যবোধকে কবি নূতন মূল্যবোধের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। এইভাবে রামানুরক্ত পাঠককে তাঁর মহাকাব্য দেশভক্ত পাঠকে উত্তীর্ণ করেছে। পরে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন মধুসূদন এই মহাকাব্যের মধ্যে যেন সেই কথাই বলতে চেয়েছেন, "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ মেঘনাদ।" আক্রান্ত ও আক্রামক এ দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এক হতে পারে না। আর্য সভ্যতার দায়ভার কাঁধে করে রাম ও তাঁর অনুচরগণ লঙ্কা অধিকারে প্রবৃত্ত, কিন্তু ছলচাতুরি প্রয়োগে এই সভ্যতাগর্বীরা মোটেই পরাঙ্মুখ নন। ভারত-বিজয়ে শাঠ্য, চাতুরি, কপটতা প্রয়োগে ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ও পরবর্তী ইংরেজ হানাদাররাও পরাঙ্মুখ ছিলেন না, যদিও শ্বেতকায়দের দায়ভার বা whiteman's burden কাঁধে করেই তাঁরা এ বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন। বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণকারগণ অযোধ্যার চোখ দিয়েই লঙ্কাযুদ্ধকে দেখেছেন ও বিচার করেছেন; এবং যুগ যুগ ধরে অগণিত পাঠকের মনে তাই অনন্তবিচার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন লঙ্কাযুদ্ধকে লঙ্কার চোখ দিয়ে নূতন করে দেখলেন, বিচার করলেন এবং লঙ্কার প্রতিরোধের মধ্যে এক স্বদেশাভিমানী জাতীয় প্রতিরোধের রূপ দেখতে পেলেন। আক্রমণকারী-কর্তৃক লঙ্কা অবরোধ নয়, আক্রান্ত লঙ্কার প্রতিরোধই মহিমান্বিত হয়ে দেখা দিল। পুরাতন বিচার ও মূল্যবোধের উপর নূতন বিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে 'আয়রনি' অমোঘ অস্ত্র। কারণ আয়রনির মধ্যে যে আপাত-বিবরণ থাকে তাকে গ্রহণের ছল করেই বর্জন করা হয়। মার্ক অ্যানটনি যখন শ্রোতাদের সামনে বলেন, এই-সব কুকীর্তি ব্রুটাস অবশ্যই করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রুটাস তো একজন মানী ব্যক্তি, তখন আপাত-শ্রুতিতে ব্রুটাসকে মানী বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যে মোটেই মানী বা সম্মানের উপযুক্ত ব্যক্তি নন সেটিই বক্তব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ষষ্ঠ সর্গে মাইকেলও লক্ষ্মণের বিবরণ দিতে গিয়ে পদে পদে অনুরূপ শ্লেষ বা আয়রনি-প্রাণিত বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। বিশেষণগুলি আপাত-শ্রুতিতে লক্ষ্মণের সপক্ষে, কিন্তু ঘটনাবলীর সাক্ষ্য সবই এই-সব বিশেষণের বিরুদ্ধে। ফলে মানী ব্রুটাস যেমন শেষ পর্যন্ত খুনী ব্রুটাস হয়ে উঠেছেন, মানী লক্ষ্মণও তেমনি ষষ্ঠ সর্গে চূড়ান্তভাবে খুনী লক্ষ্মণে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন।

ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভেই কবি উদ্যান-নিষ্ক্রান্ত লক্ষ্মণকে 'বলী' এবং 'কেশরী' বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পঞ্চম সর্গে মায়াকাননে লক্ষ্মণের বলবত্তা বা পরাক্রমের বিশেষ কোনো নিদর্শন আমরা পাই নি। একের পর এক মায়ার খেলা চলেছে, দৈবপ্রেরিত মায়াসিংহ, মায়াঝড়, মায়াকামিনীদের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ক্রমান্বয়ে ঘটেছে এবং সেখানে লক্ষ্মণ শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। অতএব সেই কানন থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় লক্ষ্মণকে শুধু 'বলী' নয়, একেবারে 'কেশরী' বলার বিশেষ কোনো সার্থকতা দেখি না :

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি-কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,

হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,— বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।

এখানে পশুরাজ সিংহের চিত্রকল্পটি রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক। এই গূঢ় চিত্রকল্পের অর্থভেদ করতে পারলে সমগ্র ষষ্ঠ সর্গেরই লক্ষ্যভেদ সহজ হবে। কবি এই সর্গের চাবিকাঠি চিত্রকল্পের আকারে সর্গের আরম্ভেই পাঠকের হাতে তুলে দিতে চান। দেখা যায়, প্রথম পঙ্‌ক্তিতে লক্ষ্মণকে সিংহের সাথে তুলনা করলেও কবি অবিলম্বে তাঁর এই সিংহবিক্রম অস্বীকার করেছেন। যাঁকে পূর্বমুহূর্তে মৃগরাজ বলা হয়েছিল পরমুহূর্তেই তিনি হয়ে গেলেন মাত্র ব্যাধ ; তাঁর রাজসম্মান এইভাবে কেড়ে নেওয়া হল। 'কেশরী' থেকে 'ব্যাধ' এই অধঃপতনই ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ চরিত্রের প্রকৃত বিবর্তন। যিনি প্রকৃত মৃগরাজ তিনি লক্ষ্মণ নন, মেঘনাদ। লক্ষ্মণ তাঁকেই লুক্কায়িত ব্যাধের মতো চোরাগোপ্তা আক্রমণে নিহত করবেন। ব্যাধ যে এখানে অন্য কোনো সাধারণ পশুশিকারী নয়, স্বয়ং লক্ষ্মণই, তা চিত্রকল্পটিতে খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। কারণ ব্যাধ প্রসঙ্গে কখনোই অস্ত্রাগার বা সংগ্রামের কথা ওঠে না। 'অস্ত্রালয়' থেকে প্রহরণ নিয়ে সংগ্রামের কথা কেবলমাত্র সেনাবাহিনী বা যোদ্ধার পক্ষেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ কবির কাছে ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের পারস্পরিক অবস্থান ও সম্পর্ক কী হবে তা একটুও অস্পষ্ট নেই। অতএব প্রথম পঙ্‌ক্তির 'বলী' কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আয়রনি যে কবির ইচ্ছাকৃত তাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই আরো এই কারণে যে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে লক্ষ্মণ নামক ব্যাধকে হঠাৎ কবি 'সুমতি' এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন। কিন্তু সম্মুখ সংঘর্ষ এড়িয়ে চোরের মতো যে ব্যাধ পশুরাজকে আক্রমণ করে সেই ব্যাধ কি 'সুমতি' না 'দুর্মতি'? পাঠককে মনে মনে সিংহ এবং ব্যাধ এই দুয়ের মধ্যে একটির পক্ষ বেছে নিতে হবে ; যিনি সিংহের পক্ষ নেবেন তিনি ব্যাধকে 'বলী' বা, 'সুমতি' বলে মেনে নিতে পারেন না ; তাঁর কাছে এ দুটি পদই শ্লেষ বা আয়রনি -প্রসূত, কারণ অন্যায়ভাবে প্রবৃত্ত গুপ্তঘাতক প্রকৃতপক্ষে কাপুরুষ এবং দুর্মতি। কবি নিজে সিংহের পক্ষই বেছে নিয়েছেন এবং পাঠকও ক্রমশ কবির পক্ষভুক্ত হয়ে পড়বেন।

আরম্ভিক চিত্রকল্পটি আপাতদৃষ্টিতে অসংযত ও স্ববিরোধী। মনে হতে পারে কবি বুঝি মনস্থির করতে পারেন নি বা পারছেন না। কিন্তু তা নয়। কবি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু তাঁর যাত্রা দুরূহ এবং পাঠকের অনেক আশাভঙ্গ ঘটিয়ে তবেই তিনি লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবেন। পাঠককে কবি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে— যাকে আমরা আশাভঙ্গ বলছি— গৃহীত দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারে বিপরীত দৃষ্টি-কোণে উত্তীর্ণ করবেন। একেবারে প্রথমেই যদি তিনি বলেন যে লক্ষ্মণ কুমতি এবং কাপুরুষ তা হলে পাঠক তা কিছুতেই মেনে নেবেন না। তেমন উক্তি শিল্পসম্মতও হবে না, কারণ যুগ যুগ ধরে লক্ষ্মণের একটি গৃহীত বা সর্বজনগ্রাহ্য ইমেজ প্রচলিত আছে। যথেষ্ট প্রমাণ খাড়া না করে তাকে নস্যাৎ করা যায় না। রোমে ব্রুটাস সম্পর্কেও এমনি একটি সর্বজনগ্রাহ্য ইমেজ প্রচলিত ছিল। সুমতি ব্রুটাসের (noble Brutus) সেই ইমেজটিকে এক কথায় চূর্ণ করা যাবে না এ কথা মার্ক অ্যানটনি জানতেন। তাই তিনি 'গৃহীত' ইমেজটিকে 'গৃহীত ইব' ইমেজে পরিণত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন ক্রমান্বয়ী আয়রনির প্রয়োগে। নিন্দা নয় আপাত-প্রশংসা, প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা, এই ছিল তাঁর পদ্ধতি। এখানে মাইকেলও লক্ষ্মণকে সরাসরি নিন্দা না করে আপাত-প্রশংসা, কিন্তু আসলে প্রশংসাচ্ছলে নিন্দাই, করছেন, অন্তত

নিন্দার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত পাঠক এই চাতুরি বুঝতে পারেন না, কিন্তু ক্রমশ তিনি দেখতে পান যে প্রাথমিক প্রশংসাগুলি পরবর্তী ভর্ৎসনাকে আরো মর্মভেদী ও অকাট্য করে তুলেছে। যখন একটি বিশেষণ বারবার ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু সেই বিশেষণের বিপক্ষেই প্রমাণ পুঞ্জীভূত হচ্ছে দেখা যায়, তখন বিশেষণটি বিদ্রূপোক্তির মতো শোনাতে বাধ্য এবং ভূষণ হয়ে ওঠে কলঙ্কের প্রতিশব্দ। দু-এক পঙ্‌ক্তি পরই লক্ষ্মণকে 'মহাযশাঃ' বলা হয়েছে এবং 'সুমতি' পদটিও আবার প্রযুক্ত হয়েছে। লক্ষ্মণকে কেন মহাযশা বলা হচ্ছে তা আমরা জানি না। পূর্ববর্তী কোনো সর্গেই লক্ষ্মণের কোনো যুদ্ধগৌরবের নিদর্শন আমরা পাই নি। এই যশ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কিংবদন্তীপ্রসূত। সেই কিংবদন্তীর জগৎ থেকে স্বতন্ত্র একটি জগতে মহাকবি আমাদের নিয়ে যাবেন, এক নূতন বাস্তবতার জগতে, যেখানে অন্য এক লক্ষ্মণের সঙ্গে মেঘনাদ ও পাঠক উভয়েরই সাক্ষাৎকার ঘটবে।

'বলী সৌমিত্রি-কেশরী' নিজেই আত্মবিবরণীতে তাঁর এই বিশেষণগুলি অপ্রমাণ করেছেন। রামের কাছে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে চণ্ডীকাননে যেতে তাঁকে কোনো যুদ্ধ করতে হয় নি, শুধু কতকগুলি মজার ম্যাজিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে এবং নিজের বাহুবলে নয় রামের পুণ্যবলেই তিনি অবাধে সেখানে প্রবেশ করতে পেরেছেন :

> ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
> মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
> মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
> রক্ষক; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
> তব পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ যথা
> যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!

যদি তাই হয় তবে তিনি মহাযশের অধিকারী হন কোন্ হিসাবে? তাঁর শক্তি পরীক্ষার জন্যই যে মায়া-জাল পাতা হয়েছিল তা নয়, যেন তাঁর সঙ্গে একটু মজা করবার জন্যই পূর্বের সর্গে কতকগুলি মায়াচাতুরির অবতারণা করা হয়েছিল। 'বিনা রণে' মহাদেব পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন, এই স্বীকৃতিতে লক্ষ্মণের মহিমা কি বর্ধিত হয়? অনেকগুলি 'মহা' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু তাতেও লক্ষ্মণের মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় নি, 'মহাযশাঃ' 'মহোরগ' 'মহৌষধ', এতগুলি মহৎ শব্দ অপব্যয়িতই হয়েছে, কোনো কাজে লাগে নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকল্পের প্রয়োগও যেন সুষ্ঠু হয় নি। 'মহোরগ' বলাতে মহাদেবকেই কেমন যেন হাস্যাস্পদ করে তোলা হয়েছে। মহাদেব 'হতবল' হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে লক্ষ্মণ মহাবলী হয়ে ওঠেন নি। কারণ লক্ষ্মণ এমন কি সাপের ওঝাও নন। এখানে সর্পবিজয়ের যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তবে তা রামের, যদি কোনো শক্তি কার্যকরী হয়ে থাকে তবে তা রামের সুকৃতি বা পুণ্যের। লক্ষ্মণের বীরত্ব যদি ফোটানো সম্ভব নাই হয়ে থাকে এবং তা যদি কবির উদ্দিষ্টও না হয় তবে মধুসূদন সর্প-ইমেজারির প্রয়োগ করে এখানে কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান? উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এখানেই তা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হবে না। এটি কবির উদ্দেশ্য অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাব যে মেঘনাদবধকাব্যের ষষ্ঠ সর্গ রীতিমতো সর্পসংকুল! অন্য কোনো সর্গে চিত্রকল্পের উপর এমন উপর্যুপরি সর্পাঘাত দেখা যায় না। মিলটন-ভক্ত মধুসূদনের কাছে সর্প শুধু চিত্রকল্প নয়, অনেক ক্ষেত্রে

প্রতীকও। বাইবেলে সর্প এবং শয়তান অভিন্ন এবং প্যারাডাইস লস্টে বর্ণিত স্বর্গোদ্যানে সর্পের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। অশুভ শয়তানি শক্তি ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় মধুসূদনও সর্পচিত্রকল্প ব্যবহারে অকৃপণ। ষষ্ঠ সর্গের সূচনায় 'মহোরগ'-এর চিত্রকল্প প্রয়োগ করে মহাকবি আসন্ন, অশুভ, কুটিল, দুরভিসন্ধিপূর্ণ নীচ ক্রিয়াকলাপের বাতাবরণেরই সূচনা করেছেন। স্বয়ং মহাদেব এখানে সর্পের সঙ্গে তুলিত হওয়ায় দেবতা ও শয়তানের মধ্যে প্রভেদই যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। হতবল মহাদেবের মধ্যে যেন শুভ দৈবশক্তির অপহ্নবই সূচিত।

রামের শিবিরের চালিকা শক্তি রাম বা লক্ষ্মণ কেউই ধারণ করে নেই, তা রয়ে গেছে স্বর্গের দেবতাদের হাতে। পঞ্চম সর্গে যাবতীয় নির্দেশ এসেছে স্বর্গ থেকে ; যা কিছু মাথাব্যথা, উদ্‌বেগ তা ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, মায়া ও স্বপ্নদেবীর ; লক্ষ্মণ তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বা guided missile মাত্র। ষষ্ঠ সর্গেও কবি পঞ্চম সর্গের এই বৃত্তান্তটি পাঠকের স্মৃতিপটে বিশেষ করে মুদ্রিত রাখতে চান যাতে পরনির্ভর লক্ষ্মণের সঙ্গে আত্মনির্ভর, বিক্রান্ত মেঘনাদের পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই ফুটে ওঠে। তাই রামচন্দ্রের কাছে লক্ষ্মণ যে-রিপোর্ট পেশ করছেন তার মধ্য দিয়ে কবি পাঠককে আর-একবার দ্রুত পঞ্চম সর্গে নিয়ে গেছেন, যেখানে মায়া সিংহ, ঝড়, দাবাগ্নি ও বামাকেলির দৃশ্য লক্ষ্মণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রামচন্দ্রের কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে লক্ষ্মণ বলছেন :

অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে।

'সুদেশ' কথাটি লক্ষণীয়। ধ্বনিসাদৃশ্যে পাঠকের কানে 'স্বদেশ' কথাটি বেজে উঠবেই। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মণের চোখের সামনে যে-সুদেশ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে তা মেঘনাদেরই স্বদেশ, এবং সেখানে 'মায়ের পূজা' দেবার প্রকৃত অধিকারী লক্ষ্মণ নন, মেঘনাদ। তিনি যে মেঘনাদের মাতৃভূমিতে বিদেশী হানাদার, লক্ষ্মণের নিজের মনেও বুঝি সেই কথা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, অন্তত কবি আভাসে সেই ইঙ্গিত এখানে দিয়েছেন।

লক্ষ্মণ যে একান্তই দৈবাশ্রিত এবং তাঁর নিজের কৃতিত্ব যে বিশেষ কিছু নেই তা বুঝাবার জন্য পঞ্চম সর্গের অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তি আরো আছে। পূর্ববর্তী সর্গে বর্ণিত লক্ষ্মণের প্রতি মহামায়ার আশ্বাস এখানে লক্ষ্মণের রিপোর্টে হুবহু পুনরুক্ত হয়েছে :

সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী সুমিত্রাসুত, দেবদেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য তোর, শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগরমাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।

সহসা শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি, দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!

'আপনি আমি আসিয়াছি হেথা / সাধিতে এ কার্য তোর, শিবের আদেশে'— এই অংশটি আর-একবার লক্ষ্মণের প্রতি ব্যবহৃত 'বলী' বিশেষণকে উপহাস করছে; কারণ লক্ষ্মণের কাজ সাধিত হবে আত্মবলে নয়, দেবদেবীর বলে। এই দীর্ঘ পুনরুক্তির সমাপ্তিতে 'যশস্বী' পদটি ষষ্ঠ সর্গে ব্যবহৃত 'মহাযশাঃ' পদটির আয়রনিকেই যেন আরো একটু প্রকট করে দিচ্ছে। ভীত লক্ষ্মণকে সাহস দেবার জন্যই বুঝি মহামায়া বলেছিলেন, 'নির্ভয় হৃদয়ে, / যা চলি, রে যশস্বি!' উপরন্তু 'সহসা শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, নাশ্ তারে' এই নির্দেশে কাপুরুষ পশ্চাৎঘাতককে শার্দুলের সঙ্গে তুলনা করায় লক্ষ্মণ প্রকৃতপক্ষে শার্দূল হয়ে ওঠেন নি। সর্গের প্রারম্ভে সিংহের চিত্রকল্পটির মতো এখানেও ব্যাঘ্রের চিত্রকল্প বিসদৃশই রয়ে গেছে এবং আয়রনির পোষক হয়েছে মাত্র। পঞ্চম সর্গের চিত্রকল্প আলোচনায় এই বৈসাদৃশ্য আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে সর্গারম্ভের সঙ্গে এই দীর্ঘ পুনরুক্তির যে সূক্ষ্ম সংযোগ রয়েছে শুধু তারই উল্লেখ করা হল।

লক্ষ্মণ একটু আগেই মহাদেব প্রসঙ্গে সর্পের ইমেজারি ব্যবহার করেছেন। প্রত্যুত্তরে রাম মেঘনাদ প্রসঙ্গেও সেই সর্পের ইমেজারিই ব্যবহার করছেন:

হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ু বেগে
প্রাণ লয়ে; দেব নর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক?

এই উক্তির সময় সম্ভবত রামচন্দ্র লক্ষ্মণের ব্যবহৃত চিত্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, নইলে সর্পের অনুষঙ্গে 'ভস্ম যার বিষে' এই চিত্রটি স্বাভাবিক নয়, সহজে মেনে নেওয়াও যায় না। লক্ষ্মণ মহাদেবকে মহোরগের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং মহাদেবের ললাট-বহ্নিতে মদনভস্মের কাহিনী সর্বজনবিদিত; এই মহাকাব্যেও চিত্রকল্পের মধ্যে বহুবার সে উল্লেখ আমরা পেয়েছি। অতএব রাম এখানে সর্পের চিত্রকল্প ব্যবহার করতে গিয়ে লক্ষ্মণের উক্তির প্রতিধ্বনি মনে রেখে মহাদেব ও মেঘনাদকে অজ্ঞাতে একসূত্রে গেঁথে ফেলেছেন। লক্ষ্মণ মেঘনাদবধের জন্য যে সর্পিল চক্রান্তের অভিযাত্রী হতে চলেছেন তার নৈতিক গ্লানিই বোধ করি প্রতিপক্ষের উপর সর্প-ইমেজারি আরোপের কারণ। আসলে লক্ষ্মণ কোনো সর্পবিবরে যাত্রা করছেন না, বরং মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারকেই তিনি একটি হত্যাবিবরে পরিণত করতে চলেছেন। লক্ষ্মণ যেমন পঞ্চম সর্গোক্ত দৃশ্যাবলীতে নিজের ভূমিকা বর্ণনায় মিথ্যা আত্মশ্লাঘা করেছেন, রামচন্দ্রও তেমনি নিজেকে বীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন:

নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ;

'রাজেন্দ্রদল' বলতে রামচন্দ্র কোন্ কোন্ রাজেন্দ্রকে বোঝাতে চান তা আমরা জানি না। বানররাজ সুগ্রীব ছাড়া আর কোনো রাজা রামের অনুগামী হয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু রাম 'রাজেন্দ্রদল' বলতে নিশ্চয়ই একাধিক রাজেন্দ্র বুঝিয়েছেন, এবং এ দাবি অবশ্যই রামের কপোলকল্পিত। মেঘনাদবধকাব্যের অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পর রামের বিলাপের কিছুটা রিহার্সালও এখানে আমরা পাচ্ছি। সেখানে আছে :

নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।

কৃত্তিবাসে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পর রামচন্দ্রের যে বিলাপ আছে সম্ভবত মধুসূদন এখানে সেই বিলাপ স্মরণ করেছেন :

রাজ্যধনে কার্য নাই নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোককেতে॥
উদয়াস্ত যতদূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার॥

বাল্মীকি রামায়ণেও রামের বিলাপে পাই :

অয়ং স সমরশ্লাঘী ভ্রাতা মে শুভলক্ষণঃ।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নঃ প্রাণৈর্মে কিং সুখেন বা॥
...
বিজয়োঽপি হি মে শূর ন প্রিয়ায়োপকল্পতে।
অচক্ষুর্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি॥
কিং মে যুদ্ধেন কিং প্রাণৈর্যুদ্ধকার্যং ন বিদ্যতে।
যত্রায়ং নিহতঃ শেতে রণমূর্ধণি লক্ষ্মণঃ॥
...
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

—যুদ্ধকাণ্ডম্, ১০১। ৫, ১১-১২, ১৫

(এই সমরশ্লাঘী পবিত্রাচারী ভাই লক্ষ্মণের যদি মৃত্যু হয় তবে আমার প্রাণধারণ বা সুখ দিয়ে কী হবে?... হে বীর, তোমা বিনা বিজয় লাভকেও প্রিয় জ্ঞান করি না ; চাঁদ যদি চোখের আড়ালে চলে যায় তা হলে কি প্রীতি উৎপন্ন হতে পারে? যখন রণমধ্যে নিহত হয়ে লক্ষ্মণ শায়িত তখন আমার

যুদ্ধেরই বা কী প্রয়োজন, প্রাণধারণেরই বা কী প্রয়োজন? যুদ্ধের কর্তব্য বলে আমার আর কিছুই নেই।… প্রতি দেশেই কলত্র এবং বান্ধব পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভাই পাওয়া যায় এমন দেশ তো চোখে পড়ে না।)

এই সময়ে লক্ষ্মণের কাছে রামের এই বিলাপ কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ-বধের পর মহাকাব্য কিভাবে অগ্রসর বা সমাপ্ত হবে হয়তো মধুসূদন সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় ছিলেন না। ষষ্ঠ সর্গের পর নবম সর্গোক্ত বর্ণনাই কাহিনীর স্বাভাবিক লজিক। সপ্তম ও অষ্টম সর্গের পরিকল্পনা হয়তো নরক-বর্ণনার লোভ থেকেই কবির মনে পশ্চাৎ-চিন্তা হিসাবে এসেছে। লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও রামের বিলাপ মেঘনাদবধকাব্যের মূল পরিকল্পনার মধ্যে থাকলে কবি কেন এখানেই সেই বিলাপের অকালবোধন করবেন? মায়াদেবীর অভয়বাণীর ('নির্ভয় হৃদয়ে, যা চলি, রে যশস্বি') পর এই বিলাপ রীতিমতো অ-নায়কোচিত। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পর রামের যে বিলাপ আছে তার কিছু অংশ উপরে উদ্ধৃত করেছি; স্থানকাল-বিচারে তা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে লক্ষ্মণের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে গিয়ে অনুরূপ বিলাপ খুব সমীচীন মনে হয় না। মধুসূদনের পূর্বপরিকল্পনায় হয়তো তাঁর মহাকাব্যে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের স্থান ছিল না, তাই তিনি কিছুটা জোর করেই পাঠককে অনুরূপ পরিবেশ উপহার দিতে চেয়েছেন। এতে মহাকাব্যের খানিকটা ব্যাপ্তিও ঘটেছে।

তা ছাড়া আরো একটা কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। এই বিলাপ লক্ষ্মণের জন্য ততটা নয় যতটা সীতার জন্য। সীতা এই মহাকাব্যের নায়িকা নন, তাঁর কোনো প্রধান ভূমিকাও নেই। কিন্তু পূর্বের একাধিক সর্গে আমরা দেখেছি মধুসূদন সীতাকে কী ভাবে এই কাব্যে নিগূঢ় আত্মিক কেন্দ্রে স্থাপন করে রেখেছেন। রাম বা লক্ষ্মণকে তিনি যেভাবেই চিত্রিত করুন-না কেন, সীতার দুঃখ ও গ্লানির প্রতি তাঁর সমবেদনা অটুট। সীতাপ্রসঙ্গে যে-ইমেজারি ব্যবহৃত হয়েছে তাতেই কবির নিবিড় অনুভূতি পরিস্ফুট :

> রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
> হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
> অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
> (হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
> নিবাইল দুরদৃষ্ট!

এটি গ্রাম্য কুটীরে বাঙালি গৃহস্থবধূর চিত্র। 'অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী' চতুর্থ সর্গের অশোককাননে 'কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে নীরবে' চিত্রটি মনে পড়িয়ে দেয়। সীতা গার্হস্থ্য পবিত্রতার প্রতীক। কিন্তু রাম এখানে যেভাবে বিলাপ করছেন তা মহাকাব্যের নায়কের পক্ষে অনুচিত। গোষ্ঠীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সাংসারিক শান্তির জন্য আক্ষেপেই অধীর। তাঁর বিলাপের ভাষা ও ধরনও যথেষ্ট গ্রাম্য :

> কে আর আছে রে
> আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
> রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?

চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ !

যুদ্ধে পরাজয়ের পর বা পরাজয়ের মুখে এরকম উক্তি তবু কিছুটা অর্থবহ হতে পারত। কিংবা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল ঘটনার চাপে জয়ের সম্ভাবনা যখন একেবারে তিরোহিত তখনো এরকম বিলাপ চলতে পারত। কিন্তু যখন অবস্থা সব দিক দিয়েই অনুকূল এবং যুদ্ধের ছলাকৌশল সবই দৈব-নির্দেশিত, তখন নিরাশ ভগ্নমনা রামের এই পশ্চাদপসরণের সুপারিশ একেবারেই অহেতুক মনে হয়। কিন্তু রামের এই দুর্বলতার সুযোগটুকু মহাকবি নিজের স্বার্থেই খানিকটা সৃষ্টি করেছেন। রামের বিলাপের ছলে মাইকেল মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ'ই এখানে ব্যক্ত হয়েছে :

কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।

রামের পক্ষে কোনো 'আশার ছলনা'য় ভোলার কথা ওঠেই না। তিনি কোনো মিথ্যা আশায় লুব্ধ হয়ে লঙ্কায় আসেন নি, তাঁকে আসতে হয়েছে অনিবার্য কর্তব্যের ডাকে, সীতা-উদ্ধারের প্রচেষ্টায়, এবং এই অভিযান যে সহজ, সুগম ও কুসুমাস্তীর্ণ হবে না তা তিনি প্রথম থেকেই জানেন। ফলে এই উক্তিটি পুরোপুরি রামের নয়, রামকে উপলক্ষ করে এটি আসলে মধুসূদনেরই মনের কথা ; এ যেন তাঁর আত্মজীবনী বা ডায়ারির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। মধুসূদন এখানে তাঁর রাম ও রাবণের দ্বিধাবিভক্ত আত্মসত্তাকেই প্রকাশ করেছেন। রাম ও রাবণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও নবীন উভয়ের প্রতিই মধুসূদনের আংশিক আকর্ষণ ও আনুগত্য আছে। প্রবল বিদ্রোহে তিনি প্রথমে প্রাচ্য ও প্রাচীনকে আঘাত করেছেন এবং পাশ্চাত্য ও নবীনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছেন, কিন্তু তৃপ্ত হন নি। প্রাচ্য ও প্রাচীনের কালজয়ী আকর্ষণ হোমরভক্ত মহাকবিকে নিয়ে এসেছে লঙ্কার রণাঙ্গনে। 'রাক্ষসপুর' বলতে তিনি এক ঐশ্বর্যদর্পী আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বোঝেন যার প্রতি তাঁর কোনো ঘৃণা নেই বরং আকর্ষণই রয়েছে। কিন্তু সেই সভ্যতার কাছে বা সেই দ্রুত-জীবনের কাছে তিনি যে তৃপ্তি বা সুখ আশা করেছিলেন তা পান নি এবং বুঝেছেন যে পাওয়া সম্ভবও নয়। পাশ্চাত্যকে 'সব পেয়েছির দেশ' ভেবে তিনি ভুল করেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর কোনো বিতৃষ্ণা নেই। পাশ্চাত্যও যে অসম্পূর্ণ, এটি আবিষ্কার করবার পর তাঁর মধ্যে এক ধরনের ব্যর্থতাবোধ পুঞ্জীভূত হয়েছে, এইমাত্র। সেই ব্যর্থতাবোধ কবির 'আত্মবিলাপ' নামক কবিতার মধ্যেও লিপিবদ্ধ আছে, এবং পূর্ববর্তী সর্গেও 'আত্মবিলাপ'-এর প্রতিধ্বনি আমরা শুনেছি, যেমন এখানেও শুনছি। মেঘনাদবধকাব্যে মাইকেল রাবণের সঙ্গে একাত্ম হয়েও অনেক ক্ষেত্রে রামের ভাষায় কথা বলেছেন এবং সব ক্ষেত্রেই সীতার প্রতি অনুগত থেকেছেন। এইভাবে মহাকাব্যের মধ্যে কবির প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে দ্বিধাক্লিষ্ট আধুনিক ব্যক্তিত্ব, বিবেক ও স্বদেশাভিমান লীন হয়ে গেছে।

লক্ষ্মণ বার বার রামকে বোঝাচ্ছেন যে ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁর কোনো হানির আশঙ্কা নেই, কারণ তিনি 'দৈববলে বলী'। তাঁর কথার মধ্যে আত্মশক্তির উল্লেখ পাই না, শুধু দৈবশক্তির বিবরণই পাই। এমন সম্পূর্ণ দেবদেবী-পরিচালিত, বহিঃশক্তি-নির্ভর লক্ষ্মণের পক্ষে 'বীরদর্প' যে কতটা বেমানান তা লক্ষ্মণ নিজে একটুও বোঝেন না এইটেই সবচেয়ে করুণ ও কৌতুকাবহ! দেবতাদের ভূমিকা বর্ণনা

করতে গিয়ে লক্ষ্মণ যে-চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন তার মধ্যেও কবি লঙ্কার প্রতি তাঁর পক্ষপাত ও সহানুভূতি গোপন রাখেন নি :

দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে !

এখানে দেবতারাই প্রকারান্তরে অশুভ শক্তির দ্যোতক হয়ে উঠেছেন। লঙ্কার স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার মধ্যে কোনো কলঙ্ক নেই বা আপনা থেকেই তা ম্লান হয় নি ; দেবতাদের অসূয়াই লঙ্কার উপর মলিন মেঘাবরণ সৃষ্টি করেছে। দেবতাদের দুমুখো নীতি পরিস্ফুট হয়েছে পরবর্তী চিত্রে—'দেবহাস্য উজলিছে, দেখ, / এ তব শিবির, প্রভু!' রামশিবিরের ঔজ্জ্বল্য স্বকীয় নয়, ধার করা, দেবতাদের দয়ার দান। কিন্তু লঙ্কার স্বর্ণময়ী আভা তার নিজস্ব ; দেবতারা ষড়যন্ত্র করে তাকে ছায়াবৃত করে রেখেছেন, নইলে তার সোনালি আভা সর্বদাই চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন, দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দৈবকৃপায় তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করবেন ; শুধু তাই নয় এই অভিযান তাঁদের স্বেচ্ছাকৃত ততটা নয়, যতটা দেবাদিষ্ট। দেবতাদের আজ্ঞা পালন না করলে অধর্ম হবে এই যুক্তিও লক্ষ্মণ দিয়েছেন :

কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?

লক্ষ্মণের মুখে ধর্মের বুলি যেন ভূতের মুখে রামনাম। যিনি অন্যায়যুদ্ধে উদ্যত এবং কুশাসনাসীন ইন্দ্রজিতের পবিত্র পূজাগৃহ লণ্ডভণ্ড করতে যাচ্ছেন তাঁর মুখে মঙ্গল-ঘটের শুচিতা বিষয়ে এই উদ্‌বেগ ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার ছাড়া আর কী ? ধর্মাধর্মের ন্যূনতম বোধ জাগ্রত থাকলে লক্ষ্মণ মুখে ধর্মের বুলি এবং কাজে চরম অধর্ম করতে অগ্রসর হতেন না। এমন-কি, নিরস্ত্রকে আঘাত না করার সামান্য ক্ষাত্রধর্মটুকুও পালন করার পরিবর্তে তিনি অচিরেই মেঘনাদকে বলবেন :

ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে !

এই যেখানে ধর্মের নমুনা সেখানে ধার্মিকদের থেকে শত যোজন দূরে থাকাই সমীচীন। মধুসূদন এই-সব দুমুখো, ভণ্ড ধর্মধ্বজীদের প্রতি বে-শ্লেষের কশাঘাত হেনেছেন তা ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের বিদ্রোহী বাতাবরণেরই ফলশ্রুতি। ষষ্ঠ সর্গে ধর্মধ্বজীদের নীতিহীন স্ববিরোধ ও আত্মপ্রতারণা মধুসূদন নাটকীয়ভাবে তুলে ধরেছেন এবং এই ভণ্ডামির মুখোশ খুলতে তিনি সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করেছেন শ্লেষ ও ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প। উপরে উল্লিখিত পদাঘাতে মঙ্গলঘট ভাঙার চিত্রকল্পের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে এই শ্লেষ ব্যক্ত হয়েছে।

রামের অনুমতিলাভের জন্য লক্ষ্মণের পর বিভীষণের বক্তৃতা শুরু। তিনি রামের পূর্বের কথার প্রতিধ্বনি করে মেঘনাদের বর্ণনায় সর্পের ইমেজারি ('কৃতান্ত-দূত') ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মৃত্যুদূতসম মেঘনাদকে আর ভয় করার প্রয়োজন নেই, কারণ স্বয়ং ভাগ্যলক্ষ্মী স্বপ্নে বিভীষণকে আশ্বাস দিয়েছেন যে

ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ নিহত হবেন এবং বিভীষণই অদূর ভবিষ্যতে লঙ্কার শূন্য সিংহাসনে বসবেন। অতএব লক্ষ্মণ যেন অবশ্যই মেঘনাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তিনি সহায়ক হিসাবে সঙ্গে থাকবেন। এই অতিরিক্ত স্বপ্নাদেশের অবতারণা এখানে বাহুল্য মনে হতে পারে। কারণ মায়াদেবী এর আগেই লক্ষ্মণকে যে বর ও আশ্বাস দিয়েছেন তার পর আবার এই স্বপ্নাদেশের কী সার্থকতা? আসলে রামকে আশ্বস্ত করবার জন্য নয়, বিভীষণের মানসিকতা খুলে ধরার জন্যই এই স্বপ্নদর্শনের অবতারণা। বিভীষণ যে শুধু ন্যায়নীতি বা রামানুগত্যের জন্যই ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লক্ষ্মণের সাথি, তা নয়; তাঁর নিজের লাভ, লোভ, উচ্চাভিলাষ এবং স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত। তাঁর আগ্রহ ও ব্যগ্রতার কারণ স্বপ্নদত্ত এই সমাচার :

পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন ছত্রদণ্ডসহ,
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি!

বিভীষণকেও 'যশস্বী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে; অথচ পাঠক জানেন বিভীষণ একজন ঘরসন্ধানী 'কুইসলিং' মাত্র। 'যশস্বী' লক্ষ্মণ এবং 'যশস্বী' বিভীষণ একই অপযশের দোসর। বুঝতে কষ্ট হয় না যে বার বার যত্রতত্র 'যশস্বী' পদটি ব্যবহার করে কবি ব্যাপক আয়রনির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চান।

মেঘনাদবধ রামায়ণের তো বটেই লঙ্কাকাণ্ডেরও ক্ষুদ্র একটি এপিসোড মাত্র। মধুসূদনের কৃতিত্ব এই যে তিনি একটিমাত্র এপিসোড গ্রহণ করেও তারই মধ্যে এপিকের ব্যাপকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, প্রায় সমগ্র রামায়ণের পটভূমি ও স্বাদ পাঠককে দিতে পেরেছেন। বিভিন্ন সর্গে এমন সব ডায়ালগ যুক্ত করেছেন এবং এমন স্বাভাবিকভাবে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করেছেন অথবা স্বপ্ন ও ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন যাতে পাঠক লঙ্কার দ্বারদেশে বসেই রামায়ণের আদি, অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর প্রভৃতি কাণ্ডের মধ্য দিয়ে অবলীলায় পরিভ্রমণ করতে পারেন, অথচ নাটকীয় তীব্র বিন্দু থেকে কখনোই একেবারে বিচ্যুত হন না। রাম দু'দুবার মেঘনাদের পরাক্রম দেখেছেন, লক্ষ্মণকে আবার ইন্দ্রজিতের মুখে ঠেলে দিতে তিনি স্বভাবতই দ্বিধান্বিত। তাই তিনি বিভীষণকে বলছেন :

স্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল-জলে?

এ পর্যন্ত 'পূর্বের কথা' যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক। কিন্তু মধুসূদন এই প্রসঙ্গটুকুর সুযোগে, এরই সূত্র ধরে, যুদ্ধক্ষেত্র এবং মেঘনাদ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন এবং পাঠককে সঙ্গে করে ফিরে গেছেন অযোধ্যায়, রামচরিতের শুরুতে। কবি বিশেষ করে আলোকপাত করেছেন বনবাসযাত্রার দৃশ্যের উপর এবং ক্লোজ-আপের মধ্যে নিয়ে এসেছেন যথাক্রমে সুমিত্রা, ঊর্মিলা ও লক্ষ্মণকে :

কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা ঊর্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?

না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।

মনোযোগী পাঠককে কবি এখানে শুধু রামায়ণের গোড়ার কথাই নয়, প্রকারান্তরে অব্যবহিত 'পূর্বের কথা', পঞ্চম সর্গের শেষ দিকের কথাও, স্মরণ করিয়েছেন। লক্ষ্মণের বনযাত্রার মতো সেখানেও লক্ষ্মণের প্রতিপক্ষ মেঘনাদের কাননযাত্রার কথা আছে; সেখানেও তরুণ বীর মাতা ও পত্নীর বিরহ সহ্য করে কর্তব্য পালনে যাত্রা করেছেন; সেখানেও কবি ক্লোজ-আপের মধ্যে নিয়ে এসেছেন যথাক্রমে মন্দোদরী, প্রমীলা ও মেঘনাদকে:

কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূসহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।

ষষ্ঠ সর্গে সুমিত্রার উক্তি, 'নয়নের মণি/আমার, হরিলি তুই, রাঘব!'

পঞ্চম সর্গে মন্দোদরীও বলেছিলেন, 'নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি/আমায় এ ঘরে তুই।' যুদ্ধের উভয় শিবিরের মধ্যে এই সম্পূর্ণ আত্মিক সাদৃশ্য মহাকবির নিজের রচনা; এটি নিঃসন্দেহে অতি উচ্চ সৃষ্টিকৌশলের দৃষ্টান্ত। দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্বিশেষে স্নেহ প্রেম-বিরহের মানবিক স্পর্শ উভয় পক্ষকেই সমানভাবে আন্দোলিত করে; সব বীরই পুত্র ও পতি হিসাবে মায়ের চোখের জল, পত্নী-বিরহের বেদনা একইভাবে অনুভব করেন।

রাম তাঁর পূর্বের কথারই পুনরুক্তি করে বলছেন, 'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।' আমরা আগেই বলেছি এই ধরনের ভীরু উক্তি ও রণে ভঙ্গ দেবার যুক্তি ঠিক এপিক-নায়কোচিত নয়। এমন-কি, আশার ছলনার কথাও রাম এখানে প্রায় পুনরুক্তি করছেন:

হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পূরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।

এখানে স্বয়ং মধুসূদন রামের ভাষায় কথা বলছেন। এই 'মায়াবিনী আশা' ও 'রাক্ষসপুর' কবির আত্ম-জীবনী ও আত্মবিলাপের সঙ্গেই বেশি সংশ্লিষ্ট।

রামকে আশ্বস্ত করবার জন্য সরস্বতী আকাশবাণী ধ্বনিত করলেন, কারণ মেঘনাদবধের জন্য সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা দেবদেবীদেরই। এখানে কবি শুধু দৈববাণী নয়, দৈববাণীর মর্মার্থও রামের কাছে প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান করে তুলেছেন। ভবিষ্যদ্‌বাণীর একটি চিত্ররূপ, দীর্ঘ চিত্রকল্প, যেন এলিজাবেথীয় নাটকে বহুল ব্যবহৃত মূক দৃশ্য (dumb show), মধুসূদন এখানে ব্যবহার করেছেন। 'গরবোডাক' (Gorboduc) বা 'হ্যামলেট' (Hamlet) নাটকে ব্যবহৃত dumb show-র মতোই এখানে সর্প-ময়ূর যুদ্ধের দৃশ্যটি ইঙ্গিতবহ, বলা যায় প্যারেব্‌ল্‌-সদৃশ:

দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহিসহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরাবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজাগর— বিজয়ীসংগ্রামে।

ইলিয়াদ মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গে ঈগল-সর্পের যুদ্ধের অনুরূপ একটি দৃশ্য আছে। কিন্তু সেখানে দৃশ্যটি হেকতরের পক্ষে অশুভ ইঙ্গিতের বাহক। জ্ঞানী পলিদেমস হেকতরকে বলেছিলেন, সর্পের কাছে ঈগলের পরাজয়ের এই আকাশ-দৃশ্যটি নিশ্চয়ই দেবরাজ জিউস ট্রোজানদের সতর্ক করে দেবার জন্যই পাঠিয়েছেন। মধুসূদন ঈগলের পরিবর্তে খাঁটি ভারতীয় বিহঙ্গ ময়ূরের ব্যবহার করেছেন, তা ছাড়া মেঘনাদবধকাব্যের এই দৃশ্যে কোনো সতর্কতা বা সাবধানবাণীর প্রশ্নই ওঠে না। এখানকার দৃশ্যটি বরং এলিজাবেথীয় নাটকের দৃশ্যারম্ভে ব্যবহৃত মূক পূর্বাভাষেরই অনুরূপ, বিভীষণের ভাষায়:

নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে;—
নির্বারিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!

কবি মধুসূদন ইলিয়াদের দৃশ্যটি মনে রেখেও এখানে তার ব্যবহারে একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। হোমরে পরাজিত ঈগল হেকতরের প্রতীক, পাঠকের সহানুভূতি তাঁর দিকে। এখানেও পরাজিত শিখী মেঘনাদের প্রতীক, পাঠকের সহানুভূতি তাঁর দিকে। যদিও লক্ষ্মণের সামনেই এই দৃশ্যটি উপস্থিত করা হয়েছে এবং রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কে উৎসাহিত করার জন্যই এর অবতারণা, তবু লক্ষ্মণের ভূমিকা যে সর্পের মতো এখানে তা অস্ফুট থাকে নি। মিলটনের মতো মধুসূদনের কাছেও সর্প এবং শয়তান অনেক ক্ষেত্রেই একে অপরের বিকল্প। এই সর্গে যে সর্প-ইমেজারির আধিক্য দেখি লক্ষ্মণের কুটিল অভিযানের বাতাবরণ সৃষ্টির জন্যই তার আমদানি। আর প্যারেব্‌ল্‌ আকারে পরিবেশিত এই মূক দৃশ্যে তো লক্ষ্মণ ও সাপ একেবারে সমার্থক।

শেকসপীয়রের নাটকে আমরা দেখি সজ্জা (appearance) ও সত্তা (reality)-র বিরোধকে নাট্যকার অনেক ক্ষেত্রে নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং নাটকীয় আয়রনি সৃষ্টিতেও এই বিরোধকে কাজে লাগিয়েছেন। তীব্র নাটকীয় বোধসম্পন্ন কবি মাইকেল মধুসূদন রাম-কর্তৃক লক্ষ্মণের যুদ্ধসজ্জার যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যেও সজ্জা ও সত্তার বিরোধ-ঘটিত আয়রনি যথেষ্ট আছে। 'সুমতি' এবং 'তেজস্বী' এই বিশেষণ দুটি ছাড়াও চিত্রকল্পের মধ্যে সূর্য এবং সিংহের আমদানি করা হয়েছে:

বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী !— মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !

কিন্তু এই লক্ষ্মণই একটু পরে মেঘনাদকে সম্বোধন করে বলবেন, 'আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু / ছাড়ে রে কিরাত তারে ?' এবং মেঘনাদ তাঁকে 'তস্কর' বলে ভর্ৎসনা করবেন ; তখন কোথায় থাকবে সূর্যের দীপ্তি ও সিংহের বিক্রম ? এই সাড়ম্বর চিত্রকল্প তখন লক্ষ্মণের পক্ষে হয়ে উঠবে উপহাস ও আয়রনির উপাদান ; এবং বীর সজ্জা ভেদ করে তখন তস্কর সত্তাটিই বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু আপাতত বাদ্য ও জয়ধ্বনির মধ্যে কবি 'বীর'-বেশী লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে শিবির থেকে যাত্রা করালেন। তবে এই সাজসজ্জা ও বাদ্যভাণ্ডের অন্তঃসারশূন্য কৃত্রিমতার প্রতি মধুসূদন খুব সূক্ষ্মভাবে পাঠককে সচেতন করতেও ভুললেন না। অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট করে দিলেন দুর্বল শব্দানুপ্রাসের ক্রমাগত প্রয়োগে ; যে পঙ্‌ক্তিগুলিতে অনুপ্রাসের আধিক্য সেই পঙ্‌ক্তিগুলিই সংযুক্তবর্ণবিরল, ফলে দুর্বল 'ব'-ধ্বনি এখানে প্রকৃত বলবত্তাকে যেন ব্যঙ্গ করে কোমল ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে ; ব্যগ্র তুরঙ্গমের ইমেজটির প্রভুত্ব সমগ্র বর্ণনায় একেবারেই বজায় থাকে নি :

শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমর তরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে !
বাহিরিলা বীরবর বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে !
বরষিলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গল বাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !

বলবত্তার সাড়ম্বর আড়ালে এই দুর্বল-কোমল লক্ষ্মণের প্রকৃত সত্তা কবি একাই ফাঁস করে দেন নি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রও সে কাজে কবিকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। লক্ষ্মণকে বীর ছাঁদে সাজাবার পর পুতুল-বীর লক্ষ্মণের জন্য অম্বিকার কাছে রামচন্দ্রের ব্যাকুল প্রার্থনার মধ্যে তিনি নিজেই ছোটো ভাইকে যে কত ছোটো করে ফেলেছেন তা খেয়াল করেন নি : 'রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃ সমরে,/প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !' ইত্যাদি। কাঁদুনি গাইতে গিয়ে রাম বীর লক্ষ্মণকে একেবারে কিশোর বালকে পরিণত করে দিলেন ; চোদ্দ বছর বনবাসের সরল হিসাবটিও তিনি বিস্মৃত হলেন, যদিও একটু আগেই রাম তাঁর সুদীর্ঘ পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ('স্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,/আকুল পরাণ কাঁদে !') বলেছিলেন :

আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।

'তরুণ যৌবন'-এর সঙ্গে চোদ্দ বছর যোগ করলে কি 'কৈশোর' হয়? বুঝতে কষ্ট হয় না 'মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী' পূর্বের এই চিত্রকল্প লক্ষ্মণ সম্পর্কে নিছক বাগাড়ম্বর। রাম যদি লক্ষ্মণকে বালকই জ্ঞান করে থাকেন, তবে সেই বালককে নিয়ে নিতান্তই বাড়াবাড়ি করেছেন। পূর্বোক্ত অকারণ শব্দানুপ্রাসের মতোই যেন কতকগুলি অকারণ বাক্যব্যয় করা হয়েছে যেগুলি শুধু কথার কথা। সজ্জা ও সত্তার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য অবশ্যই শুধু কথা দিয়ে পূর্ণ করা যায় নি, পুতুল-বীরকে এপিক-বীরের মর্যাদায় তোলা সম্ভবপর হয় নি, ফুলিয়ে ফাঁপিয়েও লক্ষ্মণকে মেঘনাদের সমকক্ষ করে গড়া যায় নি। একই পঙ্‌ক্তির দাঁড়িপাল্লায় দুজনকে তুল্যমূল্য করে বসিয়ে বিভীষণ সেই চেষ্টাই করেছেন: 'সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।' কিন্তু এ-সমতা প্রকৃত সমতা নয়। তাই সময়ে অসময়ে রামচন্দ্রকে ধর্মের দোহাই পাড়তে হয়েছে, 'ধর্ম বিপন্ন' এই অজুহাতে তিনি যত্রতত্র দৈব সহায়তা প্রার্থনা করেছেন:

ধর্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে।

এই ধর্ম কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম বা এপিক-বীরের শূরধর্ম নয়, অম্বিকার কাছে পূজারী ব্রাহ্মণের ('রাঘব ভিখারী') ভিক্ষাপ্রার্থনাকে ক্ষাত্রধর্ম বলা যায় না।

কবি লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধোদ্যমের উপর বারবার আলোকসম্পাত করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই ছায়া বা কুজ্ঝটিকা এসে সেই আলো ম্লান করে দিয়েছে। আলোছায়ার খেলার মধ্যে লক্ষ্মণ সম্পর্কে কবির দ্বিধা এবং বিশেষ করে পূর্বোল্লিখিত সজ্জা ও সত্তার বিরোধই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি একবার বাইরের আকাশে অরুণোদয়ের দিকে তাকিয়েছেন, পরক্ষণেই লক্ষ্মণের মনের অন্ধকারের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। মেঘ, ছায়া, কুজ্ঝটিকার মধ্যে লক্ষ্মণের ঔজ্জ্বল্য একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। অম্বিকা রামকে অভয় দেবার পর কবি একটি নির্মল উষার চিত্র অঙ্কিত করেছেন:

হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!

উপরে যে 'আঁধার হৃদয়ের' কথা বলা হয়েছে তা লক্ষ্মণ ছাড়া আর কার হতে পারে? এই 'আঁধার' কি

শুধুই আশঙ্কার আঁধার? দুষ্কৃতকারীর মনের তমোরাশিও কি এর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে নেই? শর্বরী পোহাচ্ছে কিন্তু তাও মৃদুগতি ও দ্বিধান্বিত। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' এরকম বর্ণনা লক্ষ্মণের অভিযান সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। ধর্মের দোহাই এবং দৈবের ভরসা সত্ত্বেও লক্ষ্মণের মনের মধ্যে একটি তস্কর মুখ লুকিয়ে আছে। তাঁর সারসনে রত্নমণ্ডিত যে ভাস্বর অসি রামচন্দ্র ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তা গুপ্তঘাতকের ছুরিকায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। এই মুহূর্তে কবি তার সামান্য আভাষ ছাড়া বেশি কিছু বললেন না, শুধু প্রকৃতির চত্বরে উষার দৃশ্যপটটি যত্ন করে সাজিয়ে দিলেন। নিকুঞ্জে যে অলির গুঞ্জরণ ধ্বনিত হল সেও কবি মধুসূদনেরই সৃষ্টি, 'মধুজীবী'! শিল্পী যেমন চিত্রের মধ্যে এক কোণে ক্ষুদ্র স্বাক্ষরটি রেখে দেন কবি মধুসূদনও তেমনিভাবে 'মধু' এই দু-অক্ষরের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরটি এই চিত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। মধুসূদনের ব্যক্তিমনের স্পর্শ আরো আছে। বিস্তৃত আকাশপটে একটিমাত্র তারা— এটি চিত্রী মধুসূদনের অন্যতম প্রিয় 'থিম'। এরই রকমফের কখনো উষায়, কখনো সন্ধ্যায়, বারেবারে তাঁর রচনায় আমরা দেখতে পাই। এই একাকী তারাটি কবির কপোতাক্ষতীরে সাগরদাঁড়ির আকাশে দেখা তারা অথবা কৈশোর-যৌবনে অন্তরস্পর্শী কোনো নারীর চোখের তারা তা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁর কাব্যের আকাশে এই একটি তারা চিরস্পন্দমান। কাব্যের পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাবার সময় বা হঠাৎ কাব্যের মধ্যে পাঠকের চিত্তবিশ্রাম দিতে গিয়ে তিনি যখন নিসর্গচিত্র আন্দোলিত করেন তখন কখনো কখনো তাঁর এই প্রিয় তারকাটি সেখানে অবলীলায় ফুটে উঠেছে দেখা যায়।

লক্ষ্মণ ও বিভীষণ তস্কর ও গৃহসন্ধানী; আলোকিত উষা তাঁদের প্রার্থিত নয়। তাঁরা দুজন মেঘ ও কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য থেকে লঙ্কার দিকে চলেছেন:

চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।

'মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী' লক্ষ্মণ সম্বন্ধে পূর্বেকার এই চিত্রকল্পটি যে শুধু লক্ষ্মণের সজ্জারই বর্ণনা সত্তার সত্য নয়, তা কবি খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। মধ্যাহ্নের কিরণ দূরের কথা উষার স্বল্প আলোটুকুও বজায় রাখা গেল না, মেঘ ও কুয়াশায় লক্ষ্মণের ছায়াবৃত মুখটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইলিয়াদ মহাকাব্যের শেষ (চতুর্বিংশ) সর্গে ট্রয়রাজ প্রায়াম যখন তাঁর পুত্র হেকতর-এর মৃতদেহ ফিরিয়ে আনবার জন্য গ্রীক শিবিরে যান তখন হেরমেসও তাঁকে লোকচক্ষুর আড়াল করে নিয়ে যান। কিন্তু সেই অদৃশ্য যাত্রার সঙ্গে লক্ষ্মণ ও বিভীষণের এই অদৃশ্য যাত্রার উদ্দেশ্যের কোনো মিল নেই।

মেঘনাদ জানেন না কী বিরাট ষড়যন্ত্রের তিনি শিকার হতে চলেছেন। শুধু সন্ধানী বিভীষণই নয়, সমগ্র দেবকুল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত। মায়া তাঁর জাল বিস্তার ও মেঘ সৃষ্টি ক'রেই— অনেকটা আধুনিক যুদ্ধে যেমন বিমানবহর দিয়ে পদাতিককে 'এয়ার কভার' দেওয়া হয় তেমনি— ক্ষান্ত হন নি, তিনি লঙ্কার রাজলক্ষ্মী কমলাকে পর্যন্ত দলে টেনেছেন। বীরত্বের বদলে ছলনাই যাদের সম্বল তাদের সমর্থক দেব-দেবীরা পর্যন্ত ছলনা ও ছদ্মবেশে পটু। মায়া দেবী 'রক্ষোবধূ-বেশে' লঙ্কায় প্রবেশ করে কমলার কাছে

সেই বস্তাপচা ধর্মের দোহাই পেড়েছেন, এমন-কি, শিবের আদেশের কথাও স্মরণ করাতে ভোলেন নি। কিন্তু পিতা যদি দোষীও হয় তবু পিতার পাপে পুত্রকে নিধন করায় কোন্ ধর্ম রক্ষিত হচ্ছে তা কেউই ব্যাখ্যা করে বলতে পারছেন না। 'ধর্ম' এখানে ষড়যন্ত্রীদের একটা কৌশলী জিগির মাত্র, এবং বিভীষণ থেকে দেবদেবী পর্যন্ত সকলেই এই জিগির পেড়েছেন। মেঘনাদ 'দম্ভী', ক্ষত্রিয় বীরের সেটি গুণ ; এ ছাড়া মেঘনাদের কোনো নির্দিষ্ট দোষের কথা কেউ উল্লেখ করতে পারেন নি। সকলেই বিশ্ববিধানের কথা এবং রাবণের দোষের কথা তুলেছেন ; কমলা বলেছেন, 'নিজ দোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি' এবং 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?' কিন্তু নির্দোষ মেঘনাদকে সেজন্য বধ করা হচ্ছে কেন, এবং এমন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেই বা তা করা হচ্ছে কেন, এর উত্তর মেলে না। কমলা লক্ষ্মণকে বর দিচ্ছেন যে ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের হাতে নিহত হবেন :

> কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
> নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
> সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
> বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !

স্পষ্টতই লক্ষ্মণ ভীত, তাই লক্ষ্মণকে বিশেষ করে সাহস দেওয়া হচ্ছে তিনি 'নির্ভয়ে' লঙ্কায় প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু তার পর সেই লক্ষ্মণকেই 'বলী' এই বিশেষণে ভূষিত করা কি সংগত ? মেঘনাদের প্রকৃত পরিচয় তিনি 'অরিন্দম', অপরাজেয় বীরত্বেই তাঁর স্বাভাবিক পরিচয়। কমলা লক্ষ্মণকে 'বলী' বলেছেন, কিন্তু মেঘনাদকেও 'অরিন্দম' বলতে বাধ্য হয়েছেন। আর এই দুটি শব্দের আড়ালে দাঁড়িয়ে মহাকবি মধুসূদন মেঘনাদের দিকেই পাল্লা ভারী রেখেছেন। কারণ, আর কিছু না হোক 'বলী' এবং 'অরিন্দম' এই দুটি শব্দের ওজনে যে পার্থক্য তাই দিয়েই লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের শৌর্যের ব্যবধান পরিমাপ করা যায়।

দেব ও নরের ষড়যন্ত্রে এইভাবে লঙ্কার লক্ষ্মীশ্রী নষ্ট হল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হবার অনেক আগেই লঙ্কার আসন্ন সর্বনাশ তার অবয়বে ফুটে উঠল। কবি যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলেন এবং প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার বিবরণ এপিকে আদৃত পারাতাকসিস রীতিতেই লিপিবদ্ধ করলেন :

> শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
> ভাঙিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
> বারি।

'ভাঙিল মঙ্গলঘট' ; কিন্তু এই মুহূর্তে মেঘনাদ-দ্বেষী দেব ও নরযূথকে সে কথা বলতে কেউ এগিয়ে এল না। কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্মণ ধর্মের দোহাই পেড়ে রামকে বলেছিলেন :

> ধর্মপথে সদা গতি তব,
> এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি ?
> কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?

কে কোথায় মঙ্গলঘট ভাঙে সে তো স্পষ্টই আমরা দেখতে পাচ্ছি। অন্যায় আক্রমণকারীরাই তা করে থাকে এবং করবার সময় নীতি, ধর্ম, ঔচিত্য কিছুরই বাদবিচার করে না। কবি লঙ্কার বিপদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা ;
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !

এখানে 'কাঁদিলা' এবং 'কাঁপিলা' যথাক্রমে কবির অন্তর এবং লেখনী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। হোমর যেমন এক-এক সময় নিজেই তাঁর মহাকাব্যের মধ্যে প্রবেশ করে হর্ষবিষাদের ভাগী হয়েছেন এবং উচ্ছ্বাস বা শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, মধুসূদনও তেমনি এখানে লঙ্কার পক্ষ নিয়ে তার শ্রীহানিতে আক্ষেপ করে লঙ্কাকেই সম্বোধন করে বসেছেন— 'জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !' এই মহাকাব্যে লঙ্কার একটি স্বকীয় ব্যক্তিত্ব আছে ; সীতা, প্রমীলা প্রভৃতির দুঃখিনী আত্মার সঙ্গে বীরপ্রসূ স্বর্ণলঙ্কার আত্মাও যুক্ত হয়ে গেছে !

কমলা এবং মায়া লঙ্কার প্রাচীর থেকে লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন :

হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে।

সজ্জা ও সত্তা, আকৃতি ও প্রকৃতি এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এখানেও সূচিত। লক্ষ্মণ দেব নন, দেবাকৃতি এবং সূর্য ও অগ্নির আবৃত সত্তার সঙ্গেই তাঁর তুলনা। মায়ার আবরণ তো বাইরের ব্যাপার ; লক্ষ্মণের অন্তরের শুভ্রতা ও ঔজ্জ্বল্যও এখন নিশ্চিহ্নপ্রায়। আর-একটি চিত্রকল্পে কবি লক্ষ্মণের কাপুরুষতা ও হীনতা এবং মেঘনাদের শুচিতার কথা বিবৃত করেছেন :

ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।

এই সর্গের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কবি লক্ষ্মণকে 'বলী সৌমিত্রি কেশরী' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু এখন কোথায় সেই 'কেশরী' ? সিংহের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বদলে 'সুযোগপ্রয়াসী' ব্যাঘ্রের কথাই কবি স্মরণ করেছেন এবং তার চেয়েও হীন, কুটিল ও গুপ্তগতি কুমীরের সঙ্গে লক্ষ্মণের তুলনা দিয়েছেন। গুপ্তঘাতক লক্ষ্মণ যাঁকে শিকার করবেন তাঁর মুক্ত সারল্য ও শুচিতা কবি ব্যক্ত করেছেন হরিণ এবং স্নানার্থীর চিত্রকল্পে। অবগাহন নিষ্পাপ শুচিতারই দ্যোতক। পক্ষান্তরে নিষ্ঠুরতা, খলতা ও ছলনার প্রতীক কুম্ভীর। লক্ষ্মণ সাধারণ নক্র নন ; কবি তাঁকে পাপের সঙ্গে, নরকের সঙ্গে আরো যুক্ত করে বলেছেন 'যমচক্ররূপী নক্র'। মহাকবির সমবেদনা মেঘনাদের প্রতি, এবং তা সোচ্চার :

হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে।

এখানে আবার যমপুরীর উল্লেখ, এবং কুটিলগতি লক্ষ্মণের উপযুক্ত উপমা হয়েছে সাপ। লক্ষ্মণরূপী সাপের অনুপ্রবেশের আগেই কবি একাধিকবার সর্প ইমেজারি ব্যবহার করে পাঠকের মনকে প্রস্তুত করছিলেন এবং এইভাবে সমগ্র ষষ্ঠ সর্গের উপর বিষাক্ত সাপের ছোবলের বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছিল। 'রিপু' এবং 'অহি' প্রত্যেকটিই অশুভ শক্তির দ্যোতক; পক্ষান্তরে 'কুসুম' নিষ্পাপ ঔজ্জ্বল্যেরই প্রতিমূর্তি। চিত্রকল্পের অন্তে 'কৌশলে' পদটি পাঠকের কানে বহুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বলে নয়, ছলে এবং কৌশলেই লক্ষ্মণ কার্যসিদ্ধি করতে চান। সমস্ত ক্ষাত্র ধর্ম ও নীতি বিসর্জন দিয়ে এই লক্ষ্মণই অচিরে মেঘনাদকে বলবেন, 'মারি অরি, পারি যে-কৌশলে!' উপরের চিত্রকল্পে কবি সেই লক্ষ্মণকেই প্রবেশপত্র দিলেন।

লক্ষ্মণ এই প্রথম লঙ্কার অভ্যন্তর দেখলেন। বিস্ময় এবং ভয় যুগপৎ তাঁকে অধিকার করল। মেঘনাদ লঙ্কারই বীরপুত্র। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ রক্ষিত লঙ্কা 'ভীমাকৃতি ভীমবীর্য; অজেয় সংগ্রামে।' কবি মেঘনাদ-অনুগামী লঙ্কার বীরদের শক্তি কর্কশ ব্যঞ্জনধ্বনিতে ব্যক্ত করেছেন:

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী,
সুবর্ণস্যন্দনারূঢ়;

'সভয়ে বলী' এই পরস্পরবিরোধী পদদুটি একসঙ্গে যুক্ত করে কবি লক্ষ্মণের বীরত্বকে উপহাসই করেছেন। লক্ষণীয়, 'হেরিলা সভয়ে বলী' এই কোমল পদগুলির পরই বিপরীত দিকে কঠিন ব্যঞ্জন-সংঘর্ষ শুরু হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে।

বিস্মিত লক্ষ্মণের চোখের সামনে কবি লঙ্কার দৃশ্যটি তুলে ধরলেন। প্রথম সর্গে রাবণের চোখে আমরা যে লঙ্কা দেখেছি সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির রাজধানী লঙ্কাই আবার আমরা লক্ষ্মণের চোখে দেখতে পেলাম। প্রথম সর্গের বর্ণনা:

চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা— মনোহর পুরী!—
হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ ছটা;
তরুরাজী; ফুলকুল— চক্ষুঃ-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,

রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।

ষষ্ঠ সর্গে :

শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ, অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেব-লোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?

উভয় বর্ণনার মধ্যেই মুগ্ধ মহাকবি স্বয়ং উত্তম পুরুষে কথা বলেছেন। তার কারণ, এই স্বর্ণলঙ্কা মধুসূদনেরই চিরবাঞ্ছিত সোনার বাংলা। মধুসূদনের অন্তরে যে দেশপ্রেমিক গান গুন্‌গুন্‌ করে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রূপান্তরিত করলে তাই হয়ে ওঠে, 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাংলাদেশের মহাকবি মধুসূদন যে বিশ্ববন্দিত মুক্ত স্বদেশের স্বপ্ন দেখতেন তার দীর্ঘ বর্ণনা আমরা মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম ও ষষ্ঠ সর্গে পাই। রাবণ যে-জন্মভূমি রক্ষায় মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে বলেছেন, 'জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?' (১ম সর্গ) সেই জন্মভূমিকে সম্বোধন করেই কবি স্বয়ং বলেছিলেন, 'রেখো মা দাসেরে মনে' এবং সেই জন্মভূমির ভবিষ্যতের ছবিই এখানে চিত্রিত হয়েছে। রেনেসাঁস বাংলা তথা ভারতের চিত্র বলেই যুদ্ধোদ্যমের মধ্যেও লঙ্কার 'অস্ত্রশালা'র উল্লেখ করতে না করতেই কবি 'চারু নাট্যশালা'র উল্লেখ করেছেন। প্রথম সর্গে রাবণের আক্ষেপোক্তিটি এখানে স্মরণীয় :

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী।

'আমরা' শীর্ষক সনেটে কবি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনা করে আক্ষেপ করেছেন, 'পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে' এবং ভাবীকালের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পুনঃ কি হরষে,/শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?' 'ভারতভূমি' শীর্ষক সনেটে :

বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি!

লক্ষ্মণ লঙ্কার ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়ে বিভীষণকে বলছেন, 'এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?' বিভীষণ লক্ষ্মণের কথারই পুনরুক্তি করে বলছেন :

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,— 'যা কহিলে সত্য শূরমণি !
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা।...

লক্ষ্মণ ও বিভীষণের উক্তির মধ্যেও আমরা কবির সেই দেশপ্রেম ও জাতিগরিমার ইঙ্গিতটি পাই যা পূর্বোদ্ধৃত 'ভারতভূমি' শীর্ষক সনেটে আমরা দেখেছি। লঙ্কার বর্ণনার মধ্যে তাই যুদ্ধোদ্যম সত্ত্বেও বাংলাদেশের মনোহর চিত্রটি কবি বারে বারে নিয়ে এসেছেন। স্বর্ণলঙ্কা এবং সোনার বাংলা কবির কল্পনায় বারে বারে এক হয়ে গেছে :

রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি ! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে !

এ যে বাংলাদেশেরই বর্ণনা সে-বিষয়ে পাঠকের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকলে কবি অচিরেই তার নিরসন করবেন :

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে !
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
ঊষা যথা ! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী ;

কবির 'দেব-দোল' শীর্ষক সনেটটি পাঠক এখানে নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন। দেখা যাচ্ছে, মাইকেল তাঁর মহাকাব্যের মধ্যে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কালানুক্রমভঙ্গ (anachronism)-কে অপরাধ বলেই গণ্য করেন নি। নইলে কোথায় লঙ্কার যুদ্ধ আর কোথায় বঙ্গগৃহ !

শেকৃসপীয়রের নাটকে আমরা দেখি যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর মধ্যে নাট্যকার দু-একটি ছোটো ছোটো সাধারণ দৃশ্যের অবতারণা করেন যেখানে রাজা-উজির সেনাপতিরা নয় একেবারে সাধারণ মানুষ তাদের কথোপকথনের মধ্যে তাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী ঘটনাবলীর উপর অপক্ষপাত বিচার ও মন্তব্য জাহির করে। পদস্থ শিবিরভুক্ত মানুষদের কথোপকথন শুনতে

শুনতে পাঠক যখন ক্লান্ত, তখন এই-সব নির্বিরোধী সাধারণ মানুষের মন্তব্য শুনতে ভালোই লাগে। তা ছাড়া দুটি বিবদমান পক্ষের বাইরে নাট্যকার কখনো কখনো একটি তৃতীয় মত উপস্থিত করার সুযোগ পান। অনুরূপভাবে, লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের সংঘর্ষকে লঙ্কার জনসাধারণ কী চোখে দেখছেন কবি তা পাঠককে জানাতে চান। এটি খানিকটা নিরপেক্ষ তৃতীয় মত এবং খানিকটা কবির নিজস্ব বিচার ও ঈপ্সিত আশা :

মুহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।

সাধারণ মানুষের এই স্বাভাবিক প্রত্যাশার পিছনে যে কবির নিজেরও সমর্থন আছে তা তিনি গোপন রাখতে পারেন নি, 'কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,/কি আর কহিবে কবি ?' এর পর ইন্দ্রজিৎ যখন অনুপ্রবিষ্ট লক্ষ্মণকে ছদ্মবেশী অগ্নিদেব বলে মনে করেছেন তখন তিনি এই গণ-প্রত্যাশার উপযোগী উক্তিই করেছেন :

নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী।

মেঘনাদ সম্বন্ধে লঙ্কার জনমত ধ্বনিত হবার পরই কবি লক্ষ্মণের বর্ণনা দিয়েছেন, 'দেবাকৃতি, দেববীর্য, দেব-অস্ত্রধারী/চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী'। এখানে 'দেব' কথার পুনঃ পুনরুক্তি আপাতশ্রুতিতে প্রশংসা মনে হলেও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন সমালোচনাই রয়ে গেছে। লক্ষ্মণের যা কিছু শৌর্য, শক্তি, সবই দেবদত্ত, দৈব-প্রেরিত, এমন-কি, অস্ত্র পর্যন্ত। ধার-করা অস্ত্রই যাঁর সম্বল তাঁকে 'যশস্বী' বলার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বর্তমান। দেশদ্রোহী বিভীষণ যাঁর সাথি ও সহায়ক তাঁকে কতখানি বীর বা যশস্বী বলা যায় তা বিবেচ্য। বিভীষণকে 'রথী' বলার মধ্যেও এই বিদ্রূপ পরিস্ফুট। কারণ বিভীষণ ও লক্ষ্মণ কেউই এখন রথ নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেন নি, এসেছেন তস্করের মতো, পায়ে হেঁটে। লক্ষ্মণ ও বিভীষণের অশুভ জুটির বিপরীত দিকে মেঘনাদ একা; একজনের বিরুদ্ধে দুজন, এই অসম আক্রমণ অবীরোচিত। মেঘনাদ একা, কিন্তু তিনি শুদ্ধ, পূত, শুভশক্তির প্রতীক :

কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষাকোষী, ভরা

হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!

মেঘনাদ পূজায় বসেছেন, সামনে পবিত্রতার প্রতীক গঙ্গাজল। কবি ট্রাজিক নায়কের একাকীত্বকে নায়কের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। নিঃসঙ্গ নায়কের জন্য কবির এতই উৎকণ্ঠা যে তিনি তাঁর শিল্পী-সুলভ নির্লিপ্তি ও দূরত্ব আর বজায় রাখতে পারেন নি, বর্ণনার মধ্যে নিজেই প্রবেশ করেছেন; যেন পার্শ্ব-কথক বা প্রম্পটার নিজেই চলে এসেছেন মঞ্চের উপর এবং উত্তমপুরুষে দু-একটি উক্তি—অ্যাপসট্রফি—আপনা থেকেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। লক্ষণীয়, গঙ্গা ('জাহ্নবী') বা মহাদেব ('চন্দ্রচূড়') কেউই এই দৃশ্যের ধারেকাছে নেই, তবু তাদের সম্বোধন করেই কবি মেঘনাদের পবিত্রতার ইমেজারি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, যেন ইমেজারি সৃষ্টির জন্যই কবি তাদের এইভাবে সম্বোধন করেছেন।

তপোমগ্ন বীরের উচ্চচূড় চিত্রটি মিলাতে না মিলাতেই পর্দার উপর ফুটে উঠেছে এক বিপরীত চিত্র। কাব্যিক ফেইড-ইন ফেইড-আউট পদ্ধতি প্রয়োগ করে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যের ভাব ফুটিয়ে তুলতে মধুসূদন দক্ষ। শান্ত, শৈলোন্নত রথীন্দ্রের পরই ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র :

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে।

উচ্চচূড়া থেকে একেবারে অধঃপতন! শুধু ব্যাঘ্র বললে পাছে কেবলমাত্র শক্তিমত্তার ভাবটিই ফুটে ওঠে তাই কবি 'ক্ষুধাতুর' বিশেষণটিও জুড়ে দিয়েছেন; এতে মাংসলোলুপ নিন্দনীয় এক জীব ছাড়া তাকে আর কিছুই মনে হয় না। লক্ষ্মণকে কবি বীর না বলে বলেছেন ভীমবাহু। পবিত্র দেবালয়ে তাঁর এই লোলুপ হিংস্র উপস্থিতি যে অবাঞ্ছিত চিত্রকল্পের মধ্যে তা কবি পরিস্ফুট করে দিয়েছেন।

লক্ষ্মণের পায়ের শব্দে মেঘনাদ হঠাৎ চোখ মেলতেই দেখলেন সামনে লক্ষ্মণের বেশ ধারণ করে একজন অস্ত্রী দাঁড়িয়ে। মেঘনাদ এইমাত্র সূর্য-উপাসনা সাঙ্গ করেছেন, কাজেই তিনি ভাবছেন সূর্যদেব বুঝি তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে এখন স্বয়ং আবির্ভূত। তিনি যা দেখছেন তা অনেকটাই তাঁর মনের রচনা; তিনি যাকে সূর্যদেব বলে ধরে নিয়েছেন তাকে যে সূর্যের মতোই দেখবেন এ তো জানা কথা। কাজেই এখানে লক্ষ্মণের যে-বর্ণনা পাচ্ছি তাকে পুরোপুরি লক্ষ্মণের বর্ণনা বলা চলে না— তা লক্ষ্মণের উপর মেঘনাদ-কর্তৃক আরোপিত যোদ্ধবেশী সূর্যদেবেরই বর্ণনা :

দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী।

মেঘনাদ এ বিষয়ে এতই নিশ্চিত যে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে আগন্তুককে প্রশ্ন করছেন: হে বিভাবসু, এই ছলনা কেন? তাঁর এই নিশ্চিতি থেকে আমরাও নিশ্চিত যে অব্যবহিত আগে লক্ষ্মণের যে বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে তা নিছক মেঘনাদের মনের সৃষ্টি, তাকে লক্ষ্মণের প্রকৃত তন্নিষ্ঠ বর্ণনা বলা যায় না।

'যথা দেব অংশুমালী' শুধু তুলনা নয়, মেঘনাদের মনের মধ্যে সেটিই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। এখানে যা 'যথা' তাই 'যথার্থ'। লক্ষ্মণ এই দৃশ্যে কিছুতেই পবিত্রতা ও তেজস্বিতার প্রতীক হতে পারেন না। এমন ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকলে লক্ষ্মণ নিজেই সে ভুল ভেঙে দিয়েছেন, শুধু মেঘনাদের নয় পাঠকেরও :

নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!

'নহি বিভাবসু আমি' এই সুস্পষ্ট উক্তি লক্ষ্মণ সম্বন্ধে সব ভ্রান্তি অপনোদন করে দেয়। মধুসূদন লক্ষ্মণকে এক অশুভ নঙর্থক অস্তিত্ব হিসাবে দেখতে চান বলেই তাঁর মুখে এই নেতিবাচনটি বসিয়েছেন। নিকুম্ভিলায় লক্ষ্মণের উপস্থিতি পবিত্র যজ্ঞগৃহে এক অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশ। 'নহি বিভাবসু' এই কথার মধ্যে লক্ষ্মণ শুধু আত্মপরিচয় নয় তাঁর দীন আত্মারও পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। মেঘনাদ যখন লক্ষ্মণকে অগ্নিদেব জ্ঞান করেছিলেন তখন তাঁর বাতাবরণটিও শুভ বলেই ধরে নিয়েছিলেন, 'হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি/ পূজিল তোমারে দাস'; কিন্তু লক্ষ্মণ যখন নিজের অশুভ সংহারক সত্তাটি প্রকট করে দিয়েছেন তখন মেঘনাদ তাঁকে যে চোখে দেখছেন তা পরবর্তী চিত্রকল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে :

যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্ধ্বফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।

অগ্নি থেকে সর্প, যেন একেবারে আলো থেকে অন্ধকার, শুভ থেকে অশুভ, এবং সৎ থেকে অসৎ। অশুভের প্রতীক ছাড়া প্রকৃতপক্ষে সাপের সঙ্গে লক্ষ্মণের আর কোনোই মিল নেই। লক্ষ্মণ ভাস্বর সূর্য বা অগ্নি নন ('নহি বিভাবসু আমি')—এ কথা লক্ষ্মণের নিজের মুখে না শুনলেও আমরা বুঝতে পারতাম। কারণ যিনি প্রকৃত সূর্যোপম তিনি লক্ষ্মণ নন, মেঘনাদ; লক্ষ্মণ বড়োজোর সূর্যগ্রাসী রাহু :

গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!

কবি পরে মেঘনাদকে অভিমন্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান দুঃশাসনকেও দ্রোণপর্বে ব্যাস সূর্যগ্রাসী রাহুর সঙ্গে তুলনা করেছেন, কবি হয়তো সে কথা স্মরণে রেখেছেন। উপরের চিত্রকল্পে দেখা যাচ্ছে মেঘনাদ একাধারে পবিত্র সূর্য, সমুদ্র এবং পুণ্যশ্লোক নলরাজা, এবং এদের বিপরীত অসদর্থক মেরুতে দাঁড়িয়ে আছেন লক্ষ্মণ। আর লক্ষ্মণকে ঘিরে বারবার চিত্রকল্পের মধ্যে কুটিল সাপ ফণা তুলেছে, বিষ ঢেলেছে :

কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!

লক্ষ্মণ কী নন তা নিজেই বলেছেন, তিনি বিভাবসু নন; তিনি কী এখন সে কথা বলছেন, তিনি একটি দংশক সাপ। ভুঁইফোঁড় সাপ নিদ্রিত মানুষকে দংশন করে বটে, কিন্তু কোনো বীর কি অপ্রস্তুত বিপক্ষকে সেইভাবে চুপিসাড়ে আচমকা আঘাত করে? নিজের স্বীকারোক্তির পর লক্ষ্মণকে শুধু 'যমদূত' বা 'কৃতান্ত'ই বলা যায়, কিন্তু তাঁকে 'বলী' বা 'বীরদর্পী' বলতে আমাদের বাধে। এর পর লক্ষ্মণের পক্ষে

আত্মপক্ষসমর্থন প্রায় অসাধ্য। কাপুরুষ গুপ্তহত্যার দায়িত্ব নিজের কাঁধ থেকে নামাবার জন্ত লক্ষ্মণ তবু বলছেন, 'দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!' যেন লক্ষ্মণ নিমিত্তমাত্র, দোষ যদি কিছু ঘটে থাকে তবে সেজন্ত শুধু দেবতারাই দোষী। নিরস্ত্র, অপ্রস্তুত প্রতিপক্ষকে একতরফা আক্রমণকে ভণ্ড লক্ষ্মণ তবু 'রণ' বলে অভিহিত করতে চান, 'রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!' তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন যে যুদ্ধের আহ্বান বলতে যা বুঝায় এর সঙ্গে তার কোনোই সাদৃশ্য নেই। লক্ষ্মণ কত বড়ো কাপুরুষ যে যুদ্ধে আহ্বান করতে না করতে প্রতিপক্ষকে মুহূর্তের অবসর না দিয়েই অসি তুলে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন। লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের সম্পর্ক কবি পৌরাণিক চিত্রকল্পে সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা / ইরম্মদময় বজ্র!' লক্ষ্মণের হাতে কৃপাণ যেন ইন্দ্রের হাতে বজ্র, অর্থাৎ লক্ষ্মণ যেন দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শক্তিমান! আপাত দৃষ্টিতে এটি লক্ষ্মণের প্রশংসা। কিন্তু আসলে তা নয়। লক্ষ্মণ ইন্দ্র হতে পারেন কিন্তু মেঘনাদ যে ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজয়ী :

> সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
> মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
> রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ?

মেঘনাদের 'ইন্দ্রজিৎ' নামটি লক্ষ্মণের ইন্দ্র-চিত্রকল্পের পরিবেশে কবি বেশ হিসাব করেই প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়। একটু পরে কবি মেঘনাদকে আবার 'বাসবজিৎ' এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

লক্ষ্মণ যেন মেঘনাদকে রণে আহ্বান করছেন, এরকম একটা ভাঁওতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মেঘনাদ তাঁকে যুক্তিতে নিরস্ত করে বলছেন, 'নিরস্ত্র যে অরি,/নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।' এর পরও যে লক্ষ্মণ উঁচু গলায় ('জলদ প্রতিমস্বনে') কথা বলছেন, স্বীয় দুষ্কৃত সমর্থনের কারণ দেখাবার চেষ্টা করছেন, এটাই আশ্চর্য। লক্ষ্মণ নিজের 'দেবাকৃতি'কে নিজেই বিকৃত করে চলেছেন ক্রমান্বয়ে, যার ফলে তিনি সূর্য থেকে রাহু, দেব থেকে 'ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র' এবং পরে কুটিল সাপে পরিগণিত হয়েছেন। এখন ব্যাঘ্রের কিঞ্চিৎ দর্পিত সত্তাটিও বধ করে নিজেকে তিনি এক হিংসাশ্রয়ী কিরাতে পরিণত করছেন :

> আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
> ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
> অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
> তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
> তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে-কৌশলে!

তিনি যে-বাঘটিকে হত্যা করতে উদ্যত সে কিন্তু লক্ষ্মণের মতো 'ক্ষুধাতুর' বাঘ নয়; পরন্তু সে 'অবোধ'। লক্ষ্মণ তাকে 'অবোধ' বলে গালি দিলেও এই গালি লক্ষ্মণের বিরুদ্ধেই ফিরে এসেছে। কারণ যে-বাঘটি নিজের গুহায় নিশ্চিন্তে বিশ্রামরত, নিজের বিপদ সম্বন্ধে 'অবোধ' অর্থাৎ অনবহিত, তাকে হত্যা করায় আর যাই হোক অন্তত ক্ষত্রমহিমা বাড়ে না। আনায় বা ফাঁদের মধ্যে বাঘকে পেয়েছেন, এটিও লক্ষ্মণের আত্মপ্রতারণা, কারণ মেঘনাদের জন্ত লক্ষ্মণ নিজে কোনো ফাঁদ পাতেন নি, বরং বলা যায় মেঘনাদের পূজা-মন্দিরে লক্ষ্মণই চোরের মতো প্রবেশ করেছেন। 'অবোধ' অর্থাৎ অপ্রস্তুত বলেই লক্ষ্মণ তাঁকে বধ করতে সাহসী হয়েছেন, এটি লক্ষ্মণের কাপুরুষতারই নিদর্শন। লক্ষ্মণ নিজের 'পাপ' সম্বন্ধে অবহিতির জন্তই,

বিবেকদংশন অস্বীকার করার জন্যই মেঘনাদকে 'পাপি' বলে সম্বোধন করেছেন, এবং যে-ধর্ম থেকে তাঁর স্খলন ঘটছে সেই ক্ষত্রধর্মের কথা অন্তত একবার উচ্চারণ না করে পারছেন না! কিন্তু কার্যসিদ্ধির জন্য যে-কোনো কৌশল যিনি অবলম্বন করেন তাঁর মুখে আর যাই হোক ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্মের বুলি সাজে না!

মহাকাব্যের তুলনা মহাকাব্য! অন্যায়ভাবে আক্রান্ত মেঘনাদকে কবি মহাভারতের সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন :

কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি শত ধিক তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই।…"

কিন্তু মহাভারতের দ্রোণপর্বে (মহা/দ্রোণ/৪০) দেখি অভিমন্যু চক্রব্যূহে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয়েছেন এমন কথা কোথাও বলেন নি; শুধু দুঃশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে অভিমন্যু বলেছিলেন: 'হে অহেতুক ক্রুদ্ধ, অধর্মনিরত, বীরাভিমানী পুরুষ, আজ সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধে তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি। তুমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে রাজসভায় কটুবাক্য প্রয়োগে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাগিয়েছিলে এবং কপট দ্যূতের সাহায্যে শক্তিমদে মত্ত হয়ে বীর ভীমসেনের প্রতি কটূক্তি করেছিলে; আজ তার প্রতিফল তুমি পাবে। রে দুর্মতি, আজ অচিরেই পরস্বাপহরণ, ক্রোধ, শান্তিনাশ, লোভ, অজ্ঞানতা, দ্রোহ, গর্হিত কর্ম এবং আমার গুরুদের রাজ্যহরণ প্রভৃতি অধর্ম কাজের ফল ভোগ করবে।'

অভিমন্যুর সঙ্গে তুলনা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেঘনাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি জাগ্রত করা। বাল্মীকি-রামায়ণে আমরা দেখি যে মেঘনাদ শত্রুবেষ্টিত সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে নিজেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞ অসমাপ্ত রেখে উঠে এসেছিলেন এবং একা লক্ষ্মণের নন, বিভীষণ, হনুমান ও বিপুল শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধ করেছিলেন। সেটি ছিল পুরোপুরি সম্মুখ-সমর, তার মধ্যে চোরাগোপ্তা আক্রমণের প্রশ্নই ছিল না। বরং লক্ষ্মণই সেখানে মেঘনাদকে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার জন্য তস্করের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন :

অন্তর্দ্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ ॥
যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস।
দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বাচা ত্বং কিং বিকত্থসে ॥

—যুদ্ধ/৮৬/১৫-১৬

—'তুমি তখন রণের মধ্যে অদৃশ্য থেকে যে কাজ করেছ তা বীরগণের অনুমোদিত নয়, তা তস্করের আচরণ। হে রাক্ষস, আমি যেমন তোমার বাণপথে অবস্থিত আছি তুমিও সেরূপ আজ তোমার তেজ দেখাও, বৃথা বাক্যব্যয়ে কেন আত্মশ্লাঘা করছ?' বাল্মীকি-রামায়ণে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়েই একাধিকবার সাপের সঙ্গে তুলিত কিন্তু অন্যান্য উপমার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের বেলায় প্রভেদ এই যে এ তুলনা ইন্দ্রজিৎ নিজেই নিজের সম্বন্ধে করেছেন, 'আশীবিষসমং ক্রুদ্ধং যন্মাং যোদ্ধুমুপস্থিতঃ' (আমার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ, মনে রেখো

আমি এখন বিষধর সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ)। মেঘনাদ লক্ষ্মণের প্রতি যে-সব শর নিক্ষেপ করেছিলেন সেগুলিও সর্পবিষের তুল্য :

তেন সৃষ্টা মহাবেগাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।
সম্প্রাপ্য লক্ষ্মণং পেতুঃ শ্বসন্ত ইব পন্নগাঃ ॥

—যুদ্ধ/৮৮/১৮

—'মেঘনাদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মহাবেগবান সর্পবিষবৎ তীরগুলি লক্ষ্মণের দেহে লাগামাত্র মাটিতে পড়ে যেতে লাগল, ঠিক যেমন মন্ত্র পড়া নিস্তেজ সাপ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাটিতে পড়ে।'

বাল্মীকি-রামায়ণে নিকুম্ভিলা-নিষ্ক্রান্ত ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধকে কোনোমতেই অসমযুদ্ধ বা সশস্ত্র-নিরস্ত্রের যুদ্ধ বলা চলে না :

স বভূব মহাভীমো নররাক্ষসসিংহয়োঃ।
বিমর্দস্তমুলো যুদ্ধে পরস্পর জয়ৈষিণোঃ ॥
বিক্রান্তৌ বলসম্পন্নাবুভৌ বিক্রমশালিনৌ।
উভৌ পরমদুর্জেয়াবতুল্যবলতেজসৌ ॥
যুযুধাতে তদা বীরৌ গ্রহাবিব নভোগতৌ।
বলবৃত্রাবিব হি তৌ যুধি বৈ দুষ্প্রধর্ষণৌ ॥

—যুদ্ধ/৮৮/৩৩-৩৫

—'যুদ্ধে পরস্পর জয়েচ্ছু নৃসিংহ লক্ষ্মণ ও রাক্ষসসিংহ ইন্দ্রজিতের মধ্যে মহাভয়ংকর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হল। তাঁরা দুজনেই বিক্রান্ত, বলী, বিক্রমশালী, পরম দুর্জয়, অতুলনীয় বল ও তেজসম্পন্ন। আকাশে দুই গ্রহের সংঘর্ষের মতো দুই বীর পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলেন ; যুদ্ধে তাঁদের দুজনকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মতো দুর্ধর্ষ বলে বোধ হতে লাগল।'

বাল্মীকি-রামায়ণে, বানরসেনা-কর্তৃক রাক্ষসসেনা নিধনের কথা শুনে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ অসমাপ্ত রেখেই বেরিয়ে আসেন এবং হনুমানকে আক্রমণ করেন, তখন হনুমানকে রক্ষার জন্য বিভীষণের নির্দেশে লক্ষ্মণ এগিয়ে যান এবং ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে আহ্বান করেন—'সমাহ্বয়ে ত্বাং সমরে সম্যগ্‌ যুদ্ধং প্র যচ্ছ মে।' (যুদ্ধ/৮৭/৯)— 'আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি ; আমায় সম্যক যুদ্ধ প্রদান করো।' কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কিন্তু সেখানেও শুধু লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ এই দুজনের চোরের মতো নিকুম্ভিলায় উপস্থিতির কথা নেই। সেখানে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ বানর সৈন্যসহ দুর্গদ্বারে উপস্থিত হন এবং রাক্ষসসৈন্যদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধের পর তাঁরা দুর্গ ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন :

রামের চরণ বন্দি বানরগণ সঙ্গে।
বিভীষণ সঙ্গে তবে চলিলেন রঙ্গে ॥
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল ॥
রাক্ষসেতে দ্বার রাখে ধনুতে দিয়া চড়া।
হনূ দাণ্ডাইল ল'য়ে পর্বতের চূড়া ॥

ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে।
ধাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে।

মাইকেল মধুসূদন বাল্মীকি-রামায়ণের সমান-সমান যুদ্ধকে অসম যুদ্ধে পরিণত করেছেন ; এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত বানরসৈন্য-কর্তৃক দুর্গদ্বার ভাঙার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। তিনি মেঘনাদের দিকে পাঠকের সবটুকু সহানুভূতি আহরণ করবার জন্য বাল্মীকি-রামায়ণোক্ত মেঘনাদের প্রতি লক্ষ্মণের ভর্ৎসনা পর্যন্ত ('তস্করাচরিতো মার্গ'…ইত্যাদি) উলটিয়ে লক্ষ্মণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনায় রূপান্তরিত করে নিয়েছেন, এবং সর্প-চিত্রকল্পও মেঘনাদের পরিবর্তে লক্ষ্মণের উপর প্রয়োগ করেছেন :

তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি !
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর ?

এই তস্কর-চিত্রকল্পটি কবি অনেক দূর পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন। এর পর বিভীষণকে ভর্ৎসনা করবার সময়ও লক্ষ্মণ বলেছেন, 'নিজ গৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?' বিভীষণকে ভর্ৎসনার ভাষা ও যুক্তি মধুসূদন অনেকখানি বাল্মীকির কাছ থেকেই ধার করেছেন ; কারণ কৃত্তিবাস ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ দুজনকেই গ্রাম্য লাঠিয়ালে পরিণত করে ফেলেছেন, ইন্দ্রজিতের ভর্ৎসনার মধ্যে সেখানে প্রকৃত ওজস্বিতা বা এপিক উন্নীতি নেই। কৃত্তিবাসে ইন্দ্রজিতের উক্তিতে জ্ঞাতিত্বের কথা আছে কিন্তু জাতিত্বের কথা নেই, দেশ-প্রেমের কথা নেই :

বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥
এত সব মারিয়াছ ক্ষান্ত নাই মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে ॥
খাইলে রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর ॥
নির্গুণ সগুণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥
এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে।
কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে ॥

বাল্মীকি-রামায়ণে মেঘনাদ বলেছেন :

ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা পিতুর্মম।
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস ॥

> ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
> প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ॥
> শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
> যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ॥
> নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্।
> ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচপরাশ্রয়ঃ॥
> গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
> নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥
> যঃ স্বপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে।
> স স্বপক্ষে ক্ষয়ং যাতে পশ্চাত্তৈরেব হন্যতে॥
> নিরনুক্রোশতা চেয়ং যাদৃশী তে নিশাচর।
> স্বজনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং রাবণানুজ॥

—যুদ্ধ/৮৭/১১-১৭

—'হে রাক্ষস! তুমি রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছ; আমার পিতার তুমি সাক্ষাৎ ভ্রাতা ও আমার তুমি পিতৃব্য, তুমি কেন পুত্রের প্রতি দ্রোহাচরণ করছ? হে দুর্মতে! হে ধর্মদূষণ! তোমার মধ্যে জ্ঞাতিত্ব, সৌহার্দ এবং জাতিত্ব বোধ নেই; তোমার কর্তব্যবোধ, সৌদর্যবোধ বা ধর্মবোধ নেই। হে দুর্বুদ্ধে! যেহেতু তুমি স্বজনদের পরিত্যাগ করে শত্রুর ভৃত্যত্ব গ্রহণ করেছ সেই হেতু তুমি শোক ও নিন্দার যোগ্য। কোথায় স্বজনদের সঙ্গে বসবাস আর কোথায় নীচ শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ! তোমার বুদ্ধি শিথিল হওয়ায় তুমি এ দুয়ের পার্থক্য বুঝতে পারছ না। শত্রু গুণবান এবং স্বজন নির্গুণ হলেও নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়ঃ, কারণ যে শত্রু সে চিরদিন শত্রুই। যে স্বপক্ষ পরিত্যাগ ক'রে শত্রুপক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ-ক্ষয়ের পর শত্রুদের হাতেই নিহত হয়। হে রাবণানুজ রাক্ষস! তুমি যেরূপ নির্দয়তা দেখিয়েছ তুমি ছাড়া আর কোনো স্বজন তা করতে পারত না।' মাইকেলের মেঘনাদ প্রায় বাল্মীকির প্রতিধ্বনি করেই বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেন:

> হায়, তাত, উচিত কি তব
> এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
> সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
> কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
> নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?

কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে দীর্ঘ উক্তির মধ্যে মেঘনাদ কোথাও বিভীষণকে 'তস্কর' বলে গালি দেন নি। সপ্তদশ শ্লোকে বিভীষণকে 'রাবণানুজ নিশাচর' বলা হয়েছে, কিন্তু 'নিশাচর' সেখানে তস্কর নয়, রাক্ষস।

বাল্মীকি-রামায়ণে বিভীষণের আচরণে বা বক্তব্যে কোনো তস্করতা বা হীনম্মন্যতা নেই, এবং ইন্দ্রজিৎকে প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে একবারও তিনি রামচন্দ্রের উল্লেখ করেন নি, বা নিজেকে রামচন্দ্রের দাস বলে অভিহিত করেন নি। কিন্তু মাইকেল কাহিনীকে বাল্মীকি থেকে বহু দূরে নিয়ে গেছেন,

এবং প্রথম থেকেই তিনি লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে অপরাধীর ভূমিকায় নামিয়ে এনেছেন। বাল্মীকিতে বিভীষণ যা কিছু করেছেন তা নিজের ধর্ম, নীতি ও বিবেকের অনুশাসনেই, রামচন্দ্রের আজ্ঞায় বা স্বার্থে নয়। তাঁর প্রত্যুত্তরও তাই তেজোদৃপ্ত ও যুক্তিনির্ভর :

কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্।
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্॥
ন রমে দারুণেনাহং ন চাধর্মেন বৈ রমে।
ভ্রাতা বিষমশীলোঽপি কথং ভ্রাতা নিরস্যতে॥
ধর্মাৎ প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ম্।
ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা॥
পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শকম্।
ত্যজ্যমাহুর্দুরাত্মানং বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা॥
পরস্বানাঞ্চ হরণং পরদারাভিমর্শনম্।
সুহৃদামতিশঙ্কা চ ত্রয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ॥
মহর্ষীণাং বধো ঘোরঃ সর্বদেবৈশ্চ বিগ্রহঃ।
অভিমানশ্চ রোষশ্চ বৈরত্বং প্রতিকূলতা॥
এতে দোষা মম ভ্রাতুর্জীবিতৈশ্বর্যনাশনাঃ।
গুণান্ প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ পর্বতানিব তোয়দাঃ॥
দোষৈরেতৈঃ পরিত্যক্তো ময়া ভ্রাতা পিতা তব।
নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন চ ত্বং ন চ তে পিতা॥

—যুদ্ধ /৮৭/১৯-২৬

—'যদিও আমি ক্রূরকর্মা রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করেছি, তবু আমার শীলস্বভাব রাক্ষসোচিত নয়, পুরুষের যা প্রধান গুণ আমি তাই অবলম্বন করে আছি। ক্রূর কর্মে আমার রুচি নেই, অধর্মেও না। সমান স্বভাবের নয় বলেই কি ভাইকে পরিত্যাগ করা ভাইয়ের উচিত ? (এর উত্তরে বলি) যার শীলস্বভাব ধর্মচ্যুত, পাপকর্মে যে আসক্ত তাকে ত্যাগ করেই লোকে সুখী হয়, যেমন হাত থেকে সাপ ঝেড়ে ফেলে লোকে বিপন্মুক্ত হয়। পরস্বাপহারী, পরস্ত্রী-অপহারক দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায়ই পরিত্যাগ করা বিধেয়। পরধন-অপহরণ, পরদারগমন এবং বন্ধুদের প্রতি অবিশ্বাস, এই তিনটি দোষ বিনাশের কারণ। মহর্ষিদের নিষ্ঠুর হত্যা, সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ, অভিমান, রোষ, বৈরভাব এবং ধর্মের প্রতিকূলতা—এই-সব দোষে আমার ভাই দোষী, এগুলিই তার প্রাণ ও ঐশ্বর্য বিনাশের কারণ হয়ে উঠেছে। যেমন মেঘেরা পর্বতমালাকে আচ্ছাদিত করে তেমনি এই দোষগুলি আমার ভাইয়ের যাবতীয় গুণ ঢেকে ফেলেছে। এই-সব দোষের জন্যই আমি তোমার পিতা অর্থাৎ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে পরিত্যাগ করেছি ; এখন এই লঙ্কাপুরী বা তুমি বা তোমার পিতা কারোই অস্তিত্ব থাকবে না।' কিন্তু মাইকেলের বিভীষণ এ-সব কথার ধার দিয়েও যান নি, তিনি 'রাঘবদাস' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, এবং রাঘবদাস বলেই রাঘবের বিরুদ্ধাচরণ করতে অসমর্থ এ কথা জানিয়েছেন। 'রাঘবদাস' এ কথা বাল্মীকিতেও নেই,

কৃত্তিবাসেও নেই। মাইকেলের নায়ক মেঘনাদ 'রাঘবের দাস' এই উক্তিকে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন :

রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে !
কেবা সে অধম ধাম ?

মহাকাব্যের বীরের মতোই এই উক্তি। রাক্ষসকুলের গৌরব ও গর্বে উদ্দীপ্ত মেঘনাদ বিভীষণের মহা অধঃপতনকে ভূপৃষ্ঠে চাঁদের পতনের সঙ্গে তুলিত করেছেন। তবু এই তুলনাটি পাঠকের মনে বিশেষ রেখাপাত করে না, কারণ এটি একেবারেই অলংকারশাস্ত্রের পুঁথিপড়া উদাহরণ বলে মনে হয়। রামের সঙ্গ যে বিভীষণের পক্ষে অসৎসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় তা বুঝাতে গিয়ে মেঘনাদ বলেছেন :

স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম ?

এই চিত্রকল্পটি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি কাব্যগুণে বিশিষ্ট হলেও এটিও কেতাবী অলংকার বলেই মনে হয়। কিন্তু এর পর মেঘনাদ আরো তিক্তকণ্ঠে বলেছেন :

মৃগেন্দ্রকেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ?

চাঁদ এবং রাজহাঁসের তুলনা একেবারেই আলংকারিক। এ-দুয়ের পর সিংহের সঙ্গে তুলনাও অনেকখানি তাই। কিন্তু 'সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে' এই উক্তির মধ্যে ধিক্কার ও বিদ্রূপ সবচেয়ে তীব্রভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এখানে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ উভয়কেই আক্রমণ করায় এটি আক্রমণের লক্ষ্যে খুব সার্থকভাবে পৌঁছাতে পেরেছে। পূর্বের 'তস্কর' এবং বর্তমানে 'শৃগাল' এই দুটি উপমার মধ্যে মেঘনাদের ঘৃণা সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতাপ্রিয় মেঘনাদ জাতিবৈর ও পরবশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনেছেন। একটু পরেই তিনি আবার বলেছেন :

কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি— এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।

কৃত্তিবাসের পরিবর্তে বাল্মীকির অনুসরণেই এখানে জ্ঞাতিত্বের সঙ্গে মেঘনাদ 'জাতি' কথাটি বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। 'স্বজন' ও 'পরজন' বলতে তিনি শুধু রক্তের সম্বন্ধই নয়, স্বদেশ ও স্বজাতির সম্পর্কই বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। 'নির্গুণঃ সজনঃ শ্রেয়ান যঃ পরঃ পর এব সঃ'—বাল্মীকির এই পঙ্‌ক্তির অনুবাদ ও পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিতে 'জাতি' কথাটি স্পষ্ট উল্লিখিত হওয়ায় একটু বিশিষ্ট অর্থে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যে নিরস্ত্রকে যুদ্ধে আহ্বান করে তস্কর ও শৃগালের সঙ্গেই তার তুলনা চলে। মেঘনাদ লক্ষ্মণকে 'কুমতি' বলে সম্বোধন করেছেন এবং পরে 'নীচ' ও 'দুর্মতি'ও বলেছেন। লক্ষ্মণকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আরো এক ধাপ এগিয়ে তিনি বলেছেন :

নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা!

বাল্মীকিতে কুলগৌরব ও জাত্যভিমানের কথা আছে কিন্তু 'জন্মভূমি'র কথা নেই। একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড যে একটি জাতির স্বদেশ এই ধারণা প্রাচীনকালে ছিল না; পরিবার এবং নৃগোষ্ঠী বা ট্রাইবের প্রতি আনুগত্যই হোমর ও বাল্মীকিতে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু জন্মভূমি বা পিতৃভূমির ধারণা সেখানে নেই। মাইকেলই ভারতবর্ষে প্রথম নব্য স্বদেশিয়ানার মহাকবি। মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও স্বাধীনতার জন্য গৌরববোধে অনুপ্রাণিত বলেই মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যের নায়ককেও এই আধুনিক জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে গড়ে তুলেছেন :

তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি···

লক্ষ্মণকে মেঘনাদ অসভ্য 'বনবাসী' 'কুমতি' 'দৈত্য' এবং অবশেষে হীনতম 'কীট' বলে বর্ণনা করেছেন। এই-ভাবে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প পরিবর্তন করে কবি ক্রমে দেবাকৃতি লক্ষ্মণের কীটাকৃতিতে রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

মেঘনাদের তীব্র ভর্ৎসনার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে বিভীষণ ব্যক্তিগতভাবে মেঘনাদের কোনো দোষেরই উল্লেখ করতে পারেন নি। যে সাপের ইমেজ লক্ষ্মণের প্রতি আগেই প্রযুক্ত হয়েছে এখন সেটি লক্ষ্মণের সহযোগী বিভীষণের প্রতিও প্রযুক্ত হল :

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ।

বিভীষণ নিজের দায়িত্ব এড়াবার জন্য সব কিছুই রাবণের কর্মফলে ঘটছে এমন একটা দার্শনিক দোহাই পেড়েছেন :

নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা

এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি ;
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে,
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল সলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি ! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?

বাল্মীকি-রামায়ণেও বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে বলেছিলেন, 'অতিমানশ্চ বালশ্চ দুর্বিনীতশ্চ রাক্ষস। / বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি॥' (যুদ্ধ/ ৮৭/২৭) — 'হে রাক্ষস! তুমি অত্যন্ত অভিমানী, দুর্বিনীত ও বালক অর্থাৎ মূর্খ ; তুমি এখন কালপাশে আবদ্ধ, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তাই আমাকে বল।' সেখানেও মহাকালের দোহাই দিয়ে বিভীষণ নিজের দায়িত্ব লঘু করার চেষ্টা করেছেন। মাইকেলের বিভীষণ নিজেকে 'রাঘবের দাস' বলাতেই মেঘনাদ তাঁকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেছিলেন। এখন তিনি নিজেকে আরো হীনভাবে 'রাঘবের পদাশ্রয়ী' বলে চিত্রিত করায় মেঘনাদ আর সহ্য করতে পারলেন না :

রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপী,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—

লক্ষণীয় যে যদিও এখন প্রত্যূষকাল তবু কবি এখানে নিশীথ রাত্রির রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। নিশীথ অন্ধকারে মেঘনাদের মেঘমন্দ্র স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 'মেঘনাদ' নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যে শুধু এই চিত্রকল্প রচিত হয়েছে তা নয়, মেঘনাদের আসন্ন বিপর্যয় ও মৃত্যুর অন্ধকারও এখানে আভাসিত হয়ে উঠেছে। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর সঙ্গে মেঘনাদের তুলনা কবি আগেও দিয়েছেন। এখন আবার সেই এপিক-নির্ভর চিত্রকল্পটির পুনরুক্তি করে মধুসূদন মেঘনাদের দিকে পাঠকের সহানুভূতি ও সমব্যথা জাগিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন, 'যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে/সপ্তরথী অস্ত্রবলে, ...।' মেঘনাদ হাতের কাছে যা পেয়েছেন লক্ষ্মণের দিকে তাই ছুঁড়ে মেরেছেন :

কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসারণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে !

ইলিয়াদ মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে, ট্রোজান যোদ্ধা পান্দারস যখন গ্রীক সেনাপতি মেনেলাওসের প্রতি শরনিক্ষেপ করেন তখন দেবরাজ জিউসের কন্যা আথিনে সেই তীরের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে মেনেলাওসকে রক্ষা করেন। হোমর বলছেন, 'মেনেলাওসের গায়ে পড়ার আগেই আথিনে তীর হটিয়ে দিলেন, যেমন করে জননী তার শিশুসন্তানের উপর থেকে মাছি তাড়ান।' মধুসূদন যে সরাসরি হোমর থেকেই চিত্রটি তুলে নিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধুসূদনের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি হোমরের দান দুই হাতে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঋণী হন নি। ঘুমপাড়ানি বা মশাতাড়ানি মায়ের চিত্রটি যে একেবারে বাঙালি, সে বিষয়ে পাঠকের মনে একটুও সন্দেহ থাকে না। মধুসূদন চিত্রের লোভেই চিত্র ধার করেন

নি; তিনি জানেন বাঙালি পাঠক এই চিত্র সহজ স্বাভাবিক ও দেশী বলেই গ্রহণ করবেন। তা ছাড়া আরো একটি কারণ আছে। এই বাঙালি গৃহচিত্রে লক্ষ্মণকে অসহায় দুর্বল এক শিশুতে পরিণত করা হয়েছে; এবং এটি কবির অভিপ্রেত। একদিকে লক্ষ্মণকে দুর্বল করা হচ্ছে এবং অন্যদিকে মেঘনাদকে বলবত্তর করে চিত্রিত করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে নিঃসঙ্গ নিরস্ত্র মেঘনাদের আক্রমণটুকু পর্যন্ত লক্ষ্মণ নিজে প্রতিহত করতে পারছেন না, আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে মায়াদেবীর দয়ার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে; এবং ইন্দ্রজিৎ নিজের বীরত্ব বা রণচাতুর্যের অভাবে নয়, অবস্থার বিপাকে এবং তাও নিছক মায়ার প্রতিকূলতার জন্যই পূর্ণচন্দ্র হয়েও রাহুগ্রস্ত এবং অক্ষম। কবির চোখে মেঘনাদ অন্ধকার চাঁদ এবং লক্ষ্মণ রাহু:

> বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
> নিষ্ফল, হায়রে মরি, কলাধর যথা
> রাহুগ্রাসে; কিংবা সিংহ আনায় মাঝারে।

এই চিত্রকল্প দুটির একত্র যোগফল মেঘনাদকে শুধু মহিমান্বিতই করে নি, তাঁর ট্রাজিক মূর্তিকে আরো মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। শেষের চিত্রকল্পটি লক্ষ্মণের মুখেও একবার শোনা গিয়েছিল; কিন্তু কবি লক্ষ্মণের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যখন নিজে তা প্রয়োগ করতে গেছেন তখন প্রায় অজ্ঞাতে মেঘনাদকে আরো একটু বড়ো করে দেখিয়েছেন। লক্ষ্মণ আনায় মাঝারে যে বাঘকে দেখেছিলেন এখন কবির চোখে সেই বাঘই সিংহে রূপান্তরিত হয়ে গেছে; 'আনায় মাঝারে বাঘ' হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সিংহ আনায় মাঝারে'। যেন কবি এখানে স্বয়ং লক্ষ্মণোক্ত চিত্রকল্পটি সংশোধন করে তারি মধ্যে মেঘনাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

কাপুরুষ হত্যার শিকার হয়ে ইন্দ্রজিতের পতন, এটি শুধু ব্যক্তিগত বিয়োগ নয়, বিশ্বজনীন ট্রাজেডি; এইজন্যই কবি স্বর্গ মর্ত পাতালে তার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। শেক্‌সপীয়রের ট্রাজেডিতেও অনুরূপ বিশ্বজনীনতা আমরা লক্ষ্য করি। জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুতে মার্ক অ্যানটনি বলেছেন:

> O! what a fall was there, my countrymen;
> Then, I, and you, and all of us fell down,
> Whilst bloody treason flourish'd over us

(*Julius Caesar*, ৩।২।১৯৪-৯৬)

আবার অ্যানটনির মৃত্যুর খবরে অকটেভিয়াস সিজারও অনুরূপ কথাই বলেছেন:

Dercetas. I say, O Caesar, Antony is dead.
Caesar. The breaking of so great a thing should make
A greater crack; the round world
Should have shook lions into civil streets,
And citizens to their dens. The death of Antony
Is not a single doom; in the name lay
A moiety of the world.

(*Antony and Cleopatra*, ৫।১।১৩-১৯)

মেঘনাদ-বধের প্রতিক্রিয়া মধুসূদন নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন :

থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে !

এই পতনে পাঠকের মনে যে শোক ও সমবেদনা জাগ্রত হয় তার কারণ মেঘনাদের পতন শুধু অসম নয় অন্যায় আক্রমণের ফলেই তা ঘটেছে। কবি খেদ করে এই আক্রমণকে 'অন্যায় সমর' বলেছেন। 'সম্মুখসমরে' বীরবাহুর পতনের সঙ্গে এর বৈপরীত্য পাঠককে বিচলিত করে এবং এখানে পাঠক মহাকাব্যের প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিগুলি স্মরণ করবেনই :

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে···

'অন্যায় সমর' কেন একে 'সমর' আখ্যাই দেওয়া যায় না। এটি একটি গুপ্তহত্যা। এই ব্যাপারে বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের সঙ্গে মধুসূদনের অমিল খুবই সুস্পষ্ট। মধুসূদন খুব সাহসের সঙ্গেই কাহিনীর এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন ; এবং এর ফলেই মুমূর্ষু মেঘনাদ এমন জোরের সঙ্গে লক্ষ্মণকে 'বীরকুলগ্লানি' বলে ভর্ৎসনা করতে পেরেছেন :

রাবণ নন্দন আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?

এই উক্তি সর্বাংশে এপিক-নায়কোচিত। মধুসূদন তাঁর নব্য এপিকের মধ্যে নানাভাবে ট্রাজেডির স্বাদ এনেছেন সত্য, কিন্তু ট্রাজিক-নায়ক ও এপিক-নায়কের মধ্যে মৌল প্রভেদের কথা তিনি ভোলেন নি। ট্রাজেডির নায়ক ব্যক্তি হিসাবে একক, বিচ্ছিন্ন ও বহিষ্কৃত ; তাঁর পতন বা মৃত্যুই আসল কথা নয় ; দ্বন্দ্ব, আত্মিক গ্লানি ও মর্মপীড়নে তিনি পীড়িত এবং যুদ্ধের চেয়ে মানসিক অন্তর্যুদ্ধেই বেশি ক্ষতবিক্ষত, শেক্‌সপীয়রের ভাষায় 'Brutus with himself at war' (নিজের সঙ্গেই যুদ্ধে অবতীর্ণ ব্রুটাস)। এপিক-নায়কের যা কিছু ব্যক্তিত্ব ও গৌরব তা গোষ্ঠীর নেতা হিসাবেই ; তিনি যে-সংগ্রামে লিপ্ত তা তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রাম নয়, অনুবর্তী নরগোষ্ঠীর মিলিত সংগ্রাম। তিনি এমন একজন নায়ক যিনি কখনোই জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন নন, যাঁর প্রতি স্বজাতির আনুগত্য একেবারে অবিসংবাদিত। নীতি বিষয়ে তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় বা দ্বিধা নেই, নিজের কোনো কৃতকর্মের জন্য তাঁর অনুশোচনাও নেই। ম্যাকবেথের মতো তিনি ক্লান্তপ্রাণ বা একা নন, কিংবা হ্যামলেটের মতো তিনি 'to be or not to be' ('রবো কি

রবো না'.)—এই জাতীয় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংশয়-দোলায়ও দোলেন না ; শত্রুকে পর্যুদস্ত করার লক্ষ্যে তিনি অটল ও নিঃসংশয়, ফলে তাঁর মনে কোনো গ্লানি বা পশ্চাত্তাপের প্রশ্নই ওঠে না। এপিক-নায়ক মেঘনাদ তাই বুঝতে পারেন না তাঁর কোন্ ত্রুটি বা পাপের জন্য দৈব তাঁর প্রতি এমন বিরূপ—'কি পাপে বিধাতা/দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?' মৃত্যুতেও মেঘনাদ শুধু 'নিষ্ফল' নন, নিষ্কলঙ্ক। মেঘনাদের কী পাপ তা মেঘনাদও জানেন না, পাঠকও জানেন না। মহাকাব্যের মধ্যে মেঘনাদের এই অন্তিম প্রশ্নের কোনো উত্তর মহাকবি চেষ্টা করেন নি। এপিক-নায়ক তাঁর সহযোদ্ধা ও স্বজাতির সঙ্গে একাত্ম শুধু সে কথাটি মনে রেখে কবি দিনান্তের চিত্রকল্পের মধ্যে মৃত্যুগামী মেঘনাদকে লঙ্কার সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন :

> লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
> নির্বাণ পাবক যথা, কিংবা ত্বিষাম্পতি
> শান্তরশ্মি, মহাবল, রহিলা ভূতলে।

মেঘনাদ-প্রসঙ্গে 'রাহুগ্রস্ত চাঁদের' চিত্রকল্প পাঠকের মন থেকে মিলাতে না মিলাতে কবি এখানে আবার সূর্যের চিত্রকল্পে ফিরে এসেছেন। কিন্তু এবার আর রাহুগ্রস্ত 'মিহির' নয়, লঙ্কারূপ পঙ্কজিনীর প্রাণপ্রতিম রবি। নায়কের মৃত্যুমুহূর্তে কবি একসঙ্গে অনেকখানি আলো তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর ফেলেছেন। পবিত্র অগ্নির ('পাবক') সঙ্গে তুলনার আগে ও পরে সূর্যের সঙ্গে তাঁকে তুলিত করেছেন। চিত্রকল্পের অগ্নি যেমন মেঘনাদের আসন্ন চিতাগ্নির সঙ্গে এক হয়ে গেছে তেমনি চিত্রকল্পের অস্থায়ী সূর্যও লঙ্কার গৌরব ও ভাগ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। চিত্রকল্পটি আপাত দৃষ্টিতে বাল্মীকি-রামায়ণের বর্ণনারই অনুবাদ—'শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ' (যুদ্ধ/৯০।৮২)—'যেন শান্তরশ্মি সূর্য অথবা নির্বাপিত অগ্নি'। কিন্তু 'লঙ্কার পঙ্কজরবি' মধুসূদনের নিজস্ব নির্মাণ, এর মধ্যে বাল্মীকির কোনো প্রতিধ্বনি নেই। আর এই নির্মাণটুকুর মধ্যেই কবি স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার সঙ্গে মেঘনাদের শৌর্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন। বাল্মীকি অস্ত-সূর্যের উপমা দিয়েছেন কিন্তু মধুসূদন তাতে তৃপ্ত নন, তিনি সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা দিবাভাগের প্রত্যেক সময়েই সূর্যকে মেঘনাদের সঙ্গে তুলনীয় দেখেছেন। অন্তিম শয্যায় শায়িত মেঘনাদকে উদ্দেশ করে বিভীষণ বলেছেন :

> হে কর্বুর কুলগর্ব মধ্যাহ্নে কি কভু
> যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
> জগৎ নয়নানন্দ ?

'লঙ্কার পঙ্কজরবি' সকালের, 'দেব অংশুমালী' দুপুরের, এবং 'ত্বিষাম্পতি শান্তরশ্মি' সন্ধ্যার অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সব মিলিয়ে মেঘনাদ এক ভাস্বর ব্যক্তিত্ব নিয়েই মহাকাব্যের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। পাঠকের মনে এই নির্বাণোন্মুখ পাবকের স্মৃতি চির দেদীপ্যমান থাকছে।

বাল্মীকি-রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-বধের পর রাবণের যে বিলাপ বর্ণিত আছে মধুসূদন এখানে বিভীষণের মুখে সেই বিলাপের কিছু অংশ বসিয়ে দিয়েছেন। রাবণের মুখের কথা বিভীষণের মুখে আরো বেশি অশ্রুপীড় হয়ে উঠেছে, কারণ রাবণের মনে ক্রোধ থাকলেও সেই খেদোক্তির মধ্যে আমরা কোনো আত্মগ্লানির সুর

শুনি না। মধুসূদনের কাব্যে বিভীষণ নিজের আত্মগ্লানি এবং রাবণের দুঃখ একত্র মিশিয়ে নিয়েছেন বলেই শিল্পবিচারে তা এত উৎকৃষ্ট হয়েছে। মধুসূদনের মহাকাব্যে বিভীষণ বলেন :

কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দু নিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা— বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলের ?

নাটকীয় ঘনত্বে ও ব্যঞ্জনায় মাইকেল অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। বাল্মীকিতে রাবণের উক্তির মধ্যে বক্তার কোনো দুর্নিরীক্ষ্য হৃদয়কম্প নেই, তাঁর উক্তি ততটা পিতৃসুলভ নয় যতটা নৃপতিসুলভ। পক্ষান্তরে মধুসূদনের কাব্যে বিভীষণ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত অনুতাপ ব্যক্ত করেছেন, তাই এখানে আত্মধিক্কার প্রবল হয়ে উঠেছে। তা ছাড়াও মধুসূদনে 'রক্ষোরাজ' ও 'রক্ষঃকুল' এই উভয়ের মধ্যে রক্ষনারীদের বিহ্বলতা গায়ে গায়ে সেঁটে রয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণের উক্তিতে আছে :

অদ্য লোকাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্না পৃথিবী চ সকাননা।
একেনেন্দ্রজিতা হীনা শূন্যেব প্রতিভাতি মে॥
অদ্য নৈঋতকল্যানাং শ্রোষ্যাম্যন্তঃপুরে রবম্।
করেণুসঙ্ঘস্য যথা নিনাদং গিরিগহ্বরে॥
যৌবরাজ্যঞ্চ লঙ্কাঞ্চ রক্ষাংসি চ পরন্তপ।
মাতরং মাঞ্চ ভার্যাশ্চ ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ॥

—(যুদ্ধ/৯২/১১-১৩)

—'এক ইন্দ্রজিৎ না থাকায় আজ ত্রিলোক ও সকাননা সমগ্র বসুমতী আমার কাছে শূন্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। গিরিগহ্বরে হস্তিনীনিনাদের ন্যায় আজ অন্তঃপুরে রাক্ষস রমণীদের রোদনধ্বনি শুনব। হে শত্রুন্দম! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসকুল, এবং মাতাকে, আমাকে ও ভার্যাদের পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেলে ?' বাল্মীকিতে মা, ভার্যা ও রক্ষনারীদের অনুক্ত বেদনার কোনো ইঙ্গিতই নেই। সেখানে রাবণ মেঘনাদকে উদ্দেশ করেই প্রশ্ন করছেন—তুমি কেন মা ও ভার্যা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছ ? মা ও ভার্যার মাঝখানে রাবণের নিজের উল্লেখ সেখানে নাটকীয় ঘনত্বের পরিপন্থী। এখানে কিন্তু কবি রমণীদের উপর কী প্রতিক্রিয়া হবে সেই কথাই বিশেষ করে ভাবছেন। বাল্মীকিতে মা ও ভার্যা অনামা, কিন্তু মাইকেলে মন্দোদরী ও প্রমীলাকে নাম করেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মেঘনাদ যখন গ্লানিশূন্য মন নিয়ে মৃত্যু বরণ করছেন তখন বিভীষণ ও লক্ষ্মণের মন কিন্তু অপরাধ ও পাপবোধে ভারাক্রান্ত। তাই লক্ষ্মণ শোকার্ত বিভীষণকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলছেন :

সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে

বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার!

এখানে 'অপরাধ নহে তোমার' বদলিয়ে 'অপরাধ নহে আমার' বললেও অর্থের বিশেষ তারতম্য হত না। কারণ, লক্ষ্মণ যে নিজের ঘাড়ে অপরাধের বোঝা নিয়ে বিভীষণের কাঁধকে হালকা করতে চাইছেন তা নয়, তিনি বুঝাতে চাইছেন যে তাঁরা দুজনে যা করেছেন তা তাঁদের করতে হয়েছে 'বিধির বিধানে'; কারণ এক সর্বব্যাপী দৈব ইচ্ছা ও দৈব বিধানই সকল ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করছে, ব্যক্তির দায়িত্ব এখানে অনুপস্থিত। নিজের বিবেককে বাঁচাবার জন্যই লক্ষ্মণ দৈবের উপর সব দায়িত্ব ফেলে দিয়ে এর আগেও আর-একবার মেঘনাদকে বলেছিলেন, 'দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে।' লক্ষ্মণ দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর বিবেক কতটুকু বাঁচছে বলা কঠিন, কিন্তু মনোবল যে একটুও বাড়ছে না তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। ইন্দ্রজিৎ-নিধনে স্বর্গে মঙ্গলবাদ্য বাজছে কিন্তু লক্ষ্মণের কানে তার কোনো সার্থকতাই নেই, কারণ লক্ষ্মণ নিজের বীর্যে বা শৌর্যে ইন্দ্রজিৎকে পরাভূত করেন নি; তাঁর কানে এই স্বর্বাদ্য অলীক অবাস্তব অসার বলে মনে হচ্ছে, 'স্বপনে যেমনি মনোহর।' প্রথম সর্গে বীরবাহু-নিধনের বার্তা যখন রাবণ প্রথম শুনেছিলেন তখন তাঁর কানেও সেই বার্তা এমনি অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল— 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা, রে দূত!' তখন রাবণের কাছে শোকের বার্তা ছিল অবিশ্বাস্য, এখন লক্ষ্মণের কাছে সুখের বাদ্য মনে হচ্ছে অবিশ্বাস্য, অলীক। কোনো দ্বজয়ের দাবি বায়ু আনন্দোচ্ছ্বাস নয়, কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পলায়নের মনোভাবটিই এখানে প্রবল:

বাহিরিল আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব, শিশু, বিবশা বিষাদে!

কবি লক্ষ্মণকে গুপ্তঘাতক প্রমাণিত করবার জন্য আরো একটি চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, সেটি নিয়েছেন মহাভারতের কাহিনী থেকে:

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চশিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে!

মহাভারতে বর্ণিত অশ্বত্থামার কাপুরুষ নৈশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লক্ষ্মণের এই ঊষাকালীন গুপ্তহত্যার তুলনার মধ্য দিয়ে কবি লক্ষ্মণের প্রতি পাঠকের মনোভাব কী হওয়া উচিত তা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'হরষে তরাসে' এই দুটি পরস্পরবিরোধী জোড়শব্দে ত্রাসের কাছে হর্ষ সহজেই পরাজিত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মণের মনে কোনো স্বাভাবিক হর্ষ সহজ বা সম্ভব নয়। নিভৃত হত্যার পরও তিনি ত্রস্ত, শঙ্কিত। তাঁর মনোবল যে একেবারে শূন্যে পরিণত এটি তারই প্রমাণ।

তার পর লক্ষ্মণ যখন রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌছলেন তখন লক্ষ্মণের এই বিজয়কে রাম জন্মভূমি অযোধ্যার গৌরব বলে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন :

ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল।

লক্ষ্মণ কর্তৃক এই গুপ্তহত্যাকে একেবারে দেশপ্রেমিক যুদ্ধ বলে রাম চালাতে চাইছেন। কিন্তু এ কথা বলে রাম আত্মতুষ্টির চেষ্টা করলেও পাঠকের কাছে এর কোনো মূল্য নেই। রামের আশা যাই হোক এই কাপুরুষ হত্যায় অযোধ্যার কলঙ্কই বাড়বে এবং লক্ষ্মণেরও কুযশই ঘোষিত হবে। মহাকাব্যের প্রথম সর্গে কবি স্বদেশরক্ষার সংগ্রামে প্রকৃত শাহিদের চিত্রটি আগেই পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন, এবং সেই চিত্রের মধ্যে যে গৌরব ও বীরত্ব জড়িত তার কাছে রামের বর্তমান উক্তি একেবারেই নিষ্প্রভ ও অসার। বীর-চূড়ামণি বীরবাহুর পতনের পর রাবণ বলেছিলেন :

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক তারে !

লক্ষ্মণ শুধুই ভীরু এবং 'শত ধিক' ছাড়া তাঁর আর কিছুই প্রাপ্য নয়। মেঘনাদ আর যাই হোন ভীত নন, এমন-কি, যখন তিনি একা নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রান্ত তখনো তাঁর মনে কোনো ডর নেই। মেঘনাদ আত্মবলে বলীয়ান, তাঁর সমস্ত আচরণ ও উক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ রেনেসাঁস মানুষের আবেগ। পক্ষান্তরে রাম ও লক্ষ্মণের মনোভাব একেবারেই মধ্যযুগীয়, তাঁরা একান্তই দুর্বল ও দৈব-নির্ভর :

পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্বল সতত
মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে !

কিছুক্ষণ আগে তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের প্রতি শ্লেষ নিক্ষেপ করে মেঘনাদ বিভীষণকে বলেছিলেন :

ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ; কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব, জাতি,— এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ?

কপট ধর্ম ও পূজা-অর্চনার প্রতি শেষ সমালোচনাটি কবি নিজেই ষষ্ঠ সর্গের শেষে কৌশলে স্থাপন করেছেন। সর্গের শেষে রামচন্দ্র সবাইকে আহ্বান করে বলছেন, 'চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি/শঙ্করী !' যিনি লক্ষ্মণ নামক 'ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র'কে নিকুম্ভিলায় পবিত্র পূজা পণ্ড করতে পাঠিয়েছিলেন, তিনিই এখন পূজারী হত্যা অনুষ্ঠানের পর আর-একটি পূজার আসনে বসতে চলেছেন। কিন্তু

পাঠক জানেন কুশাসনে উপবিষ্ট পবিত্র পূজারী মেঘনাদের যে চিত্রটি এখনো মনের মধ্যে উজ্জ্বল রয়েছে তার কাছে সব রামচন্দ্রই ম্লান হতে বাধ্য :

> কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
> নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
> চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
> পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
> পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
> গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষাকোষী, ভরা
> হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
> তুমি ! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
> হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী
> রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
> যোগীন্দ্র— কৈলাসগিরি তব উচ্চ চূড়ে !

মেঘনাদকে কবি যে পর্বতচূড়ায় বসিয়েছেন কোনো রামচন্দ্রের সাধ্য নেই সেই উচ্চচূড়া থেকে তাঁকে টেনে নামাবার। হত্যা তাঁর পৌরুষকে আরো বেশি মর্যাদাবান করেছে, এবং তাঁর মৃত্যুকে আরো মর্মস্পর্শী।

গঙ্গামঙ্গলকাব্য ও প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবীমঙ্গল'

শ্রীপ্রণব রায়

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে গঙ্গার যে-সব কাহিনী পাওয়া যায় সেগুলিকে অবলম্বন করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গঙ্গামঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো এ শ্রেণীর কাব্য খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি, তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এতে লৌকিক কোনো কাহিনীর অভাব যা সাধারণ বাঙালি মনকে সহজেই নাড়া দিতে পারত। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালিমন যখন ভক্তিরসে সঞ্জীবিত হল সে সময় থেকে বিষ্ণুর সঙ্গে গঙ্গাও তদঙ্গজারূপে সমাজে এক পবিত্র স্থান লাভ করলেন। ভক্তিমান্ বাঙালিজাতি নতুন করে গঙ্গার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে লাগলেন। বাঙালিজাতির হরিভক্তির থেকেই জন্ম হল গঙ্গামঙ্গলকাব্যের। গঙ্গামঙ্গলকাব্যে তাই পৌরাণিক কাহিনীর একঘেয়েমি থাকলেও চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতি জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্যের ন্যায় সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষ এ কাহিনী শুনতে ভালোবাসত। এর ফলে গঙ্গার পাঁচালী, ছোটো ছোটো গঙ্গাবন্দনা, গঙ্গার চৌতিশা প্রভৃতি রচিত হয়েছিল প্রচুর। বিভিন্ন স্থানে অধুনারক্ষিত ছোটো ছোটো এরূপ অনেক পুথি দেখে এ কথা সহজেই মনে হয় হিন্দুর পরমপবিত্র নদী গঙ্গার মাহাত্ম্যগাথা শোনবার আগ্রহ একসময়ে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকের আগে এই সব ছোটো ছোটো গঙ্গার মাহাত্ম্যগাথা সুসংবদ্ধভাবে মঙ্গলকাব্যের আকারে রচিত হয় নি। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে এল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। নবধর্মের প্রেরণায় বাঙালি কবি সৃষ্টি করলেন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবসাহিত্য। মঙ্গলকাব্যেও এল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভক্তিরসে অনুষিক্ত বাঙালি-সাধারণের জন্যে হরির মহিমা ব্যক্ত করে মঙ্গলকাব্য আকারের কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যও সৃষ্টি করল। গঙ্গামঙ্গল কাব্যরচনার প্রেরণা কতকটা এভাবেই কবিরা পেয়েছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে মাধবাচার্যের 'গঙ্গামঙ্গল' ও এ-যাবৎ অপ্রকাশিত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সন্ধিক্ষণের কবি প্রাণবল্লভ ঘোষের 'জাহ্নবীমঙ্গল' —এ দুখানি কাব্য পর্যালোচনা করলে এটা বেশ বোঝা যায় যে গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যে মূলত গঙ্গামঙ্গল-কাব্যের উদ্ভব হলেও বিষ্ণুর মহিমা কীর্তনই এ-সব কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। এ দিক থেকে বিচার করলে বৈষ্ণবসাহিত্যের সঙ্গে এর সমধর্মিতা লক্ষণীয়। অর্বাচীন পুরাণসমূহে গঙ্গাকে বলা হয়েছে বিষ্ণুদ্রবা ও হরির অঙ্গজা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ১০ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে রাধাকৃষ্ণের দ্রবরূপাই হলেন গঙ্গা। তাই রাধাকৃষ্ণের মূর্ত বিগ্রহ বলে পূজিত মহাপ্রভুর কীর্তনানন্দে প্রেমগঙ্গানীর বহির্গমনের কথা বৈষ্ণব কবিরা বারবার উল্লেখ করেছেন। এ প্রেমাশ্রু হল ভক্ত ও ভগবানের অন্তর্মিলন থেকে উদ্ভূত—বাহ্য ও আন্তর কলুষের ক্ষয়কারী। গঙ্গার কলুষাপহারিণী ধারা ও কৃষ্ণপ্রেমধারার তাই সুসমীকরণ লক্ষ্য করা যায় বৈষ্ণবকাব্যে। উভয়ের শক্তি ও উদ্দেশ্য এক। বৈষ্ণবদের কাছে গঙ্গা পরিণত হয়েছেন প্রেমগঙ্গায়। গঙ্গামঙ্গলের কবিগণ কলুষাপহারিণী গঙ্গার মহিমা বর্ণন করেছেন কিন্তু অন্যভাবে। বস্তুত পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণ করে গঙ্গা ও হরিকে তাঁরা অভিন্ন বলে মনে করেছেন। বিষ্ণুস্বরূপা গঙ্গা নেমে এসেছেন মর্ত্যে পাপীতাপীদের উদ্ধারের জন্যে। সাধারণ মানুষ এই গঙ্গার মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে মুক্তিলাভের উপায়

খুঁজে পেতেন। গঙ্গাপুজো উপলক্ষে বিশেষভাবে দশহরায় (জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে) গঙ্গার গুণগান করা হত। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলের মতো গঙ্গামঙ্গলের পালাগান কোনো নির্দিষ্টসংখ্যক দিন পর্যন্ত চলত বলে মনে হয় না। আঠারো শতকের শেষভাগের কবি দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' আট দিনের পালা-গানের উপযোগী করে লেখা হয়েছিল। প্রাণবল্লভের অপ্রকাশিত 'জাহ্নবীমঙ্গল' কাব্যে এগারো দিনের উনিশটি পালাগান দেখা যায়।

যতদূর জানা যায় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে রচিত মাধবাচার্যের গঙ্গামঙ্গলই হল প্রথম কাব্য যাতে গঙ্গাসম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনীগুলি সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত হয়ে এক কাব্যিক সুষমা লাভ করেছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের মঙ্গলকাব্যে বিশেষভাবে মনসামঙ্গলে গঙ্গাকে নিয়ে কিছু কিছু লৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। পুরাণের সঙ্গে এর সংস্রব নেই বললেই চলে। পৌরাণিক উপাখ্যান ও লোকগাথার সংমিশ্রণেই এ-সব কাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল মনে হয়। এর কোনো কোনোটিতে পুরাণে কথিত গঙ্গার পাবনী শক্তির কাঠামোটি বজায় রাখতে গিয়ে কিছু কিছু অদ্ভুত কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, যেমন বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে'। ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত এ কাব্যের সৃষ্টি-প্রকরণে বলা হয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবেরও কাম্য নিরঞ্জনকে দর্শন করে গঙ্গা হলেন ধবলবর্ণা। সেই থেকে তিনি হলেন সকলের কাছে পবিত্রময়ী। ধর্মের আদেশে শিব তাঁকে নিজমস্তকে গ্রহণ করলেন। পরব্রহ্মরূপী ধর্মকে দর্শন করায় গঙ্গা দেবতাদের কাছেও বন্দিতা হলেন। এমন-কি, ব্রহ্মাও চতুর্মুখে স্তব করেছিলেন গঙ্গার, আর মহাদেব তখন গঙ্গাকে নিজশিরে তুলে নিয়েছিলেন :

সম্ভ্রমে পুলক হর ভাবিয়া অন্তরে।
ভক্তিভাবে গঙ্গারে তুলিয়া লৈল শিরে ॥[১]

বিপ্রদাসের এ কাহিনীতে শান্তনু ঋষির পত্নীরূপে গঙ্গাকে বলা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় সে সময়ে এ ধরনের কাহিনী লোকসমাজে চলিত ছিল। বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলেও এ ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়।[২] বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে গৌরী ও গঙ্গার কোন্দলের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপর একটু লৌকিক রঙ চড়ানো হয়েছে। অবশ্য এর আগে বিদ্যাপতিও গঙ্গা ও গৌরীর পারস্পরিক ঈর্ষার কথা উল্লেখ করেছেন : 'গাঙ্গ লাগি গিরিজাক মনউনিহে ককে দেবি বোলহ মন্দা'। শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটিকার প্রথমে নান্দীর তৃতীয় শ্লোকে শ্লেষের মধ্য দিয়ে শিব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করায় পার্বতীর রোষের উল্লেখ আছে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে গঙ্গা ও গৌরী— এই দু সতীনের কলহ শিবকন্যা পদ্মাকে নিয়ে। গৌরী এখানে চণ্ডরূপা, কিন্তু গঙ্গা ধীরা ও শান্তস্বভাবা। গৌরী নিরপরাধ পদ্মাকে প্রহার করায় গঙ্গার মাতৃহৃদয়ের স্পর্শকাতর চিত্তটি সেখানে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন :

চণ্ডী লো, আপন ছাওয়ালে কেন মার।
…তুমি সাহসালী ঘরে কলঙ্ক রাখিয়া কুলে
শুনিয়া হাসিবে সর্বনারী।

এর প্রতিশোধ নিলেন চণ্ডী গঙ্গার কলঙ্ক উল্লেখ করে :

আনিতে ভগীরথে ঠেকিলা পর্বতপথে
শৃঙ্গার মাগিলা ঐরাবতে।

লোকমুখে হেন শুনি পথে পেয়ে জহ্নু মুনি
গণ্ডূষে তুলিয়া করে পান।

এভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে চলল উভয়ের কলহ। সেকালের কলুষিত সমাজব্যবস্থার এক চিত্র এ কলহের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় লক্ষণীয় হল এই, চৈতন্য-পূর্ব ও পরবর্তী যুগে লৌকিক মঙ্গলকাব্য-গুলিতে দেবদেবীর পৌরাণিক আভিজাত্য-বিষয়ে ও তাঁদের দেবত্বের যাথার্থ্য সম্পর্কে সমাজের মনে এক ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। পুরাণে গঙ্গাকে নিয়ে যে কাহিনী রচিত হয়েছে তার মধ্যে অবশ্য এমন-সব কাহিনী আছে যার দ্বারা তাঁর মহিমা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে দেখা যায়। সাধারণ মানবীর মতো অনেক ক্ষেত্রে গঙ্গাও কাম-ক্রোধের দাস হয়ে স্বমহিমা ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন। মহাভারতের আদিপর্বের ৯৬তম অধ্যায়ে ব্রহ্মপুরে রাজর্ষি মহাভিষকে দেখে গঙ্গা তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেন। তখন ব্রহ্মার শাপে তাঁকে মর্ত্যে আসতে হল। এই পর্বের ৯৭তম অধ্যায়েও গঙ্গার কামিনীরূপে রাজা প্রতীপের দক্ষিণ উরুতে উপবেশনের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে রাজা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনুশাসনপর্বের ৮৪ ও ৮৫তম অধ্যায়ে অগ্নির ঔরসে গঙ্গার গর্ভে কার্তিকেয়ের জন্মের কথা জানা যায়। গঙ্গা অগ্নির তেজ ধারণ করতে না পেরে তা অন্যস্থানে নিক্ষেপ করলেন :

জগামাথ দুরাধর্ষো (অগ্নিঃ) গঙ্গাং ভাগীরথীং প্রতি।
তয়া চাপ্যভবন্মিশ্রো গর্ভং চাস্যাদধে তদা ॥
ববৃধে স তদা গর্ভং কক্ষে কৃষ্ণগতির্যথা।
তেজসা তস্য দেবস্য গঙ্গা বিহ্বলচেতনা।
…নাশকত্তং তদা গর্ভং সন্ধারয়িতুমোজসা।

মহাভারতের এ-সব কাহিনী থেকে স্পষ্টই মনে হয় হিন্দুর অত্যধিক গঙ্গাভক্তির উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে এক শ্রেণীর লোক গঙ্গার মহিমা ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এ-সব কাহিনী কল্পনা করেছিলেন। পুরাণে পরবর্তীকালে গঙ্গাভক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্যে যে-সব স্মৃতির অনুশাসন পাই, মনে হয় গঙ্গাবিদ্বেষীদের আঘাত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

চৈতন্যপূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহে গঙ্গার উপরি-আলোচিত কাহিনীগুলি মহাভারতের এ-সব কাহিনীর অনুসরণে রচিত হয়েছিল মনে হয়। কবিরা তাই গঙ্গার ক্ষুণ্ণ মহিমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে লোকচক্ষে তাঁকে পবিত্রতার আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিপ্রদাস দেখিয়েছেন দেবগণের দৈত্যস্বয় যজ্ঞে রন্ধন করে গঙ্গা সে রাত্রিতে শান্তনু ঋষির গৃহে না ফেরার জন্যে ঋষি তাঁকে পরিত্যাগ করলে যে চরম অবমাননা ও কলঙ্ক তাঁর চরিত্রকে কলুষিত করেছিল নিরঞ্জনকে (ধর্ম) দর্শন করে সে কলুষ তাঁর দূর হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গার ধবলমুখী হওয়ার তাৎপর্য বোধ হয় এটাই। অবশ্য এ কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে সাধারণ বাঙালিসমাজের পারিবারিক সমস্যাও যে কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। জগজ্জীবন ঘোষালের (১৭শ শতকের মাঝামাঝি) মনসামঙ্গলে শিবের ঔরসে গঙ্গার ডাঙ্গর ও মহানন্দ নামে পুত্রদ্বয়ের জন্মের কথা বলা হয়েছে। গঙ্গা সেখানে মালিনীরূপেও দেখা দিয়েছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় সমাজের নীচু শ্রেণীর লোকের কাছে গঙ্গা কীভাবে পরিণতি লাভ করেছিলেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে গঙ্গা-চণ্ডীর কলহ বিপ্রদাসের থেকে আর-একটু উঁচু স্তরে এসে পৌঁচেছে দেখা যায়। এ কলহ দু-বোনের কলহ— দু-সতীনের নয়। রামায়ণে ও পুরাণে গঙ্গা ও গৌরীকে হিমালয়ের দুই কন্যা বলা হয়েছে— গঙ্গা বড়ো আর ছোটো হলেন উমা। (রামায়ণ। আদিকাণ্ড, ৩৭তম অধ্যায়)। কবিকঙ্কণ এঁদের দু বোন বলেই দেখিয়েছেন। দিদির সঙ্গে পার্বতীর কলহ তাই মর্যাদার সীমা অতিক্রম করে নি। ছোটো বোন উমা জহ্নুমুনির উচ্ছিষ্ট বলে নিন্দা করলে গঙ্গা তার উচিত উত্তর দিয়ে বলেছিলেন :

হই গো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি
সেই প্রভু গতি সভাকার।
হই গো বিষ্ণুর অংশা কারো নাহি করি হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥

কবিকঙ্কণের সময়ে সমাজের চিন্তাভাবনা শ্রীচৈতন্যের ভাবধারায় ভাবিত বলে নীতিবোধের এক উচ্চ আদর্শ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। সাহিত্যেও তার সংক্রাম অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই ভাষা ও ভাবের মধ্যে শালীনতার অভাব ঘটে নি। কবিকঙ্কণের কাব্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজের এই পরিবর্তনের যুগে প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও হল পরিবর্তন। মদ্যমাংস দিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পুজো অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কারজাত এক সামাজিক অনাচার বলে গণ্য হতে লাগল। বিষহরি হলেন ধিক্কৃতা— শিবের গাজনে লোকে আর আনন্দ পেত না। 'চৈতন্যভাগবত'কার বৃন্দাবন দাস চৈতন্যপূর্বযুগের এই সামাজিক অনাচারকে ধিক্কার করেছেন .

'কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। ··
মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে॥' (আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়)

এই অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্মীয় গোঁড়ামি অপসৃত হল চৈতন্যসূর্যের বিপুল আলোয়। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান শ্রীচৈতন্যের উদার ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হল। সাহিত্যে এল এক নতুন জোয়ার— ভেসে গেল বহুদিনসঞ্চিত আবর্জনা। সাহিত্যে প্রকাশ ঘটল উচ্চনীতিবোধের।

ষোড়শ শতকের শেষ দিকে মাধবাচার্য লিখলেন গঙ্গামঙ্গল। এ কাব্যে তাই চৈতন্যপরবর্তী যুগের নীতিবোধের উচ্চ আদর্শজাত ভাবকল্পনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ কাব্যে লৌকিক গ্রাম্যতার লেশমাত্র নেই, পৌরাণিক গ্রাম্যতাকেও নিঃসন্দেহে বর্জন করা হয়েছে এ কাব্যে। গঙ্গার পরমপবিত্র বিশুদ্ধ রূপটির সঙ্গে পরিচয় লাভ করে পাঠক— তার তনুমনপ্রাণ ভক্তিভাবের বন্যায় প্লাবিত হয়। শুধুমাত্র পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় করে এ কাব্য রচিত হলে এটা সম্ভব হত না। ভক্তবৈষ্ণব কবি মাধবাচার্য

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে কাব্যরচনা করলেও তাঁর রচনা বহু স্থানে সুললিত হয়ে, হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে, যেমন বামনরূপী বিষ্ণুর বর্ণনায় কবি বলেছেন :

'বড় অপরূপ বামন অবতার।
সুরনর মুনিবর হরষিত অন্তর
জানিয়া না করে প্রচার॥
অতি সুললিত তনু জিনিয়া কুসুমধনু
যেন চান্দ জিনিয়া বয়ান।
অধর বান্ধুলি ফুল দশন মুকুতা তুল
নিরমল কমল বয়ান॥'[৩]

গঙ্গামঙ্গল কাব্য রচনায় কবি মাধব সম্ভবত তাঁর পূর্ববর্তী কোনো কবির রচনা অনুসরণ করেছিলেন। কবি কাব্যের গোড়াতে বলেছেন :

'পাঁচালী প্রবন্ধ অনুসারে।
দ্বিজ মাধবে ভণে লোক তরিবারে॥'

অবশ্য এ 'পাঁচালী প্রবন্ধ' বলতে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীও হতে পারে কিংবা কাব্যাকারে গঙ্গাবিষয়ক নিবন্ধও হতে পারে। মাধবের আগে অবশ্য আমরা বিদ্যাপতির গঙ্গাবাক্যাবলী পাই। হয়তো বিদ্যাপতির সেই

'হরিপদকমলগলিতমধুসোদর পুণ্য পুনিত সুরলোকে'

অথবা 'বড় সুখ সাধে পাওল তুয় তীরে।
ছাড়ইতে নিকট নয়ন বহ নীরে॥'

বা 'সুরসরি সে বি মেরা কিছুও ন ভেলা।
পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা॥'

ইত্যাদি পদগুলি কবিকে প্রেরণা দান করে থাকবে। তবে শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা যে কবিকে গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল কবির অনেকগুলি ভণিতায় তার প্রমাণ মেলে। পুরাণের পথ অনুসরণ করে কবি সত্ত্বগুণপ্রধানা গঙ্গাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অঙ্গসংস্পর্শজনিত পবিত্রময়ী বলে উল্লেখ করলেও বিষ্ণুপদস্পর্শেই তাঁর পবিত্রতা বলে মনে করেছেন। আবার একাধিক বার তিনি গঙ্গাকে 'প্রকৃতিস্বরূপা' ও 'দ্রবরূপে বিষ্ণুদেহে সংসারতারিণী' বলেছেন :

'বিষ্ণু এক জল পরম হি নির্মল
কলিকলুষ সব ভঙ্গে।'[৪]

মাধব ও তৎপরবর্তী কবিরা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে কথিত যে-সব কাহিনী অবলম্বন করে গঙ্গামঙ্গল রচনা করেছিলেন তা প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে : গঙ্গার উৎপত্তি, ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন ও গঙ্গামাহাত্ম্য। তিন শ্রেণীর এই কাহিনীর প্রতিটিকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী রচিত হয়েছে। নদীরূপা গঙ্গা কিরূপে পবিত্রময়ী দেবীর মর্যাদা লাভ করলেন পুরাণের কাহিনীগুলি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে তা লক্ষ্য করা যায়। যে গঙ্গাকে নিয়ে আপামর জনসাধারণ নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী

কল্পনা করেছেন, যাঁকে পাপী, তাপী, আর্ত ও মুমূর্ষুর, অনন্তশরণ বলে বন্দনা করা হয়েছে, যাঁর পবিত্র মাহাত্ম্য সম্পর্কে পুরাণে অসংখ্য শ্লোক রচিত হয়েছে, সেই গঙ্গা কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে একেবারে উপেক্ষিতা রয়ে গেছেন। নদীস্তুতির মধ্যে (ঋগ্‌বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৭৫তম সূক্ত) শুধু তাঁর নামমাত্র উল্লেখিত হয়েছে। এর থেকে মনে হয় আর্যগণের কাছে গঙ্গার মহিমা তখনো প্রকটিত হয় নি। সরস্বতীই ছিলেন তাঁদের অতিপ্রিয় নদী, যাঁর তীরে বিকশিত হয়েছিল গৌরবময় আর্যসভ্যতা। পরে সরস্বতীতীরে আর্য-সভ্যতার ক্রমাবলুপ্তি ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়ে গঙ্গাতীরে যখন উপনিবেশ গড়ে উঠল, সে সময় থেকে আর্যগণ উপলব্ধি করতে লাগলেন গঙ্গার মহিমা। গঙ্গার দুই তীর যখন আর্যনিবাসে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল তখন থেকে গঙ্গা সরস্বতীর স্থান দখল করে নিলেন। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই পবিত্র নদী রূপে তিনি স্বীকৃত হয়ে এসেছেন। সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে গেলেন নিষাদদেশের দ্বারমুখে বিনশন নামক স্থানে ম্লেচ্ছদের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচবার জন্যে। মহাভারতকার বেশ সুন্দর করে সরস্বতীর আত্মগোপনের এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন :

> 'এতদ্বিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাং পতে।
> দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেষাং দোষাৎ সরস্বতী॥…
> প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীর মা নিষাদা হি মাং বিদুঃ।'[৯]

আর্যেরা গঙ্গাপূজার প্রবর্তন করলেন। অবশ্য নদী থেকে তিনি দেবীতে রূপান্তরিত হলেন কবে তার সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। তবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের প্রাচীন অংশসমূহে তাঁর নদী-রূপটিই প্রকট হয়ে উঠেছে, দেবীরূপ লাভ করেছেন তিনি অনেক পরে। ঋগ্‌বেদে তাঁকে তো দেবী বলে স্বীকারই করা হয় নি; বরং সে মর্যাদা পেয়েছেন সরস্বতী, সরযু ও সিন্ধু (ঋগ্‌বেদ, ১০. ৬৪. ৯)। তবে খ্রীস্ট জন্মাবার বেশ কিছু আগে থেকে যে গঙ্গাপূজার প্রচলন ছিল তা জানা যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে। অর্থশাস্ত্রের চতুর্থ অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, অমাবস্যাদি পর্বদিনে যখন প্লাবনের সম্ভাবনা দেখা দেয় সে সময় রাজা নদীপুজো করাবেন আর বর্ষার প্রতিবন্ধ উপস্থিত হলে পুজো করাবেন গঙ্গা, পর্বত ও সমুদ্রের :

'পর্বসু চ নদীপূজাঃ কারয়েৎ।১০ …বর্ষাবগ্রহে শচীনাথ গঙ্গাপর্বতমহাকচ্ছপূজাঃ কারয়েৎ।১২'

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৫২তম সর্গে দেখা যায় গঙ্গাতরণকালে সীতা বনগমন থেকে যাতে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারেন তার জন্যে গঙ্গার উদ্দেশে যাগযজ্ঞ ও পূজানুষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্ত করছেন :

> ততস্ত্বাং দেবি শুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
> যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্বকাম সমৃদ্ধয়ে॥

তার পর তীরে অবতরণ করে রাম সীতা উভয়ে 'সুসমাহিত' হয়ে গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়েছেন।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল রামায়ণের যুগেও গঙ্গা পবিত্র নদীরূপে পূজিত হতেন। সীতা স্বয়ং তাঁকে দেবী বলে সম্বোধন করে তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ করার কথা ঘোষণা করেছেন। এমন-কি, রামচন্দ্রের কাছ থেকেও তিনি পুজো লাভ করেছিলেন। খ্রীস্টজন্মের অনেক আগে থেকেই ভারতীয়েরা যে গঙ্গাপুজো করতেন তার আরো অনেক প্রমাণ মেলে। প্রসিদ্ধ গ্রীক পর্যটক স্ট্যাবোর বিবরণী থেকে জানা যায়, গ্রীকদের জিউস ওমব্রিওসের মতো ভারতীয়েরাও পুজো করতেন অন্তরীক্ষের দেবতা ইন্দ্রের এবং গঙ্গা

নদীর।[৬] বৌদ্ধসাহিত্যেও গঙ্গার পবিত্রতার কথা স্বীকৃত হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, গঙ্গা-উপাসনা অনেক আগে থেকেই চলিত ছিল। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও সে কথা স্বীকৃত হয়েছে। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের প্রাচীন অংশে কোথাও গঙ্গাভক্তির আতিশয্য পরিলক্ষিত হয় নি। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গঙ্গাকে প্রধান একটি নদীরূপে যতখানি দেখা হয়েছে তাঁর দেবীরূপটিকে ততখানি ব্যক্ত করা হয় নি। বিষ্ণুপুরাণের আগে গঙ্গাকে কোথাও 'বিষ্ণুপাদবিনিঃসৃতা' বলে উল্লেখ পাওয়া যায় নি। আর শিবের গানে বিষ্ণু দ্রবীভূত হওয়ার ফলে গঙ্গার যে উৎপত্তির কথা পুরাণে পাওয়া যায় তা অনেক পরবর্তী মনে করার কারণ আছে! বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুপুরাণের কোথাও এ কাহিনী নেই। তবে গঙ্গা যে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন সে কাহিনী বেশ প্রাচীন। আলেকজাণ্ডারের অভিযানসঙ্গী কনিস্থিনিসের বিবরণীতে এ কাহিনীর উল্লেখ আছে।[৭]

প্রাচীন পুরাণ যথা বায়ুতে দেখা যায় গঙ্গা শিবের অন্যতরা শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছেন। শিবের অঙ্গসংস্পর্শে তিনি অধিকতর পবিত্র হয়েছেন :

'শঙ্করস্যাঙ্গসংস্পর্শান্মহাদেবস্য ধীমতঃ। ভূয়ঃ পবিত্রসলিলা সর্বলোকে মহানদী॥'

এ যুগে রুদ্র বা শিবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে গঙ্গাকে শিবের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁকে দেবীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে বিষ্ণু যখন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হলেন সে সময়ে বিষ্ণুপদ থেকে উদ্ভূত বলে গঙ্গা খ্যাত হলেন। অবশ্য 'বিষ্ণুপদ' কথাটি যে কাল্পনিক তা বিষ্ণুপুরাণ থেকেই জানা যায়। এখানে বিষ্ণুপদ বলতে ধ্রুবলোককে বোঝানো হয়েছে। এই ধ্রুব হল সপ্তর্ষিনক্ষত্রের কিছু দূরবর্তী নক্ষত্র :

'ঊর্ধ্বোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্॥'

সেখান থেকে 'সর্বপাপহরা সরিৎ' গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছেন। তিনি বিষ্ণুর বামপদাম্বুজনখ থেকে বিনির্গত হয়েছেন। পরে বলি-বামন উপাখ্যানে বামনরূপী বিষ্ণুর স্বর্গলোকে বিস্তৃত চরণ ব্রহ্মকমণ্ডলু থেকে যে জল ধৌত করল সেই জলই স্বর্নদী গঙ্গারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করল। শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে এ কাহিনী পাই। পরবর্তী অনেক পুরাণে এ কাহিনী আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫৬তম অধ্যায়ে গঙ্গার উৎপত্তি ও মর্ত্যাবতরণের যে আখ্যায়িকা পাই তা কতকটা বিষ্ণুপুরাণের আখ্যায়িকার ন্যায়। সেখানেও জগদ্‌যোনি নারায়ণের পদধ্রুবলোক থেকে গঙ্গা উদ্ভূতা হয়েছেন। তিনি ত্রিপথগামিনী। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭৫তম সূক্তের ১ম মন্ত্রে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গে সপ্ত প্রধান নদীর (এঁদের মধ্যে গঙ্গাও অন্তর্ভুক্ত) প্রবাহের কথা ব্যক্ত হয়েছে। ভাষ্যকার সায়ণ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাই বলেছেন। পুরাণে ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গার কথা যেভাবে বলা হয়েছে তার মূলটি এখানে অনুসন্ধান করা যায়। মহাকবি কালিদাসও হরির দ্বিতীয় বিক্রম পথ বা অন্তরীক্ষে গঙ্গার অবস্থানের কথা বলেছেন (শকুন্তলা, ৭ম অঙ্ক)।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, গঙ্গা বিষ্ণুপদোদ্‌ভবা বলে পরিকল্পিত হওয়ায় তাঁর গৌরব ও মহিমা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষ্ণু-উপাসনা যখন উত্তরকালে আরো ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করল তখন গঙ্গাকে নিয়ে আরো কতকগুলি উপাখ্যানের সৃষ্টি হল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গা হলেন রাধাকৃষ্ণাঙ্গ-সম্ভূতা। তিনি 'কৃষ্ণস্বরূপা পরমা সর্বব্রহ্মাণ্ডপূজিতা···সা এবং দ্রবরূপা যা গঙ্গা গোলকসম্ভবা'। ব্রহ্মপুরাণে

কিন্তু ব্রহ্মাকে কলুষমুক্ত করার জন্যে শিব তাঁর কমণ্ডলুতে যে 'ত্রিজগৎ-পাবনী শক্তি'র আধান করেছিলেন (ব্রহ্মপুরাণ, ৭১তম অধ্যায়, শ্লোক ২৬-২৭) তিনিই গঙ্গানামে খ্যাত হলেন। গঙ্গার সেই ঐশী শক্তি বারিরূপে আবির্ভূত হবার আগেই বর্তমান ছিলেন এবং ত্রিভুবনপবিত্রকারিণী ছিলেন। যোগী মহেশ্বর নিজের যোগবলে অজিতেন্দ্রিয় পাপীদের মুক্তির জন্যে সে বিমূর্ত শক্তিকে ব্যক্ত করলেন পঞ্চভূতের অন্যতম বারিতে পরিণত ক'রে। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণের এ কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। বিষ্ণুর দ্রবরূপা বলেই তাঁর অধিক প্রসিদ্ধি হয়েছে। এই পুণ্যসলিলা পবিত্রময়ী গঙ্গাকে মর্ত্যে অবতরণ করানো হয়েছে মর্ত্যের মানুষের গ্লানি দূর করাতে। তাই সগর ও ভগীরথের কাহিনীর পরিকল্পনা। গঙ্গামাহাত্ম্যেও বহু কাহিনীর উপন্যাস হয়েছে। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে এ-সব কাহিনী পাওয়া যায়। কূর্মপুরাণের কাশীখণ্ড ও প্রয়াগমাহাত্ম্যে গঙ্গাস্নান ও তার ফল বর্ণনায় বহু স্মার্ত অনুশাসন লক্ষ্য করা যায়।

ফলত এ-সব আখ্যান-উপাখ্যানের মধ্যে সে যুগের সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার গতিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে গঙ্গাবিধৌত উপকূলবর্তী স্থানে যে সভ্যতা বিকাশলাভ করছিল তাকে সুসংবদ্ধ করার এক দৃঢ় প্রয়াস এ-সব কাহিনী পরিকল্পনার মূলে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। শিব ও বিষ্ণু -উপাসকেরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার মহিমা উপলব্ধি করে তাঁকে এঁদের শক্তিরূপে কল্পনা করেছেন।

অর্বাচীন পুরাণের গঙ্গাবিষয়ক এই কাহিনীগুলি সুসংবদ্ধভাবে স্থান পেয়েছে মঙ্গলকাব্যে, যার নাম হয়েছে গঙ্গামঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে লৌকিক বৃত্তান্ত প্রধান স্থান অধিকার করলেও বিশুদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীও এ-সব কাব্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গৃহীত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক বৃত্তান্ত শোনার আগে দেবদেবী-সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী গান করে শোনানো হত। পুরাণশ্রবণের প্রতি অত্যধিক অনুরাগের জন্যেই এ-সব কাহিনীকে মঙ্গলকাব্যে স্থান দেওয়া হত। দেবদেবীর লৌকিক কাহিনী যতই চিত্তাকর্ষক হোক-না কেন, পুরাণশ্রবণ ছাড়া প্রকৃত পুণ্যলাভ হত না। শিবায়নের কবি রামেশ্বর তাই বলেছেন :

'পুরাণশ্রবণ বিনা কিছুই না হয়।
পুণ্যদাতা পুরাণ পরমানন্দময়॥"

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে সমাজে যখন ভক্তিরসের বন্যা নামল তখন মানুষের মন হল অধিক কোমল ও গীতিভাবপ্রবণ। হিংসাকর্ম ও অন্ধ আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের মন হয়ে উঠল বিমুখ। শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ বিরাট মহীধরের থেকে জন্ম নিল পদাবলী সাহিত্য ও গোবিন্দমঙ্গলজাতীয় কাব্য। যে গঙ্গা হরির অঙ্গজারূপে সকলের ভক্তি ও পুজো পেয়ে এসেছেন সেই মহিমময়ী গঙ্গার মাহাত্ম্য-গান করার প্রয়োজন হয়ে উঠল এ যুগে। আপামর হিন্দু মুসলমান পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার প্রতি যে ভক্তিমান্ হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ পাই ত্রিবেণীর দরাফ খাঁর গঙ্গাস্তোত্রের মধ্যে :

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তম্।
স তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্॥
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

পাঠান দরাফ খাঁর এ জিজ্ঞাসার মধ্যেও গঙ্গায় পাপীতাপীর মুক্তিলাভের আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

১ সংখ্যক পৃষ্ঠা।

১৭৪-সংখ্যক পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ দেখা দেয় সাহিত্যেও তার সংক্রাম পরিলক্ষিত হয়। পদাবলী ও বৈষ্ণব সাহিত্য বাদ দিলেও মঙ্গলকাব্যে লৌকিক গ্রাম্যতা যথাসম্ভব বর্জন করার প্রয়াস এ সময় থেকেই দেখা যেতে থাকে। এ প্রয়াস সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত চলেছিল। ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আর-একবার প্লাবন এল বাংলাদেশে। এর ছোঁয়াচে সাহিত্যে উচ্চ নীতিবোধের প্রতিফলন দেখা গেল। এ শতকের কাব্যের তাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অশ্লীলতাদোষ বর্জন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাব্য হয়েছিল পুরাণধর্মী। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদেও কবিদের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল প্রচুর। এ শতকের প্রথম পাদে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গল কাব্যটি রচিত হয়েছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উচ্চ নীতিবোধের আদর্শকে সম্মুখে রেখে। এর মধ্যে পৌরাণিক শিবকাহিনীর বর্ণনা ও লৌকিক শিবকাহিনীর অভাব থেকে এ কথা মনে হয়।

মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর পুনর্বিন্যাস ও কাব্যকে রুচিদোষ থেকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা সপ্তদশ শতকের শুরু থেকে আরম্ভ হয়েছিল তা এ শতকের শেষেও অব্যাহতগতিতে চলছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনীপ্রধান ও অনুবাদধর্মী কাব্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে আনুমানিক ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত এ ধরনের কাব্যের এক পুথি আজও লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে গেছে। বর্ধমান জেলার অম্বিকানগরের (বর্তমান অম্বিকা-কালনার) কবি প্রাণবল্লভ ঘোষ রচিত এ কাব্যটির নাম হল 'জাহ্নবীমঙ্গল'। 'জাহ্নবীমঙ্গল'কে এ-যাবৎ প্রাপ্ত গঙ্গামঙ্গলকাব্যের মধ্যে বৃহত্তম বলা যায়। পুথিটির পত্রসংখ্যা ছিল মোট ১৭৪, কিন্তু ৩৫টি পত্র কালকবলিত হওয়ায় এর বর্তমান পত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩৯। ৭৪তম পত্রের অপর একটি পত্র থাকায় পত্রসংখ্যা হল ১৪০। পত্রগুলি সবই দোভাঁজ তুলট কাগজের, প্রতিটির আয়তন ১৪″ × ৪½″। অধিকাংশ পত্রের লেখা দুপৃষ্ঠায়। অতএব প্রায় ২৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুথিটিকে বাস্তবিকই বিশাল বলা যায়। পুথিটির লিপিকাল হল ১৬৪৬ শকাব্দ বা ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দ, বাংলা ১১৩১ সাল, তারিখ ৫ই জ্যৈষ্ঠ। প্রথম পাতাটি আংশিক ছিন্ন ও পরে সংযোজিত হলেও শেষ পাতাটি অবিকৃতই রয়েছে। পুষ্পিকায় গদ্যাকারে লেখা রয়েছে কয়েক পঙ্‌ক্তি। সেগুলি থেকে নিম্নলিখিত মূল্যবান তথ্য জানা যায় :

১. লিপিকাল, ১১৩১ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ দিবা ছয়দণ্ড তিথি শুক্লা তৃতীয়া
২. স্থান : চেতুয়াপরগণার বাসুদেবপুর গ্রাম (মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত)
৩. লিপিকর আম্বুয়াপরগণার অধিবাসী সীতারামদাস সুর
৪. বাসুদেবপুর নিবাসী ব্রজবল্লভ রায়ের গৃহে লিপিসমাপন
৫. মুর্শিদাবাদের বন্দখানায় (সম্ভবত নজরবন্দী অবস্থায়) ব্রজবল্লভের অবস্থিতি
৬. চেতুয়া বন্দোবস্তের জন্য দুজন কর্মচারীর আগমন
৭. পুস্তক রচনার কাল ১১০৪ সাল

পুষ্পিকায় এতগুলি তথ্য খুব কম পুথিতেই লক্ষ্য করা যায়, তা ছাড়া এতে রয়েছে আঠারো শতকের প্রথম পাদে নবাব মুর্শিদকুলির চেতুয়া-বন্দোবস্তের এক মূল্যবান তথ্য। পুথিটির উল্লেখযোগ্য আর-একটি অংশ হল, বর্তমানের দিনপঞ্জীর মতো সেকালের গদ্যে লেখা কবি ও চেতুয়া সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান তথ্য। এ থেকে জানা যায় পুথির লিপিকালে কবি জীবিত ছিলেন। শুধু জীবিত নয় তিনি সে সময়ে চেতুয়া-

বন্দোবস্তের জন্য এ অঞ্চলে এসেছিলেন। অন্তত পক্ষে বাংলা ১১৩১ সালের ফাল্গুন মাস পর্যন্ত তিনি যে চেতুয়ায় ছিলেন সে কথা দিনপঞ্জীর এক অংশ থেকে জানা যায়। এ দিনপঞ্জী লিখে রেখেছিলেন কৃপারাম বসু নামে এক ব্যক্তি পুথির দোভাঁজ পাতার ভিতরের পৃষ্ঠায়। এর থেকে রামভদ্র সুর নামে অপর এক লিপিকরের নাম জানা যায়। কবি ও রামচন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তি যুগ্মভাবে চেতুয়ার রাজস্ব-সংগ্রাহক নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়। দিনপঞ্জীর এক বিশেষ অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> সেবক শ্রীকৃপারাম বসো প্রণামা পদে পরার্দ্ধনিবেদনঞ্চ পুস্তক লিখিলেন শ্রীরামভদ্র সুর সন ১১৩১ সাল ফাল্গুন মাসে চেতুয়া মোকামে সোমবারে তিনপহুরে কালে শ্রীকৃপারাম বসু অনাথবর্ঙ্গ ঘোষজা নিকট রহীলাম…শ্রীরামচন্দ্র রায় সিকদারতগীর হইলেন মাঘ মাসে সিকদারীসনন্দ আইন শ্রীপ্রাণবল্লভ ঘোষ…সিকদারী (?) হইলেন… —(পত্র ৩৪)

সতেরো শতকের শেষ দশক থেকে চেতুয়াবরদার জমিদার শোভা সিংহের নেতৃত্বে সে সময়ে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল, শোভা সিংহ নিহত হবার পরও সে বিদ্রোহ চলেছিল কিছুকাল ধরে। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে শোভা সিংহের ভাই হেমৎ সিংহ জীবিত ছিলেন এবং চেতুয়া অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েছিলেন। দেশব্যাপী অরাজকতা ও রাজস্ব অনাদায়ে মুর্শিদাবাদ তথা দিল্লীর রাজকোষ হয়েছিল শূন্য। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সুবাদারের পরিপূর্ণ ক্ষমতা লাভ করে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে সারা বাংলা দেশে জায়গীর বিলিব্যবস্থা করেন। ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে সম্ভবত মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া অঞ্চলের বন্দোবস্ত শুরু হয়েছিল।

পুষ্পিকায় উল্লিখিত ব্রজবল্লভ রায় বোধ হয় চেতুয়া বাসুদেবপুরের জমিদার ছিলেন। মুর্শিদকুলির বিরুদ্ধাচরণ করায় অথবা খাজনা বাকি থাকায় সম্ভবত তাঁকে মুর্শিদাবাদের বন্দখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুথিটি নকল করা হয়েছিল বাসুদেবপুরে ব্রজবল্লভের গৃহে ১১৩১ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে। আর ঐ তারিখেই বাসুদেবপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন নবাবের পূর্ব-নির্দিষ্ট পরওয়ানা অনুযায়ী ('পরনামজকুর') দুজন কর্মচারী নারায়ণ সিংহ ও রাজবলয় বিশ্বাস। এর আগে থেকেই চেতুয়া-বন্দোবস্ত চলছিল মনে হয়। চেতুয়া-বন্দোবস্ত ঐ অঞ্চলে লোকমুখে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। একটি প্রবাদ হল :

> কাশীজোড়ার কাইকুই মণ্ডলঘাটের ধারা।
> চেতুয়ার বন্দোবস্ত কুতুবপুরের গেরা॥[৮]

দিনপঞ্জীর আর-একটি অংশ থেকে জানা যায়, ১১৩১ সালের মাঘ মাসে প্রাণবল্লভ 'তগীরিতে' নিযুক্ত হয়েছিলেন রামচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। পুণ্যাত্মা কবির কাছে প্রার্থী কখনো বিমুখ হতেন না। অংশটি এখানে উদ্ধৃত হল :

> শ্রীরামচন্দ্র রায় তগীরিতে বহল শ্রীপ্রাণবল্লভ ঘোষ সাযুজ্যা বহল হইলেন মাঘ মাসে শ্রীকৃপারাম বসু অনাতবর্ঙ্গ ছাপীত করিলেন প্রাণবল্লভ ঘোষ পুণ্যাতা তাহার নিকটে শ্রীগন্ধর্ব্ব রায় আসীয়াছিলে ভিখ্যা করিতে অর্দ্ধ তঙ্কা দিয়া বিদায় করিলাম— শ্রীরামনাথ মিত্র ভাগ্যথাট হইল তাহার আমলা শ্রীপ্রাণবল্লভ ঘোষের নিকট আইল প্রতিপালন করিতেছেন ঘাটা নকিরিতেছেন —(পত্র ১২)

চেতুয়া-বন্দোবস্তের জন্য সদর কার্যালয় চেতুয়াগ্রামের উল্লেখ পুথিতে একাধিকবার পাওয়া যায়।

বর্তমানে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোডের সংলগ্ন বৈকুণ্ঠপুরের কাছাকাছি চেতুয়া গ্রামটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কয়েকটি প্রাচীন স্মৃতিমন্দির অবশ্য এর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এর মধ্যে একটি হল চাঁদ-খাঁ-পীরের স্থান।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হল, কবি প্রাণবল্লভের জীবৎকালেই পুথির নকল হওয়ায় পুথিটির রচনাকাল খুব বেশি দিনের নয়। পুথিটির বর্তমান পত্রগুলিতে প্রহেলিকার মাধ্যমে কোনো রচনাকাল নেই বটে, কিন্তু পুষ্পিকার শেষে 'এ পুস্তক সন ১১০৪ সাল' বলে যে উল্লেখ আছে সম্ভবত সেটাই কাব্যরচনার কাল বলে মনে করলে অসংগত হবে না। পুথির একটি পৃষ্ঠায় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র ও তাঁর 'কৃষ্ণপরায়ণী' জননীর উল্লেখ থেকে এই ১১০৪ সালকেই কাব্যের জন্মকাল বলে মনে করা যেতে পারে। শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে কীর্তিচন্দ্রের পিতা জগৎরাম ঢাকায় পলায়ন করলে কীর্তিচন্দ্রের মাতা কিছুকাল রাজ্যশাসন করেছিলেন। বর্ধমান রাজবংশে রাজমহিষীও যে রাজ্যশাসন করতেন তার প্রমাণ ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে তেজশ্চন্দ্রের মাতার কিছুকাল রাজ্যশাসন। কীর্তিচন্দ্রের মাতার শাসনকাল ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দ, বাংলা ১১০৪ সাল। তাই পুষ্পিকায় উল্লিখিত এই সালকে প্রকৃত কাব্যরচনার কাল ধরলে অন্যায় হবে না। আর এ সময় থেকে লিপিকালের ব্যবধান মাত্র ২৭ বৎসর। কবি প্রাণবল্লভ তখন নিশ্চয়ই বৃদ্ধত্বের সীমায় পা দিয়েছেন। কাজেই ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের পর আর বেশিদিন তাঁর জীবিত না থাকাই সম্ভব। কর্মাবস্থায় চেতুয়ার বাসুদেবপুরে থাকাকালীন কবির দেহত্যাগও অসম্ভব নয়। পুথিটি এই গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় এ অনুমান হয়।[১]

কবির সঙ্গে সীতারাম সুর নামে যে লিপিকার এসেছিলেন চেতুয়ায় তাঁর আবাস ছিল আম্বুয়ায়। আম্বুয়া অম্বিকানগরের (বর্তমান কালনা শহর) কাছাকাছি এক প্রসিদ্ধ স্থান ছিল সেকালে। আম্বুয়া মুলুক আম্বুয়া গ্রামের নামেই বোধ হয় পরিচিত ছিল। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে আম্বুয়া মুলুক ও আম্বুয়ার নাম থেকে এ কথাই মনে হয়। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে একাধিকবার আম্বুয়ার উল্লেখ আছে। গঙ্গার পশ্চিম-কূলবর্তী অম্বিকানগর ও আম্বুয়া এককালে চৈতন্যের স্মৃতিধন্য বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান ও কেন্দ্র ছিল। বর্তমান কালনার অম্বিকা-শ্রীপটে মহাপ্রভুর মন্দিরটি আজও সেই প্রাচীন স্মৃতির সাক্ষী হিসাবে রয়ে গেছে। এ অঞ্চল প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষা ও সভ্যতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মহাপ্রভুর অলোকসামান্য ভাববিপ্লবের স্বচীমুখে অম্বিকা হয়েছিল বিশেষভাবে প্লাবিত। কবি প্রাণবল্লভ যখন আবির্ভূত হন তখন ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরবে এ স্থানের খ্যাতি ও সমৃদ্ধি ছিল অপরিসীম। ধর্মপ্রাণ অম্বিকাবাসীর চিত্ত ছিল বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিভাবের উন্মাদনায় উদ্‌বেল। গঙ্গা ও বিষ্ণু ছিল তাঁদের অতিপ্রিয় পূজনীয় দেবতা। প্রাণবল্লভ অম্বিকাবাসীর গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণের অভিলাষকে পূরণ করেছিলেন 'জাহ্নবী-মঙ্গল' কাব্য রচনা করে। বৈষ্ণবভক্তিরসে সিক্ত কবিচিত্তও বোধ হয় উদ্‌বেল হয়েছিল 'গঙ্গাগাথা পদ্ম-মধুপানে'র জন্যে। কবি তাই বলেছেন :

গঙ্গাকথামধুলোভে হইয়া ভ্রমর।
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভণে জাহ্নবীমঙ্গল॥ (১৫৭তম পত্র, পৃষ্ঠা ১)

অম্বিকাবাসীর অভিলাষের কথাও কবি উল্লেখ করে বলেছেন :

গঙ্গাগাথা পদ্মমধুপান অভিলাষ।
অম্বিকানিবাসী তাহা সততপ্রয়াস॥ (৭৯:২)

এই অম্বিকানগরের কাছাকাছি আম্বুয়া গ্রাম-নিবাসী সীতারাম সুর যে কবির পরিচিত ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। সম্ভবত লিপি করাই ছিল তাঁর পেশা। তাই কর্মোপলক্ষে কবি যখন এসেছিলেন মেদিনীপুরের চেতুয়ায় তখন এই লিপিকরকেও তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন বলে মনে হয়। দিনপঞ্জী-লেখক শ্রীকৃপারাম বসু সম্ভবত কবির অধীনস্থ কর্মচারী বা কোনো আত্মীয় ছিলেন। তিনি এবং আরো অনেকে মুর্শিদকুলির কর্মচারীরূপে চেতুয়ায় এসেছিলেন বলে অনুমান হয়। কবি চেতুয়া থেকে স্বদেশে ফিরেছিলেন কিনা জানা যায় নি। বৃদ্ধবয়সে বিদেশে তাঁর অবসরকালের সঙ্গী ছিল জাহ্নবীমঙ্গল পুথিটি। মূল পুথিটি জীর্ণদশায় উপনীত হলে তাঁরই নির্দেশে নতুন পুথি নকল করা হয়েছিল। এই বৃহৎ পুথিটি খুব তাড়াতাড়ি নকল করা হয়েছিল, কেননা ৭৪ সংখ্যক যে অপর একটি পত্র পাওয়া গেছে তাতে তারিখ পাই ১লা জ্যৈষ্ঠ ১১৩১। এতে মুদির দোকান থেকে নেওয়া মালপত্রের একটি হিসাব-তালিকা থাকায় পত্রটিকে বাতিল করে দিতে হয়েছিল। পরে আবার ঐ পাতাটি লিপিকর সীতারাম নতুন করে লিখে দিয়েছিলেন— তা বোঝা যায় দুটো পাতার একই রকম হস্তাক্ষর দেখে। মনে হয় ১১৩১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত পুথির ৭৪ পাতা পর্যন্ত নকল হয়েছিল। নকল শেষ হয়েছিল ৫ই জ্যৈষ্ঠ। মাত্র ৪ দিনের মধ্যে ১০০ পাতার নকল হওয়ায় অনুমান করা যেতে পারে পুথিনকলের কাজ আরম্ভ হয়েছিল বৈশাখের শেষাশেষি। পুথিতে একাধিক ব্যক্তির হস্তাক্ষর দেখে প্রমাণ হয় তাড়াতাড়ি নকলের জন্যে অনেকে এ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। কাঁচা ও পাকা হাতের হস্তাক্ষর এর প্রমাণ।

সীতারাম সুরের হস্তাক্ষর ছিল বেশ সুন্দর ও স্পষ্ট। ১৫৬তম পত্রে ২য় পৃষ্ঠার শেষে 'লিখিতং শ্রীসীতারাম সুর সাকিম আম্বুয়া' বলে তিনি নিজ হস্তাক্ষরের যে দিঙ্‌নিদর্শন করেছেন তা থেকে পুথির অন্যান্য স্থানে তাঁর হস্তাক্ষর চিনে নেওয়া যায়। কোনো স্থানে তাঁর হস্তাক্ষর এত সুন্দর ও স্পষ্ট হয়েছে যে তা দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

জাহ্নবীমঙ্গল পুথি একটি বৃহত্তম গঙ্গামঙ্গল কাব্য বলে আগেই বলা হয়েছে। এর ৩৫টি পাতা কাল-কবলিত হলেও কাব্যের বিষয়বস্তু বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। কাহিনী সম্পূর্ণ পৌরাণিক, তবে অনুবাদ নয়। কবি প্রধানত মহাভারত, নারদীয়, ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অবলম্বনে কাব্যটি রচনা করলেও স্বকীয় প্রতিভা ও কবিত্বশক্তিতে পুরাণের নীরস ও বৈচিত্র্যহীন কাহিনীকে সরস অথচ 'ভকতজনে'র হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন করেছেন। ভক্ত কবি শ্রোতৃবৃন্দকে গঙ্গা ও হরির অভিন্নত্বের বিষয় বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মহাপাপীরাই এঁদের উভয়ের ভেদ করে থাকেন। কবি তাই বলেছেন :

যেই বিষ্ণু সেই গঙ্গা বেদপরমাণ।
ভেদ কৈলে মহাপাপ শুন জ্ঞানবান্‌॥ (৬:২)

আবার গঙ্গোদক ও হরিপাদোদকেও কোনো ভেদ নেই—

যেই গঙ্গোদক হয় হরিপাদোদক।
জঠরে দ্বাদশ অব্দ থাকয়ে পৃথক্‌॥ (৬:১)

কাব্যের নানা স্থানে নিজেকে বারবার 'বৈষ্ণবকিঙ্কর' বলে উল্লেখ করে কবি বৈষ্ণবমতে তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বৈষ্ণবমতে তাঁর দীক্ষার কথাও অনুমান করা যায়। বারবার তিনি শ্রীগুরুচরণে প্রণাম

জানিয়েছেন। কাব্যের শুরুতেই শ্রীগুরুচরণে প্রণাম জানিয়ে কবি কাব্যারম্ভ করেছেন। বৈষ্ণবধর্মে অবিচলিত-নিষ্ঠাবান্ কবির অন্তর থেকে ভক্তিরসের যে নির্ঝরধারা অবিরামগতিতে নির্গত হয়েছে কাব্য-কুঞ্জের এক বিস্তীর্ণ অংশকে তা প্লাবিত করেছে। কৃষ্ণের প্রতি কবির গভীর হৃদয়ার্তি প্রকাশ পেয়েছে সহজ মধুর ভাষার মাধ্যমে। তাঁর মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ববৈষ্ণব ও কবিসাধকের যে এক চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছিল, গঙ্গাভক্তিকে অবলম্বন করে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবি যখন বলেন

সর্ব্বদেব মধ্যে যেন প্রধান গোবিন্দ।
ইথে ভেদ কৈলে হয় সেই জন নিন্দ॥
ক্ষিতিমধ্যে যেইখানে হয় হরিনাম।
তথায় সকল তীর্থ করেন বিশ্রাম॥ (৫০:১)

তখন শুদ্ধসত্ত্ববৈষ্ণবের হৃদয়দর্পণটিই পাঠকচিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবের ভক্তিবিনম্র রূপটিও ধরা পড়েছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে। কবি বলেন :

ক্ষীর যেন দধিযোগে জন্মে নানা উপভোগে
তেন সব কৃষ্ণের মায়ায়।...
বন পশুবত আমি সকল জানগ তুমি
পূর্ণ কর মন অভিলাষ।
(তোমার চরণ?) রেণু ভূষিয়া মস্তকতনু
ক্ষম দোষ মাগে প্রাণদাস॥ (৪:১)

কবি যখন বলেন নারায়ণ ত্রিভুবনে তাঁর অনন্ত বিশ্বরূপ রাখার ঠাঁই নেই জেনে সে রূপকে ভক্তসাধুর হৃৎপদ্মে সংকুচিত করে রাখলেন তখন কবিসাধকের হৃদয়টিই ধরা পড়ে :

সকলগীর্ব্বাণবাণী করিয়া শ্রবণ।
মূর্ত্তি সংবরণ কৈলা প্রভু নারায়ণ॥
ত্রিভুবনমধ্যে স্থল না পাই ভাবিয়া।
ভক্তসাধুহৃৎপদ্মে রাখি সম্বরিয়া॥ (৩১:২)

আবার কবি যখন বলেন

সর্ব্বঘটে স্থিতি হরি জগত আধার।
কৃষ্ণের ইঙ্গিত হৈলে সকল সুসার॥ (২৩:২)

তখন বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের মূল ভাবটির সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ দেখে চমৎকৃত হতে হয়। এরকম অসংখ্য পঙ্‌ক্তির মধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় তত্ত্বের সহজ সরল প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে।

'জাহ্নবীমঙ্গলে'র কোথাও কবি তাঁর নিজ পরিচয় দেন নি। একমাত্র পিতার নাম বংশী ঘোষ ছাড়া কবিসম্পর্কে আর কিছু জানার উপায় নেই। আত্মপরিচয় গোপন রেখে কবি চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের মতো অভিমানশূন্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। খণ্ডিত পত্রগুলির কোথাও কবির আত্মপরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে কাব্যের অন্য কোথাও নিশ্চয়ই তার কিছু-না-কিছু উল্লেখ থাকত।

জাহ্নবীমঙ্গল কাব্যটি এগারো দিনের গানের জন্যে রচিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গলের মতো বারো বা আটদিনের নির্দিষ্ট পালাগানের কোনো নীতি অনুসৃত হয় নি। অবশ্য কবি এ কাব্যকে এগারো দিনের উপযোগী করার এক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। কাব্যের শেষ দিকে কবি বলেছেন :

একাদশ দিন কথা পুন করি গান।
তিথিমধ্যে একাদশী প্রভু নারায়ণ॥
একাদশ রুদ্র শিব জানে জগজন।
একাদশ স্কন্ধ গ্রন্থ পোতা ভাগবত।
একাদশ দিন কথা শুন পূর্ব্বমত॥ (১৭৩:২)

কাব্যে সবসুদ্ধ আছে উনিশটি পালা। প্রথম দুদিন শুধু নিশাপালা। তৃতীয় দিন থেকে দশম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন দিবা ও নিশাপালা। দশম দিবসের নিশাপালার নাম জাগরণ। এতে গঙ্গার বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। একাদশ দিবসের প্রাতঃকালের পালায় কাব্যের ফলশ্রুতি ও সংক্ষেপে ভারতকথা বর্ণিত হয়েছে। পালাগুলির কোনো-কোনোটি আংশিক খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তৎসত্ত্বেও খণ্ডিত অংশের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাহিনী বা বস্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। এগারো দিনের পালাগুলির কাহিনী হল : গঙ্গার পাদোদ্ভবা বৃত্তান্ত, বলি-উপাখ্যান, ভগীরথ-উপাখ্যান, সৌদাসরাজার উপাখ্যান, কালকল্প-উপাখ্যান, গৃধ্র-উপাখ্যান, ক্রৌঞ্চী-উপাখ্যান, ভেকভেকী-উপাখ্যান, প্রয়াগমাহাত্ম্য-কথা, মাধব-সুলোচনা-উপাখ্যান, বারাণসী-মাহাত্ম্য, কৃষ্ণনৃপস্বর্গবাস, গঙ্গার বিবাহ ও মহাভারত-কাহিনী। কাব্যের শেষে কবি বলেছেন :

ভারতকথন যত অপূর্ব্বকাহিনী।
ত্রিভুবনমধ্যে সার গঙ্গাঠাকুরাণী॥…
গঙ্গার প্রভাবে সবে কৈল স্বর্গবাস।
গঙ্গা ২ বল সভে সাঙ্গ ইতিহাস॥
গঙ্গার চরণ সার ভরষা কেবল।
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভণে জাহ্নবীমঙ্গল॥ (১৭৪:২)

প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে 'জাহ্নবীমঙ্গল' রচিত হলেও কৃত্তিবাস ও কাশীরামের কাব্য যেমন অনুবাদকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না তেমনি এ কাব্যকেও ঠিক অনুবাদকাব্য বলা চলে না। ক্রিয়াযোগ-সারের কাহিনীর কিছু কিছু অংশের সঙ্গে 'জাহ্নবীমঙ্গলে'র কোনো কোনো পঙ্‌ক্তির অনুবাদজাত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও সে অনুবাদে কবিত্বের আধিক্যই বেশি। যেমন ক্রিয়াযোগসারে মাধব-সুলোচনা-উপাখ্যানের একটি শ্লোকের অংশ—

'অন্তর্দৃঢ়ং বহিঃশ্লক্ষ্ণং বদরীফলতদ্বচঃ'

কবি এ অংশকে কবিত্বময় ভাষায় বলেছেন :

হৃদয় কঠিন অতি বদনে মধুর স্তুতি
যেন পাকা বদরির ফল। (১১৮:২)

কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাব্যের বহু স্থানে কাব্যিক সুষমা ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব প্রদর্শনে কবির অসাধারণত্ব অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ষষ্ঠ দিনের

দ্বিবাপালা বকীমুক্ত-উপাখ্যানে ক্রিয়াযোগসারের কাহিনী ও 'জাহ্নবীমঙ্গলে'র কাহিনী তুলনা করলে দেখা যায়, ক্রিয়াযোগসারে দেবরাজ ইন্দ্র পদ্মগন্ধার রূপমুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিয়ে একেবারে ক্রীড়াগৃহে গমন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে সেখানে কাহিনীর গতানুগতিকতা ও নীরসতাই পরিলক্ষিত হয়। কবি প্রাণবল্লভ অংশটিকে আরো চিত্তাকর্ষক করার জন্যে পদ্মা ও ইন্দ্রের ক্রীড়াগৃহগমনের আগে নন্দনবনের এক অপূর্ব বর্ণনা করেছেন এবং পদ্মার রূপবর্ণনায় চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। ক্রিয়াযোগসারে এগুলি নেই। নন্দনবনে বসন্তঋতুর আবির্ভাবে নায়িকা পদ্মার প্রতি ইন্দ্রের আকর্ষণ রত্যাদিভাবের উদ্বোধক উদ্দীপনবিভাবের অনুকূল হয়েছে। পদ্মার রূপবর্ণনাও হয়েছে নিখুঁত, যেমন---

কুরঙ্গনয়নি জগতমোহিনী
হাসিল মদনসরে।
জিনি কামচাপ ভুরু করে দাপ
নাসিকা নাহিক তুলে ॥
দসনমুকুতা নহে ত সমতা
ওষ্ঠ পাকা বিম্ববর।
মন্দ মৃদুহাস বিদ্যুতপ্রকাস
বানি সুধাসম সর ॥ (৭৪:২)

প্রাণবল্লভের কবিত্ব সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকুই বলা যায় তাঁর কাব্যে কবিত্বপ্রতিভার শুভ্রোজ্জ্বল দীপ্তি পৌরাণিক কাহিনীসমূহকে ভাবের নবীন আলোকে আলোকিত করেছে। আঠারো শতকের প্রতিভাবান্ কবি ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের অনেক আগে লেখা কবি প্রাণবল্লভের এ কাব্যটি শুধু গঙ্গামঙ্গলকাব্য হিসাবে নয়, মঙ্গলকাব্যের এক উল্লেখযোগ্য কবিকৃতিরূপে মনে করা যেতে পারে।

উল্লেখপঞ্জী

১ ড. সুকুমার সেন -সম্পাদিত, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, পৃ ৮
২ ড. সুকুমার সেন -সম্পাদিত, বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল, পৃ ৬-৮
৩ আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ -সম্পাদিত, মাধবাচার্যের গঙ্গামঙ্গল, পৃ ৩৯
৪ উপরিলিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৮৯
৫ মহাভারত, ৩য় পর্ব, শ্লোক ১০,৫৩৮
৬ McCrindle, *Ancient India* (Strabo), p. 75
৭ McCrindle, *Ancient India as Described in Classical Literature*, pp. 178-179
৮ শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, দানপুরের ইতিহাস, পৃ ৮৩
৯ পুথিটির আবিষ্কারক চেতুয়া বাসুদেবপুর-নিবাসী মৎপিতৃদেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতিবিনোদ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ডায়েরির প্রকরণ ও প্রবণতা

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের শিল্পিসত্তা আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় সন্ধান করেছে সৃষ্টির বহুবিচিত্র পথ : কবিতা গান কথা-সাহিত্য নাটক চিত্রকলা ও পত্রসাহিত্যের নানা আঙ্গিক প্রকরণ। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি। রবীন্দ্রমানসকে যে-সব উপায়-উপকরণের মধ্য দিয়ে আমরা ধরতে বা বুঝতে পারি, পূর্বোক্ত ওই মাধ্যমগুলি তাদের মধ্যে বিশিষ্ট। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের নিভৃত মর্মলোকে প্রবেশের এই পথগুলি সর্বজনবিদিত সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পস্রষ্টাকে অন্তরঙ্গরূপে জানার পথ কেবল ওই ক'টিতেই সীমিত নয়। বলা বাহুল্য, আরো আছে। ডায়েরি বা দিনলিপি তাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথও ডায়েরি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর বিপুলায়ত সৃষ্টির মধ্যে এদের সংখ্যা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ 'সরকারী'-ভাবে ঘোষিত তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরির সংখ্যা মাত্র দুই— 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। শিল্পমূল্যের দিক থেকে কিংবা তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যের প্রেরণা বা উপকরণ হিসাবে এই দুটি ডায়েরির গুরুত্ব বা মূল্য স্বতন্ত্রভাবে কতখানি স্বীকৃত হয়, বলা কঠিন। যে কারণেই হোক, রবীন্দ্র-নাথের রচনার বিভিন্ন শাখার যেমন আলোচনা বা মূল্যায়ন হয়েছে, তাঁর ডায়েরি-রচনা সম্পর্কে আগ্রহ বা কৌতূহল তেমন চোখে পড়ে নি। অন্ততঃ 'দিনলিপি' হিসাবে তাঁর ওই 'ডায়ারি'-দুটির স্বতন্ত্র সমীক্ষার প্রয়াস তেমন হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য আমাদের এ প্রবন্ধও ঠিক সেই 'অপূর্ণতা' দূর করার জন্য রচিত নয়। তাঁর বিশেষ কোনো ডায়েরির স্বতন্ত্র মূল্য বা গুরুত্ব প্রসঙ্গে কোনো বিতর্কের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে চাই নে। আমাদের দৃষ্টিকোণ একটু স্বতন্ত্র। সাধারণভাবে প্রকাশমাধ্যম হিসাবে ডায়েরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের বিচার এবং সেই মনোভাব তাঁর লেখক-জীবনকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার নির্ধারণ ও তাৎপর্য সন্ধানেই আমাদের বিশেষ আগ্রহ।

২

আত্মনিষ্ঠ ভাব ও ভাবনাকে ধরে রাখার একটি বিশিষ্ট আধার দিনলিপি। রবীন্দ্রনাথের মতো গভীর অন্তর্মুখী ও আত্মনিষ্ঠ এক শিল্পীর জীবনে দিনলিপি বা ডায়েরির একটি বিশেষ ভূমিকা তাই একান্ত প্রত্যাশিত। আত্মনিষ্ঠ মনকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিয়েছেন নানা ভাবে। তাঁর অজস্র গীতিকবিতায় গানে এবং বিচিত্র গদ্য রচনায়। কিন্তু তবু ডায়েরির বিকল্প হিসাবে এদের গ্রহণ করা চলে না। কারণ যথার্থ ডায়েরিতে লেখক যতটা সহজ ও অন্তরঙ্গ হতে পারেন, যেমন করে নিতান্ত ব্যক্তিমনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবকে প্রকাশ করতে পারেন, এমন বোধ করি আর কোথাও নয়। এখানে লেখকের সামনে আর কেউ থাকে না। তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। জগৎ ও জীবনের পটভূমিতে নিজের মুখোমুখি এসে বসেন লেখক। আর সমস্ত রচনারই পাঠক বা শ্রোতা থাকে, কিন্তু কোনো পাঠকের জন্যই 'ডায়েরি' লেখা হয় না। যথার্থ দিনলিপি কোনো উপলক্ষে কারো ফরমাশে লেখা হতে পারে না, লেখার সময় দিনলিপি-লেখকের

চোখের সামনে কখনও সম্পাদক বা প্রকাশকের ছবি ভাসে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ডায়েরি বা দিনলিপি একান্তভাবে 'আলাপের অদ্বৈতরূপ'।

হঠাৎ শুনলে হয়তো কিছুটা অবাক লাগে, কিন্তু কথাটা সত্য— ডায়েরি রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কোনোদিনই অনুকূল ছিল না। ডায়েরি রচনার উদ্দেশ্য বা প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেখানে যা বলেছেন, তার কোথাও আত্মপ্রকাশের এই বিশেষ আধারটি সম্বন্ধে তাঁর এতটুকু আস্থার নিদর্শন মেলে না। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্পষ্টভাষায় ডায়েরি সম্পর্কে তাঁর 'প্রতিকূল' মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। ১২৯৯ সালের মাঘ মাসের 'সাধনা'য় যখন প্রথম 'ডায়ারি' বা 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' ধারাবাহিক বেরোতে শুরু করে তখন তার 'ভূমিকা'র একেবারে আরম্ভেই লেখক লিখছেন, "পাঠকেরা যদি 'ডায়ারি' শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন।" অর্থাৎ ডায়েরির যে প্রচলিত সংজ্ঞা ও লক্ষণ তার সঙ্গে পঞ্চভূতের কোনো মিল নেই, এ কথাই লেখক ঘোষণা করতে চান। তার পর গ্রন্থের মধ্যে আরো কিছুটা এগোলে লেখকের এই মনোভাবের একটা ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। কেন তিনি প্রচলিত ধরনের 'ডায়েরি' লিখতে চান না তার কারণ লেখক প্রধানতঃ এই গ্রন্থের সূত্রধার 'আমি' চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। এই মত রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব মত, কারণ 'আমি' চরিত্র যে-সব কথা বলেছে বস্তুতঃ 'পঞ্চভূতে'র কেউই তার কোনো জোরালো প্রতিবাদ করে নি বা ওই বক্তব্যকে খণ্ডন করে ডায়েরি লেখার সপক্ষে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয় নি। পক্ষান্তরে, কয়েকটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে বক্তা [আমি] ও স্রোতস্বিনী কেবল আপন বক্তব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : "ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন··· প্রতিদিন আমরা যাহা অনুভব করি তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথাযথ পরিমাণ থাকে না।··· ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।" অন্যত্র বলছেন, "জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভুলিয়া, অনেক ফেলিয়া অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কী হইবে··· জীবনের প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত পশ্চাতে টানিয়া লইয়া। প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিয়া পড়ে সে অতি হতভাগ্য।"

১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন এ-সব কথা লিখেছেন তখন তাঁর বয়স একত্রিশ। কবির অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের এই মনোভাব পরিণত বয়সেও পাল্টায় নি। এ থেকে যেন মনে হয়, এই মনোভাব কোনো বিশেষ কালপর্বের সাময়িক ব্যাপার নয়, বরং কবিচিত্তের একটি স্থায়ী প্রবণতা। তেষট্টি বছর বয়সে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে কবি বলছেন : "ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতি দিন থেকে ছোটো বড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগোতে চায় না, আগলাতে চায়।···

"ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাবসংগত নয়। আমি ভোলানাথের চেলা। ঝুলি বোঝাই করে আমি তথ্য সংগ্রহ করি নে। আমার জলাশয়ের যে জলটাকে অন্যমনস্ক হয়ে উবে যেতে দিই সেইটেই অদৃশ্য শূন্যপথে মেঘ হয়ে আকাশে জমে, নইলে আমার বর্ষণ বন্ধ।···

"আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের

স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।"

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাবসংগত নয়।' কিন্তু 'স্বভাবসংগত নয়' বলতে কী বোঝাচ্ছেন কবি? নিশ্চয়ই তাঁর কবিস্বভাব বা শিল্পিস্বভাবের অনুকূল নয়, এই অর্থে? উপরের উদ্‌ধৃতির শেষ অংশে সেটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন বলেছেন এ কথা? ডায়েরি রচনা তাঁর সমগ্র কবিসত্তার আত্মপ্রকাশের পথে অন্তরায় হবে, সম্ভবতঃ এই তাঁর আশঙ্কা। কারণ 'দৈনিক জীবনের' 'ঝুলি বোঝাই করা' অজস্র খণ্ড খণ্ড তথ্যের সাক্ষ্য কবির 'সমগ্র জীবনের সত্য'কে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে পারে না কিছুতেই। খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা বা ঘটনার উপকরণের ভিড়ে ব্যক্তির সামগ্রিক ছবিটি ঝাপসা হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা নিশ্চয় মিথ্যা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ডায়েরিকে যে অর্থে গ্রহণ করে এই ধারণার বশবর্তী হয়েছেন, তা থেকে একটু ভিন্ন অর্থেও ডায়েরিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়াতে ডায়েরির সংজ্ঞা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "Diary means simply a daily record of events or observations made by an individual. In it the man of letters inscribes the daily results of his reading or his meditations." অর্থাৎ ডায়েরিতে নিছক দৈনন্দিন জীবনের স্থূল ঘটনা বা ক্রিয়াকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ হবে তা নয়, তার মধ্যে লেখকের প্রতিদিনের অধ্যয়ন ও সুগভীর চিন্তাভাবনা-উপলব্ধিরও অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটবে। ডায়েরি শুধু ঘটনাবহুল বহিরঙ্গ জীবনের খণ্ডচিত্রের সমষ্টিমাত্র নয়, তা লেখকের মানস-জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়বাহীও বটে।[১] এ প্রসঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী জার্নাল-রচয়িতা অ্যামিয়েল (Amiel)-এর দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। 'ছিন্নপত্রে'র পাঠকমাত্রই জানেন অ্যামিয়েল ছিলেন কবির 'নির্জনের প্রিয়বন্ধু' এবং তাঁর জার্নাল কবির 'মনের মতো বই'। অ্যামিয়েল সাহেবের এই *Journal Intime* সম্পর্কে প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এই ডায়েরি নিয়মিত লেখা নয়। দীর্ঘ দিনের ব্যবধান আছে অনেক জায়গায়। এও দেখছি যে, ছ-সাত মাস কিংবা তারও বেশি সময়ের ব্যবধান যেমন আছে, তেমনি কোনোদিন-বা বেলা দশটায় জার্নাল লেখা শেষ করে আবার বেলা এগারোটাতেই শুরু করেছেন জার্নাল। এ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে অ্যামিয়েল-এর কাছে তাঁর জার্নাল কখনোই বহিরঙ্গ জীবনের প্রতিদিনের স্থূল ঘটনা বা 'তথ্য ভরে রাখার ঝুলি' নয়, এর মধ্যে অ্যামিয়েল-এর অন্তরঙ্গ গূঢ় ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন হয়েছে ধীরে ধীরে, তাঁর মানসলোকের ছবি একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। এই জার্নাল এমন একজনের রচনা, যাঁর কাছে কোনো ঘটনা বস্তু বা দৃশ্যের নিজস্ব মূল্য তেমন কিছু নেই, আসলে তাঁর কাছে "every landscape is, as it were, a state of the soul.···At

---

১. ডায়েরির এই বিশিষ্ট রূপ সম্পর্কে আঁদ্রে মরোয়ে-ও (Andre Maurois) বলেছেন: "The intimate diary, in which the writer is concerned to set down his thoughts and moods is a species apart" (Cassell's *Encyclopaedia of Literature*. Vol. I). এই ধরনের ডায়েরি রচয়িতাদের মধ্যে অ্যামিয়েল, হেডন, ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড, জিদ্, বদ্‌লেয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মরোয়ে-র মতে, এঁদের ডায়েরিতে, "the reader can trace the development of a consciousness".

bottom there is but one subject of study, the forms and metamorphosis of mind."[২] মনে রাখতে হবে এই অ্যামিয়েল, এই ধরনের মানসদৃষ্টিসম্পন্ন ডায়েরি-লেখক রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয়জন। তাঁর ডায়েরির নিন্দা বা বিরোধিতা করা দূরে থাক্, বরং স্পষ্ট ভাষায় কবি বলছেন, এ তাঁর 'মনের মতো বই।' ইন্দিরা দেবীকে অ্যামিয়েল-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ কথা লিখেছেন ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ২৩শে মার্চ। এর আগে 'পঞ্চভূতে'—১৮৯২ খৃস্টাব্দে সম্ভবতঃ, ডায়েরি রচনার স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন কবি। আবার ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের দীর্ঘদিন পরেও 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ইত্যাদিতে ডায়েরি রচনা সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করেছেন। এসব কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তা হলে সমগ্রভাবে ডায়েরি সম্পর্কে কবির মনোভাব কী? তার উত্তর এক কথায় এখনই দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা চলে কি যে অ্যামিয়েল-এর জার্নালের মতো দিনলিপি, যেখানে বস্তুজগৎকে অতিক্রম করে 'state of the soul'-ই মুখ্য হয়ে ফুটে ওঠে— সেরকম দিনলিপিই হয়তো কবির স্বভাবসংগত? জানি নে আলোচনার এই স্তরে সে কথা একেবারে নিশ্চিত করে বলা চলে কি না।

যাই হোক, ডায়েরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী ধরনের বা কতখানি প্রতিকূল ছিল, কেবল সে প্রসঙ্গই আমাদের কাছে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে যা কৌতূহলোদ্দীপক তা হল, রবীন্দ্রনাথ ডায়েরি রচনাকে নিজের 'স্বভাবসংগত নয়' বলে যেমন সে সম্পর্কে যথেষ্ট 'অনীহা' প্রকাশ করেছেন, তেমনি পক্ষান্তরে আবার 'ডায়ারি' রচনাও করে গেছেন। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' এবং 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' এ দুটি রচনাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'ডায়ারি' শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে অর্থেই হোক-না, এদের 'ডায়ারি' বলে স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দিই, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তেই এক দিকে ডায়েরি রচনার বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন, অন্য দিকে আবার 'ডায়ারি' লিখছেনও। উল্লিখিত দুটি রচনার মধ্যে ডায়েরির যথার্থ লক্ষণ কতখানি কী আছে, সে প্রসঙ্গ আপাততঃ স্থগিত রাখছি। তবে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' লেখা হয় ১৮৯০ খৃস্টাব্দে। আর 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' রচিত হয় ১৯২৪-২৫ খৃস্টাব্দে। দুটি ডায়েরির মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধান। মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই সময়ের মধ্যে বা অন্য সময়ে আর কোনো ডায়েরি কবি লিখলেন না কেন? এ প্রশ্ন আদৌ উঠত না, যদি মনে করতে পারতাম, রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই 'ডায়েরি-বিরোধী'— জীবনে কখনো কোনো ডায়েরি লেখেন নি। কিন্তু দুখানা গ্রন্থ স্পষ্টই সে ধারণার অন্ততঃ আংশিক বিরোধিতা করছে। এই দুখানা গ্রন্থ অন্ততঃ প্রমাণ করছে যে তিনি ডায়েরি সম্পর্কে একেবারে নিস্পৃহ বা একান্ত বিরোধী নন। অনেক বিরোধিতা বা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ডায়েরি-রচনায় তাঁর কোনোদিন কোনো আকর্ষণ ছিল না, এ কথা বলা নিশ্চয় সংগত হবে না। পূর্বে উল্লিখিত অ্যামিয়েল সাহেবের জার্নাল সম্পর্কে কবির মনোভাবও এই ধারণারই পোষকতা করছে মনে হয়।

তা হলে প্রশ্ন এই, এই পরম অন্তর্মুখী, গভীর চিন্তাশীল ও নিগূঢ় আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্র দুখানি ছাড়া আর কোনো 'ডায়েরি' রচনায় প্রবৃত্ত হলেন না কেন? অন্ততঃ অ্যামিয়েল-এর মতো, অন্তরঙ্গ জীবনের গূঢ় চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতির সহজ প্রকাশের জন্য, যে 'ডায়েরি'-ধরনের প্রকরণের প্রতি কবির শিল্পিসত্তার প্রবণতা

২. হামফ্রি ওয়ার্ড -কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত *Journal Intime* থেকে উদ্ধৃত।

থাকা স্বাভাবিক মনে হয়, তার প্রকাশ তাঁর রচনায় কোথায় কতটুকু? সে কি কেবল ওই দুখানি মাত্র 'ডায়ারি'-চিহ্নিত গ্রন্থের মধ্যেই 'আংশিক' ভাবে প্রকাশিত?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে হয়তো। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। আমাদের বিশ্বাস স্থূল তথ্যের আরো গভীরে প্রবেশ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, আপাতবিরোধের অন্তরালে ডায়েরির 'প্রকরণে'র প্রতি এক গূঢ় আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের। প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে জীবনের পর্বে পর্বে তাঁর নানা রচনায় ডায়েরির প্রকরণগত বা আন্তর লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সে-সব রচনা বহিরঙ্গে কোনোটি বা ক্ষুদ্রকায় নিবন্ধ, কোনোটি বা চিঠি, আবার কয়েকটি হয়তো ভ্রমণকাহিনী। আর শুধু তাই নয়, উপন্যাসে প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতেও ডায়েরির আঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন একাধিক ক্ষেত্রে। এ থেকেও কবির মনের উপর ডায়েরির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া যে বিরূপ ছিল না, তারও প্রমাণ হয়তো মিলবে।

৩

১৩০০ সালের ৩০শে আষাঢ় সাজাদপুর থেকে কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন: "এক এক সময় মনে হয়— আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয়, যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধহয় তাতে ফলও আছে, আনন্দও আছে।"[৩]

এ-সব কথা যে নিতান্ত কবিমনের অলস চিন্তা নয়, মনের নানা ভাবকে যে ইতোমধ্যে গদ্যে নানা আকারে প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন— তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করা কিছু কঠিন নয়। যে সময় এই উক্তি করছেন, প্রায় ঠিক তখনই কবি 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' (১২৯৯-১৩০০) লিখছেন, সেখানে নানা ভাব ও ভাবনাকে কবিতার বদলে গদ্যে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 'পঞ্চভূতে'র আলোচনাগুলি একটু দীর্ঘ। ঠিক ডায়েরির প্রচলিত ধারণার অনুরূপ নয়। তা ছাড়া সেখানে নানা চরিত্রের মুখে সংলাপ রচনা করার ফলে ডায়েরির একান্ত ব্যক্তিগত রূপটি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু 'পঞ্চভূত' লেখার অনেক আগে ১২৮৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাব ও ভাবনাকে অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে ও অনেক বেশি ব্যক্তিগত ডায়েরির ভঙ্গীতে লিখতে সুরু করেন। এই ধরনের বেশ কিছু ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ ১২৮৮ ও ১২৮৯ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এগুলি একসঙ্গে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থাকারে বেরোয় ১২৯০ সালে। এরই কাছাকাছি সময়ে (১২৯২, জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র) এই ধরনের আরও কিছু ক্ষুদ্র 'প্রসঙ্গ' লেখেন। সেগুলি পরে 'নানা কথা' শিরোনামায় 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২৯২ সালে আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: 'আলোচনা'।

এই-সব সংকলনে যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাদের বেশির ভাগেরই একটি করে শিরোনাম আছে। কেবল 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত 'নানা কথা' নামক চিন্তাসমষ্টির কোনোটির পৃথক্ কোনো নাম নেই। নাম থাক্ আর নাই থাক্, এই-সব রচনার মধ্যে ডায়েরির 'মানসিকতা' বেশ অনুভব করা যায়। রচনাগুলি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ তো নয়ই, ঠিক 'রম্য'রচনাও নয়— একমাত্র সনতারিখহীন ডায়েরির সঙ্গে এদের আকৃতি ও

---

৩. ছিন্নপত্রাবলী, ১০৭ সংখ্যক পত্র।

প্রকৃতি-গত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অ্যামিয়েল-এর জার্নালেও এই ধরনের চিন্তামূলক ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের অজস্র নিদর্শন মেলে। সেখানে ব্যক্তিগত কথা বিশেষ নেই, সেগুলি কয়েকটি তত্ত্বধর্মী ছোট ছোট অনুচ্ছেদের সমষ্টি। যেমন, ঈর্ষা; নারীর প্রেম ও দুঃখবরণ; জীবন ও আত্মা; মৃত্যু ইত্যাদি। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বা 'আলোচনা'র মধ্যেও অনুরূপ সব প্রসঙ্গের নাম পাওয়া যায়— আদর্শ প্রেম; জগতের জন্ম মৃত্যু; প্রকৃতি-পুরুষ; পাপপুণ্য; বিস্মৃতি; মৃত্যু ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত এই ধরনের প্রসঙ্গের কোনো-কোনোটির আয়তন ডায়েরির প্রসঙ্গের মতই অতি ক্ষুদ্র— পাঁচ-ছয় বা আট-দশ লাইনের মত। অবশ্য অনেকগুলি এর চেয়ে কিছু দীর্ঘ। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র চিন্তাসমষ্টি যে কিছুটা ডায়েরিধর্মী তার আভাস এই সংকলনের শেষ রচনা 'সমাপন'-এ লেখক নিজেই দিয়েছেন: "ইহা [বিবিধ প্রসঙ্গ] একটি মনের কিছু-দিনকার ইতিহাস মাত্র।···এই গ্রন্থে··· অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে।" বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট ডায়েরিও তো 'একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস'।

'আলোচনা' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গ'কে আর-এক দিক থেকেও যথার্থভাবে 'কবিমানসের কড়চা' বা ডায়েরি বলে অভিহিত করা চলে। কবি নিজেই বলেছেন: "যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাতসংগীত যখন লিখিতেছিলাম কিংবা তাহার কিছু পর হইতে ওইরূপ গদ্য লেখাগুলি 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।"[১]— এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বা 'আলোচনা' নিছক চিন্তাসমষ্টি বা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সংকলন নয়, কবি-জীবনের এক বিশেষ পর্বের অন্তর্গূঢ় উপলব্ধিরই পরিচয়বাহী। ডায়েরি বা দিনলিপিতে যে-অর্থে কবি বা কথাশিল্পীর সৃষ্টির নেপথ্যলোকের নিভৃত পরিচয় থাকে, সেই অর্থে ওই দুটি গ্রন্থ ডায়েরির মর্মগত পরিচয় অবশ্যই অনেকাংশে বহন করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বিবিধপ্রসঙ্গে'র একটি রচনার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করছি: "অনেকের গরীব-মানুষি করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে, গরীব-মানুষি করিয়া উঠিতে পারে। আমার মনের এক সাধ আছে যে, এত বড় মানুষ হইতে পারি যে, অসঙ্কোচে গরীব-মানুষি করিয়া লইতে পারি! এখনো এত গরীব-মানুষ আছি যে গিল্টি-করা বোতাম পরিতে হয়, কবে এত টাকা হইবে যে সত্যকার পিতলের বোতাম পরিতে সাহস হইবে! এখনো আমার রূপার এত অভাব যে অন্যের সমুখে রূপার থালায় ভাত না খাইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। এখনো আমার স্ত্রী কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে তাহার গায়ে আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক আয় বাঁধিয়া দিতে হয়।—"[২] বস্তুতঃ এই-সব রচনাই সঠিক স্থান-সনতারিখের দ্বারা চিহ্নিত ও আর একটু সজীব হলেই বোধহয় পূর্ণাঙ্গ ডায়েরির আকার গ্রহণ করত।

সনতারিখের দ্বারা চিহ্নিত ও ডায়েরির মত প্রায় প্রতিদিন কিছু কিছু লেখা চিন্তাসমষ্টির নিদর্শন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের অনেকে 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে একটি খাতায় নিজ নিজ মত ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতেন। প্রায় প্রতি-দিনই এরকম লেখালেখি চলত। রবীন্দ্রনাথের হাতে তখন কোনো সাময়িকপত্র নেই, তাই আপন মনের

১. জীবনস্মৃতি, 'প্রভাতসংগীত' অংশ।

২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড. পৃ. ৩৪৫

অনেক ভাব ও ভাবনা এই খাতাকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল। এমনও দেখা গেছে যে প্রায় প্রতিদিনই, এমন-কি, দিনে দুবারও কবি কিছু কিছু মন্তব্য সেই খাতায় লিখে রাখছেন। 'পারিবারিক স্মৃতি'-তে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনার নাম ও সনতারিখের উল্লেখ করছি :

ক. স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৫

খ. আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিক অসামঞ্জস্য। ৬ অগ্রহায়ণ

গ. কবিতার উপাদান-রহস্য (mystery)। ৬ অগ্রহায়ণ

ঘ. সৌন্দর্য ও বল। ৭ অগ্রহায়ণ

ঙ. আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব। ৭ অগ্রহায়ণ

চ. ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি। ৮ অগ্রহায়ণ

ইত্যাদি।

প্রতিদিনের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাকে এইভাবে সনতারিখ-সহ লিপিবদ্ধ করে রাখার মধ্যে কবির ডায়েরি লেখার মনোভাব আংশিকভাবেও কি ফুটে ওঠে নি?

রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে 'সাধনা'র পর্ব (১২৯৮-১৩০২) সৃষ্টিবৈচিত্র্যে বিশেষ সমৃদ্ধ। কবিতা গল্প নাটক, বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ, সমালোচনা, ব্যঙ্গকৌতুক ইত্যাদি বিচিত্র রচনাসম্ভারে এই পর্ব পরিপূর্ণ। এই বিভিন্ন সাহিত্যশাখা যেন কবির শিল্পিসত্তার অসংখ্য দর্পণ। নিজের নিগূঢ় সত্তাকে ওই দর্পণের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অজস্রবার নিরীক্ষণ করেছেন কবি। সেই আত্মনিরীক্ষার অবলম্বন হিসাবে, আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে এই পর্বে ডায়েরিকেও কবি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আশ্রয় করেছেন। এই পর্বে স্পষ্টরূপে 'ডায়েরি' নামে চিহ্নিত দুটি গ্রন্থ পাই— 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' (পঞ্চভূত)। 'পঞ্চভূতে' ডায়ারি-লক্ষণ কতটুকু আছে বা নেই, সে সম্পর্কে আগেই কিছু বলেছি। এবারে আলোচ্য 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'।

১৮৯০ খৃস্টাব্দে আড়াই-মাস-ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের যে দ্বিতীয়বার য়ুরোপযাত্রা ও য়ুরোপপ্রবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাই ডায়েরি বা দিনলিপির আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই ডায়েরি ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রত্যেক সংখ্যায় এই ডায়েরির খণ্ডাংশ এক-একটি পৃথক শিরোনামে অর্থাৎ একটি গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। 'সাধনা'য় প্রকাশিত রচনাটিকে তাই ঠিক যথার্থ ডায়েরির লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে না। বরং সচেতনভাবে প্রকাশের জন্য রচিত একটি গ্রন্থ বলে মনে হয়। কিন্তু বস্তুত: তা নয়। বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৫৬-৫৮) এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশরূপে যে 'খসড়া'টি প্রথম মুদ্রিত হয় (পরে জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে মুদ্রিত) সেইটিই মূল ডায়েরি। রবীন্দ্রনাথ সেটিকে অবিকল সেইরূপে 'সাধনা'য় কিংবা স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন নি। তার আগে "প্রকাশযোগ্য যথেষ্ট রূপান্তর সমাধা" করেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার একান্ত সহজ স্বচ্ছন্দ ঘরোয়া রূপটি যে অবিন্যস্ত 'খসড়া'তেই সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। 'খসড়া'টি দেখে মনে হয়, এটি রচনাকালে লেখকের মনে এর প্রকাশ সম্পর্কে কোনো বিশেষ আগ্রহ বা সচেতনতা ছিল না, তাই দেড় বছর পরে প্রকাশকালে এর যথেষ্ট 'সংশোধন' করতে হয়েছিল। এই অর্থে, অর্থাৎ রচনাকালে প্রকাশ-ভাবনার অভাবের দিক থেকে, এটি যে যথার্থ ডায়েরির লক্ষণাক্রান্ত তা বলা বাহুল্য। এই 'খসড়া'

দিনলিপির সঙ্গে দশ বছর আগেকার বিবরণধর্মী 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র তুলনা করলে 'য়ুরোপ-যাত্রী'র 'ডায়েরি' রূপের বিশিষ্টতা পাঠকের চোখে সহজেই প্রতীয়মান হবে। শেষোক্ত রচনায় অকৃত্রিম সহজ ঘরোয়া রূপের মধ্যে দিনলিপি-রচয়িতার 'আত্মমগ্ন' 'ভাব'টি অনেকখানি ফুটে উঠেছে : "আজ সকাল থেকে shopping। সলি আর ছোটবউয়ের জন্যে দুটো আয়না কিনেছি। সুরির জন্যে একটা ইলেকট্রিক-আলো-জ্বালা ঘড়ি কেনা গেল। কাল বাবির জন্যে একটা কিনলেই আমার মন নিশ্চিন্ত হয়। সমস্ত দিন জিনিস-পত্র কিনে একান্ত শ্রান্তভাবে সন্ধের সময় 'busএর মাথার উপরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি আসা গেল।... মনটা এমন শূন্য উদাস হয়ে আছে! ইচ্ছে করছে এই ঘুমোতে গিয়ে আর যদি ঘুম না ভাঙে তো বেশ হয়— ঠিক বেশ হয় না, সকলকে একবার দেখতে এবং সকলের কাছে একবার মাপ চাইতে ইচ্ছে করে।... এখানে রাত দুপুর, কলকাতায় ছটা..."।[১] এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মহত্তম কবিসত্তার নিগূঢ় পরিচয় হয়তো ফুটে ওঠে নি, কিন্তু সংবেদনশীল এক শিল্পপ্রাণ মানুষের সহজ ব্যক্তিগত পরিচয় অবশ্যই আছে। গৃহী রবীন্দ্রনাথের গৃহকাতর মনের চাঞ্চল্য ও বেদনা-প্রকাশের মধ্যে— যা এই দিনলিপির নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, এই সহজ ব্যক্তিগত রূপটি স্পষ্ট করে ধরা পড়ে। অন্ততঃ এই অর্থে এই 'খসড়া' গ্রন্থটির ডায়েরি হিসাবে মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

'সাধনা'পর্বের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পর্বে কবি প্রায় একই সঙ্গে খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই ডায়েরি রচনা সম্পর্কে 'পঞ্চভূতে' প্রতিকূল মন্তব্য করছেন, আবার 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' লিখছেন, অ্যামিয়েল-এর জার্নাল সম্পর্কেও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আর শুধু তাই নয়, এই পর্বেই রচিত হয়েছে 'ছিন্নপত্র', যা বহিরঙ্গে পত্র হলেও যার সম্পর্কে 'রবীন্দ্রজীবনী'কার যথার্থই বলেছেন, "দৈনিক কড়চা বা রোজনামচা বা ডায়েরি— পত্রাকারে লিখিত"। ডায়েরি হিসাবে 'ছিন্নপত্রে'র দাবি কতখানি, সে বিষয়ের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখলাম। এখন 'সাধনা' পর্ব ছাড়িয়ে আরো একটু সামনের দিকে এগোতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের বিপুলায়ত রচনাসম্ভারের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য। এদের মধ্যে অনেকগুলিই পত্রের আকারে লেখা। কিন্তু সবগুলি নয়। এদের মধ্যে আছে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। আর আছে 'জাপানযাত্রী' (১৯১৬), 'পারস্যে' (১৯৩২)। 'জাপানযাত্রী' সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ডায়েরির লক্ষণ যে দুর্লক্ষ্য নয়, তা সবুজপত্র-সম্পাদককে লেখা কবির একটি চিঠিতে আভাসিত হয়েছে : "আমার এ লেখা ধারবাহিক চিঠিও না, প্রবন্ধও না। যা যখন মনে আসছে লিখে যাচ্ছি, একবার revise করবারও চেষ্টা করি নি। এর মধ্যে আমাদের যাত্রার ছবি কখন কতখানি পড়বে বলতে পারি নে— কতকগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফের মত হবে। তাতে কি ক্ষতি আছে?"[২]

আপন মনে ইচ্ছামত লিখে যাওয়ার এই যে অসতর্ক অসচেতন মানসিকতা— এটি বস্তুতঃ একমাত্র ডায়েরি-লেখকেরই, আর কারো নয়। তা ছাড়া যা "চিঠিও না, প্রবন্ধও না" কেবল "কতকগুলি খাপছাড়া

১. য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, পৃ, ১৭৭-৭৮

২. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১৩-১৪।

প্যারাগ্রাফ”— তার সঙ্গে সহজেই ডায়েরির প্রকরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, 'জাপান-যাত্রী' ভ্রমণ-নিবন্ধ হলেও এর মধ্যে মাঝে মাঝে তারিখ দিয়ে সেই বিশেষ দিনের ঘটনার বিবরণ ও মনের অবস্থার কথা লেখার প্রয়াস আছে। 'জাপানযাত্রী'তে এরকম চারদিনের 'দিনলিপি' আছে। 'পারস্যে' নামক ভ্রমণবৃত্তান্তে ডায়েরির পূর্বোক্ত বহিরঙ্গ লক্ষণটি আরো অনেক ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। অনেক তারিখ-চিহ্নিত ও তারিখ-না-দেওয়া 'দিনলিপি'র রচনাভঙ্গী স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় সেখানে। বলা যেতে পারে, প্রায় সমগ্র 'পারস্যে' গ্রন্থটিই এই ডায়েরির ভঙ্গীতে লেখা।

রবীন্দ্রনাথের 'ডায়ারি' নামাঙ্কিত যে দু'টিমাত্র গ্রন্থ ('পঞ্চভূতে'র 'ডায়ারি' অভিধা কবি শেষ পর্যন্ত বর্জন করেছিলেন, এ কথা আগেই বলেছি), তার একটি 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', অন্যটি 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। লক্ষ্য করার বিষয়, দুটোই ভ্রমণবিষয়ক। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের আগে ইংরেজীতে যে-সব ডায়েরি লেখা হয়েছে তার এক অংশ ভ্রমণবিষয়ক। যেমন, জেম্‌স বস্‌ওয়েলের 'জার্নাল অব্‌ এ ট্যুর টু দী হেব্রাইড্‌স' (১৭৫৯)। চার্লস ডারুইনের বিখ্যাত বিশ্বপরিক্রমার অভিজ্ঞতাও ডায়েরি আকারে বিধৃত। বাঙলা ভাষায় ভ্রমণ ও প্রবাস-অভিজ্ঞতা বিষয়ক ডায়েরি রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী হলেন 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'-রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রী। এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত দুটি ডায়েরিই ভ্রমণমূলক হলেও এদের রচনার মধ্যে, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধান। কালের এই বিপুল ব্যবধান দুই ডায়েরি-রচয়িতার সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন মানসিকতার পরিচয় বহন করে এনেছে। প্রথমটির মধ্যে লেখকের মনোভাব অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু সহজ ও অবিন্যস্ত। তাঁর সেই পর্বের শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় উৎসলোকের সন্ধান তেমন পাই নে। কিন্তু কবির তেষট্টি বছর বয়সে লেখা 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র চেহারা এর থেকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'-রচয়িতা ছিলেন বিদেশে সম্পূর্ণ অখ্যাত, স্বদেশেও অনতিপরিচিত। সে রচনার আশু মুদ্রণ-সম্ভাবনাও ছিল না। তাই সেখানে নিজের সম্পর্কে অনেকখানি অসচেতন এক সহজ স্বচ্ছন্দ মনের দেখা পাই। কিন্তু 'পশ্চিম-যাত্রী'-র লেখক স্বদেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববন্দিত মহাকবি। তাঁর 'ডায়ারি' যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে, সে সম্পর্কেও কবি নিশ্চয় অবহিত। তাই এখানে ডায়েরি-লেখকের কাছে প্রত্যাশিত নিভৃত আত্ম-উন্মোচন যথার্থভাবে পাই নে, এখানে লেখক যেন যথেষ্ট সচেতন। সেই সচেতনতা তাঁর শব্দ-প্রয়োগে, ভাষাবিন্যাসের কারুকর্মে, ভাবের সুসংবদ্ধতায় ও মননধর্মী তত্ত্বনিষ্ঠায়।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও ডায়েরি হিসাবে 'পশ্চিম-যাত্রী'র নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতা আছে। ভাষায় বা ভঙ্গীতে যে বুদ্ধিদীপ্ত সচেতনতার প্রকাশ দেখি, সে তো কেবল এই গ্রন্থেই নয়, এই পর্বের অর্থাৎ সবুজপত্র-উত্তর পর্বের প্রায় সমস্ত গদ্যরচনায় তা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই ভঙ্গী কৃত্রিম কিছু নয়, এটা কবির এই পর্বের স্বভাবসিদ্ধ রচনারীতি। আলোচ্য 'ডায়ারি'টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটি বিদেশ-ভ্রমণকালে রচিত হলেও কবির অন্যান্য ভ্রমণকথার মত এখানে পথের বা প্রবাসের বিবরণ তেমন মেলে না। কবি এখানে বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে ডুব দিয়েছেন আপন হৃদয়ের গভীরে। ফলে এই গ্রন্থ বহির্বিশ্বের স্থূল ভ্রমণবৃত্তান্ত হয় নি, কবিচিত্তের এক অমূল্য দলিল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, আঁদ্রে জিদের "Voyage au Congo" পড়তে পড়তে জনৈক বিশিষ্ট পাঠকের[১] আবেগতপ্ত সোচ্চার কণ্ঠস্বর— "And

১. প্রখ্যাত ফরাসী লেখক ফ্রাঁসোয়া ম্যরিয়াক।

…I am seized, not by Africa, but by this Gide"। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'-পাঠকেরও প্রায় সেই একই অভিজ্ঞতা— পশ্চিমযাত্রার বিবরণ নয়, পাঠকের সমগ্র চিত্ত অধিকার করে নেন কবি নিজেই। কবি এখানে যেন অনেকটা আত্মস্থ। তিনি নিজের মনের সঙ্গে আলাপে তন্ময়। পরিণত প্রজ্ঞা নিয়ে কবি এক দিকে যেমন রাজনীতি সমাজনীতি আর্ট সাহিত্য নরনারীর প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব ভাবনা করছেন, তেমনি অন্য দিকে জীবন-সায়াহ্নের ছায়ায় দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় মনের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বের গূঢ় অনুভবের মধ্যে আত্মনিমগ্ন হয়েছেন। আর আলোচ্য পর্বের এই গাঢ় গভীর অনুভব থেকেই জন্ম নিয়েছে এই সময়কার অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'পূরবী'র 'পথিক'-অংশের অনেক কবিতার উৎস এই ডায়েরির অনেক ভাব ও ভাবনা। সাবিত্রী, লিপি, ক্ষণিকা, পূর্ণতা, আহ্বান ইত্যাদি অনেক কবিতার নাম করা চলে এ প্রসঙ্গে। দৃষ্টান্ত বিশদ না করে (বলা বাহুল্য, বর্তমান প্রবন্ধ সে উদ্দেশ্যে রচিতও নয়।) পূরবী কাব্যের 'গ্রন্থপরিচয়ে' যা বলা হয়েছে তার অংশবিশেষ শুধু স্মরণীয় : "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ও পূরবীর মুখ্য কবিতাগুলি (কালক্রম অনুসারে 'পথিক' অংশে সন্নিবিষ্ট) একই সময়ে লেখা এবং এরূপ বলিলে ভুল হইবে না যে, উভয় রচনাতে একই প্রকার মানসিক অবস্থার প্রতিফলন হইয়াছে।" আলোচ্য ডায়ারিতে কেবল কয়েকটি কবিতার উৎস ও 'উপকরণ' খুঁজে পাওয়া যায়, এটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না। কবির মনে আপন গূঢ়তম সত্তার যথার্থ অন্তরঙ্গতম পরিচয় লাভের জন্য যে সমগ্র জীবনব্যাপী আত্মজিজ্ঞাসা ছিল, ডায়েরি রচনার নিভৃত অবকাশে স্মৃতির পথ বেয়ে সেই জিজ্ঞাসা ও ভাবনা এক বিস্ময়কর বাণীরূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের দিনলিপি বিশেষভাবে স্মরণীয় : "এমন সময় ঘাটে পড়লুম। একদিন বিকেল বেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা খুশি করে বেড়াচ্ছে।… হঠাৎ… একটা… কথা মনে উঠল যে, ওই ছেলেটা এই অপরাহ্নের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে।… আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা,… এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়। সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ-বেলাকার ?"… এই আত্মমগ্ন অন্তর্গূঢ়তার মধ্যেই ডায়েরির যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ। আর অন্ততঃ সেই অর্থে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' নিশ্চয় দিনলিপি হিসাবে ব্যর্থ সৃষ্টি নয়।

চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের অন্যতম মুখ্য বাহন। পত্রের মধ্যে সাধারণতঃ আমরা খুঁজি সহজ ব্যক্তিমানুষটিকে। পরোক্ষভাবে আরো খুঁজি, যাঁকে উদ্দেশ করে পত্র লেখা, তাঁকেও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পত্রে এই শেষোক্ত ব্যক্তি অনেক সময়েই গৌণ, হয়তো বা প্রায় দুর্লক্ষ্য। এরকম যে ঘটে এর কারণ, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বভাব, তাঁর স্বধর্ম। আসলে আত্ম-সমীক্ষা ও আত্ম-উন্মোচনই ওই-সব পত্রে কবির অন্বিষ্ট। ব্যক্তিগতভাবে পত্রপ্রাপক সেখানে অনেকখানি অপ্রধান। কবিচিত্তের এরকম প্রবণতা চোখে পড়ে জীবনের শেষ পর্ব অবধি। হয়তো 'ভারহীন সহজের রস', কবি যাকে চিঠির যথার্থ রস বলেছেন, তখন ততটা নেই, তবু আত্মমগ্ন মনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির কথাই শেষ পর্বের পত্রগুচ্ছেও পাই। এর একটি দৃষ্টান্ত—'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯২৬-১৯৩৮)। এই পত্রগুচ্ছে কবির মন যথেষ্ট সচেতন, ভঙ্গী অনেক ঘষামাজা, তবু তারই মধ্যে কোনো কোনো চিঠিতে দিনলিপির অন্তরঙ্গ আত্মমগ্ন সুরটি স্পষ্ট। ৮ই

এপ্রিল ১৯৩৫-এর চিঠিটি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় : "মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠির তেতলার নিভৃত ঘরটি— আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে— পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল।"— ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এর ভিতরকার যে nostalgic অনুভূতির নিভৃতি, তা বিশেষভাবে দিনলিপির রস-সংবেদনকেই জাগিয়ে তোলে।

তা ছাড়া এই পর্বে তাঁর চিঠিগুলি যে যথার্থ চিঠি হচ্ছে না, তা তো কবি নিজেই বলেছেন, "অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সেই হালকা চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে— এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই— দাঁড় বেয়ে চলি নে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক একে চিঠি বলে না।" [৪ শ্রাবণ, ১৩৩৬]

'একে' যদি যথার্থ 'চিঠি' না বলি, তবে কী বলব? এই পর্বের চিঠি 'ভারহীন' নয় বটে, তবে এদের অসহজ বা কৃত্রিম রচনা বলা চলে না নিশ্চয়। কবির মনের নিগূঢ় চিন্তার যেগুলি 'উপরকার ঢেউ' মাত্র নয়, তাদের অনিবার্য আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই-সব পত্রাকার রচনায়। বস্তুতঃ কবির শেষপর্বের এই ধরনের রচনায় চিঠির চেয়ে ডায়েরির অন্তর্নিহিত স্বভাবই বেশি প্রকাশ পেয়েছে।[১]

অবশ্য 'ভারহীন সহজের রসে' সিক্ত চিঠি যে কত সার্থক ডায়েরি-ধর্মী রচনা হতে পারে তার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন 'ছিন্নপত্রাবলী'। পত্রগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে ১৮৮৭ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরের মধ্যে, অর্থাৎ কবির ছাব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে লেখা। পত্রগুলি রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় নি। দীর্ঘকাল পরে ১৯১২ খৃস্টাব্দে আংশিক বর্জিত আকারে এগুলি গ্রন্থাকারে ('ছিন্নপত্র' নামে) মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ এগুলির প্রকাশ-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন না হয়েই তরুণ কবি আত্ম-উন্মোচনের গূঢ় প্রেরণায় এগুলি লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, যখন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তখন পত্রগুলি কাকে লেখা তা কোথাও জানানো হয় নি। অর্থাৎ সে ব্যাপারটি যেন অনেকখানি গৌণ। মুখ্যতঃ এটি কবির অন্তরতম কবিসত্তার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত উন্মোচন। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের স্মৃতিকথা বলেছেন, 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তার ঠিক পরবর্তী অধ্যায়ের শিল্পিসত্তার নিভৃত রহস্যরূপটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আর এই দিক থেকে আমরা মনে করি 'ছিন্নপত্রাবলী'র খণ্ড খণ্ড পত্র মূলতঃ 'ডায়েরি'-ধর্মী রচনা, পত্রধর্মী নয়। পত্রের যথার্থ লক্ষণ যে 'আলাপের দ্বৈতরূপ' তা এখানে সর্বত্র তেমন পরিস্ফুট নয়। বরং 'দ্বৈততা'র বহিরঙ্গ আবরণের নীচে দেখি, কবির নিঃসঙ্গ গূঢ় প্রত্যয় ও চেতনাগুলিই যেন আপনাকে নিঃশেষে প্রকাশের আনন্দে তন্ময়। 'ছিন্নপত্রাবলী'র অনেক চিঠি একাদিক্রমে পর পর কয়েক-দিনের (যেমন, ১৭ থেকে ২০ অক্টোবর, ১৮৯৪ প্রত্যহ কিংবা ২৩ থেকে ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৪ প্রত্যহ, ইত্যাদি)। অর্থাৎ যাঁকে লেখা হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশা না রেখেই কবি চিঠি লিখে চলেছেন। এর অর্থ সহজেই অনুমেয়। আসলে চিঠি-লেখা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কবি যেন 'দিনলিপি' লিখছেন। সৌন্দর্য-সম্ভোগ ও জীবন-উপলব্ধির রসে কানায় কানায় ভরে ওঠা কবি-

---

১. চিঠিপত্রের মধ্যে অনেক সময়ে যে ডায়েরি-ধর্ম নিহিত থাকে সে সম্পর্কে আঁদ্রে মরোয়া'র স্বীকৃতিসূচক আর-একটি উক্তি : "Sometimes the writing of letters has the character of an intimate diary, as with Balzac's series 'a´ l´E´trange´re'." —Cassell's *Encyclopaedia of Literature*, Vol I.

চিত্তের আত্ম-উন্মোচনের ব্যাকুলতাই এই-সব 'ডায়েরিধর্মী চিঠি' লিখতে কবিকে প্রেরণা দিয়েছে। আর সেই একই প্রেরণাবেগে সৃষ্ট হয়েছে এই পর্বের অনেক রসোত্তীর্ণ কবিতা ও গল্প। তাদের উৎসমূলে কবির যে গূঢ় অভিজ্ঞতা ও অনুভব তাদের নিশ্চিত সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে এইসব পত্রের নানা অংশে। সেই অর্থে 'ছিন্নপত্রাবলী'কে নিছক ব্যক্তিগত পত্র হিসাবে গণ্য না ক'রে বলা উচিত, 'A writer's notebook' বা ভাষান্তরে 'লেখকের দিনলিপি'— যেখানে লেখকের ভাবীরচনার শস্যবীজ সঞ্চিত হয়ে থাকে, সমরসেট ম'মের ভাষায়, 'storehouse of materials'।

কবি একটি পত্রে লিখছেন: "আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে— আমার চোখে পড়লেই আবার সেই-সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা-কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন-সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়— কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন— যা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই— তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস··· আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব।···আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এ রকম করে গাঁথা নেই।"[১]

এই প্রাসঙ্গিক অংশ থেকেই 'ছিন্নপত্রাবলী'র ডায়েরি-ধর্ম সম্পর্কে কবির পরোক্ষ স্বীকৃতি যেন পাওয়া যায়। এখানে যে সুরটি ফুটে উঠেছে সেটি ব্যাকুল কবিহৃদয়ের একান্ত 'অন্তরঙ্গ' ও ব্যক্তিগত সুর। আর ডায়েরির যথার্থ সার্থকতা তো এই সুরের উপলব্ধি ও আস্বাদের মধ্যেই, এই নিভৃত আত্মনিমগ্ন সত্তার উন্মোচনে, সচেতন মননের প্রহরামুক্ত হৃদয়ের চিত্রাঙ্কনে।

৪

সারা জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় ডায়েরি-রচনার অন্তর্নিহিত মানসিকতা ও ডায়েরির আঙ্গিক-প্রকরণের নানা লক্ষণ— যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে ফুটে উঠেছে— সে সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করলাম। কিন্তু এ-সমস্ত রচনাই সরাসরি ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের লেখা। লেখক ও পাঠকের মধ্যে এখানে কোনো আড়াল নেই। শুধু তাই নয়, এগুলিকে প্রচলিত অর্থে খাঁটি কল্পনাসৃষ্ট 'ক্রিয়েটিভ' রসসাহিত্যের পর্যায়ে বোধ হয় ঠিক ফেলা চলে না। অর্থাৎ এগুলি কবিতা নাটক বা কথাসাহিত্য নয়। এগুলি হয় চিঠিপত্র নয় ভ্রমণকথা, নয়তো বা ক্ষুদ্র নিবন্ধ ইত্যাদি। কিন্তু এই বিশেষ আঙ্গিকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে আপাত-বিরোধিতার নেপথ্যে এমন আকর্ষণ ছিল যে 'ক্রিয়েটিভ' রচনার ক্ষেত্রেও তিনি এই প্রকরণ প্রয়োগের ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন। আধুনিক মননধর্মী ব্যক্তিত্বসচেতন নরনারীর জটিল হৃদয়রহস্যের

১. ছিন্নপত্রাবলী, ১১ই মার্চ, ১৮৯৫ তারিখের চিঠি।

উন্মোচনে একালের ঔপন্যাসিকেরা যে-সব বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন, ডায়েরির মাধ্যম তাদের অন্যতম। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের এমন বাস্তবনিষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য পন্থা বা উপকরণ কথাসাহিত্যে খুব সুলভ নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসে এই প্রকরণের ব্যবহারের দিক থেকে হাক্সলির *Point Counter Point* কিংবা জিদ্‌-এর *La Porte étroite* (*Straight is the Gate*) ও *Les faux monnayeurs* (*The Counterfeiters*) ইত্যাদির নাম স্মরণীয়। ইংরেজ লেখকদের মধ্যে উনিশ শতকের ঔপন্যাসিক উইলকি কলিন্সের উপন্যাস *The Woman in White*-এ আত্মকথার আঙ্গিক প্রথম প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সেই আঙ্গিক সেখানে আত্মচরিত্র-উন্মোচনের চেয়ে আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ঘটনা-বিন্যাসের কাজে বেশি প্রযুক্ত। এই গ্রন্থের অনুসরণে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে যে 'আত্মকথা'র আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে, তা ঠিক 'ডায়েরি' ধরনের নয়। অবিশ্বাস্য অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ ও একটানা আখ্যান-বিবৃতির ফলে এই প্রকরণ সেখানে কখনোই আধুনিক নরনারীর মনস্তত্ত্ব-উদ্ঘাটনের উপযোগী হয়ে ওঠে নি।

১৯১৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এই বিশিষ্ট আঙ্গিকটিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করেন। লক্ষ্য করার বিষয়, সবুজপত্র-পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা নবপর্যায়ের সূচনা হয়েছে, সেই পর্বের একেবারে গোড়ায় পর পর রচিত দুটি উপন্যাসেই এই আঙ্গিক প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ একালে উপন্যাসের মাধ্যমে মানবমনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এই বিশেষ আঙ্গিকটির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কবি যে যথেষ্ট সচেতন তা সহজেই অনুমান করা চলে।

'চতুরঙ্গে' ডায়েরির প্রয়োগ নিতান্ত আংশিক হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। 'শচীশ' অংশের ষষ্ঠ ও দশম পরিচ্ছেদে ডায়েরির ব্যবহার দেখা যায়। এর মধ্যে দশম পরিচ্ছেদে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুহা-দৃশ্যটি কথক (narrator) শ্রীবিলাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সরাসরি উপস্থাপিত না হয়ে শচীশের ডায়েরি আকারে বিবৃত হয়েছে। শচীশের মত নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখী মানুষের এক বিচিত্র গোপন অভিজ্ঞতা বর্ণনায় ওই দৃশ্যে ডায়েরির মাধ্যম একেবারে অপরিহার্য মনে হয়। ওই অংশে (অতিপরিচিত বলে উদ্ধৃতি দিলাম না।) এই বিশেষ আঙ্গিকের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত শিল্পদৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে, সন্দেহ নেই।

সম্ভবতঃ 'চতুরঙ্গে' ডায়েরির আংশিক প্রয়োগ সাফল্যলাভ করাতেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী উপন্যাসটি ('ঘরে বাইরে') পুরোপুরি ডায়েরির আঙ্গিকে লেখার পরিকল্পনা করেন। এই উপন্যাসের বিমলা নিখিলেশ ও সন্দীপের 'কথা', বেশ একটু দীর্ঘ হলেও, আসলে তাদের 'দিনলিপি'রই নামান্তর। এই 'কথা' যে বস্তুতঃ তাদের ডায়েরিই, ডায়েরির মতই এগুলি তারা লিখে রেখেছিল, তার আভাস গ্রন্থের মধ্যে একাধিক স্থানে ছড়িয়ে আছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই:

১. বিমলার কথা: "আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৬৫)

২. সন্দীপের কথা: "এই পর্যন্ত লিখেছি, এগুলো আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরও ফুটিয়ে তোলা যাবে।" (ঐ, পৃ. ২৫২)

"খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম।" (ঐ, পৃ. ২৫৩)

এ ছাড়া, মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখায় ছেদ পড়েছে, কোনো আকস্মিক ঘটনার উদ্ভবের ফলে।

তার পর সেই ঘটনা শেষ হলে, তার বিবরণ দিয়ে আবার ডায়েরি শুরু হয়েছে। এই ধরনের তাৎক্ষণিক ও খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার নিদর্শন— যা ডায়েরির অন্যতম লক্ষণ, 'ঘরে বাইরে'র নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এই-সব তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ও অনুভব সাধারণ ব্যক্তিগত ডায়েরির উপাদানের মতো অবিন্যস্ত ও উদ্দেশ্যহীন নয়। সমস্তই সুনির্বাচিত এবং একটি সমগ্রতার সূত্রে বিধৃত ও বিন্যস্ত— তবু 'ঘরে বাইরে' নিঃসংশয়ে ডায়েরির আঙ্গিক প্রকরণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আগ্রহের একটি সুনিশ্চিত প্রমাণ।

৫

এতক্ষণ ধরে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রজীবনের বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেও আমাদের বক্তব্যকে হয়তো কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে বা সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নে পৌঁছে দিতে পারি নি। বস্তুতঃ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য বর্তমান প্রবন্ধ রচিতও নয়। শিল্পিব্যক্তিত্বের নানা গুহাহিত গোপন তথ্য নির্দেশের কাজে ডায়েরি অনেক সময় একটি মূল্যবান্ ভূমিকা নেয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর 'দিনলিপি'র সে ধরনের 'গুরুত্ব' হয়তো খুব বেশি নেই। (সে রকম 'গুরুত্ব' আরোপের চেষ্টাও আমরা করি নি।) দিনলিপিকে আশ্রয় করে আমরা শুধু একটি বিশেষ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রপথবাহী শিল্পিব্যক্তিত্বের উপর আলোকসম্পাত করতে চেয়েছি। সেই আলোকসম্পাতের দ্বারা শিল্পিস্বভাবের কোনো নতুন পরিচয় হয়তো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে না, তবে সেই স্বভাবের 'আপাত-বিরোধী জটিলতা' সম্পর্কে কিছু আভাস— সব মিলিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল হয়তো উদ্রিক্ত হতে পারে।

রবীন্দ্রমানসের উৎসসন্ধানে সেই 'জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল' নিশ্চয় একেবারে অর্থহীন নয়।

ভাষা পথিক হরিনাথ দে । সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় । অভী প্রকাশন । পনের টাকা ।
Selected Papers: Mainly Indological. Compiled and Edited by Sunil Bandyopadhyaya. Sanskrit Pustak Bhandar. Rs. 25.

বিরল প্রতিভাধর হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১) বাঙালীর চিরকালের গর্বের বস্তু, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় তাঁর সম্বন্ধে লিখিত কোনো প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ পূর্বে আমার চোখে পড়ে নি। হরিনাথ দে-র জন্মশতবর্ষপূর্তি যখন আসন্ন, সৌভাগ্যক্রমে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হল।

জীবনী রচনার নানা রীতি ও পদ্ধতি থাকলেও জীবনী-গ্রন্থগুলি প্রধানত শ্রদ্ধানির্ভর দৃষ্টি নিয়ে রচিত হয়। স্ট্রেচির 'Eminent Victorians' রচনার দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ বলে আজ স্বীকৃত নয়। অলোচ্য বইটিতে লেখক হরিনাথ দে-র জীবনবৃত্ত রচনায় একান্ত শ্রদ্ধাগর্ভ তথ্যনিষ্ঠ মন নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। মাত্র চৌত্রিশ বৎসর মর্তজীবন যাপন করে যিনি লব্ধকীর্তি বহুভাষাবিদ্‌, যিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য রূপে জীবৎকালে স্বীকৃত, সেই কিংবদন্তীকল্প হরিনাথ দে-র প্রামাণিক জীবনী রচনায় লেখক প্রভূত শ্রম স্বীকার করে প্রচুর অনুসন্ধান চালিয়ে জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিবিধ তথ্যসম্ভার আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। Informative তথা objective biography বলতে যা বোঝায় সুনীলবাবুর বইটি তার প্রকৃষ্ট নমুনা। অবিসংবাদী তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য তিনি দেশের ও বিদেশের সকল সম্ভাব্য সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন কিন্তু আহৃত তথ্যগুলিকে নির্বিচারে গ্রহণ বা বর্জন করেন নি। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি তিনি মোটামুটি বজায় রাখতে পেরেছেন, এটাই বড়ো কথা।

সুনীলবাবুর লেখায় ধরা পড়ে হরিনাথের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের মিল। উভয়েই বহুভাষাবিদ্‌, পানাসক্ত ও স্বল্পায়ু। তবে মধুসূদন সর্জন-সিদ্ধ শিল্পী হিসেবে তাঁর মাতৃভাষাকে গৌরবিত করেছেন, হরিনাথ সে দিকে অগ্রসর হন নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গেও লেখক একটি ক্ষেত্রে মিল দেখেছেন হরিনাথ দে-র— দরিদ্র ছাত্র ও দুর্গত ব্যক্তি, আশ্রয়হীন পণ্ডিত ব্যক্তি, হরিনাথের অকৃপণ সাহায্য লাভ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই. সি. এস., হরিনাথ দে অনুরূপ ভাবে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে প্রথম আই. ই. এস.। ঢাকায় ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। জে. ম্যাক্‌ফার্‌লেনের মৃত্যুর পর ১৯০৭ সালে হরিনাথ তৎকালীন ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি) অধ্যক্ষ হন। ১৯১১ সালে ঐ পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি অচিরে পরলোকযাত্রী হন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির তদন্ত শেষ হবার পূর্বেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে সুনীলবাবু বিচার-বিশ্লেষণ অনেক করেছেন। জীবনী-লেখক সব তথ্য অবশ্যই খুঁটিয়ে দেখবেন কিন্তু বিচারপতির মতো তিনি রায় দেবেন না, এটাই সাধারণভাবে গৃহীত রীতি। সেজন্য মনে হয় সুনীলবাবু 'মিড্‌ ভিক্‌টোরীয় ছুৎমার্গে'র বিরুদ্ধে কটাক্ষ বা 'প্রতিভাহীন মাংসলুব্ধ মানুষেরা' ধরনের শব্দ

প্রয়োগ না করলেই ভালো করতেন। উজ্জ্বল প্রতিভা ও প্রশাসন-দক্ষতা দুইয়ের সাযুজ্য বড় মেলে না। 'বুদ্ধের মতো মুখমণ্ডলের অধিকারী' হরিনাথের নিজের চরিত্রের মধ্যেই ট্রাজিক নায়কের মতো আত্মধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল। সে বিষয়ে সুনীলবাবু অনবহিত নন:

> "ভাষাচর্চায় ও জীবনচর্যায় যিনি অভিন্ন, শৃঙ্খলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় যিনি সমপরিমাণে আসক্ত সেই মৃত্যুতে সমাপ্ত অথচ পুনরুজ্জীবনে ভাস্বর হরিনাথ দে আমাদের স্মরণার্হ।"

বইটির 'পরিশিষ্ট' অংশ পাঠকদের বিশেষভাবে লক্ষ করতে অনুরোধ করি।

Selected Papers: Mainly Indological বইটি হরিনাথ দে-র ভারতীয় সাহিত্য -সম্পর্কিত কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার সংকলন। কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে হরিনাথ ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করেন কাওয়েল সাহেবের কাছে। হরিনাথ ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তের ইংরেজি অনুবাদ করেন। অপ্রকাশিত এই অনুবাদগুলি সুনীলবাবু বোধ করি প্রথম সুধীলোচনের সম্মুখে তুলে ধরলেন। এই অনুবাদ মূলানুগত ও সুখপাঠ্য।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের ইংরেজি অনুবাদও হরিনাথ করেছিলেন। সমস্ত নাটকটির অনুবাদাকাঙ্ক্ষা অবশ্যই তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি তো অসমাপ্ত জীবনের কবি। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি পিশেল-সম্পাদিত সংস্করণ গ্রহণ করেছেন। ছন্দ ও মিলবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদ মূলের সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে বলা চলে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। 'কিমিব হি মধুরাণাম্ মণ্ডনং নাকৃতিণাম্' অংশর অনুবাদ দাঁড়িয়েছে—

> So to this maiden doth her dress
> Of bark give greater loveliness.
> To forms that loveliness present
> What may not serve as ornament?

অনুরূপভাবে পালি সাহিত্যের 'ধনিয়া সুত্ত' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গীতের ইংরেজি অনুবাদের কথা উল্লেখ করা চলে। এই সংকলন-গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনাই হরিনাথের প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বিতর্কহীন অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। সংকলনকর্তা তথা সম্পাদক বহু টীকা-টিপ্পনী-যোগে রচনাগুলির মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিস্মৃতপ্রায় মনীষী হরিনাথ দে-র জীবনালেখ্য-রচনায় ও তাঁর বিভিন্ন রচনার সম্পাদনা-কর্মে সুনীলবাবু যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

সাহিত্যলোক। অমলেন্দু বসু। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বসু বিভিন্ন পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেরকম সাতটি এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অমলেন্দুবাবু একদা প্রগতি-কল্লোলে সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী ছিলেন। সে-সব সাহিত্য আন্দোলনে তিনি ধরা দেন নি সত্য কথা কিন্তু বরাবর সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তাঁর ধ্যেয় বস্তু হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় বার হলেও এদের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগসূত্র লক্ষ্য করি। বোধ করি এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বসুর রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কিত বিশেষ কতকগুলি চিন্তা এবং ভাবনা প্রকাশ পাবার সুযোগ পেল। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তার করণকৌশলই লেখককে আকৃষ্ট করেছে। এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহে তিনি রবীন্দ্রচর্চায় গতানুগতিকতা ভেঙে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের দু-পিঠের উল্লেখ করেছেন। দেহ ও আত্মা এ দু পিঠ। এদের মিলনেই সাহিত্যের পূর্ণতা। দেহ ও আত্মা অপৃথক হলেও সমালোচনা শাস্ত্রে দুয়ের পৃথক আলোচনা স্বীকৃত। বাংলা রবীন্দ্রচর্চায় এতাবৎ কাল আত্মার অনুসন্ধানে যত তৎপর এবং গভীর হয়েছে দেহ-আলোচনায় সেরকম মনোযোগ লক্ষ করা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌শিল্পের বিশ্লেষণ কদাচিৎ চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একটুখানি কথাকে প্রকাশ করবার জন্য কত ইশারা কত ভঙ্গি কত কৌশলের আয়োজন। অমলেন্দুবাবু বাক্‌শিল্পের বিশ্লেষণে এই ইশারা ভঙ্গি কৌশলের মনোহারিত্ব ও চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করেছেন। বিষয়টি ব্যাপক এবং বহুধা। রবীন্দ্রকাব্যে ইমেজ বা 'বাক্‌প্রতিমা' ব্যবহারের নিপুণ বিশ্লেষণে শ্রীযুক্ত বসু বাংলা সমালোচকবৃন্দকে উৎসাহিত করেছেন। 'কবির মনোজগৎ মূলে ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রাণ-দৃশ্য-সম্পৃক্ত অনুভূতিতে উদ্‌বুদ্ধ, কবিচিত্ত Sensuous, ইন্দ্রিয়বেদী' (পৃ. ৩)। 'কাব্য ব্যঞ্জনা প্রধানত ইন্দ্রিয়বেদী, তার প্রকাশরূপ বাক্‌প্রতিমায়।' এ দুটি সূত্র ধরেই অমলেন্দুবাবু রবীন্দ্রকাব্যের ইমেজ প্রয়োগের করণ-কৌশল লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমাগুলি কেমন করে আমাদের ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে তোলে, আমাদের সংস্কারের মূলে কিরকম টান দেয় এবং আমাদের অনুভূতি-উপলব্ধিকে কিরকম সুষমা-অভিমুখী করে তোলে লেখকের অন্বিষ্ট তাই। কোনো একটি বাক্‌প্রতিমা একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হয়েও কেমন করে অন্য ইন্দ্রিয়ে তড়িৎ স্পর্শ ঘটায় সে রহস্য সন্ধান করেছেন বারে বারে রবীন্দ্রনাথের গান এবং কাব্য থেকে উদাহরণ দিয়ে। বলা বাহুল্য, অমলেন্দুবাবু সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ইমেজের পরিসংখ্যান নেন নি, কিন্তু তাঁর বিহঙ্গ দৃষ্টিতে এটা নজরে এসেছে যে রবীন্দ্রকাব্যে দৃশ্যেন্দ্রিয় অনুসারী ইমেজই বেশি। চিত্রী রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে না রেখেও রবীন্দ্রনাথ যে ছবি লেখার জাদুকর সে কথা লেখক দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। ব্যাপক অর্থে বাক্‌প্রতিমা কাব্যেরই অলংকার। প্রাচীন আলংকারিকেরা এই অলংকারের স্বরূপ নির্ণয়ে বৈয়াকরণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের বিশ্লেষণে দক্ষতা, নৈপুণ্য স্বীকৃত। কিন্তু আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসা কেবল এই গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ নয়। বৈয়াকরণ নিষ্ঠা এবং রসিক বুদ্ধির সমন্বয়ে কাব্যজিজ্ঞাসার তল খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্যলোকের আলোচনা-গুলিতে এই বোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

অমলেন্দুবাবু বাক্‌প্রতিমার ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য লক্ষ করেছেন তেমনি তিনি দেখিয়েছেন

রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিমাপুঞ্জের সুষ্ঠু প্রয়োগে কেমন করে 'কতকগুলি বিভিন্ন প্রতিমার চূড়ান্তে একই ভাবজগত, তারা সবাই মিলে এক ভাবনারই ইশারা দিচ্ছে।' এইরকম 'প্রতিমাপুঞ্জে একটি বিলম্বিত ভাবনা নানা কবিতার নানা উপাদানে বিস্তার লাভ করে।' গ্রন্থকার লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের জনতাচিন্তায় বিপরীতের সংশ্লেষ যেমন চমকপ্রদ তেমনি সুদূরপ্রসারী। কড়ি ও কোমল, ক্ষণিকা, শেষ সপ্তক থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে তিনি দেখিয়েছেন, 'কবির দোটানা-দোলার ভাবনায় জনতা কখনো সমুদ্রের মতো, কখনো যেন অরণ্য, কথনো কারাগার থেকে মুক্তি, কখনো বা সংগীতমুখর মিছিল।' রবীন্দ্রকাব্যে chain imagery বা প্রতিমা শৃঙ্খলের উদাহরণও 'শিশুতীর্থ' ও 'পত্রপুট' (১০নং কবিতা) 'আরোগ্য' (২নং কবিতা) থেকে সংগ্রহ করেছেন। 'এক প্রতিমার বিশেষ ইন্দ্রিয় সংবেদনা থেকে পরক্ষণেই পাঠক-চিত্ত অপর প্রতিমার অন্য ইন্দ্রিয় সংবেদনার পানে ধাবিত হয়। এমন-কি, একই সঙ্গে তিন চারটি অথবা তদধিক প্রতিমায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সংবেদনার সমন্বয় হয়ে যায়।' জনতা এবং নির্জনতা ভাবনার বৈপরীত্য ঘুচে গিয়েছে এক অখণ্ড সত্তায়। এই সত্তার উপলব্ধি সংকীর্ণায়তন আত্মস্বরূপ থেকে অপরিসীম বিশ্বরূপে মুক্তি।

সাহিত্যলোকে কড়ি ও কোমল কাব্যটি প্রতিটি প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ বেশি মনোযোগ পেয়েছে। সাধারণত 'মানসী'র কাব্যকলায় রবীন্দ্রকাব্যে দৃক্‌পরিবর্তনের সূচনা বলে আমরা জানি। কিন্তু এই গ্রন্থে কড়ি ও কোমল বারবার স্মরণ হওয়াতে বাক্‌প্রতিমা রচনায় গ্রন্থটির একটি বিশেষ স্থান নির্ণীত হল। তা ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প যে কত বৈচিত্র্য এবং ইন্দ্রিয়বেদী সে প্রসঙ্গও লেখক উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তুলনায় তাঁর নিজের রচনার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। এটা নিশ্চয়ই কবির অত্যুক্তি কিন্তু এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য কথা হল কোনো কোনো রচনায় বাংলা সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখকের রচনা বিশ্লেষণ করে শ্রীযুক্ত বসু অবনীন্দ্রনাথের ফ্যাণ্টাসি জগতের রহস্যঘনিমার উন্মোচন করেছেন। অবন ঠাকুরের লেখার মৌলিকতা আবিষ্কারে লেখক যে কয়টি বিশেষ উপাদানের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন তার মধ্যে আরবী-ফার্সী শব্দের কুশল ও নিপুণ প্রয়োগের প্রসঙ্গ অন্যতম। আর চাঁইবুড়োর ঘন ঘন আবির্ভাবে যে কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে এবং তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ফলে সেই কৌতূহল তুঙ্গস্পর্শী হল সে কথা এ গ্রন্থে লেখক সহৃদয় সাহিত্য-জিজ্ঞাসা নিয়ে উদ্‌ঘাটন করেছেন। এ ফ্যাণ্টাসির জগতে শিশু-বুড়ো সকলেরই অবাধ প্রবেশাধিকার। পরিণত মনেরও একটা অংশ ধ্বনি আর ছন্দের কাঙাল। এইটি অবনীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানতেন। তাঁর লেখায় সেই ধ্বনি রঙ ছন্দের মেশামেশি।

শ্রীযুক্ত বসুর লেখায় ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিণত রচনার কথা প্রায়শই উত্থাপিত। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা বিশ্লেষণে ইউরোপীয় কবি-সমালোচকের সিদ্ধান্তগুলি তিনি পরীক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর অধিকার সহৃদয় পাঠকমাত্রেই মান্য করবেন। কখনো কখনো বাংলা সমালোচনায় এ-রকম তৌলন বিচার আরোপিত বলে মনে হয়। আবার বিদেশী লেখকের আপ্তবাক্যচয়ন কখনো কখনো নিজের সাহিত্যের দৈন্যকেই প্রকাশ করবার সুযোগ করে দেন কেউ কেউ। অমলেন্দুবাবুর রচনায় এ দুই মনোভাবের একটিরও পরিচয় নেই। এই লেখায় সর্বদাই স্পষ্ট হয়েছে যে মহৎ সাহিত্য স্থানকালের উর্ধ্বে। এর মধ্যে ভৌগোলিক সংকীর্ণতা নেই। সেজন্যেই বোধ করি শ্রীযুক্ত বসু একই প্রযত্নে উল্লেখ করেন,

'পোর্টম্যান্টে শব্দরাজির এমন নিখুঁত নন্‌সেনস্‌ অবন ঠাকুর ছাড়া আর লিখতে পারতেন সুকুমার রায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আর অবশ্য লিউইস্‌ ক্যারল্‌।' এই মানসিকতা গ্রন্থটির সর্বত্র।

বিজিতকুমার দত্ত

পাদটীকা

রচনার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, মুদ্রণপারিপাট্যেও চমৎকার, এই গ্রন্থের মুদ্রণশুদ্ধি আশানুরূপ নয়— এজন্য একটি শুদ্ধিপত্রের সংযোজন বিহিতই হয়েছে। দুঃখের বিষয় তার বাইরেও একাধিক ছাপার ভুল থেকে গেছে। কয়েকটির উল্লেখ অনুচিত হবে না। দণ্ডচিহ্নের আগে পরে অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ পাঠ, নীচে থেকে গণনীয় হলে ছত্রের সংখ্যা বিন্দুচিহ্নিত।—

পৃ. ৩। ছ. ৫ হাওয়ার/আভার, ৩৭।৭ বিচারের/বিকারের, ৪২।১১ ঝুড়ি/ঝুরি, ৫৬।১১. তোমার/তোর, ৬০।৮. করেছে/করিছে এবং ৬০।৬. "কবির বয়স", 'ক্ষণিকা'/"নগর-সংগীত", 'চিত্রা', ৮৭।৮ সুধা/স্পর্ধা এবং আমার/থামার, ৯১।১৪ 'লেখনী'/'লেখন', ৯৮।৫. চিরতরে/দিবসের। আশা করব শীঘ্রই এ বইয়ের নূতন সংস্করণের প্রয়োজন হবে আর সে সময় প্রুফ দেখাতেও যথোচিত যত্ন এবং সাবধানতার অভাব হবে না।

—সহ-সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

যখন সম্পাদক ছিলাম। শ্রীপরিমল গোস্বামী। রূপা অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা। দাম ষোল টাকা।

পরিমলবাবুর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ 'যখন সম্পাদক ছিলাম'। পূর্ববর্তী চারটি বই— 'স্মৃতি-চিত্রণ', 'দ্বিতীয় স্মৃতি', 'আমি যাঁদের দেখেছি' এবং 'পত্রস্মৃতি'। এদের যোগসূত্র কালানুক্রমিক পর্ববিভাগ দ্বারা চিহ্নিত নয়। যোগসূত্র লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং প্রায় পঞ্চাশ বছরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপট।

বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস যেরূপ দ্রুত রূপান্তরিত হয়েছে, পূর্বে তা কখনো হয় নি। পরিমলবাবুর উল্লিখিত পাঁচটি বই থেকে এই কালখণ্ডে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কেমন ছিল তার একটি রসস্নিগ্ধ উজ্জ্বল বিবরণ পাওয়া যাবে। এ বিবরণ অবশ্যই আংশিক, কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধি স্বভাবতঃই সীমিত। তথাপি তা-ও অনেকখানি। ভবিষ্যতের ইতিহাসকার, বিশেষ করে সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক, তাঁর পরিবেশিত তথ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন।

লেখক সম্পাদনা করেছেন ১৯৩২ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত। তবে এর সূত্রপাত হয়েছিল ছাত্রজীবনে পাবনার সুরাজ পত্রিকায়। তার পরে জাহান-আরা বেগম চৌধুরী -সম্পাদিত বার্ষিক পত্রিকার প্রকৃত সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে পরিমলবাবুর উপর। ১৩৩৯ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে তিনি শনিবারের চিঠির সম্পাদক হন। এ কাজ ত্যাগ করবার পর একে একে সম্পাদনা করেন সচিত্র ভারত, অলকা, নতুন-পত্র ও শিক্ষক। ১৯৪৫-এর মার্চ থেকে যুগান্তর পত্রিকার রবিবাসরীয় সাময়িকী সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

শনিবারের চিঠির দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পাদক জীবনের আরম্ভ। শনিবারের চিঠি, বঙ্গশ্রী, শিক্ষক ও যুগান্তর পত্রিকা কেন্দ্র করে সাহিত্যের আড্ডা গড়ে উঠেছিল। এই-সব আড্ডার

সুযোগে তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। লেখক হিসাবে যশঃপ্রার্থী তরুণ তাঁর কাছে লেখা নিয়ে আসত ; আবার প্রবীণ লেখকদের কাছে সম্পাদককে রচনা প্রার্থনা করতে হত। সুতরাং নবীন প্রবীণ লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সেতুস্বরূপ। লেখকদের মধ্যে ছিলেন নানা বৃত্তির লোক— শিক্ষাবিদ্, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, ব্যবসায়ী, প্রভৃতি। এই বিচিত্র বৃত্তির লেখকগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে পরিমলবাবুর ভাবগ্রাহী মনের ভাণ্ডার নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও শনিবারের চিঠির দৃষ্টিভঙ্গি তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হয়তো যুক্তিযুক্ত ছিল ; কিন্তু দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের হেয় করে দেখাবার প্রয়াস অযৌক্তিক। এই আক্রমণ কিরকম ছিল তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করে দেওয়া হয়েছে শনিবারের চিঠির 'সংবাদ-সাহিত্য' থেকে।

যুগান্তর সাময়িকীর পৃষ্ঠাতেই পরিমলবাবু তাঁর সম্পাদকীয় দায়িত্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পালন করতে চেষ্টা করেছেন। বিচ্ছিন্ন কতকগুলি লেখা ছেপে দেওয়া সহজ কাজ। তাতে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "যুগান্তরের মধ্যস্থতায় এই জাতীয় শিক্ষামূলক নানা বিষয়ের জ্ঞান পাঠক মহলে প্রচারের চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্প, স্বাস্থ্যচর্চা এবং এ-সবের বাইরে প্রতারণার নানা কৌশলের কথাও প্রচার করা হয়েছে যাতে লোকে কিছু সতর্ক হতে পারে।" (পৃ ২৩২)

শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের প্রমাণ রয়েছে যুগান্তর সাময়িকীর পৃষ্ঠায়। এর মধ্যে বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তকে ভুল-প্রমাদের বিরুদ্ধে অভিযান। জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন এই ভ্রমাত্মক কথা আমাদের ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তক থেকে শেখে। যুগান্তরে ক্রমাগত লিখেও নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক এখনো ছাত্ররা পায় না। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাই যে অনেক গলদের জন্য দায়ী তা তিনি দেখিয়েছেন বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন তার সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বিবরণ উদ্‌ধৃত করে। বিদেশ থেকে তাঁর কাছে লেখা চিঠি থেকে এই উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

লেখক তৈরি করা সম্পাদকের একটি প্রধান সামাজিক দায়িত্ব। পরিমলবাবু সে দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করেছেন। বনফুলকে দিয়ে তিনিই লিখিয়েছেন শনিবারের চিঠিতে। রাজশেখর বসুর অগ্রজ শশিশেখরকে দিয়ে বাংলা লেখানোর কৃতিত্ব তাঁর। তা ছাড়া যে-সব তরুণ লেখকদের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়েছেন তাদের উৎসাহ দিয়ে লিখিয়ে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সহায়তা করেছেন।

এই স্মৃতিকাহিনী সম্পাদকীয় দপ্তরের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে নি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শোনা কয়েকটি কাহিনীও দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি লেখকের সম্পাদক থাকাকালীন জীবনের স্মৃতিচারণ। এ-সব কারণে স্মৃতিকথার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, ও একটি কালখণ্ডের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা সম্ভব হয়েছে।

বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি স্নিগ্ধ কৌতুকপ্রবাহ ওতপ্রোতভাবে বয়ে চলেছে। পরিমলবাবুর মতে "সহসা বুদ্ধিবৃত্তিকে ধাক্কা মেরে কাত করে ফেলাই হচ্ছে কৌতুকের কাজ।" (পৃ ১৩৫) তাঁর লেখকদের সঙ্গে পরিমলবাবু নিজেও কিভাবে কৌতুক সৃষ্টির কাজে সক্রিয় ভাবে লেগে যেতেন তার চিত্তা-কর্ষক বিবরণ পাঠকের মনেও কৌতুক সঞ্চার করে। সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে কৌতুকের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ভালোই হয়েছে। না হলে এগুলো হয়তো চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত।

বইপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। এইজন্য আমাদের ইতিহাস নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেও এই স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। তাই পরিমলবাবুর বই পত্রিকা চিঠিপত্র সব-কিছু সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। তিনি এ-সব রক্ষা না করলে এ ধরনের স্মৃতিকথা লেখা সম্ভব হত না। শুধু যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাগজপত্র রেখেছেন তা নয়, অ-নামাদের প্রতিও তাঁর সমান শ্রদ্ধা। তাদের চিঠিপত্রও সযত্নে রক্ষা করেছেন।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। বিষয়কে অতিক্রম করে ভাষা কখনো প্রাধান্য লাভ করে নি। ভাষার প্রসাদগুণ, দু-এক আঁচড়ে চরিত্রচিত্রণ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি, জীবনের সব-কিছু সম্বন্ধে আগ্রহ, কৌতুকপ্রিয়তা, সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব এবং সুন্দর বিন্যাসকৌশল বইটিকে উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক করেছে। আর-একটি বড় গুণ, আত্মকথা বলতে বসেও লেখক নিজেকে যথাসম্ভব পশ্চাতে রেখেছেন; বর্ণিত নরনারী এবং পরিবেশকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে আছেন। আলাদা হয়ে সব-কিছু ছাড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে জাহির করেন নি।

শুধু যে সুখপাঠ্য তা নয়, এ বই থেকে অনেক কিছু জানবার ও ভাববার কথাও পাওয়া যাবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি ॥
বসন্তের ফুলের পরাগে যেই রঙ জাগে,
ঘুম-ভাঙা পিককাকলিতে যেই রঙ লাগে,
যেই রঙ পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্লসপ্তমীর তিথি ॥
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে,
সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝরকল্লোলে,
দক্ষিণসমীরণে ভাসে, পূর্ণিমাজ্যোৎস্নায় হাসে—
সে আমারি স্বপ্নের অতিথি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদা

II মর্সা -া র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা র্সা I র্সা -না না না | মা -া -া -া
ধূ• • স র জী ব নে• র গো • ধূ লি তে • • •

||
I সা -মা মা মা | মা মা মপা -মগা I গা -ঋা সা -া | -া -া -া -া
ক্লা ন্ ত ম লি ন যে• ই স্মৃ • তি • • • • •

I সা সমা মা -া | মা -া -া -াগ I মা -ধা ধা ধনা | না -র্সা র্সা -া
মু ছে• আ • সা • • • সে ই ছ বি• টি • তে •

I র্সা -র্গা র্গা র্গা | র্গা -র্পা র্পা -র্গা I র্গা -াম মা -া | -া -া -া -া
র ঙ্ এঁ কে দে য়্ মো র্ গী • তি • • • • •

II র্সা -র্গা র্গা -া | র্গা -া -া -র্মর্পা I র্গা র্গর্পা র্পা র্মর্গা | র্গা -র্রা র্রা -র্সা I
ব • স ন্ তে • • • •ব্ ফু লে• র প• রা • গে •

I র্সা -না -র্সা -ধা | -না -র্সা -া -ধা I -নধা -না র্সা -া | র্সা -া মা -া I
যে • • • • • • • •• ই র ঙ্ জা • গে •

I সমা -া মা মা | মা মা মা মা I মপা -গা গা -া | -া -া -া -া I
ঘু• ম্ ভা ভা পি ক কা ক লি• • তে • • • • •

I মা -ধা -না -র্সা | র্সর্ঋা -া র্সা -া I র্সা -া মা -া | -া -া -া -া I
যে • • • ই • র ঙ্ লা • গে • • • • •

I { ধা -না না -া | না না না না I না -র্সা -র্রা -র্সা | -নর্সা (-ধা -া -া) } I -ধা ধা না I
যে ই র ঙ্ পি য়া ল ছা য়া • • • •• • • য় য়্ ঢা লে

I র্সা -া র্গা র্গা | -া র্পা র্পা র্পা I র্গা -া মা -া | -া -া -া -া II
শু ক্ ল স প্ ত মী র তি • থি • • • • •

II সা -মা মা মা | মা না মা -া I মা -া মপা মা | মপা -া মা গা I
সে ই ছ বি দো লা খা য়্ র ক্ তে• র হি• ল্ লো লে

I মা -ধা ধা ধা | ধা মা মা -গা I মা -ধা ধা না | না -া না না I
সে ই ছ বি মি শে যা য়্ নি র্ ঝ র ক ল্ লো লে

I ধা -া না না | না না র্সা র্রর্সা I র্সা -া মা -া | -া -া -া -া I
দ ক্ খি ণ স মী র ণে• ভা • সে • • • • •

I সা -মা মা মা | মা -া মপা -গা I গা -ঋা সা -া | -া -া -া -া I
পূ র্ ণি মা জ্যো ৎ স্না য়্ হা • সে • • • • •

I সা সমা মা -া | মা -া মপা গা I মা -ধা ধা -না | না -র্সা -া -া I
সে আ মা র্ স্ব প্ নে• র অ • তি • থি • • • •

I র্সা -র্গা র্গা -া | র্গা -া -া -র্মর্পা I র্গা র্গর্পা র্পা র্মর্গা | র্গা -র্রা র্রা -র্সা I
ব • স ন্ তে • • •র্ ফু লে• র প• রা • গে •

I র্সা -না -র্সা -ধা | -না -র্সা -া -ধা I -নধা -না র্সা -া | র্সা -া মা -া II II
যে • • • • • • • •• ই র ঙ্ জা • গে •

যে প্রেসে বিশ্বভারতী পত্রিকা বরাবর মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল তাহা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং অন্যান্য অনতিক্রম্য বাধায় পত্রিকার কাজ প্রায় দেড় বৎসর বন্ধ ছিল, ফলে অষ্টাবিংশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশে এই বিলম্ব। এজন্য পাঠক ও গ্রাহক -বর্গের কাছে আমরা মার্জনা-প্রার্থী।

সহ-সম্পাদক : শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৭	নীচে থেকে	৪	জিনিষেরাদ অর্শ টা	জিনিষের আদর্শ টা
২৮৩		৩	মেঘনাধবধ	মেঘনাদবধ
২৯৮		৪	সারসনে	সরাসনে
৩১০		১৫	লক্ষ্মণ	মেঘনাদ
৩২০		১৫	দ্ধজয়ের দাবি বাযু	যুদ্ধজয়ের দাবি বা
৩২৩	নীচে থেকে	৬	উদ্ভুত	উদ্ধৃত
৩৪৮		১০	যথার্থ	যথার্থ

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক ॥ শ্রীপুলিনবিহারী সেন
অষ্টাবিংশ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৭৯ - আষাঢ় ১৩৮০

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১

২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীরণজিৎ রায় (ভারতীয়)
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১

৪. প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ রায় (ভারতীয়)
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১

৫. সম্পাদক : শ্রীপুলিনবিহারী সেন (ভারতীয়)
৫৪ বি হিন্দুস্থান পার্ক। কলিকাতা ২৯

৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীপুলিনবিহারী সেন এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

১ জানুয়ারি ১৯৭৬ স্বাঃ পুলিনবিহারী সেন

তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬ হইতে

রণজিৎ রায়, অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চিত্র ও মলাট রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট। ৭/১ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত